রাষ্ট্রতত্ত্ব

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

তৃতীয় খণ্ড

শাসনপদ্ধতি

[গ্রেট বৃটেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র]

(কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংকলিত ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত)

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, এম. এ.

অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা,

'An Introduction to Politics', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), 'অর্থতত্ত্ব', 'ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান',
'প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান',
'বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান'
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রাষ্ট্রতত্ত্ব

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

গ্রেট ব্রিটেন—(Great Britain)

শাসনপদ্ধতির ক্রমবিকাশ (Growth of the Constitution)

গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে-কোন শাসনব্যবস্থা-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তৎপূর্বে গ্রেট বৃটেনের শাসনপদ্ধতির সহিত পরিচয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জগৎ সভ্যতার অগ্রগতিতে ইংরাজ জাতির একটা প্রধান অবদান হইল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন। এইজন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভাকে পৃথিবীর সমুদয় আইনসভার মাতৃস্থানীয়া বলা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও সর্বদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অল্পবিস্তর পরিমাণে গ্রেট বৃটেনের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থা শুধু যে খুব প্রাচীন তাহা নয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, এই শাসনব্যবস্থার অখণ্ড ধারাবাহিকতা। অন্যান্য দেশে তাহাদের অধুনা-প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সহিত পূর্বতন শাসনব্যবস্থার আদৌ কোন যোগসূত্র নাই। সেখানে পুরাতন শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া নূতন শাসনব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে। ফরাসী, জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে পূর্বতন শাসনব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের বর্তমান শাসনব্যবস্থা পূর্বতন শাসনব্যবস্থার বিবর্তনের ফল। গ্রেট বৃটেনে অতীত ও বর্তমান শাসনব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র নষ্ট হয় নাই। রাজনৈতিক কারণে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করিয়া পুরাতন ব্যবস্থাকে

সময়োপযোগী করা হইয়াছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের এই সহজ ও সময়োপযোগী পরিবর্তনশীলতার জন্য গ্রেট বৃটেনে বিনা রক্তপাতে শাসনব্যবস্থার সংস্কার সম্ভবপর হইয়াছে। শাসনব্যবস্থার এই স্বাভাবিক ও সাবলীল গতি বৃটিশ জাতি কোনও দিন কোন কারণে ব্যাহত হইতে দেয় নাই। তাই গ্রেট বৃটেনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও রাজতন্ত্র, রাজার মন্ত্রণাসভা (Privy Council), লর্ডসভা প্রভৃতি শাসনব্যবস্থার অতি প্রাচীন বিভাগগুলি আজও বর্তমান আছে।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের সহিত অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল যে, অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের মত বৃটিশ শাসনতন্ত্র কতকগুলি লিখিত বিধি-নিষেধ দ্বারা সীমায়িত নহে। বৃটিশ শাসনতন্ত্র একটি ক্রমবর্ধমান জীবন্ত শক্তি। জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হইতেছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্র একমাত্র লিখিত আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হয় নাই, পরন্তু লিখিত আইন অপেক্ষা অ-লিখিত প্রথাগত বিধান, বিচারবিভাগীয় অনুশাসন, শাসনকর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা অধিকতরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একাধিক উৎস পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাসী দেশের অনেক লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রেট বৃটেনের কোন নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এইরূপ অভিমতের অসারতা প্রমাণিত হয়।

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাসীদেশের অধিবাসিগণ শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলিতে এক বা একাধিক লিখিত দলিল বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শাসনতন্ত্র শব্দটি একমাত্র লিখিত শাসনতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ব্যাপক অর্থে শাসনতন্ত্র বলিতে লিখিত ও অ-লিখিত—সর্ববিধ বিধি-নিষেধগুলিকে বুঝায়, যদ্দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কোন দেশেরই শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা সম্পূর্ণরূপে অ-লিখিত হইতে পারে না। লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ থাকিতে পারে, অপরপক্ষে অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকিতে পারে। কিন্তু বৃটিশ শাসনতন্ত্র মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র বা ফরাসী দেশের শাসনতন্ত্রের ন্যায় বিধিবদ্ধ এক বা একাধিক দলিলে সীমায়িত নয় বলিয়া গ্রেট বৃটেনে কোন শাসনতন্ত্র নাই একথা বলা অযৌক্তিক।

শাসনতন্ত্র শব্দটির অর্থের পার্থক্যহেতু 'শাসনতন্ত্র-বিরোধী' (Unconstitutional) এই সংজ্ঞাটি গ্রেট বৃটেনে ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্রেট বৃটেন রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা আইনানুগ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার দেশের কোন বিচারালয়ের নাই। পার্লামেণ্টে প্রণীত আইন নীতিজ্ঞান-বিরোধী বা জনমত-বিরোধী অথবা প্রচলিত প্রথা-বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু এই আইনের বৈধতাসম্বন্ধে কেহই প্রশ্ন করিতে পারে না। অপরপক্ষে, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেস-রচিত আইন বা প্রেসিডেণ্টের নির্দেশকে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। বিচারালয় কর্তৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত আইন কার্যকরী হয় না। সুতরাং মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে 'শাসনতন্ত্র-বিরোধী' শব্দটি বে-আইনী অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে 'শাসনতন্ত্র-বিরোধী' শব্দটি নীতিজ্ঞান-বিরোধী বা জনমত-বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু কখনই 'বে-আইনী' অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্রের উৎস (Sources of the Constitution)

গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত—(ক) শাসনতান্ত্রিক আইন (Laws of the Constitution) ও (খ) প্রথাগত বিধান (Conventions of the Constitution)। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি হইল কতকগুলি বিধিবদ্ধ আইনের সমষ্টি, যাহা বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা হয়। কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না, সুতরাং সেগুলিকে আইনের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি নিম্নলিখিত উপাদান লইয়া গঠিত :—

(১) ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র (Certain Charters and Constitutional Landmarks)

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান অংশ কতকগুলি ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র লইয়া গঠিত। ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মহাসনদ, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের অধিকারের আবেদন-পত্র, ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকারের বিল, ১৭০৭ ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের সহিত মিলনের চুক্তিপত্র প্রভৃতি এই

শাসনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ। যদিও উপরি-উক্ত সনদ ও চুক্তিপত্রগুলির অধিকাংশ পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক প্রণীত হয় নাই, তথাপি কেহই এই সনদ-গুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না।

(২) পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন (Statutes)

উল্লিখিত সনদ ও চুক্তিপত্রগুলি ছাড়াও পার্লামেণ্ট সভা-রচিত আইন এই শাসনতন্ত্রকে নানাভাবে পুষ্ট করিয়াছে। নির্বাচনব্যাপার ও সরকারী নানাবিধ কার্যপরিচালনা করিবার নির্দেশদান করিয়া পার্লামেণ্টে যে-সমস্ত আইন রচিত হইয়াছে, সেগুলি বর্তমান শাসনতন্ত্রের একটি বিরাট অংশ। এই আইনগুলির মধ্যে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইন, ১৮৩২, ১৮৬৭ ও ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনগুলি, ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন, ১৯১৮ সালের জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩) বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত (Judicial Decisions)

বিচারপতিগণ বিচারকালে শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত আইনের যেরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন তদ্দ্বারাও শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন ঘটে। বিচারপতি-গণ প্রচলিত আইন বা সনদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার সময় অনেক নূতন আইনের সৃষ্টি করেন। এইরূপে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রায় সকল দেশের শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের উপর বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব সম্পর্কে ডাইসি বলেন যে, এই শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন অপেক্ষা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষাকল্পে বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে। এইরূপে সোমারসেটের মামলায় ইংলণ্ডে দাসত্ব প্রথার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়; হাওয়েলের মামলায় বিচারপতিগণের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয় ও বুসেলের মামলায় জুরীগণের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) প্রথাগত আইন (Common Law)

জাতীয় জীবনের অবশ্যম্ভাবী সহচররূপে কতকগুলি আচারপদ্ধতি ও রীতিনীতি গড়িয়া উঠে। এগুলির দ্বারা জাতীয় জীবন বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনসভা-নিরপেক্ষ রীতিনীতি ও পদ্ধতিগুলি বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃতিলাভ করিয়া আইনের মর্যাদা লাভ করে। গ্রেট বৃটেনে এইরূপ

বহু প্রথাগত আইন শাসনতন্ত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। জুরীর বিচার, বাক্‌স্বাধীনতা ও সভাসমিতি কবিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রথাগত আইনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রথাগত বিধান (Conventions)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রেট ব্রটেনের শাসনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অংশ প্রথাগত বিধানের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ, এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে গঠিত হইয়াছে। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইহার সৃষ্টি হয় নাই। ব্রটেনে যখনই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হইযাছে, তখনই পার্লামেন্ট-প্রণীত শাসনতান্ত্রিক আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রথাগত বিধানের মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। এইজন্য গ্রেট ব্রটেনে রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের সহিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন সংঘাত হয় নাই।

প্রথাগত বিধান বলিতে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত এমন কতকগুলি বিধিনিষেধ বুঝায়, যাহা পার্লামেন্ট-সভা-নিরপেক্ষভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রথাগত বিধানগুলি রাজার, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গের ও শাসনকার্য-পরিচালনায় নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রথাগত বিধানগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা না গেলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমুদয় ব্যক্তি ইহা মানিতে বাধ্য। প্রথাগত শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলি যে শুধু আদালতে বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত তাহা নয়, এই বিধানগুলি ভঙ্গ করিলে শাসনকর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বিচারালয়ের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

প্রথাগত শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয়ঃ—

রাজা ও মন্ত্রিসভা-সম্পর্কিত প্রথাগত বিধান হইল প্রথম শ্রেণী। রাজার ক্ষমতা সম্পর্কে একটি প্রথাগত বিধান হইল যে, রাজা পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক অনুমোদিত বিল নাকচ করিবেন না। এই বিধান অনুযায়ী পার্লামেন্ট সভাকে বৎসরে অন্ততপক্ষে একটি অধিবেশনের জন্য ডাকিতে হইবে। পার্লামেন্টে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের মন্ত্রি-

সংসদ গঠন করিবার অধিকার থাকে ও সেই দলের নেতা রাজা কর্তৃক প্রধান-মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের লর্ড সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইলেও বর্তমানে প্রথাগত বিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীকে কমন্স সভার সদস্য হইতে হইবে। মন্ত্রিসংসদ তাঁহাদের কার্যের জন্য কমন্স সভার নিকট দায়ী এবং এই সভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর একজোটে পদত্যাগ করিতে হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধানগুলি পার্লামেন্ট সভার কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লর্ড সভা যখন প্রধান বিচারালয় হিসাবে আপীল মামলার বিচার করে, তখন নয় জন মনোনীত আপীল লর্ড ব্যতীত অন্য কোন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। কমন্স সভার স্পীকার দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হইলেও নির্বাচনের পর দল-নিরপেক্ষ থাকেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে প্রত্যেকটি খসড়া আইন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবে—এই বিধিটিও প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একটি প্রথাগত বিধান হইল যে, ভোটদাতৃমণ্ডলীর নির্দেশ ব্যতীত সরকার কোন বিতর্কমূলক আইন পার্লামেন্ট সভায় পেশ করিবে না। এই বিধানটি গ্রেট বৃটেনে গণসার্বভৌমত্ব নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধানগুলি গ্রেট বৃটেনের সহিত ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সম্পর্ক নির্ধারিত করে। বহুদিন পর্যন্ত এই সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতা ও চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন পাস করিয়া প্রথাগত বিধানগুলির অধিকাংশকে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্তমানে এই কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রধান মন্ত্রিগণ মধ্যে মধ্যে সম্মেলনে মিলিত হইয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

প্রথাগত বিধানগুলির অনুমোদন (Sanction behind Conventions)

এখানে প্রশ্ন হইল যে, এই প্রথাগত বিধানগুলি আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও কেন মানিয়া চলা হয়? এইগুলি না মানিলেও

ভঙ্গকারীকে কোনরূপ শাস্তিভোগ করিতে হয় না। ডাইসি বলেন, প্রথাগত বিধান অনুসারে যদি শাসনকার্য পরিচালিত না হয় তাহা হইলে এই প্রথাগত বিধানভঙ্গের ফলে শাসনতান্ত্রিক আইন অ-কার্যকরী হইয়া উঠিবে ও ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যাঘাত জন্মিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাইসি বলেন যে, পার্লামেণ্ট সভার যদি বৎসরে অন্ততঃপক্ষে একবার অধিবেশন না হয় তাহা হইলে বাৎসরিক সৈন্য-আইন ও অন্যান্য আয়ব্যয়-সংক্রান্ত আইন পাস হইবে না। অনুরূপভাবে কমন্স সভার আস্থাহীন ও নির্বাচনে পরাজিত কোন মন্ত্রিসংসদ যদি পদত্যাগ না করে, তাহা হইলে এই উভয়ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক সংকট উপস্থিত হইয়া শাসনকার্য ব্যাহত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী বজায় রাখা বা মন্ত্রিসংসদের শাসনকার্য পরিচালনা করা উভয় কার্যই বে-আইনী হইবে এবং শাসনকর্তৃপক্ষের এইরূপ বে-আইনী কার্য বিচারালয়ের নির্দেশ দ্বারা রহিত করা সম্ভব হইবে।

ডাইসি-প্রদত্ত উল্লিখিত যুক্তি প্রথাগত বিধান মানিয়া চলার পক্ষে উপযুক্ত কারণ বলিয়া মনে হয় না। সার্বভৌম শক্তির অধিকারী পার্লামেণ্ট সভা ইচ্ছা করিলে সৈন্য-সংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দ-সম্পর্কে স্থায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। অপরপক্ষে, এমন কতকগুলি প্রথাগত বিধান আছে যেগুলি না মানিলেও আইনভঙ্গ করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লর্ড সভা যখন আপীল মামলার বিচার করে তখন নয় জন মনোনীত আইনজ্ঞ লর্ড ছাড়াও লর্ড সভার অন্য সদস্যগণ উপস্থিত থাকিয়া বিচারকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে আইন ভঙ্গ করা হয় না।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিবার প্রকৃত কারণ হইল জনমতের প্রভাব, আইন ভঙ্গ করিবার ভয় নহে। এই প্রথাগত বিধানগুলি যথাযথভাবে মানিয়া না চলিলে শাসনকার্যে নানাবিধ বিশৃংখলা উপস্থিত হয়। এই বিশৃংখলার জন্য জনমত ক্ষুব্ধ হইয়া শাসকবর্গের প্রতি আস্থাহীন হইবে। ফলে, পরবর্তী নির্বাচনকালে শাসকবর্গ জনমতের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবে। রাজা যদি প্রথাগত বিধানগুলি না মানিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন তাহা হইলে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কমনওয়েলথ-সংক্রান্ত প্রথাগত বিধানগুলি না মানিয়া চলিলে গ্রেট বৃটেনের জাতীয় স্বার্থের হানি হইতে পারে। গ্রেট বৃটেনের আর্থিক ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী

রাখিবার নিমিত্তই কমনওয়েলথ-সম্পর্কিত প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলা একান্ত অপরিহার্য। সমাজের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য-বিধান রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রথাগত বিধানগুলির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যবধান পরিদৃষ্ট হয়, প্রথাগত বিধানগুলি তাহা দূর করিয়া শাসনব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করিয়া কার্যকরী রাখিতে সহায়তা করে। প্রথাগত বিধানগুলির অবর্তমানে শাসকশ্রেণীর পক্ষে জনমত অনুসারে গণতান্ত্রিক আদর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই শাসন-কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংহতি ও সম্মান রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রথাগত বিধানগুলি মান্য করেন।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলা হয় বলিয়া গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রে সহজ পরিবর্তনশীলতা বিদ্যমান আছে। সহজ পরিবর্তনশীলতার জন্য এই শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করিয়া সংস্কার করা সম্ভব। প্রথাগত বিধান-গুলির জন্যই গ্রেট বৃটেনে আজ সার্বজনীন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব হইয়াছে। রাজা কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন—এই প্রথাগত বিধান দ্বারা গ্রেট বৃটেনে আজ গণসার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথাগত বিধানগুলির জন্যই আজ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ গ্রেট বৃটেনের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গ্রেট বৃটেনের মর্যাদা ও শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

আইন ও প্রথাগত বিধান (Law and Conventions)

গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক আইন ও প্রথাগত বিধানগুলির মধ্যে কতিপয় পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, আইনগুলি আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়, অপরপক্ষে প্রথাগত বিধানগুলি আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি হয়। কিন্তু বর্তমানে যাহা প্রথাগত বিধান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে কালক্রমে সেগুলি আইনে পরিণত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ডোমিনিয়নগুলির সহিত গ্রেট বৃটেনের যে রাজনৈতিক সম্পর্ক বহুদিন পর্যন্ত প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ১৯৩১ সালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার আইন পাস হওয়ার ফলে সেই সমুদয় প্রথাগত বিধানের অধিকাংশ আইনে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আইনগুলি

বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা যায়, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বিচারালয় সাহায্যে বলবৎ করা যায় না। তৃতীয়তঃ, আইন আইনসভা কর্তৃক আকস্মিকভাবে প্রণীত হয়, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি সকলের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, প্রথাগত বিধানগুলি প্রচলিত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ধিত হইলেও শেষ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথাগত বিধানগুলিকে ভিত্তি করিয়াই নূতন আইনের জন্ম হয়।

প্রথাগত আইন ও প্রথাগত বিধান (Common Law and Conventions)

প্রথাগত আইন ও প্রথাগত বিধানের কোনটিই আইনসভা কর্তৃক সৃষ্ট নহে। প্রথাগত আইনগুলি বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা যায়, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বিচারালয় সাহায্যে বলবৎ করা যায় না। প্রথাগত বিধানগুলি দেশাচার হইতে উদ্ভূত, অপরপক্ষে প্রথাগত আইনগুলি বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জন্মলাভ করিয়াছে।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Constitution)

(১) গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার এককেন্দ্রীয় (Unitary) শাসনব্যবস্থা। শাসনকার্য-পরিচালনা-সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃটেনের আঞ্চলিক সরকারগুলির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি আঞ্চলিক সরকারগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি বা সংকোচ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার কোন বিভাগ হয় নাই। আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে বৃটিশ পার্লামেন্ট সর্বেসর্বা।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এই শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত ও সহজে পরিবর্তনশীল (mainly unwritten and flexible)। ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মহাসনদ, ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকারের বিল, ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন প্রভৃতি কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক আইন লিপিবদ্ধ হইলেও এই ঐতিহাসিক

শাসনতন্ত্রের একটা বিরাট অংশ প্রথাগত বিধান ও রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনতন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার পরিবর্তনশীলতা। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্র অতি সহজে পরিবর্তন করিতে পারে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত এই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার নিমিত্তে কোনরূপ জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। অন্যান্য অনেক দেশের মত গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। পার্লামেণ্ট সভা উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কে সর্বেসর্বা।

(৩) পার্লামেণ্ট সভার আইনগত প্রাধান্য (Sovereignty of Parliament) বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব। পার্লামেণ্ট সভা সর্ববিধ আইন-প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করিবার ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন-সম্পর্কিত এই অবাধ ক্ষমতা পার্লামেণ্ট সভা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই—এ বিষয়ে পার্লামেণ্টকে স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী বলা যাইতে পারে। বৃটেনের বিচারালয়গুলি পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনগুলির ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই এগুলির বৈধতাসম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয় কংগ্রেস সভা-প্রণীত আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু আইন-প্রণয়ন-বিষয়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টের এরূপ অবাধ ক্ষমতা আছে যে, এ-সম্পর্কে একজন লেখক বলিয়াছেন যে, পার্লামেণ্ট সভা পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ও নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর সব কিছুই করিতে পারে (It can do anything and everything except that it cannot unsex.)।

বর্তমানে পার্লামেণ্ট সভার এই আইনগত সার্বভৌমত্ব কেবিনেট সভার ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীতে পার্লামেণ্ট সভা যে সমস্ত ক্ষমতার বলে শক্তিশালী মন্ত্রিপরিষদের পতন ঘটাইয়াছে, আজ আর পার্লামেণ্ট সভা সে সমস্ত ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী নয়। আইনতঃ পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয়নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা

থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে নানা কারণে এই ক্ষমতাগুলি মন্ত্রিপরিষদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্ট সভা কার্যতঃ শুধু মন্ত্রিসংসদ-নির্ধারিত কার্যক্রমের নিষ্ক্রিয় সমর্থকে পর্যবসিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও, বর্তমান সময়ে জনমতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া পার্লামেণ্ট সভা কোন কার্য করিতে পারে না। ব্রিটেনের জনমত এত সজাগ ও সচেতন যে, পার্লামেণ্ট সভা জনমতের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন না করিয়া কোন আইন-প্রণয়ন বা নীতি-নির্ধারণ করিতে সাহসী হয় না। পার্লামেণ্ট সভা যে-কোন আইন-প্রণয়ন বা বাতিল করিতে পারে, কিন্তু বর্তমান পার্লামেণ্ট পরবর্তী কোন পার্লামেণ্টের অবাধ আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে সংকুচিত করিতে পারে না।

(৪) গ্রেট ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না (No Separation of Powers)। আইনসভা, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগ—এই প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনে রাজা একাধারে শাসনবিভাগের প্রধান ও আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁহার বিচারবিভাগীয় কিছু ক্ষমতাও আছে। লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড সভার সভাপতি, মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য এবং সর্বোচ্চ আপীল আদালতের বিচারপতি। সুতরাং একাধারে তিনি আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের সদস্য ; সুতরাং তাঁহাকে এই তিন প্রকার ক্ষমতারই অধিকারী বলা যাইতে পারে। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের আইনসভার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অনুসারে গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতার এই একত্রীকরণে ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্রিটেনে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের মত সূক্ষ্ম ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি প্রযুক্ত না হইলেও সাধারণভাবে ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না।

(৫) আইনের প্রাধান্য বা আইনের অনুশাসন (Rule of Law) শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ডাইসির মতে আইনের এই অনুশাসন তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ প্রচলিত

আইন ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করে। কোন বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে না বা তাহার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আইনের দ্বারা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়। যদি কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়, তাহা হইলে 'হেবিয়াস্ করপাস্' আইনের বলে বন্দী ব্যক্তিকে কোন আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে ও আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ কোনক্রমে তাহার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনে আইনের চক্ষে সকলেই সমান। সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী সকলেই এক আইন মানিতে বাধ্য ও আইনভঙ্গকারী হিসাবে সকলেই একই আদালতের অধীন। ফরাসী দেশের মত বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের বিচারের জন্য পৃথক আইন বা পৃথক আদালত নাই। তৃতীয়তঃ, অন্য অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা নাগরিক অধিকারগুলি স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়, কিন্তু বৃটেনে নাগরিক অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। বৃটেনে জাতীয় জীবনের নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাগরিক অধিকারগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বিচারালয়গুলি এই স্বতঃস্ফূর্ত অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া ইহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করিয়াছে। অন্য দেশে নাগরিক অধিকারের উৎস হইল শাসনতান্ত্রিক আইন, আর বৃটেনে আদালত কর্তৃক স্বীকৃত ও নির্ধারিত নাগরিক অধিকার হইল শাসনতন্ত্রের ভিত্তি।

ডাইসি-প্রদত্ত আইনের অনুশাসনের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা অধুনা বৃটেনে কতদূর প্রযোজ্য সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। সত্য বটে, ফরাসী দেশের মত বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ বিচারের জন্য স্বতন্ত্র কোন আইন নাই, কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পাবলিক্ প্রটেক্‌শন আইন ও নানাপ্রকার বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের অনেক পরিমাণে সাধারণ আইনের অধিকার বহির্ভূত করা হইয়াছে।

(৬) গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত (Cabinet System) সরকার বর্তমান। শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রেট বৃটেনে বর্তমানে

মন্ত্রিসংসদ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেন্ট সভা কার্যতঃ মন্ত্রি-সংসদের নিষ্ক্রিয় সমর্থক দলে পরিণত হইয়াছে।

(৭) গ্রেট বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) প্রতিষ্ঠিত। রাজা নামেমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু কার্যতঃ তাঁহার ক্ষমতা নানারূপ শাসনতান্ত্রিক আইন ও প্রথাগত বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। বৃটেনের রাজা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না (He reigns but does not govern.)।

(৮) বৃটেনের শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার অবাস্তবতা (Unreality)। ইহার কারণ হইল যে, শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কার্যক্ষেত্রে ঐ নীতির প্রয়োগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশে শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলি ও বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, কিন্তু বৃটেনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুসারে রাজা সমস্ত ক্ষমতার উৎস, তিনি মন্ত্রিগণকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাজার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই।

(৯) বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার অখণ্ড ধারা-বাহিকতা (Unbroken continuity) যাহা অন্য কোন দেশের শাসনতন্ত্রে পরিলক্ষিত হয় না। অন্য দেশের শাসনব্যবস্থায় অতীতের সহিত বর্তমানের আদৌ কোন যোগসূত্র নাই, কিন্তু বৃটেনে রাজা, প্রিভি কাউন্সিল, লর্ড সভা প্রভৃতি শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশগুলি আজ পর্যন্ত অতীতের সহিত বর্তমানের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র প্রমাণিত করিতেছে।

(১০) এই শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহাতে বহু প্রথাগত বিধান স্থান পাইয়াছে এবং এই বিধানগুলি শাসনতন্ত্রের বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সাহায্য করিয়াছে। এই প্রথাগত বিধানগুলির অস্তিত্বের জন্যই এই শাসনতন্ত্রকে অ-লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। এই বিধান-গুলির জন্যই গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কার্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়।

(১১) বৃটিশ শাসনতন্ত্র মূলতঃ বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত (Judge-made Constitution). বলিয়া কথিত হয়। গ্রেট বৃটেনের

নাগরিকগণ আজ যে সমস্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারী তাহার অধিকাংশই বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইয়াছে।

শাসনকর্তৃপক্ষ (The Executive)

গ্রেট বৃটেনের শাসনকর্তৃপক্ষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা,— রাজা, কেবিনেট সভা ও স্থায়ী আমলাতন্ত্র। রাজা হইলেন শাসনকর্তৃপক্ষের নামসর্বস্ব প্রধান, রাজাসহ কেবিনেট সভা হইল রাজনৈতিক ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসনকর্তৃপক্ষ, কেবিনেট সভা হইল প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ এবং কার্যকালের স্থায়িত্বের জন্য আমলাতন্ত্রকে স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়।

রাজা ও রাজতন্ত্র (The King and the Crown)

বৃটিশ শাসনব্যবস্থার মূলগত বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে রাজা ও রাজতন্ত্রের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, সে সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা থাকা প্রয়োজন। গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী রাজা কালক্রমে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ফলে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। রাজার হস্ত হইতে সমুদয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ায় রাজা বর্তমানে একটি ক্ষমতার আধারে পরিণত হইয়াছেন। আইনতঃ রাজাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু কার্যতঃ এই ক্ষমতা তিনি আর এখন নিজ ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতে পারেন না। ক্ষমতাগুলিকে এখন আর রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতা বলিতে পারা যায় না। ক্ষমতাগুলির অধিকারী হইল রাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তি গণশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাই রাজা আজ গণশক্তির ধারকরূপে রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজার ক্ষমতা সার্বজনীন ক্ষমতায় পরিণত হইয়াছে, আর এই সার্বজনীন ক্ষমতা গণ-প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনতঃ রাজার বহুবিধ ক্ষমতা আছে। রাজার ক্ষমতা-গুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :—

(ক) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Executive and Administrative Powers)

রাজা শাসনবিভাগের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। প্রধান-মন্ত্রী ও মন্ত্রিসংসদের অন্যান্য সদস্যদের তিনি নিয়োগ করেন এবং কতিপয়

নির্দিষ্ট কর্মচারী ব্যতীত অন্য সকলকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাজা। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁহার যুদ্ধঘোষণা, শান্তিস্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন করিবার অধিকার আছে। স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব রাজার হস্তে ন্যস্ত। পররাষ্ট্রনীতি-নির্ধারণ, বিদেশে দূতপ্রেরণ ও বৈদেশিক দূতগ্রহণ করাও রাজার অন্যতম কর্তব্য। শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে তিনি আইন কার্যকরী করেন ও সমুদয় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

(খ) আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers)

রাজাসহ পার্লামেণ্ট আইন-প্রণয়ন করিবার অধিকারী। রাজার বিনা সম্মতিতে কোন আইনই বিধিবদ্ধ আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাজা আইন নাকচ করিতে পারেন, কিন্তু ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কালে রাজা কর্তৃক এই ক্ষমতা আর প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া ইহা বর্তমানে অকার্যকরী। রাজার আহ্বানে পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় ও রাজার নির্দেশে পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশন স্থগিত থাকে। তিনি ইচ্ছা করিলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন ও প্রয়োজন হইলে পূর্বতন সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পার্লামেণ্ট পুনর্গঠন করিবার নিমিত্ত নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। সরকারী কর্মচারীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাজা আদেশ জারী করিতে পারেন। এই আদেশগুলিকে সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) বলা হয়।

আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে রাজার এখন আর নিজস্ব বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশসমূহের উপর রাজার জরুরী আদেশ ঘোষণা করিবার বিশেষ ক্ষমতাও সংকুচিত হইয়াছে। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের কাঠামোকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য উহার যে বিস্তারিত বিধানের প্রয়োজন তাহার ভার বর্তমানে রাজশক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনকে বিস্তারিত করিবার যে ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক রাজশক্তির উপর অর্পিত হইয়াছে—ইহা রাজার নিজস্ব ক্ষমতা নহে।

(গ) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers)

রাজশক্তি হইল ন্যায়বিচারের একমাত্র পরিবেশক। রাজা বিচারপতি-

গণকে নিয়োগ করেন ও পার্লামেণ্ট সভার অভিভাষণ-ক্রমেই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ হইতে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করা হয়, সেই আপীলসমূহের বিচার করিয়া প্রিভি কাউন্সিল রাজাকে তাহার মন্তব্য জ্ঞাপন করে এবং রাজা সেই আপীলসমূহের রায় প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত, দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করিবার অথবা দণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করিবার একমাত্র অধিকারী হইলেন রাজা।

(ঘ) বিবিধ ক্ষমতা (Miscellaneous Powers)

রাজা ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ধর্মমহামণ্ডলের তিনিই হইলেন প্রধান। আর্চবিশপ ও বিশপগণকে তিনি নিয়োগ করিয়া থাকেন। রাজা সমস্ত সম্মানের উৎস। যোগ্য ব্যক্তিগণকে তিনি বিবিধ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করেন। তিনি লর্ড উপাধি প্রদান করিয়া কোন ব্যক্তিকে লর্ড সভার সদস্য নিযুক্ত করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, গ্রেট বৃটেনে রাজা আইনতঃ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতাগুলির দুইটি প্রধান উৎস আছে। প্রথমতঃ, পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া (Statutes) রাজার হস্তে বিবিধ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রাজা প্রাচীনকালে যে ক্ষমতাগুলি নিজ ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করিতেন তাহার অধিকাংশই বর্তমানে পার্লামেণ্টের ক্ষমতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু রাজার আদিম বিশেষ ক্ষমতার (Prerogatives) যে অংশ এখনও পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয় নাই, সেগুলি রাজার স্বকীয় ক্ষমতা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে এই দুইটি ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করিবার কোন যুক্তিই নাই। পার্লামেণ্ট-প্রদত্ত ক্ষমতাই হউক আর রাজার স্বকীয় ক্ষমতাই হউক, রাজা স্বয়ং নিজ ইচ্ছানুসারে কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে পারেন না।

রাজার মৃত্যু নাই (The King never dies)

রাজার ক্ষমতাগুলি আলোচনা করিলে ইহা অনুমান করা যায় যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিহিসাবে রাজা ও শাসকপ্রধান হিসাবে রাজশক্তির একটি পার্থক্য বিদ্যমান। এডওয়ার্ড, জর্জ প্রভৃতি হইলেন নির্দিষ্ট ব্যক্তি,

যাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ে গ্রেট বৃটেনের রাজকীয় উত্তরাধিকার আইন অনুসারে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অপরপক্ষে রাজতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠানবিশেষ, যাহাকে সর্ববিধ রাজশক্তির ধারক ও নিয়ামক বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষ রাজার মাধ্যমেই এই সমুদয় রাজশক্তি মন্ত্রিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজা শুধু স্বাক্ষরকারী যন্ত্র হিসাবেই শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। এইজন্য বলা হয় যে, গ্রেট বৃটেনের রাজার মৃত্যু নাই। মানুষ হিসাবে কোন ব্যক্তি অমর হইতে পারে না। ব্যক্তি হিসাবে বৃটেনের রাজারও মৃত্যু হয় এবং এক রাজার মৃত্যুর পর অন্য ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে এক রাজার মৃত্যু হইলে রাজকীয় ক্ষমতার অবসান হয় না। রাজকীয় ক্ষমতা পরবর্তী রাজার নামে মন্ত্রিসংসদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। সুতরাং রাজার মৃত্যু নাই বলিলে বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত রাজার মৃত্যুতে রাজকীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা কোনক্রমেই ব্যাহত হয় না।

রাজা কোনরূপ অন্যায় করিতে পারেন না (The King can do no wrong)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা কোন অন্যায় কার্য করিতে পারেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে কোন অন্যায় কার্যের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না। রাজাকে দোষী করিয়া কোন আদালতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, রাজার অন্যায় কার্যের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ আনয়ন করা না যায় তাহা হইলে কেহ না কেহ এই অন্যায়ের জন্য দায়ী হইবেন। বৃটেনে আইনের অনুশাসন বর্তমান থাকার জন্য কোন অপরাধী বিনা বিচারে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। সুতরাং রাজার নামে অনুষ্ঠিত অন্যায় বা অপরাধের জন্য কাহাকেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই নীতি কার্যকরী হওয়ার ফলে বৃটেনে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসংসদের উদ্ভব হইয়াছে। রাজার নামে প্রচারিত প্রত্যেকটি নির্দেশ কোন-না-কোন মন্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত হয় ও এই নির্দেশের জন্য মন্ত্রিগণ দায়ী হইয়া থাকেন। যেহেতু রাজার নিজস্ব কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার নাই, সেইহেতু কোন কার্যের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না। যে কর্মচারীর দ্বারা বে-আইনী কার্য সম্পাদিত

হয়, তাঁহাকেই অভিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন রাজকর্মচারীই অন্যায় বা বে-আইনী কার্য করিয়া রাজার আদেশের অজুহাতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। রাজা নিজে যখন অন্যায় কার্য করিতে পারেন না তখন স্বভাবতই তাঁহার অন্যায় আদেশ প্রদান করিবারও ক্ষমতা নাই। সুতরাং বৃটেনে কোন সরকারী কর্মচারী রাজাদেশের দোহাই দিয়া বে-আইনী কার্যের জন্য নিষ্কৃতি পায় না।

রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার কারণ (Reasons for the Survival of Monarchy)

রাজার ক্ষমতা আলোচনা করিলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই উঠে যে, ক্ষমতাবিহীন নামসর্বস্ব রাজতন্ত্র বজায় রাখিয়া গ্রেট বৃটেনের কি লাভ! অন্যান্য দেশে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডেও এই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিলে জাতীয় ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। ইহা ছাড়া, বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে পুরাতন ব্যবস্থা-সম্মত রাজতন্ত্র অচল। সুতরাং কোন দিক দিয়াই এই রাজতন্ত্রের সমর্থন পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার অনেকগুলি কারণ প্রদর্শিত হয়। ইংরাজ জাতি নানাবিষয়ে প্রগতিশীল হইলেও রক্ষণশীলতা তাহাদের জাতীয় চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতীয় চরিত্রের এই রক্ষণশীলতার জন্যই তাহারা রাজতন্ত্ররূপ একটি অতি সুপ্রাচীন ও তাহাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠানটির বিলোপ সাধন করে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ইংলণ্ডে কোন দিনই গণতন্ত্রের প্রসারকে ব্যাহত করে নাই। রাজার ব্যক্তিগত সমুদয় ক্ষমতাই বর্তমানে রাজতন্ত্রের উপর আরোপিত হইয়া গণশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। বস্তুতঃ রাজার ক্ষমতাগুলি এখন জনসাধারণের শক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে। তাই রাজতন্ত্রের সহিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন বিরোধ হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, রাজতন্ত্র ঈশ্বরানুমোদিত শাসনব্যবস্থা—এই বিশ্বাস এখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের মনে কার্যকরী আছে। এই বিশ্বাসই রাজতন্ত্র শাসনব্যবস্থার প্রতি সাধারণের একটি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিয়া

শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ়তর রাখিতে সমর্থ হয়। সাধারণ লোকে আজও পর্যন্ত রাজার উপর একটি অতি-মানবীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বা একদলীয় নায়ক জনসাধারণের নিকট হইতে এতটা আনুগত্য বা বশ্যতা দাবী করিতে পারে না। সুতরাং রাজতন্ত্র ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, বাস্তবতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান অপরিহার্য। রাজার পরিবর্তে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় একজন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী শাসকপ্রধান রাজপদে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট সভার সর্বময় কর্তৃত্ব লোপ পাইবে ও বৃটেনের বহু শতাব্দী ধরিয়া অর্জিত গণসার্বভৌম আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে, ফরাসী দেশের পর রাষ্ট্রপতির ন্যায় একজন নামসর্বস্ব ও নিষ্ক্রিয় রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিযুক্ত হন, তাহা হইলেও অবস্থার উন্নতি দূরে থাকুক, নিকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে। সুতরাং দেখা যায় যে, রাজার পরিবর্তে উপযুক্ত অন্য কোন শাসকপ্রধানের অভাবহেতু রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন করা হয় নাই।

পঞ্চমতঃ, সমগ্র জাতীয় জীবনের উপর রাজতন্ত্র বহুকাল হইতে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও জাতীয় জীবনের সামাজিক ও নৈতিকক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। জাতীয় জীবনে রাজা হইলেন উচ্চতর আদর্শের প্রতীক। রাজার অবর্তমানে জাতীয় জীবনের এই আদর্শ মান ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে।

ষষ্ঠতঃ, বেজহটের মতে রাজার এখনও পর্যন্ত তিনটি প্রধান ক্ষমতা অব্যাহত আছে। রাজা মন্ত্রিসংসদকে নিষেধ করিতে পারেন, উৎসাহিত করিতে পারেন এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন। এই তিনটি ক্ষমতার বলে রাজা মন্ত্রিবর্গকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন এবং জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন। একথা সত্য যে, মন্ত্রিমণ্ডলী রাজার অনুরোধ ও নির্দেশ

পালন করিতে বাধ্য নহে। কিন্তু রাজা যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন ও তাঁহার পরামর্শ যদি যুক্তিযুক্ত হয় তাহা হইলে মন্ত্রিসংসদের পক্ষে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করা অসম্ভব হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রিসংসদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা রাজার পরামর্শ অনেক সময় অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রিসংসদ সাময়িক কালের জন্য শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা একটা নির্দিষ্ট দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করেন। অপর-পক্ষে রাজা হইলেন সম্পূর্ণরূপে দল-নিরপেক্ষ। তিনি স্থায়ী শাসক, সুতরাং, শাসনব্যাপারে তাঁহার অধিকতর অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি দ্বারা মন্ত্রিবর্গকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারেন। বর্তমানে রাজার কোন স্বকীয় ক্ষমতা না থাকিলেও তাঁহার যথেষ্ট পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। এই প্রভাব-প্রতিপত্তি, দল-নিরপেক্ষতা ও অগাধ অভিজ্ঞতার জন্য রাজা জাতীয় স্বার্থের প্রধান রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যখন গুরুতর মতভেদ দেখা যায়, তখন রাজাই নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন মতের সমন্বয়সাধন করিয়া জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। সুতরাং পরামর্শদাতা হিসাবে জাতীয় জীবনে রাজার অবদান উপেক্ষণীয় নহে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজা এই বহুজাতি-সমন্বিত বিশাল আয়তনের (বৃটিশ) কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ঐক্যের একমাত্র যোগসূত্র। ডোমিনিয়নগুলি বর্তমানে কার্যতঃ স্বাধীন। ডোমিনিয়নগুলি সম্পর্কে রাজা বর্তমানে যে সামান্য কার্য করেন তাহা ডোমিনিয়ন মন্ত্রিসংসদের পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হয়। ইহা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে, এই বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতীক হিসাবে রাজার বিশেষ গুরুত্ব আছে। রাজার অবর্তমানে কমনওয়েলথের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হইবে। ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হইলেও কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে ইংলণ্ডের রাজাকে কমনওয়েলথের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই আলোচনা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, রাজা শুধু নামসর্বস্ব নিষ্ক্রিয় শাসকপ্রধান নহেন, বাস্তবক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। জাতীয় আয়ের যে অংশ রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য ব্যয় করা হয়, বৃটিশ জাতি সে ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়া মনে করে না।

প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ: কেবিনেট (Cabinet—The Real Executive)

প্রিভি কাউন্সিল (The Privy Council)—গ্রেট বৃটেনে শাসনকার্য প্রকৃতপক্ষে কেবিনেট সভা কর্তৃক পরিচালিত হইলেও এই সভাকে আইন-সম্মত শাসনকর্তৃপক্ষ বলা যায় না। কেবিনেট সভার ক্ষমতার উৎস হইল প্রিভি কাউন্সিল। ব্যক্তিগতভাবে রাজা যখন স্বকীয় শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিতেন তখন রাজার যে মন্ত্রণাসভা ছিল তাহাকে প্রিভি কাউন্সিল বলা হইত। স্টুয়ার্ট রাজাদের শাসনকালে প্রিভি কাউন্সিল সর্ববিষয়ে অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠে ও সর্ববিষয়ে রাজার পরামর্শদাতা হিসাবে কার্য করিতে থাকে। কালক্রমে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, জরুরী অবস্থায় রাজাকে পরামর্শ দিবার জন্য ইহার কার্যকারিতা বহুপরিমাণে নষ্ট হয়। সেইজন্য প্রিভি কাউন্সিলের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সদস্য লইয়া ক্ষুদ্র একটি মন্ত্রণাসভা গঠিত হয় এবং এই সভা কালক্রমে কেবিনেট সভায় পরিণত হয়। কেবিনেট সভা গঠিত হইবার পর মূল সভা প্রিভি কাউন্সিলের কার্যকারিতা বহুপরিমাণে হ্রাস পায়। বর্তমানে মূল সভার আইনসিদ্ধ অস্তিত্ব থাকিলেও মন্ত্রণাসভা হিসাবে ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। ইহা এখন নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে এই সভার সদস্যসংখ্যা প্রায় তিনশত তিরিশ। এই সভার সদস্যগণ রাজা কর্তৃক আজীবন সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়া থাকেন। কেবিনেট সভার প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যসমূহ এই সভার সদস্য মনোনীত হন। এতদ্ব্যতীত, রাজ-পরিবারের সদস্য, ক্যান্টারবেরী ও ইয়র্কের আর্চ বিশপদ্বয়, ডোমিনিয়নগুলির প্রধান মন্ত্রিগণ এবং যুক্তরাজ্যের যে সমস্ত ব্যক্তি কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও এই সম্মানসূচক পদে নিযুক্ত করা হয়।

রাজার অভিষেক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা অন্য কোন বিশেষ আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে এই সভার সদস্যগণ মিলিত হইয়া থাকেন। বর্তমানে এই সভার কার্য কয়েকটি বিশেষ সংস্থার দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই সংস্থাগুলির মধ্যে শিক্ষাসংস্থা, কৃষিসংস্থা ও বিচারকার্য-পরিচালনার সংস্থা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল সপরিষদ

রাজাদেশ (Orders-in-Council) প্রবর্তন করা। কিন্তু সপরিষদ রাজাদেশ জারী করিতেও ৪।৫ জনের অধিক সদস্য উপস্থিত থাকেন না। মাত্র তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই আইনানুমোদিতভাবে কার্য পরিচালিত হয়। প্রিভি কাউন্সিলের সমুদয় কার্য পরিচালনারও দায়িত্ব সভার লর্ড প্রেসিডেন্টের হস্তে ন্যস্ত। তিনি আবার কেবিনেটের সদস্য।

কেবিনেট সভা (The Cabinet)

রাজার মন্ত্রণাসভা বলিয়া গণ্য হইলেও বহুদিন পর্যন্ত কেবিনেট সভা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে কেবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তৃতীয় উইলিয়ম ও রাণী অ্যানের রাজত্বকালে কেবিনেট সভা আইনতঃ না হইলেও কার্যতঃ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর প্রথম জর্জের রাজত্বকালে কেবিনেট সভার সভাপতি হিসাবে রাজা অপসারিত হইবার ফলে প্রধান মন্ত্রিপদের সৃষ্টি হইল। ওয়াল্‌পোল প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেট সভার সভাপতি হইয়া এই সভাকে অনেক পরিমাণে ইহার বর্তমান পদমর্যাদায় উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কমন্স সভায় পরাজিত হইয়া ওয়াল্‌পোল্ প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া কেবিনেট প্রথায় একটি নূতন নীতি প্রবর্তন করেন। কেবিনেট যতদিন পর্যন্ত আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের আস্থাভাজন থাকিবে ততদিন পর্যন্ত ইহার সভ্যবৃন্দ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন। আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিসংসদের সভ্যগণের পদত্যাগ বাধ্যতামূলক হইবে। এইরূপে পার্লামেন্ট সভার নিকট মন্ত্রিদায়িত্বের প্রবর্তন হইল।

বিংশ শতাব্দীতে কেবিনেট সভার সংগঠনে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধকার্য যাহাতে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল হইতে প্রতি-নিধি লইয়া সর্বদলীয় কেবিনেট (Coalition Cabinet) সভা গঠিত হয়। পূর্বে কেবিনেট সভার কার্যসূচীর কোন লিখিত বিবরণ রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই উদ্দেশ্যে কেবিনেটের একটি দপ্তরখানা (Secretariat) সৃষ্টি হয়। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এক

নূতন ধরণের জাতীয় সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই ব্যবস্থা শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রবর্তন করেন। এই জাতীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, মন্ত্রিসংসদ সর্বদলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলেও বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি মন্ত্রিগণ তাঁহাদের বক্তৃতা ও ভোটদান দ্বারা অপর দলের মন্ত্রিগণের বিরোধিতা করিতে পারিতেন। এই প্রথা অবশ্য জাতীয় প্রয়োজনে সাময়িকভাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে কেবিনেট সভার আরও কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে। সর্বদলের নেতাকে সরকার গঠনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া ছাড়াও আর একটি অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীই পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে কার্য করেন। দক্ষতার সহিত যুদ্ধকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত এই সময় প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁহার দলীয় নেতৃত্বের ভার অপর একজন কেবিনেট সদস্যের উপর ন্যস্ত করিয়া যুদ্ধ-কার্য পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপে জাতীয় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কেবিনেট সভা ইহার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

কেবিনেট সভার গঠনপদ্ধতি (Composition of the Cabinet)

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পর রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে কেবিনেট সভা গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকেই সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়। এই প্রধানমন্ত্রী তাঁহার অন্যান্য সহকর্মী সদস্যদের নামের তালিকা রাজার নিকট পেশ করেন। রাজা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। অন্যান্য মন্ত্রিনির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার খুশীমত কার্য করিতে পারেন না। মন্ত্রিসভার সদস্যনির্বাচনে বিভিন্ন ব্যক্তির রাজনৈতিক মতামত, দলের সংহতি-রক্ষার কার্যে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির গুরুত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয়। দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণ যাহাতে কেবিনেট সভায় স্থান পান সেদিকেও তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সহায়ক বিষয়গুলির প্রতিনিধিত্বের দাবীও তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হয়।

সাধারণতঃ কুড়ি হইতে পঁচিশ জন সদস্য লইয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বিশেষ আইনবলে এই সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ তিনজনকে লর্ড সভার সদস্য হইতে হইবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নৌ, স্থল ও বিমান-বাহিনী, এই তিনটি বিভাগ তিনজন পৃথক মন্ত্রীর পরিবর্তে একজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে আনীত হইয়াছে। কেবিনেটের সদস্যসংখ্যা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

বৃটিশ কেবিনেট প্রথার বৈশিষ্ট্য (Features of the British Cabinet)

(১) একই নীতির সমর্থক একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয় (Political Homogeneity)। মতানৈক্য ঘটিলেও কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন না। আপৎকালে একাধিক দলের প্রতিনিধি লইয়া সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তখনও জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁহাদের সম-মতাবলম্বী হইতে হয়।

(২) কেবিনেট সভার সহিত আইনসভার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান (Close correspondence between the executive and the legislature)। কেবিনেট সভার সদস্যগণকে অবশ্যই পার্লামেণ্ট সভার সদস্য হইতে হইবে। পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের প্রধানগণকে লইয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয়। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকরী হয় নাই।

(৩) আইনসভার নিকট মন্ত্রিমণ্ডলীর যৌথ দায়িত্ব এই শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য (Collective responsibility of the ministry)। মন্ত্রি-সংসদের সভ্যগণ যতদিন পর্যন্ত কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের আস্থাভাজন থাকেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিদায়িত্বের বিশেষত্ব হইল যে, মন্ত্রীরা যৌথভাবে তাঁহাদের কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব পাস হইলে সমস্ত মন্ত্রীকে একসঙ্গে পদত্যাগ করিতে হয়।

(৪) বৃটিশ কেবিনেট প্রথার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার ঐক্যবদ্ধ ভাব (Unity and Solidarity of the Cabinet)। এই ঐক্য ও সংহতির

উপর কেবিনেট শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সদস্যবৃন্দ শুধু যে এক রাজনৈতিক মতাবলম্বী হইবেন তাহা নহে, পার্লামেন্ট সভা সম্পর্কে সর্ববিষয়ে তাঁহাদের একমত হইতে হইবে। কেবিনেট সভার অধিবেশনকালে তাঁহাদের মতবিরোধ ঘটিতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাদের মতভেদের পরিচয় তাঁহারা দিতে পারিবেন না।

(৫) কেবিনেটের এই ঐক্য ও সংহতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কার্যকরী হয় (Leadership of the Prime Minister)। অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাঁহাদের দলের নেতার পরামর্শ ও নির্দেশ মানিয়া চলেন। কেবিনেটের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন ও মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে প্রধানমন্ত্রীই আলাপ-আলোচনার দ্বারা মতানৈক্যের নিরসন করিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপর কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের ভার থাকে না। তিনি সমগ্র শাসনব্যবস্থার তদারক করেন। যদি কোন মন্ত্রী কোন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত হইতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যতামূলকভাবে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে পদত্যাগ করিয়া সমগ্র কেবিনেট সভার পতন ঘটাইতে পারেন। সুতরাং কোন মন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত হওয়া অথবা পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

(৬) কেবিনেট সভার কার্যসূচীর গোপনীয়তা রক্ষা করা বৃটিশ কেবিনেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য (Secrecy of the Cabinet meetings)। কেবিনেট সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু এই মতভেদের কথা বা তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিষয় যদি প্রকাশ পায় তাহা হইলে শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা সূচিত হয়। এইজন্য গোপনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কেবিনেটের কার্যকলাপ-সম্পর্কে কোন কিছু প্রকাশ পাইলে তৎসংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পদত্যাগ করিবার বহু নজীর আছে।

(৭) কেবিনেট সভায় রাজার অনুপস্থিতি (Exclusion of the King) একটি লক্ষণীয় বিষয়। কেবিনেট রাজার পরামর্শ সভা হইলেও রাজা নিজে এই সভার কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। শাসনকার্য-পরিচালনা করিবার কার্যকরী নীতি রাজার অনুপস্থিতিতে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

কেবিনেট ও মন্ত্রিসংসদ (The Cabinet and the Ministry)

ইংলণ্ডে কেবিনেট সভা ও মন্ত্রিসংসদের মধ্যে একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রিসংসদ কেবিনেট সভা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত। সাধারণতঃ কেবিনেট সভার সদস্যসংখ্যা কুড়ি হইতে পঁচিশ-এ সীমাবদ্ধ থাকে, আর মন্ত্রিসংসদে সাধারণতঃ ষাট-সত্তর জন সদস্য থাকেন। কেবিনেট সভার সমুদয় সদস্য মন্ত্রিসংসদের সদস্য থাকেন, কিন্তু মন্ত্রিসংসদের সমুদয় সদস্য কেবিনেটের সদস্য নহেন। কেবিনেট সভার সদস্য ছাড়াও ইংলণ্ডের অ্যাটর্নি-জেনারেল, সলিসিটর জেনারেল, পার্লামেণ্টের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ, রাজপরিবারের পাঁচজন কর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ লইয়া মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই ইঁহাদের সকলকে নিযুক্ত করেন। কেবিনেট সভার প্রধান কার্য হইল শাসন-সম্পর্কিত বিষয়-সমূহের নীতি নির্ধারণ করা, কিন্তু মন্ত্রিসংসদের নীতিনির্ধারণ-ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নাই। কেবিনেট সভার নিয়মিত অধিবেশনের মত মন্ত্রিসংসদের কোন অধিবেশন হয় না। কেবিনেট সভার অনুরূপ ইহাদের কোন যৌথ দায়িত্বও নাই। কেবিনেট সভা পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসংসদের সদস্যবৃন্দেরও পদত্যাগ করিতে হয়। তবে মন্ত্রিসংসদ আইনসম্মত সংস্থা আর কেবিনেট একটা প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা।

কেবিনেটের কার্যাবলী (Functions of the Cabinet)

(১) শাসনপরিচালনা-সম্পর্কিত কার্য :—

বর্তমানে শাসনকার্য পরিচালনার-কার্যকরী শক্তি কেবিনেটের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কেবিনেটের ক্ষমতাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে : (১) পার্লামেণ্ট সভার নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্য শাসননীতি নির্ধারণ করা, (২) পার্লামেণ্ট সমর্থিত নীতি অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা এবং (৩) শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের সীমা-নির্ধারণপূর্বক তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা ও সামঞ্জস্য বিধান করা।

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করা কেবিনেটের একটি প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। রাজতন্ত্রে আরোপিত

সমুদয় ক্ষমতাই বর্তমানে কেবিনেট দ্বারা পরিচালিত হয়। কি নীতি ও পদ্ধতিতে এই রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালিত হইবে, কেবিনেট সভা তাহা নির্ধারণ করে। কেবিনেটের কার্যে রাজা আর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।. তবে কেবিনেট সভার শাসন-সংক্রান্ত সমুদয় সিদ্ধান্ত রাজাকে জানাইতে হয় এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলে এই সময়ে তিনি তিনটি উপায়ে উহার উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। শাসনবিভাগীয় কার্য কেবিনেট সদস্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক সদস্য নিজ-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ, কেবিনেট সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগের কার্য স্বাধীন-ভাবে পরিচালনা করেন। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান করিতে হইলে বিভাগীয় প্রধান বিষয়টি সমগ্র কেবিনেটের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। ইহার কারণ হইল কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের কার্যের জন্য যৌথভাবে দায়ী থাকেন।

(২) আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক কার্য—

কেবিনেট শুধু শাসনকার্য পরিচালনা করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নহে, আইন-প্রণয়ন-সম্পর্কেও ইহা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট সভার নূতন অধিবেশনের পূর্বে রাজা স্বয় জাতীয় সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজার এই বক্তৃতার মধ্যে ভবিষ্যৎ আইন-সংক্রান্ত কর্মসূচীর আভাস থাকে। এই রাজকীয় বক্তৃতা কেবিনেট কর্তৃক রচিত হয়। পার্লামেণ্ট সভায় আইনের খসড়া উত্থাপিত হয় সাধারণতঃ মন্ত্রীদের দ্বারা। বিভিন্ন বিষয়ে আইনের খসড়া-প্রণয়ন, পার্লামেণ্টে পেশ করা ও পার্লামেণ্ট দ্বারা সমর্থিত করিয়া আইন পাস করা কেবিনেটের প্রধান কার্য। পার্লামেণ্টের বে-সরকারী সদস্যগণ আইনের খসড়া উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু কেবিনেট সভা অনুমোদন না করিলে সে খসড়ার আইনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এতদ্ব্যতীত কেবিনেট সভা পার্লামেণ্টের কার্যসূচী নির্ধারণ করিয়া বে-সরকারী সদস্যদের আইনের খসড়া উত্থাপনের সুযোগ সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারও একপ্রকার কেবিনেটের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন। সরকারী আয়ব্যয় পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ হইলেও পার্লামেণ্ট সভা আয়ব্যয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে না। আইন-

প্রণয়ন-ব্যাপারে কেবিনেটের আর একটি ক্ষমতা আছে। পার্লামেন্ট সাধারণতঃ যে আইন প্রণয়ন করে তাহা খুব কমক্ষেত্রেই সবিস্তারে বর্ণিত থাকে। সময়ের অভাবে পার্লামেন্ট সভা শুধু আইনের কাঠামো প্রস্তুত করিয়া দেয়। তারপর কেবিনেট স-পরিষদ রাজাদেশ দ্বারা ঐ মূল আইন-গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে।

গ্রেট ব্রটেনে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতি কার্যকরী না হওয়ার ফলে কেবিনেট সভা ও পার্লামেন্ট সভার মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা আছে। কেবিনেটের সমুদয় সদস্যই পার্লামেন্টের সদস্য। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারা মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া সংখ্যাধিক্যের বলে তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক নীতি এবং কার্যক্রম বলবৎ করিতে পারেন। কেবিনেট পার্লামেন্ট সভার নিকট তাহার কার্যের জন্য দায়ী। কমন্স সভার আস্থা হারাইলে কেবিনেটের পতন ঘটে। তবে বর্তমানে কেবিনেট ও পার্লামেন্টের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচন করা হয়। কেবিনেট-অনুসৃত নীতি জনগণ সমর্থন করে কিনা তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে এই নূতন নিবাচনের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং বতমানে কেবিনেট সভাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতৃগণের নিকট দায়ী হইতে হয়। ভোটদাতৃমণ্ডলীর নির্দেশ অনুসারে নূতন কেবিনেট গঠিত হয়।

কেবিনেট কমিটি (Committees of the Cabinet)

গ্রেট ব্রটেনের কেবিনেট সভাকে একদিক দিয়া প্রিভি কাউন্সিলের একটি বিশেষ সংস্থা বলা চলে, অপর দিক দিয়া কেবিনেট হইল আইনসভার সংখ্যা-গরিষ্ঠদলের একটি বিশেষ সংস্থা। কিন্তু এই বিশেষ সংস্থাটি দ্রুত দক্ষতার সহিত ইহার গুরু কার্যভার নিষ্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় ছোট ছোট কমিটি গঠন করিয়া এই কমিটির সাহায্যে কাজ করে। যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কাজের জন্য কেবিনেট কমিটি গঠন করিয়া কমিটির হস্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অর্পণ করে। এই কমিটিগুলি সাধারণতঃ কতিপয় কেবিনেট সদস্য ও বে-সরকারী কেবিনেট-বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ সদস্য লইয়া গঠিত হয়। বর্তমানে এইরূপ কতকগুলি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটিগুলির নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পেশ করা

হয়। দেশরক্ষা কমিটি, উৎপাদন কমিটি, আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কমিটি প্রভৃতি হইল স্থায়ী কমিটির পর্যায়ভুক্ত। স্থায়ী কমিটিগুলি ব্যতীত সাময়িক সমস্যা সমাধানকল্পে অনেক সময় অস্থায়ী কমিটিও গঠিত হয়। অস্থায়ী কমিটিগুলি নির্ধারিত বিষয়ে অভিমত প্রদান করিলে তাহাদের কার্যকাল শেষ হয়। তবে স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটিগুলি যে অভিমত প্রদান করে কেবিনেটের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে। সুতরাং কেবিনেটের এই বিশেষ সংস্থাগুলিকে নিছক পরামর্শদাতা সংস্থা বলা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থার গুণ হইল যে, বিশেষ বিষয়ে কেবিনেট সভা বিশেষজ্ঞের অভিমত পাইতে পারে এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বে-সরকারী সদস্যগণও শাসন নীতি নির্ধারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা জন-সাধারণের সহিত শাসকশ্রেণীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

কেবিনেটের সহিত রাজার সম্পর্ক (The Cabinet in relation to the Crown)

রাজার মন্ত্রণাসভা হিসাবেই কেবিনেটের জন্ম ও রাজাকে পরামর্শ দান করাই হইল কেবিনেটের প্রধান কর্তব্য। রাজা প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য সদস্যদেরও তিনি নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিমণ্ডলী একযোগে রাজাকে পরামর্শ দান করেন ও যৌথভাবে তাঁহার নিকট আইনতঃ দায়ী। বর্তমানে রাজার সহিত কেবিনেটের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্কে পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্বে রাজা কেবিনেটের পরামর্শমত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। বর্তমানে শাসনকার্য পরিচালনা করে কেবিনেট সভা এবং রাজা ইচ্ছা করিলে শাসনকার্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে কেবিনেটকে পরামর্শ দান করিতে পারেন। কেবিনেটের পক্ষে সে পরামর্শ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে। সুতরাং রাজার নিকট কার্যতঃ কেবিনেটের কোন দায়িত্ব নাই।

কেবিনেটের সহিত আইনসভার সম্পর্ক (The Cabinet in relation to the Legislature)

গ্রেট বৃটেনে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা হয় নাই। কেবিনেট সভার সদস্যগণ আইনসভার

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিপত্তিশালী সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হয়। সুতরাং কেবিনেটের সমুদয় সদস্যকেই আইনসভার সদস্য হইতে হয়। এ-দিক দিয়া দেখিতে গেলে কেবিনেটকে আইনসভার একটি বিশেষ সংস্থা বলা হয়। কেবিনেট পার্লামেন্টের বিশেষ করিয়া কমন্স সভার নিকট তাহার কার্য ও নীতির জন্য দায়ী। কমন্স সভার আস্থাহীন হইলে কেবিনেট সদস্যদের পদত্যাগ করিতে হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের পর রাজনৈতিক ক্ষমতাসমূহ রাজার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া পার্লামেন্টের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। এই ক্ষমতার বলে পার্লামেন্ট সভা আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ এবং কেবিনেট সভার কার্যনিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত ব্যাপারে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিল। কেবিনেটের গঠন ও কেবিনেটের পতন পার্লামেন্ট সভার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কেবিনেট আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিত বটে, কিন্তু কেবিনেটের প্রত্যেকটি কার্য পার্লামেন্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল এবং পার্লামেন্ট সভার অনাস্থা প্রস্তাবে বহু প্রতিপত্তিশালী কেবিনেটের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে পার্লামেন্টের আর সে ক্ষমতা নাই। বর্তমানে পার্লামেন্ট কেবিনেটের কার্যকলাপে সম্মতি দান করিবার একটা যন্ত্রবিশেষে পরিণত হইয়াছে। নীতিগতভাবে পার্লামেন্টের এখনও মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যের উপর পূর্ণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পার্লামেন্ট আর সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। ধীরে ধীরে পার্লামেন্টের সমুদয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। পার্লামেন্ট শুধু নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কার্যতঃ কেবিনেটই সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। পূর্বে কেবিনেট সভা পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিত ও পার্লামেন্টের ইচ্ছার উপর কেবিনেটের স্থায়িত্ব নির্ভর করিত। অধুনা আইনসভা হইতে উদ্ভূত কেবিনেট আইনসভাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। আইনসভার আজ্ঞাবহ কেবিনেট আজ আইনসভার প্রভুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

কয়েকটি কারণে আজ কেবিনেটের এই প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ও সেই অনুপাতে পার্লামেন্ট সভার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। কেবিনেট সভার সহিত মতবিরোধ ঘটিলে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিবার ক্ষমতাই হইল কেবিনেটের হস্তে কমন্স সভাকে স্বমতে আনিবার একটি

প্রধান অস্ত্র। নূতন নির্বাচনের ফলাফল অনিশ্চিত। ইহা ছাড়া, কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিলে সদস্যগণ যে বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইংলণ্ডে সার্বজনীন ভোটাধিকার-প্রথা বর্তমান থাকার ফলে কোন নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে কোন একটি রাজনৈতিক দলের সাহায্য ব্যতীত নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডে খুব কঠোরভাবে দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা হয়। দলের সমর্থকগণ দলের নেতার নির্দেশ অমান্য করিলে তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবনের অবসান অবশ্যম্ভাবী। ইহা ছাড়া, এরূপ অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দলের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন যে, তাঁহাদের নির্দেশ অমান্য করিবার মত ব্যক্তিত্ব দলের সমর্থকগণের মধ্যে বিরল। তাই পার্লামেণ্ট সভায় দলের নেতা প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে যখন কোন আইন প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন বা আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে বা বৈদেশিক নীতিতে কোন পরিবর্তন আনয়ন করিতে সংকল্প করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী-নির্ধারিত নীতি দলের সমর্থকগণের বিবেকবুদ্ধিসম্মত না হইলেও দলীয় সংহতি বজায়রাখিবার জন্য তাঁহারা ইহা সমর্থন করিয়া থাকেন। কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, কি রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্ববিষয়ে কেবিনেট সভার প্রাধান্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ প্রশ্ন করিতে পারেন, সমালোচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সমালোচনা বিশেষ কার্যকরী হয় না। পার্লামেণ্ট সভার কার্যসূচী কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সুতরাং বে-সরকারী সদস্যগণের বক্তৃতা দিবার সময় সীমাবদ্ধ। আবার বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করিবারও নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এইরূপে নানাপ্রকারে বর্তমান পার্লামেণ্ট সভা শুধু মূক দর্শকের অভিনয় করিতেছে। যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া রাজার নিকট হইতে পার্লামেণ্টের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট সভার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার একটা প্রধান কারণ হইল ইংলণ্ডে শিক্ষিত ও সচেতন জনমতের অভ্যুদয়। জনমত বর্তমানে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের কর্তব্য শেষ করে না—জনমত প্রত্যক্ষভাবে শাসনপরিচালনা কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কেবিনেট সভা এই জনমতের প্রাধান্যের সুবিধা লইয়া প্রত্যক্ষভাবে জনমতের নিকট তাহার কার্যের জবাবদিহি করে। কেবিনেট সভা যদি জনমতকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে তাহা হইলে

পার্লামেণ্ট সভার সমর্থনের উপর তাহাকে একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিপত্তি ও সংহতি অসম্ভব-রূপে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেণ্ট সভার সদস্যগণের স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। দলের নেতার নির্দেশ সকল সময়েই অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই পার্লামেণ্টের আজ আর কোন কার্যের অনুপ্রেরণা নাই, ইহা শুধু যন্ত্রচালিতের ন্যায় সম্মতি দান করে।

বৃটিশ কেবিনেটের একনায়কত্ব (Dictatorship of the Cabinet)

বৃটিশ কেবিনেট সভার ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে দেখা যে, কি শাসন-ব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সর্ববিষয়েই কেবিনেটই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয়। যত সময় পর্যন্ত কেবিনেট পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট থাকে, তত সময় কেবিনেটই হইল সর্বেসর্বা। দলীয় শাসনের বিধি-নিষেধগুলি দলের সদস্যগণের উপর এরূপ কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় যে, সদস্যগণ তাঁহাদের বিবেক, বিচারবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া অন্ধভাবেই দলীয় অনুশাসন মান্য করিতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক দলের সদস্যগণের এই অন্ধ ও অবিমিশ্র আনুগত্যের ফলে বর্তমানে পার্লামেণ্টের সদস্যগণের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়া কেবিনেটের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া কেবিনেট আজ একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, শাসন-নীতি নির্ধারণ ও ইহার প্রয়োগ সব কিছু ক্ষমতাই আজ কেবিনেটের হস্তে কেন্দ্রীভূত। সত্য বটে, কেবিনেট সব কিছু কাজই পার্লামেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া করে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পার্লামেণ্ট কেবিনেট-প্রস্তাবিত ও কেবিনেট-অনুসৃত নীতি ও কার্য সমর্থন না করিয়া পারে না। কারণ কেবিনেট ইচ্ছা করিলে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারে। কমন্স সভা ভাঙ্গিবার ফলে সদস্যগণের শুধু পদচ্যুতি ঘটে না, তাঁহারা তাঁহাদের বেতন ও ভাতা হইতে বঞ্চিত হন এবং নূতন নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হয়। দলীয় সমর্থন ব্যতীত ইংলণ্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে সদস্যগণ তাঁহাদের দলপতিগণ (কেবিনেট সদস্য) কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ের বিরোধিতা করিতে সাহসী হন না। ইহা ছাড়া, কেবিনেটের সমর্থন

ও সাহায্য না পাইলে কোন বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল পাস হইতে পারে না। পার্লামেন্টের প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনের প্রথমে কেবিনেট রাজা কর্তৃক প্রদত্ত বাণী (Speech from the Throne) প্রস্তুত করে এবং কেবিনেট-অনুসৃত নীতি-সম্বলিত এই বাণী পার্লামেন্ট সভা পরোক্ষ-ভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কেবিনেট আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেন্টে পেশ করে এবং দলীয় সমর্থন সাহায্যে পাস করাইয়া লয়। পার্লামেন্টের কার্যসূচীও কেবিনেট প্রস্তুত করে এবং বিরোধী দলের দীর্ঘ সমালোচনা ও বাদানুবাদ রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নানাপন্থা অবলম্বন করে। বর্তমানে পার্লামেন্টের একমাত্র কাজ হইল কেবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা। কোন বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কোন কিছুর প্রস্তাব করার ক্ষমতা পার্লামেন্ট কেবিনেটের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। সত্য বটে, পার্লামেন্টের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা এখনও পর্যন্ত আছে কিন্তু এই ক্ষমতা বর্তমানে এক প্রকার নিষ্ফল। পূর্বে কেবিনেট পার্লামেন্টের আজ্ঞাবহ ছিল কিন্তু বর্তমানে পার্লামেন্ট কেবিনেটের আজ্ঞাবহ হইয়াছে।

সুতরাং কেবিনেটই হইল সমগ্র শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। এখন প্রশ্ন হইল যে, কেবিনেটের এই সর্বময় কর্তৃত্বের উৎস কোথায়? কেন সমগ্র জাতি কেবিনেটের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে? কেবিনেটের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা কি বৃটিশ গণতান্ত্রিক আদর্শকে সংকুচিত করে নাই?

এ প্রশ্নের উত্তর হইল যে, বৃটিশ কেবিনেটের সর্বময় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও গ্রেট-বৃটেনে পার্লামেন্টরী শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্থাৎ জনমতের প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত সবক্ষমতার আধার কেবিনেটও জন-মতের উপর নির্ভরশীল। কোন প্রধানমন্ত্রীই ক্রমাগত জনমত উপেক্ষা করিতে পারেন না। পার্লামেন্টের সহিত মত বিরোধ ঘটিলে তাঁহাকে ভোট-দাতাগণের বিচারালয়ে আবেদন করিতে হয় এবং এই সার্বজনীন আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধবিজয়ী প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতি স্বীকার করিয়া প্রধান-মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে ইজিপ্ট আক্রমণ করিবার অপরাধে জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী এন্টনী ইডেনকেও পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং ইংলণ্ডে কেবিনেটের একনায়কত্ব গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা

ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া, বিরোধীদলের সমালোচনাও কেবিনেটের একনায়কত্বের অন্যতম অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়।

মন্ত্রিগণের দায়িত্ব (Ministerial Responsibility)

মন্ত্রিগণের দায়িত্ব ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, মন্ত্রিগণ রাজার নিকট দায়ী। কিন্তু এই দায়িত্ব শুধু নাম মাত্র—প্রকৃত নহে, কারণ মন্ত্রিগণ যতদিন পর্যন্ত আইনসভা পার্লামেন্টের আস্থাভাজন থাকেন ততদিন পর্যন্ত রাজা তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিগণের একটি পারস্পরিক দায়িত্ব আছে। বিভাগীয় নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত করিতে হইলে প্রত্যেক মন্ত্রীরই তাঁহার সহকর্মী অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া কাজ করিতে হয়। কারণ একজন মন্ত্রীকে যদি আইনসভায় পর্যুদস্ত হইয়া পরাজয় বরণ করিতে হয়, তাহা হইলে এই একজনের পরাজয় সমগ্র মন্ত্রিসভার পরাজয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিগণ কমন্স সভার নিকট দায়ী এবং মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বলিলে কমন্স সভার নিকট তাঁহাদের দায়িত্বের কথাই বুঝায়।

মন্ত্রিগণের দায়িত্বের অর্থ হইল যে, মন্ত্রিগণ তাঁহাদের অনুসৃত নীতি ও কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল যে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে অকুণ্ঠভাবে সমগ্র পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত-ভাবে হয়ত একজন সদস্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু পার্লামেন্টের সহিত বা জনমতের সহিত সম্পর্কে বিরুদ্ধমতাবলম্বী মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা কখনই সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। গুরুতর মত-বিরোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রমিক-নেতা র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কেবিনেটের এই চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম ঘটে। এই সময়ে সাময়িক কালের জন্য মন্ত্রিগণের যৌথ-দায়িত্ব বলবৎ হয় না। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া এই সময়কার মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং এই বিভিন্ন দলের মন্ত্রিগণের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে তাঁহাদের বক্তৃতা ও ভোট দ্বারা অপর দলের মন্ত্রিগণের বিরোধিতা

করিতে পারিতেন। কিন্তু সাময়িক কালের জন্য মন্ত্রিগণের যৌথ-দায়িত্বের এই ব্যতিক্রম দ্বারা ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণের সুপ্রতিষ্ঠিত যৌথ-দায়িত্বের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় নাই। আইনসভার সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ একটি একক ও অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কার্য পরিচালনা করে। আইনসভা যদি কোন একজন মন্ত্রীর কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে অথবা কোন মন্ত্রী কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাব আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত হয় ও মন্ত্রিপরিষদ একসংগে পদত্যাগ করে। গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিগণের পার্লামেণ্ট সভার নিকট এই দায়িত্ব প্রথাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, অসদাচরণ বা কু-শাসনের ফলে দোষী হন তাহা হইলে এই মন্ত্রী বিশেষের ত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভা দায়ী হইতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই এককভাবে পদত্যাগ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মিঃ মণ্টেগুর, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে স্যার স্যামুয়েল হোরের ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডল্‌টনের পদত্যাগ উপরি-উক্ত নীতির পরিচায়ক।

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি (Position and Powers of the Prime Minister)

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রেট বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রীর সমকক্ষ আর দ্বিতীয় কোন রাষ্ট্রনায়ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধানমন্ত্রী কার্যতঃ স্ব-নির্বাচিত নেতা। তাঁহাকে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা নির্বাচিত হইতে হয়। সংখ্যা-গরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবেই তিনি রাজা কর্তৃক আহূত হইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হইলে গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য সম্পাদন করা অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রীকে রাজা, কেবিনেট সভা, তাঁহার নিজ দল—আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, বিরোধী দল ও দেশের জনমত—এতগুলি পক্ষের সহিত যোগসূত্র রাখিয়া রাষ্ট্রনায়কের কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রিপদের গুরুত্ব অপরিসীম।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী এই প্রধানমন্ত্রীর পদ আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে। রাজস্ববিভাগের প্রথম লর্ড হিসাবে তিনি বেতন পাইয়া থাকেন ও এই বেতনের পরিমাণ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের রাজমন্ত্রী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী তাহার মূল উৎস হইল তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর স্বীয় দলসম্পর্কে কতকগুলি কর্তব্য আছে। দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিয়া তাঁহাকে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে দলের নীতি ও কার্যক্রম এইরূপভাবে স্থির করিতে হইবে যে, দলীয় নীতি জনপ্রিয় হইয়া জনসমর্থন লাভ করিতে পারে। এজন্য শুধু জনমতের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা করিলে তাঁহার কর্তব্য শেষ হয় না, অনেক সময় জনমতকে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন হয়। নির্বাচনের পর দলীয় কার্যক্রম ও নীতির দ্বারা জনমতকে সন্তুষ্ট রাখাও প্রধানমন্ত্রীর গুরু-দায়িত্ব। পার্লামেন্টের অনুমোদন অপেক্ষাও জনমতের অনুমোদনের উপর কেবিনেটের স্থায়িত্ব অধিকতরভাবে নির্ভর করে।

কমন্স সভায় প্রধানমন্ত্রী হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা। তাঁহার নির্দেশেই পার্লামেন্টের সমুদয় কার্য পরিচালিত হয়। অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানগণ তাঁহাদের বিভাগসম্পর্কিত আলাপ-আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সমগ্রভাবে কেবিনেট সভা-অনুসৃত কার্যক্রমের অধিকর্তা হিসাবে পার্লামেন্টে দলীয় নীতি সমর্থন করেন। সমুদয় বিভাগীয় কার্যসম্পর্কে তিনি দলীয় নীতি পার্লামেন্ট সভায় বিশ্লেষণ করেন। কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। পার্লামেন্ট সভার সভাপতি-নির্বাচন ব্যাপারে ও বিভিন্ন কমিটির সদস্য-নির্বাচন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। পার্লামেন্ট সভার কর্মসূচীও তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিরোধী দলের নেতার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা প্রধানমন্ত্রীর গুরু-দায়িত্ব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলগুলির সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহাদের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে বিরোধী দলগুলির সহিত সম্মিলিতভাবে কেবিনেট গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা তাঁহার কর্তব্য।

সাধারণ নির্বাচনের পর দলের নেতা হিসাবে তাঁহাকেই কেবিনেট সভার অন্যান্য সদস্যদের মনোনয়ন করিতে হয়। তিনিই কেবিনেট সভার সভাপতি হিসাবে সমুদয় বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। কেবিনেটের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার সমপদস্থ সহকর্মী হইলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয় ও তিনি পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন হয়। অন্যান্য মন্ত্রিদের পৃথক্‌ভাবে পদত্যাগের প্রয়োজন হয় না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অপর মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই কেবিনেট সভার ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নহেন, সেজন্য তাঁহার পক্ষে বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাহাদের তদারক করা সহজসাধ্য হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সহিত রাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনিই রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। প্রধানমন্ত্রীই রাজার সহিত কেবিনেটের প্রধান যোগসূত্র ও তাঁহার মাধ্যমেই পারস্পরিক মতামত বিনিময় হয়। শাসনকার্য পরিচালনা-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় প্রধানমন্ত্রী রাজাকে জ্ঞাত করান। লর্ড সভা ও প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা, সম্মানসূচক পদবী বিতরণ করা, কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীই রাজাকে পরামর্শ দান করিয়া থাকেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আলোচনা করিয়া ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারী ব্যক্তির অসীম যোগ্যতা ও কর্মকুশলতা থাকা চাই। প্রধানমন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, কর্তব্যবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সর্বোপরি সহনশীলতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতার উপর শাসনকার্যের সাফল্য নির্ভর করে; বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রীপদের অধিকারীর যোগ্যতার উপরেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পরিমাণ নির্ভর করে। গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতার উপর যে শুধু দেশের শাসনকার্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহা নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ দেশ খুব কম আছে যাহার সহিত বৃটেনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক

রাজনীতির ক্ষেত্রেও গ্রেট বৃটেন যে মর্যাদার অধিকারী তাহাও বহুলাংশে তাহার প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

এই বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেও প্রধানমন্ত্রীকে স্বৈরাচারী শাসকের সহিত তুলনা করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁহার নির্ধারিত কার্যকাল পাঁচ বৎসর। তারপর তাঁহাকে পুনরায় জনমতের সমর্থন লাভ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার প্রাধান্যের অবসান ঘটিবে। পার্লামেণ্টে যতদিন তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন ততদিনই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্ররূপ তরণীর কর্ণধার থাকিতে পারেন।

কেবিনেট সভা ভাঙ্গিয়া দিবার পদ্ধতি (How a Ministry is ousted)

পূর্বে নানাকারণে কেবিনেটের পতন ঘটিত। বর্তমানে অবশ্য ইহার কোনটিই কার্যকরী নয়। প্রথমতঃ, আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিতর্কের সময় যদি কমন্স সভায় কোন মন্ত্রীর বেতন নামমাত্র হ্রাসের প্রস্তাব পাস হয়, তাহা হইলে একযোগে কেবিনেটের সমুদয় সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেবিনেটের সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত কোন প্রস্তাব যদি কমন্স সভা কর্তৃক পাস না হয় তাহা হইলে কমন্স সভার এই অসম্মতি অনাস্থাপ্রস্তাবের পরিচায়ক মনে করিয়া কেবিনেটের পতন হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও যদি কোন বে-সরকারী সদস্য-উত্থাপিত আইনের খসড়া পাস হয়, তাহা হইলেও মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিতে পারে। চতুর্থতঃ, যদি কোন মন্ত্রীবিশেষের বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব পাস হয়, সেক্ষেত্রেও কেবিনেটের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, কেবিনেট-অনুসৃত নীতির উপর যদি সমগ্রভাবে অনাস্থাপ্রস্তাব পাস হয়, তাহা হইলেও কেবিনেটের পতন হইতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, রাজা স্বয়ং মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বর্তমানে এ ক্ষমতার উল্লেখ না করিলেও চলে। অধুনা কেবিনেট যদি পার্লামেণ্ট সভায় তাহাদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত না হয়, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন।

শাসনবিভাগসমূহ (The Administrative Departments)

কেবিনেট সভা সমগ্রভাবে শাসননীতি নির্ধারণ করে এবং কেবিনেটের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংশ্লিষ্ট নীতি কার্যে রূপদান করে। প্রত্যেক বিভাগেরই একজন বিভাগীয় প্রধান থাকেন। এই বিভাগীয় প্রধান সাধারণতঃ কেবিনেট সভার একজন সদস্য থাকেন এবং তাঁহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য তিনি পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী থাকেন। বিভাগীয় প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন কর্মসচিব থাকেন—একজন অস্থায়ী (Parliamentary under-secretary), আর একজন স্থায়ী (Permanent under-secretary)। স্থায়ী কর্মসচিব হইলেন ইংলণ্ডের শাসনবিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারী। মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিলেও স্থায়ী কর্মসচিবের পদত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু অস্থায়ী কর্মসচিব হইলেন মন্ত্রী-সংসদের (Ministry) সদস্য—কেবিনেটের পরিবর্তন ঘটিলে তাঁহাকেও পদত্যাগ করিতে হয়। বৃটিশ শাসনব্যবস্থার চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কোন বিভাগীয় প্রধান যদি কমন্স সভার সদস্য হন তাহা হইলে তাঁহার অস্থায়ী কর্মসচিবকে লর্ড সভার সদস্য হইতে হইবে, অপর পক্ষে বিভাগীয় প্রধান লর্ড সভার সদস্য হইলে তাঁহার অস্থায়ী কর্মসচিবকে কমন্স সভার সদস্য হইতে হইবে। এই নিয়মের তাৎপর্য হইল যে, উভয় পরিষদে যাহাতে কেবিনেটের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া সদস্যবর্গের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।

শাসন-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিভাগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। আভ্যন্তরীণ শাসনবিভাগ (Home Office)

এই বিভাগের অধিকর্তা হইলেন আভ্যন্তরীণ শাসনবিভাগীয় সচিব (Secretary of State for Home affairs)। এই বিভাগের প্রধান কার্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ, জেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। বিদেশীর উপর বৃটিশ নাগরিকত্ব অর্পণ করা ও বিদেশী পলাতক অপরাধীকে যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করাও (Extradition) এই বিভাগের কাজ।

২। পররাষ্ট্র বিভাগ (Foreign Office)

এই বিভাগটি বর্তমানে সর্বদেশেই শাসনবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বলিয়া পরিগণিত হয়। পররাষ্ট্র সচিব এই বিভাগের অধিকর্তা। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হইল এই বিভাগের প্রধান কার্য। এই বিভাগ কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে।

৩। ঔপনিবেশিক বিভাগ (Colonial Office)

গ্রেট বৃটেনের উপনিবেশগুলি সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করা ও উপনিবেশগুলিতে গভর্ণর নিয়োগ করা হইল এই বিভাগের কাজ।

৪। সাধারণতন্ত্র-সম্পর্কিত বিভাগ (Commonwealth Relation Office)

এই বিভাগ ডোমিনিয়নগুলি সম্পর্কিত কাজ করে।

৫। প্রতিরক্ষা বিভাগ (Defence Office)

এই বিভাগের কাজ পূর্বে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী এই তিনটি পৃথক বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হইত। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই তিনটি বিভাগ একত্রিত করিয়া একজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

৬। স্কটল্যাণ্ড-সম্পর্কিত বিভাগ (Scotland Office)

স্কটল্যাণ্ড শাসন-সম্পর্কিত ব্যাপারের জন্য একজন মন্ত্রী আছেন।

৭। আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিভাগ (Treasury Department)

অর্থসচিব (Chahcellor of the Exchequer) এই বিভাগের প্রধান। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা ও আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা এই বিভাগের প্রধান কার্য।

৮। ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিভাগ (Board of Trade)

এই দপ্তরের মন্ত্রী প্রেসিডেন্ট নামে অভিহিত হন। ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা ও এ সম্পর্কে পরিসংখ্যান (Statistics) সংগ্রহ করা হইল এই বিভাগের কাজ।

৯। শিক্ষা বিভাগ (Ministry of Education)

দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কর্তৃত্বে এই বিভাগ পরিচালিত হয়।

১০। কৃষি ও মৎস্য বিভাগ (Ministry of Agriculture and Fisheries)

কৃষিকার্য ও মৎস্যের চাষ সম্পর্কিত ব্যাপারের জন্য এই দপ্তরটি একজন মন্ত্রীর অধীনে কাজ করে।

১১। স্বাস্থ্য বিভাগ (Ministry of Health)

স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়াও গৃহনির্মাণ ও শহর পরিকল্পনার কাজ এই দপ্তরটির উপর ন্যস্ত থাকে।

১২। পরিবহন বিভাগ (Ministry of Transport)

এই বিভাগটি রেল, ট্রাম প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা এবং রাস্তা, পথ-ঘাট, সেতু, খাল প্রভৃতির যোগাযোগের উপায়গুলির তত্ত্বাবধান করে।

১৩। শ্রমবিভাগ (Ministry of Labour)

শ্রমিকসংঘগুলির ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার জন্য এই বিভাগটি বর্তমানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কার্য হইল আপোষ আইন ও বেকার বীমা আইন কার্যকরী করা।

১৪। গৃহ নির্মাণ, স্থানীয় শাসন ও ওয়েলস্ সম্পর্কিত বিভাগ (Ministry of Housing, Local Government and Minister for Welsh affairs)

এই বিভাগটি উপরি-উক্ত বিষয়গুলির কার্য পরিচালনা করে।

১৫। বে-সামরিক বিমান বিভাগ (Ministry of Aviation)

এই বিভাগটি বে-সামরিক বিমান ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

১৬। সরকারী অর্থপ্রদানকারী বিভাগ (Paymaster General)

এই বিভাগটির কার্য হইল সরকার কর্তৃক অর্থপ্রদান কার্যের তদারক করা।

ইহা ছাড়া আরও তিনজন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী আছেন। ইঁহারা হইলেন, (১) লর্ড চ্যান্সেলর, (২) লর্ড প্রিভিসিল ও (৩) ল্যাংকাষ্টারের ডিউকের সম্পত্তির চ্যান্সেলর। কেবিনেটের সদস্য নহেন এরূপ আরও ১৯ জন রাষ্ট্র-মন্ত্রী আছেন।

উপদেষ্টা সমিতি (Advisory Committees)

শাসনব্যবস্থার প্রধান প্রধান বিভাগগুলির সহিত একটি করিয়া উপদেষ্টা সমিতি যুক্ত থাকে। সাধারণতঃ বে-সরকারী সদস্যগণ লইয়া উপদেষ্টা সমিতিগুলি গঠিত হয়। সদস্যগণ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং এই বিশেষ বিষয়সমূহ সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাগকে পরামর্শ দান করেন। কিন্তু এই উপদেষ্টা সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট শাসন-বিভাগের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে এবং উপদেষ্টা সমিতিও তাঁহাদের কোন পরামর্শের ফলাফলের জন্য দায়ী নহে। তবে এই ব্যবস্থার গুণ হইল যে, বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ-সমন্বিত সমিতি সরকারী বিভাগের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া শাসনব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পায়।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ (The Permanent Executive—The Civil Service)

শাসনবিভাগীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করিবার নিমিত্ত দুই শ্রেণীর কর্মচারী থাকে। শাসন-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির নীতি নির্ধারণ করা এবং ঐ বিষয়সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা হইল প্রথম শ্রেণীর প্রধান কার্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারিগণ প্রথম শ্রেণী কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও আইনগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বলবৎ করে। গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় নীতি-নির্ধারক শাসনকর্তৃপক্ষ হইলেন মন্ত্রিমণ্ডলী, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ স্থায়ী কর্মচারী নহেন। তাঁহারা একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাদের উপর যে সমস্ত দপ্তর পরিচালনা করিবার ভার থাকে, সেগুলি সম্পর্কে তাঁহাদের খুব কম অভিজ্ঞতা থাকে। এমন হয়ত হইতে পারে যে, আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রাজস্ব-মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে রাজস্ববিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

হইলেন মন্ত্রী। অনভিজ্ঞ মন্ত্রী মহাশয়কে শাসনকার্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বিভাগে একদল স্থায়ী কর্মকুশল কর্মচারী থাকেন, যাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার দ্বারা শাসনপরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রীকে কার্যকরিভাবে সহায়তা করেন। মন্ত্রিগণ শুধু নীতি নির্ধারণ করেন ও বিভাগীয় শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন। মন্ত্রিপ্রদত্ত নির্দেশগুলিকে কার্যে রূপদান করা হইল এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের প্রধান কার্য।

গ্রেট বৃটেনে প্রায় তিন লক্ষ স্থায়ী সরকারী কর্মচারী আছেন। ইঁহাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ হইলেন নারী কর্মচারী। স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগে বিভাগীয় কর্মসচিব থাকেন। ইঁহারাই বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ইঁহাদের সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতানুসারে নিয়োগ করা হয়। ইঁহা-দিগকে সাহায্য করিবার জন্য অধস্তন আরও তিন-চারি শ্রেণীর কর্মচারী থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা কর্মঠ ও দক্ষ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। শাসনব্যাপারের সহিত দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থাকেন বলিয়া শাসনকার্যে খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁহাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মে, শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মন্ত্রিগণের সে অভিজ্ঞতা বা কর্মকুশলতা থাকে না। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কার্য ও নীতির জন্য দায়ী থাকেন। কিন্তু এই নীতিনির্ধারণ ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে মন্ত্রিগণকে সম্পূর্ণ-রূপে স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইঁহাদের সাহায্য ব্যতীত মন্ত্রিগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের উপর মন্ত্রিগণের এই একান্ত নির্ভরশীলতার জন্য এই কর্মচারি-গণের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মন্ত্রিগণ-প্রবর্তিত প্রত্যেকটি নীতি ও আইনের উপর এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়।

গ্রেটবৃটেনের উর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ হইলেন অস্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী। মন্ত্রি-মণ্ডলীর পতন হইলে এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া থাকেন। শাসনকার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা যদি দলীয় মনোভাবাপন্ন হন তাহা হইলে বিরোধী দলের শাসনকালে তাঁহারা

শাসনকার্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারেন। এইজন্য ভোটদান অধিকার থাকিলেও ইহারা সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করিতে পারেন না। যে কোন রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হউক না কেন, স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের কর্তব্য হইল যে, দলের নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচী সমান আন্তরিকতার সহিত কার্যকরী করা। স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দেব এই দলনিরপেক্ষতা আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মত স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের এই স্বাধীন ও রাজনৈতিক নিবপেক্ষ মনোভাব জনমতেব প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট সভা (Parliament)

গ্রেট বৃটেনেব পার্লামেণ্ট বা আইনসভা রাজা-সহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা লইয়া গঠিত। পূবে বলা হইয়াছে যে, এই সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অব্যাহত ক্ষমতার অধিকারী। কি সাধারণ আইন, কি শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত আইন—সবপ্রকার আইন এই সভা প্রণয়ন করিতে পারে, সংশোধন করিতে পারে অথবা বাতিল করিতে পারে। বৃটেনে এমন কোন বিচারালয় নাই যাহা এই সভার আইনসম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন কবিতে পারে। পার্লামেণ্টেব আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা স্বৈর ও আদিম : কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে। এইজন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভাকে অন্যান্য দেশেব আইনসভাগুলির সহিত তুলনা করিয়া **সার্বভৌম আইনসভা** বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে পার্লামেণ্টের এই সাবভৌম ক্ষমতা কেবিনেটের অস্বাভাবিক ক্ষমতাবৃদ্ধি, অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন-প্রণযন প্রভৃতির জন্য অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

লর্ড সভা—গঠন পদ্ধতি ও ক্ষমতা (House of Lords—Composition and Functions)

লর্ড সভা একটি অতি প্রাচীন আইনসভা বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমানে নিম্নলিখিত ছয়টি বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৯১০ জন সদস্য লইয়া এই সভা গঠিত। ১। রাজবংশের নির্ধারিত কতিপয় ব্যক্তি। ইঁহারা সাধারণতঃ লর্ড সভায় উপস্থিত থাকেন না। ২। জন্মগত উত্তরাধিকারসূত্রে ইংলণ্ড ও যুক্তরাজ্যের লর্ডগণ। ৩। স্কটল্যাণ্ডের লর্ডগণ কর্তৃক নির্বাচিত

ষোল জন প্রতিনিধি ; ইঁহারা একটি পার্লামেণ্টের কার্যকালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ৪। আটাশ জন আয়ারল্যাণ্ডের আজীবন লর্ড সদস্য। এই আসনগুলি আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতে শূন্য আছে। ৫। ক্যাণ্টারবেরি ও ইয়র্কের আর্চবিশপ ও ছাব্বিশ জন বিশপ লইয়া মোট আটাশ জন ধর্মযাজক লর্ড সভার সদস্য আছেন। ৬। লর্ড সভার আপীল মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য পনের জন আইনবিশারদকে লর্ড সভার আজীবন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা বেতন ভোগ করিয়া থাকেন। লর্ড সভার সভাপতি হইলেন লর্ড চ্যান্সেলর। তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য চলিতে পারে, কিন্তু কোন আইন পাস করিতে হইলে কমপক্ষে ত্রিশজন সদস্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

লর্ড সভার কার্য সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা। আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার পূর্বে লর্ড সভা কমন্স সভার সমক্ষমতা-বিশিষ্ট ছিল। বর্তমানে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই আইনের প্রধান ধারাগুলি হইল : ১। যদি কোন সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত আইনের খসড়া পর পর তিনটি অধিবেশনে কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ও যদি প্রথম অধিবেশনে কমন্স সভায় বিলের দ্বিতীয় পাঠ ও তৃতীয় অধিবেশনে বিলের তৃতীয় পাঠের মধ্যে দুই বৎসর অতিবাহিত হয় তাহা হইলে ঐ আইনের খসড়াটি লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই রাজার সম্মতির জন্য প্রেরিত হইতে পারে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের এই আইন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত হইয়াছে। এই সংশোধন-আইনের দ্বারা লর্ড সভার অনুমোদনের জন্য দুই বৎসরের স্থলে এক বৎসর সময় নির্ধারিত হইয়াছে। ২। অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে নিয়ম হইল যে, যদি কোন বিল কমন্স সভা পাস করে ও লর্ড সভায় ঐ বিল প্রেরিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে যদি লর্ড সভা ঐ বিল পাস না করে, তাহা হইলে লর্ড সভার অনুমোদন ব্যতীত ঐ বিল রাজার সম্মতিসহ আইনে পরিণত হইবে। ৩। কোন একটি বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা কমন্স সভার সভাপতির উপর প্রদত্ত হইয়াছে। এবিষয়ে তাঁহার নির্দেশই চূড়ান্ত

নির্দেশরূপে পরিগণিত হয়। ৪। কমন্স সভার কার্যকাল সাত বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর করা হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ও পরবর্তী ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা কার্যতঃ লোপ পাইয়াছে। পূর্বে লর্ড সভা বিরোধিতা করিলে কমন্স সভাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের মাধ্যমে জনসমর্থনের শক্তিতে আইন পাস করিতে হইত। বর্তমানে আর কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এই আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে লর্ড সভা কমন্স সভা-প্রস্তাবিত আইনকে মাত্র এক বৎসরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিবার ক্ষমতা ইহার নাই। কমন্স সভা কর্তৃক প্রেরিত অর্থ-সংক্রান্ত বিল লর্ড সভাকে এক মাসের মধ্যেই তাহার পর্যালোচনা শেষ করিতে হইবে। সুতরাং আইন-প্রণয়ন বিষয়ে লর্ড সভার বিশেষ কোন কার্যকারিতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন লর্ড সভার বিচারবিভাগীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে নাই। লর্ড সভা গ্রেট বৃটেনের সর্বোচ্চ আপীল বিচারালয়। যুক্ত রাজ্য ও উত্তর-আয়ারল্যাণ্ডের সমুদয় আপীল মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা এই আদালতের আছে। লর্ড চ্যান্সেলর, পনের জন আপীল লর্ড, ভূতপূর্ব লর্ড চ্যান্সেলরগণও গুরুত্বপূর্ণ বিচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন বা বর্তমানে আছেন এরূপ লর্ডগণ লইয়া এই আদালত গঠিত। আপীল মামলার বিচার করা ছাড়াও এই বিচারালয় আদিম বিচারকার্যও পরিচালনা করে। লর্ড সভার কোন সদস্য রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত হইলে তাঁহার বিচারকার্য এই আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়াও কমন্স সভা কর্তৃক আনীত গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীর বিচারকার্যও এই আদালত নিষ্পন্ন করে।

লর্ড সভার অধিকার (Privileges of the House of Lords)

আইনসভার সদস্যগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন সেজন্য সকল দেশেই তাঁহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকে। লর্ড সভার সদস্যগণ সাধারণ অধিকার ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ

অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশেষ অধিকারগুলি হইল—
১। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।
২। তাঁহারা পৃথকভাবে সভার অধিবেশনের আহ্বান পাইয়া থাকেন।
৩। তাঁহারা আপীল মামলার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কার্য করিতে পারেন ও কমন্স সভা কর্তৃক আনীত গুরুতর অভিযোগেরও বিচার করিতে পারেন।
৪। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন লর্ড নিজে সভায় অনুপস্থিত থাকিয়াও অন্যের মারফৎ ভোট দিতে পারিতেন। ৫। লর্ড সভা যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারে। ইহা ছাড়া সভাগৃহে সাধারণভাবে তাঁহাদের বাক্-স্বাধীনতা আছে এবং সভার অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্বে এবং পরে কোন লর্ডকে দেওয়ানী অপরাধের জন্য আটক করা যায় না।

লর্ড সভার বিরুদ্ধে অভিযোগ (Criticism against the House of Lords)

গ্রেট বৃটেনের লর্ড সভা সম্পর্কে এ যাবৎ বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। সমালোচনার কয়েকটি সঙ্গত কারণ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া ইহার প্রথম ও প্রধান সমালোচনা করা হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এরূপ গণতন্ত্র-বিরোধী পদ্ধতিতে নিযুক্ত সদস্য-সমন্বিত উচ্চ পরিষদ এক ক্যানাডা ব্যতীত অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। জনগণ দ্বারা নির্বাচন পদ্ধতিতে গঠিত আইনসভা ব্যতীত ভিন্ন পদ্ধতিতে গঠিত আইনসভা জনমত প্রতিফলিত করিতে পারে না। লর্ড সভা জনমতের প্রতিনিধি নয়, সুতরাং এই সভা গণতন্ত্র-বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ, লর্ড সভার অধিকাংশ সদস্যই ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। গ্রেট বৃটেনের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণী এই সভার সদস্য। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি ও বিশেষ করিয়া মদ্য ব্যবসায়ের প্রতিনিধি লইয়া এই সভা প্রধানতঃ গঠিত। সুতরাং এইরূপ আইনসভার অস্তিত্ব স্বাধীন দেশের মূর্ত প্রতীক ইংলণ্ডে সমর্থনযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ, লর্ড সভায় কার্যাবলীর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই সভা পূর্বাপর কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কাজ করিয়াছে এবং প্রগতিমূলক ও উদারনৈতিক কার্যক্রমে বাধা দিয়াছে।

চতুর্থতঃ, লর্ড সভার সদস্যগণের উপস্থিতির সংখ্যা হইতে আইনসভা হিসাবে ইহার অসারতা ও প্রয়োজনীয়তার অভাব বুঝিতে পারা যায়। অধিকাংশ সদস্যই অনুপস্থিত থাকেন। প্রায় সাড়ে নয়শত সদস্যের মধ্যে তিনজন উপস্থিত থাকিলেই সভার কাজ চালতে পারে এবং কোন আইন পাস করিতে হইলে ৩০ জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই আইন পাস করা যায়। উপরি-উক্ত নিয়মটি হইতে লর্ড সভার অসারতা প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ের মতানুযায়ী লর্ড সভা একদিকে যেরূপ ক্ষতিকর (mischievous) অপরদিকে তদ্রূপ বাহুল্যমাত্র (superfluous)। যখন উদারনৈতিক দল বা শ্রমিক দল সরকার গঠন করে তখন লর্ড সভা এই দল কর্তৃক আনীত আইনের অন্ধভাবে বিরোধিতা করে। সুতরাং এই সভার কার্য একদেশদর্শী এবং জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার যখন রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসীন থাকে তখন এই সভা রক্ষণশীল দল কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন গুণাগুণ বিচার না করিয়া সমর্থন করে। সুতরাং এই সভার নিজস্ব কোন স্বাধীন অভিমত নাই। ইহা রক্ষণশীল মতবাদ সমর্থন করে, সুতরাং বাহুল্য মাত্র।

লর্ড সভার কার্যকারিতা (Utility of the House of Lords)

১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট আইন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইলেও ইহার উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও লর্ড সভার অস্তিত্ব যে একেবারেই বিলুপ্ত হয় নাই ইহা দ্বারা ইহার উপযোগিতা প্রমাণিত হয়। লর্ড সভার সম্পূর্ণ বিলোপ অথবা সংস্কারসাধনের নিমিত্ত পূর্বে বহুবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হয় নাই। গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে লর্ড সভা গণতন্ত্র-বিরোধী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লর্ড সভা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। লর্ড সভার সদস্যতালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি

জাতীয় জীবনের নানাদিকে তাঁহাদের চিন্তাধারা ও কার্যের দ্বারা উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে লর্ড পদবীতে অলংকৃত করা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই লর্ড সভার সদস্য মনোনীত হইয়া থাকেন। সুতরাং লর্ড সভার গঠনপদ্ধতিকে নিতান্ত গণতন্ত্র-বিরোধী বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও লর্ড সভা আইনসভার উচ্চ কক্ষের কার্য সুষ্ঠুভাবে পবিচালনা করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। কমন্স সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করিয়া তাহা সংশোধন করা হইল উচ্চ কক্ষের প্রধান কার্য। লর্ড সভা বিতর্কবিহীন আইনের প্রস্তাব করিতে পারে ও কমন্স সভার দ্রুত আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতায় এক বৎসরকাল পর্যন্ত বাধা প্রদান করিয়া আইন-প্রণয়ন-বিষয়ে জনমতকে সজাগ রাখিতে পারে। ইহা ছাড়া, অনেক সময় লর্ড সভা হইতে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিতে কেবিনেটের সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

লর্ড সভার সংস্কার (Reform of the House of Lords)

লর্ড সভার উত্তরাধিকারসূত্রে গঠন ও রক্ষণশীল প্রকৃতি ইহার জনপ্রিয়তাব অন্তরায় এবং এই কারণে মধ্যে মধ্যে এই সভার সংস্কারের জন্য গণদাবী উত্থিত হয়। যতদিন পর্যন্ত রক্ষণশীলদল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত লর্ড ও কমন্স সভার মধ্যে কোন গুরুতব মতবিরোধ ঘটে নাই। কিন্তু উদার-নৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন হইবার পরবর্তী কাল হইতে উভয় সভার মধ্যে মতভেদ গুরুতর আকার ধারণ করে এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড সভা অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তখনই উদার-নৈতিকদল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া লর্ড সভার ক্ষমতা বিশেষভাবে সংকুচিত করে। এই সময় হইতে লর্ড সভার সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে একটি প্রকৃত উচ্চ পরিষদের মর্যাদা দান করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়।

১। ল্যান্সডাউন প্রস্তাব—এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, লর্ড সভা মোট ৩৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই সদস্যগণের মধ্যে কিয়দংশ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইবেন, কিছু সংখ্যক সদস্য বিশপগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন

এবং অবশিষ্টাংশ কমন্স সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা হয় নাই।

২। ব্রাইস্ প্রস্তাব—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ব্রাইসের সভাপতিত্বে লর্ড সভার সংস্কারের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করে। (ক) উচ্চ পরিষদের সদস্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া ৩২৭-এ সীমাবদ্ধ করা, (খ) পরিষদের কার্যকাল ১২ বৎসর হইবে এবং ১/৩ সদস্য প্রতি চারবৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবে, (গ) উচ্চ পরিষদের ২/৩ সদস্য কমন্স সভা কর্তৃক আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবে ও অবশিষ্ট ১/৩ সদস্য লর্ডগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে, (ঘ) উভয় পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে প্রত্যেক পরিষদের ৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি যুক্ত কমিটি দ্বারা এই মতবিরোধ বিবেচিত হইবে। কিন্তু বিরোধেব ক্ষেত্রে যুক্ত কমিটির দ্বারা বিরোধের মীমাংসা প্রস্তাবে উদারনৈতিকদল সম্মত না হওয়ার ফলে এই প্রস্তাবও সফল হয় নাই।

৩। ১৯২২ সালের প্রস্তাব—১৯২২ খৃষ্টাব্দে লয়েড্ জর্জের মন্ত্রিসভা লর্ড-সভার সংস্কার উদ্দেশ্যে কয়েকজন কেবিনেট সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটি গঠন বরে। এই কমিটি এই সম্পর্কে ব্রাইস্ প্রস্তাবের অনুরূপ পাঁচটি প্রস্তাব লর্ড সভার বিবেচনার জন্য পাঠায়, কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি লর্ড সভা বা জনসাধারণ গ্রহণ কবে না বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

৪। কেভ্ প্রস্তাব—১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি কেবিনেট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রস্তাব করেন যে, লর্ড সভা বাজপবিবারের সদস্য ও আপীল-বিচারক সদস্য বাদ দিয়া মোট ৩৫০ জন্য সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। অল্পসংখ্যক সদস্য রাজা কর্তৃক বারো বৎসরের জন্য মনোনীত হইবে এবং লর্ডগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে বারো বৎসরের জন্য কিছুসংখ্যক সদস্য নিবাচিত করিবে। এই প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কিনা তাহা কমন্স সভার স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত না হইয়া উভয় পরিষদের একটি যুক্ত কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড সভা সংস্কারের উদ্দেশ্যে লর্ড ক্লারেণ্ডেন আর একটি প্রস্তাব করেন।

৬। ১৯৩৩ সালে লর্ড সল্‌সুবেরী আর একটি প্রস্তার করেন এবং বিলের আকারে এই প্রস্তাবটি পার্লামেণ্টে পেশ করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে লর্ড

সভার সদস্যসংখ্যা ৩২০ জন করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৫০ জন লর্ডগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে, আর ১৫০ জন জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইবে। কমন্স সভার স্পীকারের সভাপতিত্বে উভয় পরিষদের একটি যুক্ত অধিবেশন কর্তৃক অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রকৃতি নির্ধারিত হইবে। কিন্তু এ প্রস্তাবও কার্যকরী হয় নাই। শ্রমিকদলের নীতি ছিল যে, লর্ড সভা যদি ইহার শাসনকার্যে বাধা দেয় তাহা হইলে লর্ড সভার বিলোপ সাধন করা।

কিন্তু লর্ড সভার সংস্কারের উদ্দেশ্যে এতগুলি প্রস্তাব সত্ত্বেও লর্ড সভা এখনও পর্যন্ত নিজ বৈশিষ্ট্যসহ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল পূর্ণ গণতান্ত্রিক যুগে এই গণতন্ত্র-বিরোধী আইনসভা বজায় থাকিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, লর্ড সভার দুর্বলতাই ইহার অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বর্তমানে এই সভা আইন-প্রণয়নে কিছু বিলম্ব ঘটাইতে পারে, কিন্তু কমন্স সভার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে না। ইহা ছাড়া, বর্তমানে লর্ডগণ একটি স্বতন্ত্রশ্রেণী নহেন। জনসাধারণের মধ্য হইতেও লর্ড সৃষ্টি হয় এবং লর্ডবংশ হইতেও সাধারণ শ্রেণীর জন্ম হয়। সুতরাং লর্ড সভার গঠন ও ক্ষমতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সভা কোনদিক দিয়াই গ্রেট ব্রুটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শের অন্তরায় হয় নাই। তাই গ্রেট ব্রুটেনের জনমত এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী, বিভিন্ন দেশের মাতৃস্থানীয়া আইনসভার কোন সংস্কার করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই।

কমন্স সভা (The House of Commons)

বর্তমানে কমন্স সভা ছয়শত তিরিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত; সত্তর হাজার সংখ্যক লোকপ্রতি একজন প্রতিনিধির ভিত্তিতে ইংলণ্ড হইতে চারিশত নিরানব্বুই জন প্রতিনিধি, স্কটল্যাণ্ড হইতে চুয়াত্তর, ওয়েলশ্ হইতে ছত্রিশ ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড হইতে তেরজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের গণপ্রতিনিধিত্ব আইন ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সমান প্রতিনিধিত্বের আইন পাস হইবার ফলে গ্রেট ব্রুটেনে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হইয়াছে বলা চলে। কমন্স সভার সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাজা তৎপূর্বেই কমন্স

সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। রাজা কমন্স সভা আহ্বান করেন ও ইহার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন।

কমন্স সভার ক্ষমতা (Powers of the House of Commons)

১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট আইন বলবৎ হইবার পর লর্ড সভার ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া কমন্স সভার আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কমন্স সভাকে কেন্দ্র করিয়াই বৃটিশ শাসনব্যবস্থার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য প্রকটিত হইয়াছে। বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় কমন্স সভা যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূল কারণ হইল শাসনব্যবস্থার উপর এই সভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে, আইন-প্রণয়ন-কার্যে, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণে, কেবিনেট সভার নীতি ও কর্মসূচীর নিয়ন্ত্রণে কমন্স সভা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী।

কমন্স সভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। এই সভা কর্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত না হইয়া কোন আইনের প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে না, বা কোন আইনেরই পরিবর্তন বা পরিবর্জন সম্ভব নয়। অর্থ-সংক্রান্ত সমুদয় প্রস্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হয় ও এই সভার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রস্তাবই বলবৎ করা যায় না। সরকারের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত নীতির সমালোচনা করিবার পূর্ণ অধিকারী হইল কমন্স সভা। সর্বোপরি কমন্স সভা শাসনব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ামক কেবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেবিনেটের হস্তেই প্রকৃত শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এবং এই কেবিনেট সভা ইহার শাসননীতি ও কার্যক্রমের জন্য কমন্স সভার নিকট দায়ী। কেবিনেটের প্রত্যেকটি কার্যসম্পর্কে কমন্স সভা প্রশ্ন তুলিতে পারে। উহা কেবিনেটের কার্য অনুমোদন করিতে পারে অথবা অসম্মতিসূচক মত প্রকাশ করিতে পারে। কমন্স সভা কর্তৃক কেবিনেটের কার্য অননুমোদিত হইলে, কেবিনেট সভাকে হয় পদত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা জনমতের নিকট আবেদন জানাইতে হইবে অর্থাৎ কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কমন্স সভার সদস্যগণ শাসন-সংক্রান্ত কোন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য কেবিনেট সদস্যগণকে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়াই কেবিনেট সভার কার্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কমন্স সভাকে

ব্রিটেনের প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ কেবিনেট সদস্যগণের রাজনৈতিক শিক্ষাক্ষেত্র বলা যাইতে পারে—এইখানেই তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক কর্মকুশলতার পরীক্ষা চলে।

কিন্তু কেবিনেটের সহিত কমন্স সভার সম্পর্ক আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, বর্তমানে কমন্স সভা আর তাহার পূর্বগৌরবের অধিকারী নাই। শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা দূরে থাকুক, বর্তমানে আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে ও আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও কার্যতঃ ইহার ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। সিড্‌নি লো যথার্থই বলিয়াছেন যে, বর্তমানে কমন্স সভা ক্ষমতার বাহ্যিক আড়ম্বরের অধিকারী—কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা অন্য প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হইয়াছে। কমন্স সভার আজ্ঞাবহ কেবিনেটই বর্তমানে ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইয়া কমন্স সভাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পর্যবসিত করিয়াছে।

কমন্স সভার অধিকার (Privileges of the House of Commons)

লর্ড সভার সদস্যদের অনুরূপ কমন্স সভার সদস্যগণও কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, কমন্স সভার কোন সদস্যকে অধিবেশনকালে ও অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্ব ও পর পর্যন্ত কোন দেওয়ানী মামলার জন্য আটক করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সদস্যগণ বাক্‌-স্বাধীনতার অধিকারী। এই অধিকার ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকারপত্র দ্বারা প্রদত্ত হয়। এই অধিকারের বলে সদস্যগণ সভার আলোচনা ও বিতর্ককালে তাঁহাদের বক্তৃতা বা বক্তৃতার কোন অংশে উচ্চারিত কোন শব্দ বা বাক্যের জন্য দায়ী নন। এজন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন বিচারালয়ে অভিযোগ চলিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, কমন্স সভার সভাপতির মধ্যবর্তিতায় তাঁহারা সমবেতভাবে রাজার নিকট আবেদন পেশ করিতে পারেন। চতুর্থতঃ, লর্ড সভার অনুরূপ কমন্স সভা যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে। পঞ্চমতঃ, কমন্স সভার আর একটি বিশেষ অধিকার হইল যে, এই সভাতেই অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি প্রথম উত্থাপিত হয়। নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সন্দেহ হইলে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার বিশেষ অধিকার এই সভার আছে। ইহা ছাড়া, নির্বাচন-প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতাও কমন্স সভার হস্তে ন্যস্ত।

কমন্স সভার সভাপতি (The Speaker of the House of Commons)

কমন্স সভার সভাপতি 'স্পীকার' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাচীনকালে যখন কমন্স সভা ইহার বর্তমান ক্ষমতা বা পদমর্যাদায় উন্নীত হয় নাই, যখন এই সভার প্রধান কার্য ছিল রাজার নিকট নানা অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আবেদন পেশ করা, তখন এই সভার একজন প্রতিনিধি কমন্স সভার মুখপাত্র হিসাবে এই আবেদনগুলি রাজার নিকট পেশ করিতেন। কালক্রমে এই মুখপাত্রের উপরই কমন্স সভার কার্য পরিচালনার ভার অর্পিত হইল এবং তিনি স্পীকার নামে পরিচিত হইলেন।

নূতন নির্বাচনের পর কমন্স সভার প্রথম অধিবেশনের প্রধান কার্য হইল সভার সভাপতি নির্বাচন করা। এই সভাপতি হইলেন স্পীকার, স্পীকার নির্বাচন ব্যাপারে সাধারণতঃ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। কমন্স সভার চিরাচরিত প্রথা হইল যে, বিদায়ী স্পীকার সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকেই পুনরায় নিবাচন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী অন্যান্যদলের নেতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া একজন সদস্যকে স্পীকারপদে মনোনয়ন করেন। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা বলিয়া তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি যে কমন্স সভা কর্তৃক ভোটাধিক্যে স্পীকারপদে নির্বাচিত হইবেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদিও কার্যতঃ স্পীকার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, তথাপি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর এই মনোনয়ন কমন্স সভার নির্বাচনের মধ্য দিয়া সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। এই নিয়োগে রাজার আনুষ্ঠানিক সম্মতিরও প্রয়োজন। স্পীকার বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড বেতন ও লণ্ডন শহরে বিনা ভাড়ায় একটি সুসজ্জিত আবাসগৃহ পাইয়া থাকেন। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি পেন্‌সন্ পাইয়া থাকেন ও সাধারণতঃ তাঁহাকে লর্ড উপাধি দেওয়া যায়।

স্পীকারের প্রধান কার্য হইল কমন্স সভার অধিবেশন পরিচালনা করা। বৃটিশ কমন্স সভা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর আইন-পরিষদ, সেখানে বহু কৃতবিদ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক ও সুদক্ষ বাগ্মী থাকেন। সুতরাং এই সভার পরিচালক হিসাবে স্পীকারের কি পরিমাণ

কর্মদক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও সর্বোপরি শিষ্টাচারী হওয়া প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। স্পীকার সভার কার্য পরিচালনা করেন, সুতরাং তাঁহাকেই সভার কার্য পরিচালনা করিবার নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হয় ও এই নিয়মাবলী কার্য-পরিচালনায় বলবৎ করিতে হয়। বিতর্ককালে তিনি সভার শান্তি-শৃংখলা ও মর্যাদা রক্ষা করেন এবং কোন ব্যাপারে মতভেদ হইলে তাঁহাকে মীমাংসা করিতে হয় এবং বিতর্কমূলক ব্যাপারে স্পীকারের নির্দেশ চূড়ান্ত বলিয়া সকল সদস্যেরই গ্রহণ করিতে হয়। কোন সদস্য যদি বক্তৃতা-কালে অভদ্রোচিত বা সম্মানহানিকর বা বিদ্রোহাত্মক কোন ভাষা প্রয়োগ করেন তাহা হইলে স্পীকার তাঁহাকে তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিতে পারেন অথবা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন—এমন কি প্রয়োজনক্ষেত্রে সভার নিয়মাবলী গুরুতররূপে অবহেলিত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কার করিতে পারেন।

তিনি মুলতুবী-প্রস্তাব আনয়নের অনুমতি দিতে পারেন অথবা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন যে, কমন্স সভায় উত্থাপিত কোন আইনের প্রস্তাবের উপর সংশোধন প্রস্তাবগুলির বিস্তারিত আলোচনার যথেষ্ট সময় নাই, তাহা হইলে তিনি মাত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রস্তাবগুলি আলোচনা ও ভোটগ্রহণে অনুমতি দান করিতে পারেন। কোন বিল অর্থ-বিষয়ক বিল কিনা এবিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত প্রদান করিবার ক্ষমতা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা স্পীকারের উপর অর্পিত হইয়াছে। সভার অবমাননার অভিযোগে স্পীকার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

কমন্স সভার আলাপ-আলোচনায় স্পীকার অংশ গ্রহণ করেন না এবং সাধারণতঃ তিনি ভোট প্রদান করেন না। কিন্তু যখন কোন প্রস্তাবের সপক্ষে ও বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হয়, তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ভোট দিতে হয়। স্পীকারের এই ভোটদান তাঁহার নিজ ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় না। প্রথাগত নিয়মানুসারে তিনি এরূপভাবে ভোট দেন যাহাতে প্রচলিত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে এবং সভা ঐ বিষয়ে পুনরায় ভোট গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। সভার সমুদয় সদস্যকেই স্পীকারকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে হয়। তিনি কমন্স সভার

বক্তা নামে অভিহিত হইলেও বর্তমানে তাঁহাকে আর বক্তৃতা করিতে হয় না। তিনি বক্তা হইতে নির্বাক শ্রোতায় পর্যবসিত হইয়াছেন।

কমন্স সভার সদস্য হিসাবে স্পীকারকে রাজনৈতিক দলের সমর্থকরূপে নির্বাচিত হইতে হয়। স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দল-নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। কমন্স সভার ভিতরে ও বাহিরে কোন রাজনৈতিক দলের সভাসমিতিতে তিনি যোগদান করিতে পারিবেন না। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলসম্পর্কিত কোন সংবাদপত্র বা সংস্থা বা কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। সভার অধিবেশন পরিচালনাকালেও দল-নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখা তাঁহার প্রধান কর্তব্য। স্পীকারের এই দল-নিরপেক্ষতার উপরই তাঁহার নিজের পদমর্যাদা ও জাতীয় সম্মান নির্ভর করে।

কমিটি ব্যবস্থা (Committee System)

বর্তমান যুগে আইনসভার কায এরূপ ব্যাপক ও জটিলতাপূর্ণ হইয়াছে যে, বহু সদস্য-সমন্বিত আইনসভার পক্ষে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক সূক্ষ্মভাবে কোন বিষয়ের মীমাংসা করা সম্ভব নয়। এইজন্য প্রত্যেক দেশের আইনসভা বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে কতকগুলি কমিটি গঠন করে। কমিটিগুলির প্রধান কার্য হইল খসড়া আইনগুলি যখন ইহাদের নিকট বিবেচনার্থ প্রেরিত হয় তখন সেগুলিকে সবিস্তারে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন অন্তে কমিটির সুপারিশসহ আইনসভায় প্রেরণ করা। এই ব্যবস্থা দ্বারা শুধু যে আইনের প্রস্তাবগুলির সম্যক পর্যালোচনা হয় তাহা নয়, আইনসভাও অনেক পরিমাণে ভারমুক্ত হইয়া অন্য অসংখ্য কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনে কমন্স সভার কার্যপরিচালনা-বিষয়ে কমিটিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতি অধিবেশনের প্রারম্ভে ছয় রকমের বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। এই বিভিন্ন কমিটিগুলি সদস্যনির্বাচনের জন্য বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে সরকারী দলের ও বে-সরকারী বিপক্ষদলের নেতৃগণ একটি যুক্ত সম্মেলনে মিলিত হইয়া একটি ১। নির্বাচনী কমিটি গঠন করেন। উপরি-উক্ত বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণ এই নির্বাচনী কমিটি (Committee of Selection) দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সাধারণ-সম্পর্কিত বিলগুলি বিবেচনার জন্য ২। স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Public Bills) তিরিশ হইতে পঞ্চাশ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইহারা প্রয়োজন বোধ করিলে অতিরিক্ত পনের হইতে বিশজন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞ লইয়া এইরূপ পাঁচটি স্থায়ী কমিটি কমন্স সভায় আছে। ৩। সাময়িক কমিটি (Select Committees) বিশেষ কোন প্রস্তাব বিবেচনার্থ সাময়িকভাবে গঠিত হয় ও নির্দিষ্ট কার্য শেষ হইলে এই কমিটিগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। ৪। একটি অধিবেশনের জন্য গঠিত কমিটি (Sessional Committees)—আবেদনপত্র পরীক্ষা করা প্রভৃতি নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই কমিটি-গুলি গঠিত হয়। ৫। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত প্রস্তাব বিবেচনাকারী কমিটি (Private Bills Committees)—এই কমিটিগুলি মাত্র চারজন সদস্য লইয়া গঠিত। ইহাদেব প্রধান কার্য হইল, যে সমস্ত বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের বিরোধিতা হয় সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা ও এই বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষেব বক্তব্য শুনিয়া কমন্স সভায় তাহাদের সিদ্ধান্তসহ বিবরণী পেশ করা। ৬। সমগ্র কমন্স সভার কমিটিরূপে অধিবেশন (Committee of the Whole House)। সমগ্র সভা দুইটি উদ্দেশ্যে কমিটিরূপে মিলিত হইতে পারে : (ক) প্রথমতঃ, কি উপায়ে ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থ আহরণ করিতে হইবে অর্থাৎ কব ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে যখন মিলিত হয় তখন এই কমিটিকে Committee of Ways and Means বলা হয়। (খ) দ্বিতীয়তঃ, যখন এই কমিটি ব্যয়ের তালিকাগুলি বিবেচনা করিবার অনুমোদন কবিবার উদ্দেশ্যে মিলিত হয় তখন ইহাকে Committee on Supply বলা হয়। কমন্স সভার সাধারণ অধিবেশনের সহিত কমন্স সভার এই কমিটির অধিবেশনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সভার যখন কমিটি হিসাবে অধিবেশন চলিতে থাকে তখন এই অধিবেশনে স্পীকার সভাপতিত্ব করিতে পারেন না। এই কমিটির জন্য পৃথক সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকে। স্পীকারের দণ্ড ও টেবিলের নীচে রাখা হয়। কমন্স সভার কার্যপরিচালনা-ব্যাপারে যতটা নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বিত হয়, কমিটির কার্যপরিচালনায় ততটা নিয়মানুবর্তিতা প্রদর্শিত হয় না। যে-কোন সদস্য একাধিকবার বক্তৃতা করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব

(Budget) পরীক্ষা করিবার জন্য ৭। Standing Committee on Public Accounts আছে।

খসড়া আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Bills)

আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে আইনের খসডাগুলির শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন—কারণ আইনের খসডার বৈচিত্র্যের জন্য আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির কিছু পরিমাণ পার্থক্য হয়। আইনের খসডাগুলিকে সাধারণতঃ সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসডা (Public Bill) ও বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত খসডা (Private Bill) বলা হয়। সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসডাগুলি কোন ব্যক্তি বা সংসদ অথবা কোন স্থান বিশেষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। এই খসডাগুলির বিষয়বস্তু জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়। যেমন, দেশে বাল্যবিবাহ নিষেধ বা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার আইন। এই খসডাগুলি সাধাবণতঃ সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক (মন্ত্রিমণ্ডলী) বিশেষ বিচাব-বিবেচনা করিয়া আইনসভায় পেশ করা হয়। তবে বে-সরকারী সদস্যগণ এই জাতীয় খসডা আইন উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু উত্থাপনের পূর্বে সরকারী সদস্যগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাদের সম্মতিক্রমেই বে-সরকারী সদস্যগণ এই সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিল উত্থাপন করিতে পারেন। সরকারী সম্মতি ও সরকারী সাহায্য না পাইলে এরূপ বিল অনুমোদিত হইতে পারে না। বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক আনীত সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিলকে (Private member's bill) বলা হয়।

ইহা ছাডা, বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত খসডা আইন (Private Bill) আছে। এই বিলগুলি সাধারণতঃ বে-সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত হয়। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত ব্যাপার হইল এই বিলগুলির বিষয়বস্তু। কোন শহরে নূতন মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্টি করা বা কোন নদীর উপর পুল তৈয়ারী করা, ইত্যাদি বিশেষ স্বার্থের জন্য এই আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়।

পার্লামেণ্টে সাধারণ আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি (Process of Law-making in Parliament)

আইনের প্রস্তাব অর্থসম্পর্কিত হইতে পারে অথবা অর্থসম্পর্কিত নাও হইতে পারে। যে সমস্ত প্রস্তাব অর্থসম্পর্কিত নহে, সে সমুদয় প্রস্তাব

পার্লামেণ্ট সভার লর্ড বা কমন্স যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোন আইনের প্রস্তাবকে আইনে পর্যবসিত করিতে হইলে নির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাইতে হয়, যথা,—প্রস্তাবের খসড়া-প্রণয়ন (Drafting), আইনসভায় খসড়াটিকে পেশ করা (Introduction), প্রথম পাঠ (First Reading), দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading), কমিটিতে প্রেরণ (Committee Stage), কমিটি কর্তৃক বিবরণ প্রদান (Report Stage) ও তৃতীয় পাঠ (Third Reading)।

যে সদস্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক, প্রথমে তাঁহাকে নিজে অথবা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে প্রস্তাবের একটি খসড়া প্রণয়ন করিতে হয়; খসড়াটি প্রস্তুত হইলে প্রস্তাবককে আইনসভায় ঐ প্রস্তাবটিকে উত্থাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয় অথবা প্রস্তাবের উত্থাপককে লিখিত নোটিশ দিয়া সভার টেবিলে প্রস্তাবটিকে স্থাপন করিতে হয়। সভার কর্মসচিব (Clerk of the House) প্রস্তাবের শিরোনামা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন। ইহার পর স্পীকারের অনুরোধক্রমে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাবের দ্বিতীয় পাঠের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ করেন। এই প্রক্রিয়াকে প্রথম পাঠ বলা হয়। কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ব্যতীত সাধারণতঃ প্রথম পাঠের সময় প্রস্তাবটি সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা হয় না।

অতঃপর নির্ধারিত দিনে প্রস্তাবটির দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় পাঠের সময় প্রস্তাবটির মূল নীতি সম্পর্কে প্রস্তাবটির সমর্থক ও বিরুদ্ধ দলের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। এই পর্যায়ে প্রস্তাবটির ধারা-উপধারা লইয়া কোন বিস্তারিত আলোচনা হয় না। আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক প্রস্তাবের মূল নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময়ে বিরোধী দল প্রস্তাবটির সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে পারেন অথবা 'ছয়মাস পরে বিলটির দ্বিতীয় পাঠ করা হউক' এই মর্মে প্রস্তাব আনিতে পারেন। দ্বিতীয় পাঠে প্রস্তাবটি যদি ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় পাঠ পর্যায় শেষ হয়।

প্রস্তাবটির মূলনীতি দ্বিতীয় পাঠ দ্বারা স্থিরীকৃত হইবার পর প্রস্তাবটিকে স্পীকারের নির্দেশ অনুসারে সভার একটি কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সাধারণতঃ প্রস্তাবগুলিকে সভার কোন স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে প্রস্তাবটি একটি বিশেষ সাময়িক কমিটিতেও প্রেরিত হইতে

পারে। এই কমিটি প্রস্তাবের বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে প্রস্তাবের সংশোধন করিতে পারে।

কমিটির বিবেচনার পর সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটিকে উত্থাপক সভায় প্রেরণ করা হয়। যদি কমিটি প্রস্তাবের কোন সংশোধন না করেন তাহা হইলে কমিটির এই বিবরণ-পেশ পর্যায়ের আর কোন প্রয়োজন হয় না। প্রস্তাবটিকে অপরিবর্তিত আকারেই সভায় প্রেরণ করা হয়। উত্থাপক সভা এই সময়ে প্রস্তাবটির ধারা-উপধারা অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা করে ও প্রয়োজন বোধ করিলে প্রস্তাবটির সংশোধনও করিতে পারে।

তাহার পর প্রস্তাবটির উত্থাপক প্রস্তাবটির তৃতীয় পাঠের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তৃতীয় পাঠের সময় প্রস্তাবটির মূলনীতি ও আদর্শ লইয়া পুনরায় আলাপ-আলোচনা চলে, কিন্তু কোনরূপ বিস্তারিত আলোচনা হয় না। এই সময়ে প্রস্তাবের আনুষ্ঠানিক সংশোধন ছাড়া অন্য কোনরূপ সংশোধন করা চলে না। প্রস্তাবটিকে হয় সমগ্রভাবে অনুমোদন করিতে হইবে, নতুবা সমগ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে ; কিন্তু কোনরূপ পরিবর্তন করা চলিবে না।

একটি পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে উহা দ্বিতীয় পরিষদের নিকটে প্রেরিত হয় অর্থাৎ প্রস্তাবটি যদি কমন্স সভা কর্তৃক উত্থাপিত হইয়া এই সভা দ্বারা তিনটি পাঠের পর অনুমোদিত হয় তাহা হইলে প্রস্তাবটিকে লর্ড সভায় প্রেরণ করা হয়। লর্ড সভায়ও প্রস্তাবটি একই পদ্ধতির মধ্য দিয়া চালিত হয়। বর্তমানে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন পাসের ফলে লর্ড সভা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিলেও এক বৎসর পরে লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই বিলটি রাজার সম্মতি পাইয়া আইনে পরিণত হয়। সুতরাং সাধারণ আইন-প্রণয়নে কমন্স সভাই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যদি লর্ড সভায় উত্থাপিত কোন আইনের প্রস্তাব কমন্স সভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে সে প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে না।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব (Money Bills in Parliament)

সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতিতে আয়ব্যয়-

সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করা হয়। যে-সমস্ত প্রস্তাবের দ্বারা রাজস্ব আদায়, ব্যয়বরাদ্দ-অনুমোদন, ঋণগ্রহণ ও ঋণপরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হয় সেই সমস্ত প্রস্তাবকে সাধারণতঃ অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব বলা হয়।

গ্রেট বৃটেনে অর্থ-বিষয়ক প্রস্তাবগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা,—(১) রাজস্ব বিল (Finance Bill), (২) ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর বিল (Appropriation Bill), ও (৩) একত্রিত তহবিল বিল (Consolidated Fund Bill)। বৃটেনের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের সহিত পরিচিত হইতে গেলে একটি বিষয়সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বৃটেনে সরকারী সমগ্র আয় জাতীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে জমা হয় এবং সরকারী এই জমাকে সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) বলা হয়। এই সঞ্চিত তহবিল হইতেই পার্লামেণ্ট সভা সমগ্র ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করে। ব্যয়বরাদ্দ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সরকারী ব্যয়ের একটি বড় অংশ পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক স্থায়ী আইন দ্বারা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খরচা, জাতীয় ঋণপরিশোধ, বিচারপতিগণের ও হিসাবপরীক্ষক-প্রধানের বেতন, ইত্যাদি পার্লামেণ্ট-নির্ধারিত এই স্থায়ী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যয়বরাদ্দগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। এই ব্যয়বরাদ্দগুলিকে সঞ্চিত তহবিল ব্যয় (Consolidated Fund Services) বলা হয়। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ব্যয় আছে, যেগুলি প্রতি বৎসর পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এই অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়গুলি (Supply Services) কতকগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়; এই বিভিন্ন ভাগগুলিকে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর বিল (Appropriation Bill)

প্রতি বৎসর অক্টোবর মাস হইতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে তাহাদের আগামী বৎসরের আনুমানিক ব্যয়ের একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া ট্রেজারি বিভাগের নিকট পেশ করিতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের এই হিসাব বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত থাকে। এই ভাগগুলি সাধারণতঃ 'ভোট' নামে অভিহিত হয়। ব্যয়ের এই আনুমানিক হিসাবগুলিকে জানুয়ারী

মাসের শেষে অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথমে কমন্স সভায় পেশ করা হয়। প্রথাগত বিধানানুযায়ী সমগ্র কমন্স সভা ব্যয়বরাদ্দের এই হিসাবগুলি বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটি কমিটিতে রূপান্তরিত হয়। সমগ্র সদস্য-সমন্বিত এই কমিটি সরবরাহ কমিটি (Committee on Supply) নামে পরিচিত হয়। কমন্স সভা কমিটি হিসাবে একে একে বিভিন্ন ব্যয়বরাদ্দের 'ভোট'গুলি অনুমোদন করে এবং এই অনুমোদন-কার্যের জন্য ছাব্বিশ দিন সময় নির্ধারিত থাকে। ব্যয়বরাদ্দের অনুমোদন-কার্য শেষ হইলেই কমন্স সভার কর্তব্য সমাপ্ত হয় না। সরকারী কর্মচারিগণ ব্যয়-নির্বাহের জন্য যাহাতে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড হইতে টাকা উঠাইতে পারেন, সেজন্য কমন্স সভার পৃথক অনুমোদনের আবশ্যক হয়। অন্য একটি কমিটির রূপ পরিগ্রহ করিয়া কমন্স সভা ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রস্তাব পাস করে। এই কমিটি পন্থা ও উপায় নির্ধারণ কমিটি (Committee of Ways and Means) নামে পরিচিত। অতঃপর উল্লিখিত দুইটি কমিটির প্রস্তাবগুলিকে একটি সরবরাহের বিলের আকারে একত্রিত করা হয় (Appropriation Bill) ও কমন্স সভার নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়।

(খ) রাজস্ব বিল (Finance Bill)

ব্যয়নির্বাহের জন্য আয়ের পন্থা নিরূপণ করা নিতান্ত অপরিহার্য। মার্চ মাসের শেষ দিনে অর্থমন্ত্রী (Chancellor of the Exchequer) কমন্স সভায় তাঁহার বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব-সমন্বিত বাজেট উপস্থাপিত করেন। গত বৎসরের আয়ব্যয়ের বিবৃতির সহিত নূতন বৎসরের আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ এবং ঐ ব্যয়নির্বাহের জন্য আনুমানিক রাজস্বের একটা পরিমাণের উল্লেখ থাকে। রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিবার জন্য কমন্স সভা পন্থা ও উপায় নির্ধারণ কমিটিতে পর্যবসিত হয়। সরকারী ব্যয়ের একটি অংশ যেরূপ স্থায়ী আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে, তদ্রূপ সরকারী রাজস্ব যে সমুদয় কর হইতে আদায় করা হয়, আয়কর, চা-শুল্ক প্রভৃতি ব্যতীত অন্য অধিকাংশ করই স্থায়ী আইন দ্বারা নির্ধারিত করা থাকে। এই করগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেণ্টের অনুমোদন

প্রয়োজন হয় না। করধার্যের এই বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি একত্রিত করিয়া পন্থা-ও উপায় নির্ধারণ কমিটি উহা রাজস্ব বিলরূপে কমন্স সভার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে।

কমন্স সভা তৃতীয় পাঠ দ্বারা উল্লিখিত সরবরাহ বিল ও রাজস্ব বিল অনুমোদন করিলে কমন্স সভার স্পীকার বিল দুইটিকে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব বলিয়া ঘোষণা করেন। স্পীকার কর্তৃক অর্থ-সংক্রান্ত বিল বলিয়া সমর্থিত হইলে বিল দুইটিকে লর্ড সভায় প্রেরণ করা হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন অনুসারে একমাস সময় পরে রাজার সম্মতিসহ বিল দুইটি আইনে পরিণত হইয়া কার্যকরী হয়।

ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হইতে অনেক সময় আগস্ট মাস শেষ হইয়া যায়। কিন্তু এপ্রিল মাস হইতে সরকারী বৎসর আরম্ভ হয়। ব্যয়বরাদ্দ পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক আইনতঃ অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কোন দপ্তর অর্থব্যয় করিতে পারে না। অথচ এপ্রিল মাস হইতেই নূতন ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কমন্স সভা নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বেই সরবরাহ কমিটিরূপে প্রত্যেক সরকারী বিভাগকে প্রত্যেক ব্যয়বরাদ্দের বাবদ কিছু পরিমাণ অর্থ খরচ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রস্তাব পাস করে। যতদিন পর্যন্ত ব্যয়বরাদ্দ চূড়ান্তভাবে মঞ্জুর না হয় ততদিন পর্যন্ত কমন্স সভার এই সাময়িকভাবে অনুমোদিত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন বিভাগগুলির ব্যয়নির্বাহ হইয়া থাকে।

আয়ব্যয়ের উপর পার্লামেন্ট সভার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা (Parliamentary Control over Finance)

সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইলেও এই সভার আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। অর্থসচিব—চ্যান্সেলর অব্ দি একস্‌চেকার হইলেন এ বিষয়ে অধিকর্তা। কেবিনেট সভার অনুমোদনক্রমে অর্থসচিবের নির্দেশে ট্রেজারি বিভাগ এই সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কোন নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব বা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব রাজার অনুমোদনক্রমে একমাত্র কোন মন্ত্রির মারফত উত্থাপিত হইতে পারে। কোন বে-সরকারী সদস্য ব্যক্তিগতভাবে এরূপ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন না। এ

সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার সদস্যগণ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে আয় ও ব্যয়বরাদ্দের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। কমন্স সভার সদস্যগণ নির্ধারিত কোন ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন না, বা একটি বিভাগের ব্যয়বরাদ্দের নির্ধারিত পরিমাণ অন্য আর একটি বিভাগের খরচের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন না। রাজার ব্যক্তিগত পারিবারিক খরচ, বিচারপতিগণের বেতন, জাতীয় ঋণসম্পর্কিত ব্যয় প্রভৃতি বিষয়গুলি যেগুলির ব্যয়বরাদ্দ স্থায়ী আইন দ্বারা নির্ধারিত, সেগুলি সম্পর্কেও কমন্স সভার কোন অধিকার নাই। পার্লামেণ্ট সভার একমাত্র ক্ষমতা হইল এই আয়ব্যয়-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলির সমালোচনা করা এবং সমালোচনা দ্বারা কেবিনেটের অর্থ-সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রমসম্বন্ধে জনমতকে অবহিত রাখা। বর্তমানে পার্লামেণ্ট সভার এই সমালোচনা করিবার অধিকারও বহুপরিমাণে নানাপ্রকারে সঙ্কুচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, পার্লামেণ্ট সভার কার্যসূচী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেবিনেট সভা কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। বে-সরকারী সদস্যগণ সমালোচনা করিবার সুযোগ খুব কমই পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, সমালোচনামূলক বিতর্কের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করিবার জন্য মাত্র ছাব্বিশ দিন সময় নির্ধারিত থাকে। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়সম্পর্কে আলোচনা হওয়া অসম্ভব। ফলে, ব্যয়বরাদ্দের অনেক অংশ বিনা বিতর্কেই অনুমোদিত হয়। তৃতীয়তঃ, আয়ব্যয়ের হিসাব বর্তমানে এরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ ব্যতীত কমন্স সভার সাধারণ সদস্যের পক্ষে এই জটিলতার আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিবার সময় থাকে না এবং একজন সাধারণ সদস্য এরূপ যোগ্যতারও অধিকারী নহেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চতুর্থতঃ, এ কথা সত্য যে, কমন্স সভা কোন ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করিতে পারে কিংবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। কিন্তু কেবিনেট সভার অনুমোদনক্রমে উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করার অর্থ হইল কেবিনেটের উপর অনাস্থা প্রকাশ করা। এরূপ ক্ষেত্রে বর্তমান কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়। সুতরাং কমন্স সভার পক্ষে কেবিনেট কর্তৃক উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করা কার্যতঃ সম্ভব নয়। সুতরাং কি করধার্য ব্যাপারে

কি ব্যয়বরাদ্দ-মঞ্জুর ব্যাপারে পার্লামেণ্ট সভার পক্ষে কেবিনেট কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের সমালোচনা করা ছাড়া কার্যকরিভাবে ঐ প্রস্তাবগুলিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

একমাত্র স্থায়ী হিসাবপরীক্ষক কমিটির (Standing Committee on Public Accounts) মাধ্যমে পার্লামেণ্ট সভা সরকারী আয়ব্যয়-বরাদ্দের উপর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। সরকারী আয়-ব্যয়ের সমুদয় হিসাবই রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন হিসাবপরীক্ষক-প্রধান (Controller and Auditor-General) দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। হিসাব-পরীক্ষক-প্রধান তাঁহার পরীক্ষাকার্য সমাপ্ত করিয়া এ সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যসহ একটি বিবরণী কমন্স সভায় পেশ করেন। কমন্স সভা এই বিবরণী পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হিসাবপরীক্ষক কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে। কমন্স সভার বিভিন্ন দলের পনের জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। বিরোধী দলের একজন সদস্য সাধারণতঃ এই কমিটির সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। হিসাবপরীক্ষক-প্রধানের বিবরণীসহ প্রত্যেক বিভাগের ব্যয়ের হিসাব এই কমিটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকে। কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া কমিটি কমন্স সভায় বিবরণী প্রেরণ করে ও ভবিষ্যতে যাহাতে ব্যয়-বরাদ্দ-সম্পর্কে কোনরূপ অনিয়ম বা অপচয় না ঘটে সে সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করে। হিসাবপরীক্ষক কমিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার জন্য সরকারী বিভাগগুলি ব্যয়সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকে।

বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল (Private Bills)

সাধারণত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিল হইতে ভিন্ন পদ্ধতিতে বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল পাস করা হয়। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল বলিতে বুঝায় সেই সমস্ত আইনের প্রস্তাব, যেগুলির সহিত অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লোকের স্বার্থ জড়িত থাকে বা যে-সমস্ত প্রস্তাব কোন বিশেষ স্থান বা শিল্প-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। কোন শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রস্তাব বা কোন বিশেষ শিল্পব্যবসায়ে শ্রমিক আইন প্রবর্তন করিবার প্রস্তাবগুলিকে বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল বলা যাইতে পারে।

এই জাতীয় বিল উত্থাপনের পূর্বে বিলের উত্থাপককে গেজেটে ও স্থানীয় সংবাদপত্রে বিলসম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হয়। যে পরিষদে বিলটি উত্থাপিত হইবে, বিলের প্রস্তাবককে সেই পরিষদের বে-সরকারী বিল-অফিসে উক্ত বিলসহ একটি আবেদন-পত্র জমা দিতে হয় ও একই সময়ে বিলের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরগুলিতে পাঠাইতে হয়। পার্লামেন্টের উভয় পরিষদেই বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলগুলি আইনসম্মতরূপে সংকলিত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা কবিবার জন্য আবেদন-পত্র পরীক্ষকগণ (Examiners of Petitions for Private Bill) নিযুক্ত থাকেন। ইঁহারা বিলটি বিধি-সম্মতরূপে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করিলে বিলটির প্রথম পাঠ হয়। প্রথম পাঠ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। ইহার পর দ্বিতীয় পাঠ আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটির সাধাবণ নীতি ও আদর্শের উপর আলাপ-আলোচনা চলে। দ্বিতীয় পাঠের সময় ভোটাধিক্যে বিলটি যদি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে বিলটি একটি সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলটিকে পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে তাহাদের বিবরণীসহ সমগ্র সভায় প্রেরণ করে। কিন্তু বিলটি সম্পর্কে যদি কোন পক্ষ আপত্তি জানায়, তাহা হইলে উহাকে একটি সাধারণ প্রাইভেট বিল কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এই কমিটি বিলটি বিবেচনা করিবাব জন্য বিচারালয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে। বিলেব সমর্থকগণ ও বিরুদ্ধবাদীবা আইন-জীবী নিযুক্ত করিয়া সাক্ষ্য-প্রমাণাদিব দ্বারা তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করেন। কমিটি বিশেষ নিপুণভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিলটিকে পরীক্ষা করেন। প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারিগণেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সমগ্র সভার নিকট কমিটি বিলটি সম্পর্কে তাহাদের মন্তব্য পেশ করে। ইহাব পর বিলটির তৃতীয় পাঠ হয় ও সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের অনুরূপ পদ্ধতিতেই উহা আইনে পরিণত হয়।

বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিল প্রণয়ন-পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, এই পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট সভার মূল্যবান্ সময়ের অপচয় ঘটে না। ইহা ব্যতীতও বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলগুলির যথাযথ ও নিরপেক্ষ সমালোচনা হইতে পারে। কিন্তু এই সুবিধাগুলি সত্ত্বেও এই কথা বলিতে হইবে যে, এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের প্রণয়ন-পদ্ধতির অসুবিধা দূর

করিবার উদ্দেশ্যে গ্রেট বৃটেনে নূতন পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। এই পদ্ধতিকে অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ বলা হয়।

অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ (Provisional Orders)

যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের নিকট আবেদন-পত্র পেশ করিতে হয়। সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর উক্ত বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া প্রার্থিত বিষয়ের যুক্তিযুক্ততা-সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ দান করিতে পাবেন। এই আদেশগুলিকে অনুমোদনসাপেক্ষ বলা হয় তাহার কারণ পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদন ব্যতীত শাসনবিভাগের কোন আদেশ কার্যকরী হয় না। সাধারণতঃ এইরূপ কতকগুলি অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ একত্রিত করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্ট সভায় পেশ করেন। কোন মন্ত্রী কর্তৃক একত্রিতভাবে উত্থাপিত এই বিলগুলিকে Confirmation Bill বলা হয়। অতঃপর ইহা বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের অনুরূপ পদ্ধতিতে আইনে পরিণত হয়। যেহেতু এই বিলগুলি সরকারী দপ্তর কর্তৃক অনুসন্ধানের পর পার্লামেণ্ট সভায় উত্থাপিত হয়, সেই হেতু সাধারণতঃ এ সম্পর্কে বিশেষ কোন আপত্তি হয় না।

পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতা (Sovereignty of Parliament)

বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভা হইল সাবভৌম আইনসভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং পার্লামেণ্টের এই সার্বভৌমিকতা হইল বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা এতই দুর্ভেদ্য যে, এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে পার্লামেণ্ট সভা একমাত্র পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ও নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ব্যতীত সবই করিতে পারে। পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা স্বৈর—ইহা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নহে। পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের বৈধতাসম্পর্কে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডের কোন কর্তৃপক্ষেরই, এমন কি, বিচারালয়গুলিরও নাই। পার্লামেণ্ট সভা সর্বপ্রকার আইনই—কি সাধারণ কি শাসনতান্ত্রিক—প্রণয়ন, সংশোধন

ও বাতিল করিতে পারে। পার্লামেন্ট প্রণীত আইন সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রযোজ্য। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে, পার্লামেন্ট সভার তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসকে অ-সার্বভৌম আইনসভা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু নীতিগতভাবে পার্লামেন্ট সভার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইলেও কার্যতঃ বর্তমানে পার্লামেন্ট সভাকে আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা সমীচীন নহে। পার্লামেন্ট বলিতে রাজাসহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা বুঝায়। বর্তমানে রাজা ও লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। পার্লামেন্টের প্রাধান্য বর্তমানে কমন্স সভার প্রাধান্য সূচিত করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কমন্স সভা হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে পার্লামেন্টের প্রাধান্য বলিতে কেবিনেটের প্রাধান্য বুঝায়। ইহা ব্যতীত, অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসন-বিভাগ কর্তৃক আইন-প্রণয়ন ও বিচারবিভাগ কর্তৃক আইন ব্যাখ্যাকালীন পরোক্ষ আইন-প্রণয়ন দ্বারাও পার্লামেন্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইন-গুলির বিরোধী কোনও আইন পার্লামেন্ট সভা প্রণয়ন করিতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইনই ডোমিনিয়নগুলির বিনা সম্মতিতে ডোমিনিয়নগুলিতে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং দেখা যায় যে, পার্লামেন্টের প্রাধান্য বর্তমানে একটি নিছক কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতার সীমা (Limitations on Parliamentary Sovereignty)

বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা স্বৈর ও অন্য-নিরপেক্ষ। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, পার্লামেন্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতার কতিপয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বাধা আছে। আভ্যন্তরীণ বাধা সম্পর্কে ডাইসি বলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পার্লামেন্টের স্বৈর ক্ষমতা প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কোন পার্লামেন্ট সভাই আর উপনিবেশগুলির জনগণের উপর কর ধার্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইবে না। বাহ্যিক বাধা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, যে আইন জনসাধারণ কর্তৃক আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সেরূপ আইন প্রণয়নেও পার্লামেন্ট

সভা দ্বিধাবোধ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন পার্লামেন্টই শ্রমিকসংঘগুলির বিলোপ সাধন করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে সাহসী হইবে না—যদিও আইনতঃ পার্লামেন্টের এইরূপ আইন প্রণয়নে কোন বাধা নাই।

তৃতীয়তঃ, পার্লামেন্ট সভা আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না—কারণ বৃটিশ সরকার একাধিক ক্ষেত্রে জাতীয় আইনের তুলনায় আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে যদি জাতীয় আইনের সহিত আন্তর্জাতিক আইনের সংঘাত ঘটে তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিচারালয়গুলি আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কারণে পার্লামেন্ট সভা আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে দ্বিধা করে।

চতুর্থতঃ, ভোটদাতাগণের নিকট হইল বর্তমানে পার্লামেন্টের প্রধান দায়িত্ব। এই কারণে পার্লামেন্ট জনমত-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে সাহসী হয় না।

পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ডের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থাও পার্লামেন্টের স্বৈর ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিচারালয়গুলি আইনের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে অনেক সময় ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষা-কবচ হিসাবে কাজ করে।

পরিশেষে, ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনষ্টার আইনের বলে পার্লামেন্ট-প্রণীত কোন আইনই আর ডোমিনিয়নগুলির বিনা সম্মতিতে ডোমিনিয়নগুলিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

লর্ড সভা ও কমন্স সভার সম্পর্ক (Relationship between the two Houses)

গ্রেট বৃটেনের পার্লামেন্ট রাজাসহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা লইয়া গঠিত। লর্ড সভা হইল উচ্চ কক্ষ, আর কমন্স সভা হইল নিম্ন কক্ষ। প্রাচীনত্বে ও আভিজাত্যে লর্ড সভা কমন্স সভা হইতে শ্রেষ্ঠতর হইলেও বর্তমানে লর্ড সভার ঐতিহ্য থাকিলেও এই সভা আর পূর্বতন গৌরব ও ক্ষমতার অধিকারী নহে। পার্লামেন্ট বলিতে কার্যতঃ শুধু কমন্স সভাকে বুঝায়।

সদস্য সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, লর্ড সভা কমন্স সভা অপেক্ষা বৃহত্তর। কমন্স সভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা হইল ৬৩০। আর লর্ড সভার সদস্য সংখ্যা হইল প্রায় ৯১০। কমন্স সভার সদস্যগণ গণতান্ত্রিক আদর্শে ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, আর লর্ড সভার সদস্যগণ বংশানুক্রমিক সূত্রে বা মনোনয়ন নীতি অনুসারে নির্বাচিত হন। এই নীতিগুলি গণতন্ত্র-বিরোধী।

আইনসভার প্রধান কার্য হইল তিনটি, যথা, (১) আইন প্রণয়ন করা, (২) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা ও (৩) শাসনবিভাগের নীতি ও কার্যসূচীর উপর সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করা। এ দিক দিয়া লর্ড সভা ও কমন্স সভার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বর্তমানে লর্ড সভা অপেক্ষা কমন্স সভা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন বিষয়ে লর্ড সভা পূর্বে কমন্স সভার সমক্ষমতার অধিকারী থাকিলেও ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইন ও ১৯৪৯ সালের ঐ আইনের সংশোধন হইবার ফলে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে কার্যতঃ পঙ্গু করা হইয়াছে। কমন্স সভা এখন ইচ্ছা করিলে লর্ড সভার বিনা সম্মতিতে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ছাড়া অন্য সাধারণ সম্পর্কিত আইন আইনসভায় উত্থাপনের দিন হইতে এক বৎসর পর রাজার সম্মতিতে পাস করাইতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি অবশ্যই কমন্স সভায় প্রথম উত্থাপিত হয় এবং কমন্স সভা কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব লর্ড সভায় প্রেরণের একমাস পরে লর্ড সভার সম্মতি অথবা বিনা সম্মতিতে পাস হইতে পারে। সুতরাং কি সাধারণ আইন, কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে কমন্স সভাকেই অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী বলা যাইতে পারে। লর্ড সভা প্রস্তাবিত আইনের আলাপ-আলোচনা, সমালোচনা বা সংশোধন প্রস্তাব করিতে পারে। কিন্তু কোন ক্রমেই কমন্স সভার আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারে না। তবে পার্লামেন্ট সভার স্বাভাবিক কার্যকাল বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবে উভয় কক্ষের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীকে কমন্স সভার সদস্য হইতেই হইবে। তিনি লর্ড সভার সদস্য হইতে পারেন না। ইহা ছাড়া, কয়েকটি নির্ধারিত পদ ব্যতীত কেবিনেটের অধিকাংশ পদই কমন্স সভার সদস্যগণ কর্তৃক পূরণ করা হয়। বৃটেনে মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বলিতে কমন্স সভার নিকট

মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বুঝায়। এ বিষয়ে লর্ড সভার কোন ক্ষমতা নাই। একমাত্র বিচারবিষয়ক ক্ষমতায় লর্ড সভা কমন্স সভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

রাজার অনুগত বিরোধীদল (His Majesty's Loyal Opposition)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল নীতি হইল আলাপ-আলোচনার দ্বারা পাবস্পরিক মতভেদ দূর করিয়া যথাসম্ভব সার্বজনীন ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা কবা। কিন্তু মানুষ মাত্রই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও কার্য করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহশীল। স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যেই একমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাঁহাদের মতানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকেন। যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ কবেন, তাঁহারা ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাঁহাদের মত শাসনব্যাপারে কার্যকবী করিতে সচেষ্ট থাকেন। বাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে শুধু শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহা নয়, শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিরোধীদলের সমালোচনাব ভয়ে জনস্বার্থবিরোধী কোন কার্য করিতে সাহসী হয় না। যে-কোন উপায়েই হউক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করাই বিরোধী দলের একমাত্র কর্তব্য নহে। গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সর্বদা জাতীয় স্বার্থেব অনুকূল কার্যকলাপে প্ররোচিত কবা বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এইজন্য প্রয়োজন হইলে বিবোধী দলকে সরকারেব সহিত সহযোগিতা কবিবার প্রয়োজন হইতে পারে। দলগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল দলীয় নীতি ও কার্যসূচীর দ্বারা জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করা। সুতবাং মতানৈক্য সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থের উন্নতিকল্পে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। গ্রেট ব্রটেনে বিরোধী দলকে রাজার অনুগত বিরোধী দল বলা হয়। বিরোধী দলের এই নামকরণের মধ্য দিয়াই বিরোধীদলের কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা করা যাইতে পারে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ গ্রেট ব্রটেনে যেরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। দায়িত্বশীল সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলগুলির অবদান উপেক্ষণীয়

নহে। গ্রেট ব্রটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস আলোচনা করিলে শাসনব্যাপারে দলীয় রাজনীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীত যুগে গ্রেট ব্রটেনে যে দলগুলির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে আধুনিক অর্থে অবশ্য রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া চলে না। এই দলগুলি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল এবং যখনই কোন একটি দল শাসনক্ষমতার অধিকারী হইত তখনই সেই দল অন্য দলগুলিকে সবপ্রকারে পর্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গ্রেট ব্রটেনের বিভিন্ন দলগুলি তাহাদের দলগত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া নীতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি বুঝিতে পারিল যে, শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে একটি বিরোধীদলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। এই বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই বিরোধীদলের সৃষ্টি হয়। সুতরাং গ্রেট ব্রটেনে বিরোধী দল শাসনপরিচালনা কার্যের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সেইজন্য বিরোধী দল ও সরকারী দলের সম্পর্কে কোনরূপ তিক্ততা দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্রেট ব্রটেনে বিরোধী দল সরকারী দলকে অপদস্থ করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে না। সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ উভয়েই জানে যে, একটির অধিক রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। একটি দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, অপর দল যুক্তি দ্বারা ক্ষমতায় আসীন দলের অনুসৃত নীতি ও কার্য-সূচীর সমালোচনা করিবে। একমাত্র বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারাই সরকার তাহার শাসনকায-সম্পর্কিত ক্রটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে। বিরোধী দল বলপূর্বক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করিয়া সরকারী কার্যের সমালোচনা দ্বারা জনমতকে প্রভাবিত করে। জনমত অনুকূল হইলে পরবর্তী নির্বাচনকালে বিরোধী দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারে। গ্রেট ব্রটেনে বিরোধী দলের প্রধান কার্য হইল সরকারী কার্যের সমালোচনা করা।

গ্রেট ব্রটেনে অন্যান্য কেবিনেট সহকর্মীদের সহিত প্রধানমন্ত্রীর যে পরিমাণ আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করিতে হয়, বিরোধী দলের নেতার সহিতও তদ্রূপ তাঁহাকে যোগসূত্র স্থাপন করিতে হয়। পার্লামেন্ট সভায়

কার্যসূচী স্থির করিবার কালে বিরোধী পক্ষকে বিতর্কে যোগদান করিবার জন্য সময় দিতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিলসমূহের উপর বিতর্কের জন্য সময় নির্ধারণকালে বিরোধী পক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। কি আভ্যন্তরীণ শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে, কি বৈদেশিক নীতিনির্ধারণে, বিরোধী দলের সহিত মতবিনিময় করা বৃটিশ শাসনব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হইতে পারে। পার্লামেণ্ট সভা বাৎসরিক আয়ব্যয়-ববাদ্দ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যে হিসাব-পরীক্ষা কমিটি নিযুক্ত করে, বিরোধী দলের একজন প্রতিপত্তিশালী সদস্যই এই কমিটির সভাপতিত্ব করেন। স্পীকার-নির্বাচন ও অন্যান্য কমিটি গঠন ব্যাপারেও বিরোধী দলের সহিত পরামর্শ করা হইয়া থাকে। জরুরী অবস্থায়, বিশেষ করিয়া যুদ্ধকালে বিরোধী দলের সহিত সম্মিলিতভাবে কেবিনেট সভা গঠন করা হয়। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিরোধী দলের নেতাই পার্লামেণ্ট সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার কার্য পরিচালনা করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে যুদ্ধকার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রচুর অবসর দান করিয়াছিলেন। রাজার অনুগত বিরোধী দল শাসনকার্যের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মন্ত্রী বেতন আইন দ্বারা বিরোধী দলের নেতার বেতন নির্ধারিত হইয়াছে। তিনি বাৎসরিক তিন হাজার পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকেন। সরকারী কার্যের জন্য তাঁহাকে এতটা সময় ব্যয় করিতে হয় যে, তাঁহার পক্ষে অন্য কোন কার্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় না।

গ্রেট বৃটেনে বিরোধী দলের কর্তব্য সম্পর্কে অনেক সমালোচক বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। সমালোচকগণ বলেন, যেখানে বিরোধী দলের নেতার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য সম্পাদন করা হয় না, যেখানে বিরোধী দলের নেতার পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি, প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রায় সমতুল্য এবং সর্বোপরি যেখানে বিরোধী দলের নেতা বেতনভুক্ সরকারী কর্মচারীর পদে পর্যবসিত হইয়াছেন সেখানে এই বিরোধী দলের কি সার্থকতা থাকিতে পারে! অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেটের অনেক প্রতিপত্তিশালী সদস্য এবং বিরোধী দলের নেতৃগণ স্কুল-কলেজের সহপাঠী বন্ধু—আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। অনেক সময় তাঁহারা একই শিল্প বা ব্যবসায়-

প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক হইতে পারেন। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের নিকট হইতে সরকারী কার্যকলাপের নিরপেক্ষ সমালোচনার আশা করা দুরাশামাত্র। বিরোধী দলের নেতৃগণ সমপদস্থ ও সমস্বার্থ-ভাবাপন্ন হইলে প্রকৃত সমালোচনার কার্য ব্যাহত হওয়া অবধারিত।

এই বিরুদ্ধ সমালোচনার বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, গ্রেট ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের নেতৃগণ খেলোয়াড়সুচক মনোভাব লইয়া রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহারা জাতীয় স্বার্থকে সর্বসময়েই দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া থাকেন। তাই জাতীয় স্বার্থের জন্য তাঁহারা ব্যক্তিগত বা দলগত মত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ কবেন না।

আমলাতন্ত্র ও অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থা (Bureaucracy and Delegated Legislation)

গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেন্ট সভা হইল আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। কিন্তু বর্তমানে নানাকারণে আইন প্রণয়ন করিবাব এই সাবভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পার্লামেন্ট কর্তৃক হস্তান্তরিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া যে সমস্ত আইন-কানুন প্রবর্তিত কবেন, সেইগুলিকে সাধারণতঃ অর্পিত ক্ষমতাবলে আমলাতন্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত আইন বলা হয়।

বর্তমান সময়ে পার্লামেন্ট সভাব কার্যভাব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পালামেন্ট সভাব সর্ববিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবাব পযাপ্ত সময় নাই। ইহা ব্যতীত পার্লামেন্ট সভা যে আইনগুলি প্রণয়ন করে, সেগুলি শুধু কতকগুলি সাধারণ নীতি স্থিব কবিয়া দেয়। আইনের বিস্তারিত বিবরণগুলি উহ্য থাকে। কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কালে আইনগুলির বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন হয়। এই বিস্তারিত বিবরণ-সম্পর্কিত নিয়ম-কানুনগুলি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সাধারণতঃ মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন অনুসারে পার্লামেন্ট কর্তৃক রচিত আইনেব সহিত নূতন নিয়ম-কানুন সন্নিবেশিত করিয়া আইনটিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উপযোগী করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গ্রেট ব্রিটেনে শাসনকর্তৃপক্ষ অর্পিত ক্ষমতার বলে দুই প্রকারে আইন প্রণয়ন কারতে পারেন। প্রথমতঃ, শাসন-

সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করিবার জন্য ইঁহারা অনেক নূতন নিয়মাবলী প্রবর্তিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট যে-সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দেয় সেই আইনগুলিকে শাসনকর্তৃপক্ষ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নিয়ম-কানুন দ্বারা প্রয়োগোপযোগী করিয়া তুলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রেট বৃটেনে শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারী হইলেন মন্ত্রিপরিষদ। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ স্বল্পকালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। দলীয় কর্তৃত্বের অবসানের সঙ্গে তাঁহাদেরও কার্যকালের সমাপ্তি হয়। মন্ত্রিগণ শাসন-সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রম স্থির করেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতিকে কার্যকরী করিবার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা তাঁহাদের থাকে না। এজন্য মন্ত্রিগণকে স্থায়ী আমলাতন্ত্রের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। আমলাতন্ত্রের এই স্থায়ী কর্মচারিগণ শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রিগণ অপেক্ষা অনেক বেশী অভিজ্ঞ ও কর্মকুশল। সুতরাং কি নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে শাসনকর্তৃপক্ষ এই স্থায়ী কর্মচারিগণের সহায়তা ব্যতীত তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। সুতরাং অর্পিত ক্ষমতার বলে মন্ত্রিগণ যে আইন প্রণয়ন করেন, কার্যতঃ সে আইনগুলি আমলাতন্ত্রের দ্বারাই রচিত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ-প্রবর্তিত প্রত্যেকটি আইন ও প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমলাতন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। অথচ এজন্য আমলাতন্ত্র দায়ী নয়। শাসনকর্তৃপক্ষকেই এই সমস্ত আইন ও নির্দেশের সমস্ত দায়িত্ব বহন করিতে হয়। সুতরাং অর্পিত ক্ষমতার বলে মন্ত্রিগণের উপর আইন-প্রণয়নের যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরোক্ষভাবে এই আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। এইজন্য গ্রেট বৃটেনের জনমত অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসনকর্তৃপক্ষের এই আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা-প্রয়োগের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, একাধিক কারণে শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে এই ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিবার মত পর্যাপ্ত সময় পার্লামেণ্ট সভার নাই। ইহা ছাড়া, সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারসম্পর্কেও পার্লামেণ্টের আদৌ কোন

অভিজ্ঞতা নাই। জরুরী অবস্থায় বিশেষ করিয়া যুদ্ধকালে শাসনকার্যে যাহাতে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, সেজন্য শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসনকর্তৃপক্ষ যে সমস্ত নির্দেশনামা বলবৎ করেন, সেইগুলি পার্লামেন্ট সভা ইচ্ছা করিলে রদ করিতে পারে। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইল পার্লামেন্ট সভা।

মন্ত্রিগণের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা পর্যালোচনা করিবার জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। কমিটি মন্ত্রিগণের এই আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া বলেন যে, মন্ত্রিগণ-প্রদত্ত নির্দেশগুলি কার্যকরী করিবার পূর্বে কমন্স সভা কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে। এই নির্দেশগুলির মধ্যে যদি আপত্তিকর কোন অংশ থাকে তাহা হইলে তাহা কমন্স সভার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এক নূতন আইন দ্বারা শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত নির্দেশগুলি পার্লামেন্টের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের জন্য চল্লিশ দিন সময় নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে গণতন্ত্র-বিরোধী আখ্যা দিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বিচারবিভাগ (The Judiciary)

গ্রেট বৃটেনে বিচারালয়গুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ফৌজদারী আদালত, দেওয়ানী আদালত ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশগুলি হইতে আনীত আপীল মামলা বিচার করিবার আদালত। ফৌজদারী মামলার বিচার করিবার জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল একতরফা আদালত (Court of Summary Jurisdiction)। ইহার উপরে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত। এই বিচারালয়গুলি ছোট ছোট অপরাধের বিচার করে। ইহার পরবর্তী উচ্চ বিচারালয় হইল ত্রৈমাসিক আদালত (Quarter Sessions)। এই আদালত জুরীর সাহায্যে অপেক্ষাকৃত গুরুতর মামলার বিচার করে ও নিম্ন আদালত হইতে আনীত আপীলের বিচার করে। গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত (Assizes) বসে। প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এই আদালতের কার্য

পরিচালনা করেন। এখানেও জুরীর সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। ফৌজদারী মামলার আপীলের জন্য সর্বোচ্চ বিচারালয় হইল ফৌজদারী আপীল আদালত (Court of Criminal Appeal)। ইংলণ্ডের লর্ড চীফ জাষ্টিস্ ও উচ্চ বিচারালয়ের রাজার বিচারবিভাগের (King's Bench Division) একাধিক বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হয়। লর্ড সভায় সাধারণতঃ কোন আপীল করা যায় না। তবে কোন জটিল আইন-সম্পর্কিত প্রশ্ন উঠিলে এ্যাটর্ণি-জেনারেলের সম্মতি লইয়া লর্ড সভায় আপীল করা যাইতে পারে।

দেওয়ানী মামলার বিচার করিবার সর্বনিম্ন আদালত হইল একতরফা বিচারালয় (Court of Summary Jurisdiction)। ইহার পরবর্তী উচ্চ বিচারালয় (The High Court of Justice)। এই বিচারালয় বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচার করে ও নিম্ন আদালত কর্তৃক আনীত আপীলের বিচার করে। এই আদালতের তিনটি বিভাগ আছে, যথা—রাজার বিচার বিভাগ (King's Bench Division), চ্যান্সারী বিভাগ (Chancery Division) ও ইচ্ছাপত্র, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং নৌ-বিভাগ-সংক্রান্ত বিচার-বিভাগ (Will, Divorce and Admiralty Division)। উচ্চ বিচারালয় হইতে আপীল আদালতে (Court of Appeal) আপীল করা যায়। ফৌজদারী মামলার ন্যায় দেওয়ানী মামলারও জটিল আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নে লর্ড সভার নিকট আপীল করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, লর্ড সভার সমুদয় সদস্যই বিচারকের কায করেন না। নয় জন আইনবিশারদ্ লর্ড দ্বারা বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের বিচারবিভাগের আর একটি প্রতিষ্ঠান হইল প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটি। এখানে ভারত ও স্বাধীন আয়ার প্রভৃতি দেশ ব্যতীত কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশ হইতে আনীত আপীলের শুনানী হইত।

ইংলণ্ডের বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiarities of the English Judicial System)

ইংলণ্ডের বিচারবিভাগের পর্যালোচনা করিলে প্রথমতঃ ইহার স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উর্ধ্বতন বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভা-

নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। বিচারপতিগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের রাজসকাশে যুক্ত আবেদন ব্যতীত তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। সুতরাং তাঁহারা যতদিন পর্যন্ত সদাচারী থাকেন ততদিন পর্যন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কর্তৃত্বমুক্ত থাকিয়া নিবপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। তাঁহাদের নির্ধারিত বেতন পার্লামেণ্ট সভার বার্ষিক অনুমোদন-সাপেক্ষ নয় বা পার্লাসেণ্ট সভা তাঁহাদের বিচারকার্যের কোনরূপ সমালোচনাও করিতে পারে না।

ইংলণ্ডের বিচারকগণের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক সমালোচক বলেন যে, প্রতিষ্ঠিত বিচারব্যবস্থার মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি না থাকিলেও ইংলণ্ডের বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফলে বিচারবিভাগ অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আইনের ব্যাখ্যাও প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের বিচারকমণ্ডলী সাধারণতঃ অভিজাত শ্রেণী হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই অভিজাত শ্রেণী প্রায়শঃ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়া শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল সূত্রগুলি তাঁহাদের কর্মজীবনে এরূপ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে যে, তাঁহাদের পক্ষে এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। তাই বিচারকগণের পক্ষে সার্বজনীন ভিত্তিতে আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের বিচারালয়গুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়গুলির মত পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারে না। ইংলণ্ডে শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, পার্লামেণ্ট সভার সার্বভৌমত্ব। বিচারালয়গুলি আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু কোনক্রমে আইনগুলির বৈধতাসম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বিচারালয়গুলি পার্লামেণ্ট সভার অধীন।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের বিচারবিভাগে ফরাসী দেশের অনুরূপ কোন স্থায়ী শাসনবিভাগীয় বিচারালয় (Administrative Court) নাই। আইনের অনুশাসন শাসনতন্ত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনের প্রাধান্যের জন্য আইনের চক্ষে সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী সমপর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থতঃ, গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি ও বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে পবিচালিত হয়।

বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি—(Principle of Mutual Check and Balance in the British Constitution)

বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-বিভাজন নীতির সূক্ষ্ম প্রয়োগ দেখা যায় না। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতার একত্রীকরণ দৃষ্ট হয়, যেমন, লর্ড চ্যান্সেলর একাধারে আইনসভার (লর্ড সভার) সদস্য, কেবিনেটের (শাসনবিভাগীয়) সদস্য ও ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ বিচারালয় লর্ড সভার সদস্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ দৃষ্ট না হইলেও বৃটিশ শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির প্রয়োগ দেখা যায় এবং এই পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে অন্তর্বিভাগীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে সরকারী প্রত্যেকটি বিভাগের সহিত অপর বিভাগের নির্ভরশীলতাসূচক সহযোগিতা রহিয়াছে, যথা, (১) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ আইন প্রণয়ন করে; কিন্তু রাজার সম্মতি ব্যতীত এই আইন বলবৎ করা যায় না। (২) মন্ত্রিসভা ইহার কার্যের জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। পার্লামেন্ট সভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া অথবা অন্য নানাভাবে মন্ত্রিসভাকে বিতাড়িত করিতে পারে। (৩) পার্লামেন্ট সভা মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে সত্য, কিন্তু মন্ত্রিসভাও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজার সম্মতি লইয়া পার্লামেন্ট সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। (৪) মন্ত্রিগণ স্থায়ী কর্মচারিগণকে নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু মন্ত্রিগণকেও বিশেষ কাজের জন্য এই কর্মচারিগণের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয়। (৫) বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহারা শাসনকর্তৃপক্ষের অবৈধ কাজের সমালোচনা ও বাধা সৃষ্টি করিতে পারেন। একবার বিচারপতি নিযুক্ত হইলে তাঁহারা যতদিন সদাচারী থাকেন, ততদিন শাসনকর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারেন না।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা (Local Government)

স্থানীয় স্বার্থসম্পর্কিত ব্যাপারগুলি স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা যখন পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ইংলণ্ডে স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান আছে। পার্লামেণ্ট সভা নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে এই শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকটা স্বাধীনভাবে তাহাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে।

স্থানীয় শাসন পরিচালনা করিবার নিমিত্ত সমগ্র ইংলণ্ড ও ওয়েলস্‌কে তিরাশীটি কাউন্টি (County Borough) এবং বাষট্টিটি শাসন কাউন্টিতে (Administrative County) বিভক্ত করা হইয়াছে। কাউন্টিগুলি আবার বহুসংখ্যক জিলা (Districts) লইয়া গঠিত হয়। জিলাগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) শহরাঞ্চল জিলা (Urban Districts) ও (২) গ্রামাঞ্চল জিলা (Rural Districts)। অনেকগুলি গ্রাম (Parish) লইয়া এই জিলাগুলি গঠিত হয়।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠিত একটি সভা (Council) আছে। একুশ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক স্থানীয় অধিবাসীর ভোটদান-ক্ষমতা আছে। কাউন্টি ও বরোগুলিতে নির্বাচিত সদস্যগণ অল্ডারম্যান নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সভার সাধারণ সদস্য ও অল্ডারম্যান যুক্তভাবে একজন মেয়র নির্বাচিত করেন। মেয়র বেতন পাইয়া থাকেন, কিন্তু তিনি বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী নহেন। স্থানীয় সভাগুলি কতকগুলি কমিটি গঠন করিয়া কমিটির মাধ্যমে বহু কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কার্য হইল স্থানীয় অধিবাসীদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ, জল ও আলোক সরবরাহ, অগ্নিনির্বাণ, গ্রাম ও শহর পরিকল্পনা করা প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর কার্য ইহাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ ও বে-সামরিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করিবার ভার এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা, পুস্তকালয়, যাদুঘর, শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রসূতি-আগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করে।

স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির যে ব্যয় হয় তাহা স্থানীয় কর, ব্যবসায় হইতে আয়, ঋণগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা সংকুলান করা হয়।

লণ্ডন শহরের জন্য বিশেষ শাসনব্যবস্থা আছে। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে লণ্ডনকে তিনটি অংশে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, (১) লণ্ডন শহর (City of London), (২) কাউন্টি লণ্ডন (County of London) এবং (৩) রাজধানী লণ্ডন (Metropolitan London)। লণ্ডন শহরের আয়তন মাত্র এক বর্গ মাইল। এখানে একটি কর্পোরেশন আছে। কর্পোরেশনের কাজ একজন লর্ড মেয়র ও তিনটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়।

কাউন্টি লণ্ডনের কাজ ১২৪ জন নিবাচিত কাউন্সিলর ও ২০ জন অল্ডারম্যান লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের দ্বারা পরিচালিত হয়। কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণ মিলিয়া এক বৎসরের জন্য একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করে। কাউন্টি লণ্ডন আবার ২৮টি পল্লীতে (Borough) বিভক্ত এবং প্রত্যেক পল্লীর কাজের জন্য একজন নির্বাচিত মেয়র, এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যান আছেন।

রাজধানী লণ্ডন হইল পুলিশ শাসনের একটি বিভাগ। কাউন্টি লণ্ডন ছাড়াও অন্যান্য কাউন্টির অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। আয়তনে ইহা প্রায় সাত শত বর্গমাইল। রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন পুলিশ কমিশনার তিনজন সহকারী কমিশনারের সাহায্যে কার্য পরিচালনা করেন।

রাজনৈতিক দল (Political Parties)

এক গ্রেট ব্রুটেন ব্যতীত অন্য কোন দেশে রাজনৈতিক দলের প্রভাব গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য এতটা সহায়ক হয় নাই। বহু পূর্ব হইতেই দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ছিল।

ইংলণ্ডে বহুদিন পূর্ব হইতেই দুইটি দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। অবশ্য পূর্বের এই দলগুলিকে রাজনৈতিক দল আখ্যা না দিয়া বিবদমান স্বার্থান্বেষী কুচক্রী দল বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। Lancastrians ও Yorkists, White Roses ও Red Roses, Cavaliars ও Roundheads এই জাতীয় দল ছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'গৌরবময় বিপ্লবের' পরবর্তী

কালে ইংলণ্ডে Whigs এবং Tories নামক দুইটি সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান ঘটে। কালক্রমে এই দুইটি দল নাম পরিবর্তন করিয়া রক্ষণশীল (Conservatives) ও উদারনৈতিক (Liberals) দলে রূপান্তরিত হয়। রক্ষণশীল দলটি ইহার পূর্ববর্তী Tory দলের নীতি গ্রহণ করিয়া চলতি অবস্থা সংরক্ষণের পক্ষপাতী হইল। উদারনৈতিক দলটি Whigs মতবাদ গ্রহণ করিয়া প্রগতিমূলক সংস্কার দাবী করিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার দাবী করিয়া একটি আইরিশ জাতীয় দল গঠিত হয়, কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আয়াবল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অর্জনের পরে এই দল বিলুপ্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের অভ্যুত্থানে ইংলণ্ডের অতি প্রাচীন দ্বি-দলীয় ঐতিহ্যে ছেদ পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রমিকদল ইহার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয় এবং নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করে। ইংলণ্ডে বর্তমানে তিনটি—রক্ষণশীল, উদরনৈতিক ও শ্রমিক দল থাকিলেও কার্যতঃ দুইটি দল (রক্ষণশীল ও শ্রমিক) প্রবল। উদারনৈতিক দলটি বর্তমানে বিশেষ দুর্বল হইয়াছে বলিয়া জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের উপর এই দলের আর বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই। পার্লামেণ্ট সভায় এই দল সাধারণতঃ রক্ষণশীল দলকে সমর্থন করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির বৈশিষ্ট্য (Features of English Political Parties)

ইংলণ্ডে দলীয় ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, অর্থ-নৈতিক বা রাজনৈতিক—যে-কোন কারণে হউক না কেন, এই দলগুলির মধ্যে যে মতানৈক্য থাকে তাহা শুধু শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। জাতীয় জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রে এই মতানৈক্যের ফলে দলগুলির মধ্যে বিরোধ হয় না। এই কারণেই কোন জরুরী অবস্থায় দলগুলি তাহাদের মতানৈক্য বিসর্জন দিয়া সবদলীয় সরকার গঠন সাহায্যে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, এই দলগুলি সরকার হইতে অবিচ্ছেদ্য। সরকার হইল সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিমাত্র এবং এই প্রতিনিধির মাধ্যমেই দলের নীতি রূপায়িত হয়।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে ক্ষমতায় আসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সহযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন দেশে তাহা নাই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে বিরোধী দলের নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পার্লামেন্টের কার্যসূচীও বিরোধী দলের নেতার সম্মতিতে প্রস্তুত হয়। বিরোধী দলের নেতা শাসন পরিচালনা কার্যের এরূপ অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হন যে, বর্তমানে তিনি সরকারের বেতনভুক্ পদস্থ কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হন।

চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডের দলীয় সংগঠনগুলির কাযক্রম নির্দিষ্ট আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণে দলগুলি সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলাবদ্ধ। নির্ধারিত দলীয় নীতির প্রতি আনুগত্য প্রত্যেক সদস্যই পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।

দলীয় সংগঠন (Party Organisation)

রাজনৈতিক দলগুলি সুসংবদ্ধ না হইলে জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। এইজন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দল আইনসভার অভ্যন্তরে ও বাহিরে দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট হয়। ইংলণ্ডে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের যে-সমস্ত সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন তাঁহারা তাঁহাদের নির্বাচিত নেতার নির্দেশে পরিচালিত হন। আইনসভায় প্রত্যেক দলের নির্বাচিত হুইপ থাকেন। তাঁহারা দলীয় কার্যনির্বাহ ব্যাপারে দলের নেতাকে সাহায্য করেন।

পার্লামেন্ট সভার বাহিরেও প্রত্যেক দলের নিজস্ব স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠন আছে। প্রার্থী-মনোনয়ন, প্রচারকার্য ও নির্বাচন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা হইল এই সংগঠনগুলির প্রধান কর্তব্য। প্রত্যেক দলের একজন নেতা নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং নির্বাচিত নেতাকে কেন্দ্র করিয়া দলীয় কর্মসূচী নির্ধারিত হয়।

শ্রমিক দল (Labour Party)

প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক লইয়া শ্রমিক দল গঠিত। এইজন্য শ্রমিক দলে সমবায়সমিতি ও শ্রমিকসংঘগুলির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং দলের অধিকাংশ অর্থ শ্রমিকসংঘগুলি হইতে সংগৃহীত হয়। শ্রমিক কল্যাণের

উদ্দেশ্যে এই দল সমস্ত শিল্প, কল-কারখানা প্রভৃতি জাতীয়করণের পক্ষপাতী। পশ্চিম শক্তিগোষ্ঠীর সমর্থক হইলেও এই দলটি সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি আদৌ বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন নহে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে শ্রমিক দল কমন্স সভায় ২৫৮টি আসন লাভ করে।

রক্ষণশীল দল (Conservative Party)

বড় বড় জমিদার, শিল্পপতি, মহাজন, ধর্মযাজক প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া রক্ষণশীল দল গঠিত। বর্তমানে কিছুসংখ্যক শ্রমিকও এই দলে যোগদান করিয়াছে। উৎপাদনক্ষেত্রে এই দল জাতীয়করণ নীতি সমর্থন করে না। ইহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের প্রাধান্য বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি এই দল বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। বর্তমানে এই দল শাসনক্ষমতায় আসীন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে এই দল ৩১৮টি আসন লাভ করিয়া কমন্স সভায় সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে

উদারনৈতিক দল (Liberal Party)

অতীতে উদারনৈতিক দল জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্তমানে আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলে এই দলটি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ও জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের উপর এই দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। পার্লামেণ্ট সভায় এই দল সাধারণতঃ রক্ষণশীল দলকে সমর্থন করিয়া থাকে। জাতীয়করণ নীতির পরিবর্তে এই দল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সমর্থন করে। বর্তমানে কমন্স সভায় এই দলের সদস্য সংখ্যা হইল মাত্র ছয়জন।

সাম্যবাদী দল (Communist Party)

গ্রেট বৃটেনের রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে বর্তমানে সাম্যবাদী দলের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে সাম্যবাদী দলের কোন সদস্যই পার্লামেণ্ট সভায় নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই দল শ্রমিক দলের সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে শ্রমিক দল

সাম্যবাদী দলের সহিত একযোগে কার্য করিতে অসম্মত হওয়ার ফলে ইহাদের প্রভাব হ্রাস পায়।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি (Nature of the British constitution)

অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্র হইতে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল, এই শাসনতন্ত্রের অখণ্ড ধারাবাহিকতা ও ইহার সহজ পরিবর্তনশীলতা। জাতীয় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই শাসনতন্ত্র পুষ্টিলাভ করিলেও অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসূত্র বৃটিশ জাতি কোনদিনই একেবারে ছিন্ন হইতে দেয় নাই। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই বর্তমানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অতীত যুগের প্রতিষ্ঠান ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই শাসনতন্ত্রকে পৃথিবীর প্রাচীনতম শাসনতন্ত্র বলা যাইতে পারে। এই শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত হইলেও সুপ্রতিষ্ঠিত আইনের অনুশাসন (Rule of law) নীতির সাহায্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বাধিক পরিমাণে রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা থাকার ফলে এই শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনায় কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে না। সর্বোপরি এই শাসনতন্ত্রে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র—অতীত, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। বৃটেনের শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় হইলেন রাজা। রাজার যথেষ্ট ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা থাকিলেও তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে কোন ক্ষমতাই পরিচালনা করিতে পারেন না। রাজা বর্তমানে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। সুতরাং বৃটেনে রাজতন্ত্রের অবস্থিতি গণতন্ত্র প্রসারের পরিপন্থী না হইয়া বরং ইহার সহায়ক হইয়াছে। ক্ষমতাবিহীন হইলেও রাজা জাতীয় জীবনের সকল উচ্চ আদর্শের প্রতীক এবং বৃটেন ও অন্যান্য সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের ঐক্যের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হন। বৃটেনের লর্ড সভা হইল অভিজাততন্ত্রের নিদর্শন। অন্যান্য দেশের অভিজাততন্ত্রের সহিত বৃটেনের অভিজাততন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল যে, এই অভিজাততন্ত্র শুধুমাত্র বংশানুক্রমিক স্থায়ী অভিজাততন্ত্র নহে—পরন্তু অভিজাততন্ত্র ও জনসাধারণের

মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রহিয়াছে। কোন লর্ডের একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই লর্ড হইয়া থাকেন, অন্যান্য সন্তানগণ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত থাকেন, আবার প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে রাজা জনসাধারণের মধ্য হইতে গুণানুসারে লর্ড সৃষ্টি করেন। সুতরাং ব্রটেনের অভিজাত শ্রেণী একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নহে। ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন ও ইহার সংশোধন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা বহুল পরিমাণে সংকুচিত হইয়াছে। সুতরাং অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ব্রটেনে গণতন্ত্রের প্রসার বাধা পায় নাই। জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমন্স সভাই হইল ব্রটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতীক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান উৎস। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলিলে বর্তমানে কমন্স সভার প্রাধান্য সূচিত হয় এবং কমন্স সভার মধ্য দিয়াই গণতান্ত্রিক আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রের কাঠামো রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক—এই তিনটি আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও গণতান্ত্রিক আদর্শই প্রকৃত কার্যকরী শক্তি হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে।

বর্তমানে অবশ্য কেবিনেট সভার ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে কমন্স সভার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। গণতান্ত্রিক শক্তি ধীরে ধীরে মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ত হইয়া গণতন্ত্র অভিজাততন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ব্রটেনের জন-সাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা এতই প্রবল যে, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না। অন্যায়ভাবে ইজিপ্ট আক্রমণ করিবার ফলে জনমতের চাপে এমন কি জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনী ইডেন্‌কেও পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের উৎস—শাসনতন্ত্রের উৎস হইল—(১) শাসনতান্ত্রিক আইন ও (২) প্রথাগত বিধান, (৩) কতকগুলি ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র, (৪) পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন, (৫) বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত এবং (৬) প্রথাগত আইন লইয়া শাসনতান্ত্রিক আইন গঠিত। এই আইনগুলি

আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায়। প্রথাগত বিধানগুলি পার্লামেণ্ট-নিরপেক্ষ-ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিধানগুলি রাজা, মন্ত্রিসভা ও সমুদয় রাজকর্মচারীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু এই বিধানগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় না। তিন শ্রেণীর প্রথাগত বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) রাজা ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত, (২) পার্লামেণ্ট সভার কার্যপদ্ধতি-সম্পর্কিত এবং (৩) গ্রেট বৃটেনের সহিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলি-সম্পর্কিত।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিবার প্রধান কারণ হইল জনমতের প্রভাব, আইন ভঙ্গ করিবার ভয় নহে।

আইন ও প্রথাগতবিধান—(১) আইন আইনসভা কর্তৃক রচিত হয়, প্রথাগতবিধান আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে ধীরে ধীরে গঠিত হয়। (২) বিচারালয় আইন বলবৎ করিতে পারে, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বিচারালয় সাহায্যে বলবৎ করা যায় না।

প্রথাগত আইন ও প্রথাগত বিধান উভয়েই আইনসভা নিরপেক্ষভাবে বর্ধিত হইলেও প্রথাগত আইন বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করা যায়, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বলবৎ করা যায় না।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—১। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। ক্ষমতার কোনরূপ ভাগ হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস। ২। অ-লিখিত ও সহজে পরিবর্তনশীল। মহাসনদ প্রভৃতি কিছু লিখিত অংশ থাকিলেও এই শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত এবং পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতেই ইহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। ৩। পার্লামেণ্ট সভার প্রাধান্য। এই প্রাধান্যের বলে পার্লামেণ্ট সভা সর্ব-প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে ও বাতিল করিতে পারে। কোন বিচারালয়ই পার্লামেণ্টের আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারে না। ৪। ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি এই শাসনতন্ত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। ৫। আইনের অনুশাসন এই শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান ও বিনা বিচারে কাহাকেও বন্দী রাখা যায় না। ৬। আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলিয়া

এই ব্যবস্থাকে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ৭। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ৮। শাসনতন্ত্রের অবাস্তবতা অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কার্যক্ষেত্রে এই নীতিগুলি প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ৯। অখণ্ড ধারাবাহিকতা অর্থাৎ অতীত শাসনব্যবস্থার সহিত বর্তমান শাসনব্যবস্থার যোগসূত্র কার্যতঃ কোনদিনই ছিন্ন হয় নাই।

রাজা ও রাজতন্ত্র—বৃটিশ শাসনতন্ত্রে রাজা ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য হইল একটি লক্ষণীয় বিষয়। রাজা হইলেন ব্যক্তিবিশেষ, আর রাজতন্ত্র হইল প্রতিষ্ঠানবিশেষ। রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতা কালক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া রাজতন্ত্রে আরোপিত হইয়াছে। বর্তমানে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট সভার সদস্যগণের সম্মতিক্রমে কেবিনেট সদস্যগণ এই প্রতিষ্ঠানগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ রাজার মৃত্যু হইলেও প্রতিষ্ঠানগত রাজার মৃত্যু নাই। রাজার ক্ষমতা জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা অব্যাহতভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজা স্ব-ইচ্ছায় কোন কার্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার নামে মন্ত্রিগণ যে-সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন তজ্জন্য রাজাকে কোন মতে দায়ী করা যায় না। রাজা নিজে কোন অন্যায় কার্য করিতে পারেন না বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায় কার্যে প্ররোচিত করিতে পারেন না। কারণ, কোন ব্যক্তি অন্যায় কার্য করিয়া রাজার নির্দেশ বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

রাজার ক্ষমতা—রাজার শাসন-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন বিষয়ক, বিচারবিভাগীয় এবং অন্য বহুবিধ ক্ষমতা আছে। তিনি সরকারী উচ্চপদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ করেন, আইন-প্রণয়নে তাঁহার সম্মতি অপরিহার্য। তিনিই সমাজের কর্ণধার। কিন্তু বর্তমানে কার্যতঃ তিনি কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে পারেন না। মন্ত্রিগণ কর্তৃক রাজার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার কারণ—১। গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের রক্ষণশীল প্রকৃতি। ২। রাজার পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ফরাসী দেশের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ নির্বাচিত কোন রাষ্ট্রপতি গ্রেট বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শ অব্যাহত রাখিতে অসমর্থ। ৩। রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তি শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

৪। রাজা মন্ত্রিপরিষদকে কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন, নিষেধ করিতে পারেন ও পরামর্শ দান করিতে পারেন। ৫। রাজা হইলেন সমগ্র কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের প্রতীক। রাজার অভাবে এই ঐক্য বিনষ্ট হইতে পারে।

শাসনকর্তৃপক্ষ—কেবিনেট : পূর্বে রাজার মন্ত্রণাসভা প্রিভি কাউন্সিল বৃহদায়তনবিশিষ্ট হইয়া উঠিলে রাজা অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সদস্যের সহিত পরামর্শ করিতেন। কালক্রমে এই ক্ষুদ্র মন্ত্রণাসভা কেবিনেটে পরিণত হইল। প্রথম জর্জের রাজত্বকালে রাজা এই মন্ত্রণাসভায় যোগদানে বিরত হইলেন। কাজেই সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সভার কার্য পরিচালনা করিতেন। কেবিনেটের এই সভাপতিই প্রধানমন্ত্রী নামে পরিচিত হইলেন। এই সময়ে কেবিনেটের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার নিজ দল হইতেই কেবিনেট সভার সদস্য মনোনীত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা পার্লামেণ্ট সভার আস্থাভাজন থাকিতেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা মন্ত্রিত্ব করিতেন।

কেবিনেটের সংগঠন, বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ—নূতন নির্বাচনের পর রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে কেবিনেট গঠন করিতে আহ্বান করেন। নেতা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন ও তাঁহার মনোনীত সদস্যগণ রাজা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে কেবিনেট সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ১। কেবিনেট সভার সদস্যগণ একমতাবলম্বী একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ২। সদস্যগণের পক্ষে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক ও তাঁহারা যৌথভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। ৩। সদস্যগণের মধ্যে ঐক্যমত ও সংহতি একান্ত আবশ্যক। ৪। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই ঐক্যমত ও সংহতি বজায় থাকে। ৫। কেবিনেট সভার কার্যসূচীর গোপনীয়তা রক্ষা করা ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য। ৬। রাজার অনুপস্থিতি কেবিনেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য। কেবিনেট সভার প্রধান কার্য—(১) শাসননীতি নির্ধারণ করা। (২) পার্লামেন্ট-সমর্থিত নীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। (৩) বিভিন্ন বিভাগগুলির কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করা। (৪) আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা ও পার্লামেন্টের সমর্থনে প্রস্তাবগুলিকে আইনে পরিণত করা। (৫) আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা।

কেবিনেটের সহিত (১) রাজা ও (২) পার্লামেন্ট সভার সম্পর্ক—নীতিগতভাবে রাজার মন্ত্রণাসভা ও রাজাকে মন্ত্রণা দান করাই কেবিনেটের প্রধান কর্তব্য এবং এজন্য কেবিনেট সমবেতভাবে রাজার নিকট ইহাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী। বর্তমানে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে রাজার নিকট কেবিনেটের এই দায়িত্ব নামমাত্র দায়িত্বে পরিণত হইয়াছে। মন্ত্রিগণই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের মুখপাত্র হিসাবে রাজাকে শাসনপরিচালনা-সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ জ্ঞাত করান, কিন্তু রাজার পরামর্শ কেবিনেট গ্রহণ না করিতেও পারে।

কেবিনেটে কার্যতঃ পার্লামেন্ট সভার নিকট ইহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী। পূর্বে পার্লামেন্ট সভার অনাস্থা প্রস্তাবে বহু কেবিনেট ক্ষমতা-চ্যুত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে কেবিনেট সভাই অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। পার্লামেন্টের সহিত মতভেদ হইলে কেবিনেট কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। সুতরাং কেবিনেট এখন প্রত্যক্ষ-ভাবে ভোটদাতৃগণের নিকট দায়ী। কেবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে পার্লামেন্ট সভার ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। পার্লামেন্ট সভা বর্তমানে শুধু কেবিনেট-নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমে সমর্থন জ্ঞাপন করে। কেবিনেটের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ হইল : (১) কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা, (২) সার্বজনীন ভোটাধিকার-প্রবর্তনের ফলে ইংলণ্ডে ভোটদাতার সংখ্যার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। সুতরাং দলের সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য ব্যতীত কোন প্রার্থীর পক্ষে স্বাধীনভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব। (৩) সদস্যগণ বেতন পাইয়া থাকেন সুতরাং কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিলে তাঁহারা এই বেতন হইতে বঞ্চিত হইবেন। (৪) প্রতিপত্তিশালী দলীয় নেতাকর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন সদস্য বিরোধিতা করিতে ইচ্ছুক নন। উল্লিখিত কারণগুলির সমবায়ে বর্তমানে পার্লামেন্ট সভার ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভার নির্বাচিত সদস্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁহার নেতৃত্বে কেবিনেট গঠিত হয়। তিনি কেবিনেট সভার সভাপতি ও অন্যান্য কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার সমপর্যায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া

লইয়া থাকেন। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে নিজে পদত্যাগ করিয়া সমগ্র কেবিনেটের পতন ঘটাইতে পারেন ও তৎপরে রাজার অনুরোধক্রমে তাঁহার ইচ্ছামত কেবিনেট সভার সদস্যদের রদবদল করিতে পারেন। সমগ্র কেবিনেট সভার প্রতিনিধিরূপে তিনি শাসনকার্যে রাজাকে পরামর্শ দান করেন। পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারূপে তিনি কেবিনেট-অনুসৃত নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ রচিত হয়, আয়-ব্যয়-বরাদ্দগুলি নির্ধারিত হয় এবং পার্লামেণ্ট সভার যাবতীয় কার্য পরিচালিত হয়! বাহিরের জনমতের উপর তাঁহাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। জনমতকে স্বীয় দলীয় মতের অনুবর্তী করিতে না পারিলে তাঁহার নেতৃত্বের অবসান অনিবার্য। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতার উপরেই রাষ্ট্র-পরিচালনা-কার্যের সাফল্য নির্ভর করে।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ—শাসনকায পরিচালনা করিবার নিমিত্ত বৃটেনে দুই শ্রেণীর শাসক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—অস্থায়ী ও স্থায়ী শাসক। মন্ত্রি-পরিষদ মাত্র একটি নির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারের মূলনীতিগুলি তাঁহারা নির্ধারিত করেন। এজন্য তাঁহারা পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী থাকেন। শাসন-সংক্রান্ত-নীতিগুলিকে বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কার্যকরী করিতে গেলে যে অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার প্রয়োজন হয়, মন্ত্রিগণ তাহার অধিকারী নহেন। এইজন্য মন্ত্রিগণকে সাহায্য করিবার জন্য এক শ্রেণীর স্থায়ী কর্মচারী থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা গুণানুসারে তাঁহাদের নিয়োগ করা হয়। এই স্থায়ী কর্মচারিগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। দলীয় শাসনের পরিবর্তনে ইঁহাদের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইঁহারা দলনিরপেক্ষভাবে দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখেন।

পার্লামেণ্ট সভা—পার্লামেণ্ট সভা হইল গ্রেট বৃটেনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন আইনসভা। রাজাসহ লর্ড সভা ও কমন্স সভাকে যুক্তভাবে পার্লামেণ্ট বলা হয়। এ সভা আদিম ও স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন সম্পর্কে বৃটেনের কোন বিচারালয়ই বৈধতার প্রশ্ন তুলিতে পারে না।

লর্ড সভা—প্রায় ৯১০ জন বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য লইয়া লর্ড সভা গঠিত। ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার পর এই সভার

আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে সংকুচিত হইয়াছে। বর্তমানে এই সভা একবৎসর কাল পর্যন্ত সাধারণ আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারে, কিন্তু আয়ব্যয়-সম্পর্কিত প্রস্তাব এই সভায় পেশ হইবার একমাস কাল পরে ইহার অনুমোদন ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইতে পারে। তবে এই সভা আজও পর্যন্ত বৃটেনে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। নয়জন মনোনীত আজীবন সদস্য এই বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এই সভার সদস্যগণ কমন্স সভার সদস্যগণের প্রাপ্য অধিকারগুলি ছাড়াও আর কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করেন, যথা,—ব্যক্তিগতভাবে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা, পৃথক ভাবে সভার অধিবেশনের আহ্বান পাইবার অধিকার, ইত্যাদি। লর্ড সভা জনগণ-নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত না হইলেও দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন স্বার্থ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে, একথা বলা যাইতে পারে। কার্যকারিতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও বলা যায় যে, জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে উচ্চ পরিষদের যাহা করণীয়, লর্ড সভা সে সমুদয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে।

লর্ড সভার বিরুদ্ধে অভিযোগ—১। এই সভার গঠনতন্ত্র গণতন্ত্র-বিরোধী।

২। এই সভা ধনিক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

৩। পূর্বাপর এই সভা প্রগতিমূলক কার্যে বাধা দিয়াছে। ৪। এই সভা আইনের প্রস্তাবের গুণাগুণ বিচার না করিয়া একমাত্র রক্ষণশীল দল কর্তৃক আনীত প্রস্তাব সমর্থন করে। সুতরাং এই সভা একদিকে বাহুল্য মাত্র, অন্যদিকে ক্ষতিকর।

কমন্স সভা—সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ছয়শত তিরিশ জন সদস্য লইয়া কমন্স সভা গঠিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন বলবৎ হইবার পর পার্লামেণ্ট বলিতে কার্যতঃ কমন্স সভাকেই বুঝায়। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-বরাদ্দ-নিয়ন্ত্রণ, কেবিনেট সভার সদস্য-নির্বাচন ও কেবিনেটের নীতি ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমন্স সভার হস্তে ন্যস্ত; কিন্তু বর্তমানে এই সমুদয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কেবিনেটের সহিত মতবিরোধ ঘটিলে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। কমন্স

সভার সদস্যগণও বাক্‌স্বাধীনতা, সভার অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্বে ও পরে বন্দী না হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন।

সভাপতি বা স্পীকার—কমন্স সভার কার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত সমগ্র সভা একজন সভাপতি নির্বাচন করেন। এই নির্বাচন অবশ্য রাজা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। নির্বাচিত সভাপতিকে সম্পূর্ণ দল-নিরপেক্ষ থাকিয়া সভার নিয়ম-কানুন অনুসারে সভার সমুদয় কার্য পরিচালিত করিতে হয়। সভার কার্য পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার নির্দেশ চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

কমিটি ব্যবস্থা ও আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি—আইনসভার কার্য সাধারণতঃ কতকগুলি কমিটির দ্বারা বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয়। সভার অধিবেশনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রিসহ সবদলের সম্মেলনে একটি নির্বাচন কমিটি নিযুক্ত হয়। এই নির্বাচনী কমিটি অন্যান্য কমিটিগুলির সদস্য নির্বাচন করে। পার্লামেন্ট সভায় নানাবিধ কমিটি গঠিত হয় যথা, স্থায়ী কমিটি, অস্থায়ী কমিটি, একটি অধিবেশনের জন্য গঠিত কমিটি বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল পরীক্ষা করিবার কমিটি, ইত্যাদি।

আয়ব্যয়-বরাদ্দ বিল ব্যতীত সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। বিলটি প্রস্তুত হইলে সভাপতির অনুমোদন লইয়া বিলটি আইনসভায় পেশ করিতে হয়। পেশ হইবার পর প্রথম পাঠ হয়। ইহা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। তাহার পর নির্ধারিত দিনে দ্বিতীয় পাঠ হয় ও এই সময়ে সবিস্তারে আলোচনা না হইয়া বিলটির শুধু মূলনীতি ও আদর্শের উপর আলোচনা চলে। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটি অনুমোদিত হইলে ইহা একটি কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। কমিটি বিচার বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে কিছু পরিবর্তন করিয়া তাহাদের বিবরণীসহ সমগ্র সভায় বিলটি প্রেরণ করে। তখন তৃতীয় পাঠ হয়। তৃতীয় পাঠে বিলটি সমগ্রভাবে গৃহীত হইলে অপর পরিষদে প্রেরিত হয় ও সেখানে অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া পরিষদের সম্মতি লাভ করিলে উহা রাজার নিকট প্রেরিত হয় এবং রাজার স্বাক্ষর যুক্ত হইলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

অর্থ-সংক্রান্ত বিলের প্রস্তাব একমাত্র কমন্স সভায় উত্থাপিত হয়। অর্থ-

সংক্রান্ত বিল ও বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতিতে আইনে পরিণত হয়। বিশেষ-স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলের প্রণয়ন-পদ্ধতি জটিল বলিয়া অনেক সময় বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাগে বিলের খসড়া সহ বিল অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র পেশ করিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট শাসন-বিভাগ প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন করিয়া বিলটি অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্ট সভায় পেশ করে। শাসনবিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলকে অনুমোদন-সাপেক্ষ বিল বলা হয়।

রাজার অনুগত বিরোধী দল—বৃটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরোধী দলের অস্তিত্ব বহুপূর্ব হইতেই দেখা যায়। পূর্বকালে বিরোধীদলগুলি বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত চরম বিরোধিতা করিত। বৃটেনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় উন্নতির উদ্দেশ্যে তাহাদের কার্যসূচী নির্ধারিত করিতে লাগিল এবং জাতীয় উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করিল। বর্তমানে বিরোধী দল জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সহযোগিতাব মনোভাব লইয়া সরকারী দলেব সহিত প্রতিযোগিতা করে। প্রধানমন্ত্রী সর্ববিষয়ে বিরোধী দলের নেতার সহিত পবামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাসনব্যাপারে বিরোধী দলের কার্যকারিতাব গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বিরোধী দলের নেতা তাঁহার এই সহযোগিতামূলক বিরোধিতার জন্য বাৎসরিক একটা বেতন পাইয়া থাকেন। অবশ্য বেতনভুক্ত বিরোধী নেতা বেতনদাতা সরকারের কতদূর নিরপেক্ষ সমালোচনা কবিতে সক্ষম তাহা বিচার্য বিষয়।

আমলাতন্ত্র ও অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন প্রণয়ন-ব্যবস্থা—পার্লামেণ্ট সভার কাযের পবিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ইহার পক্ষে সবিস্তারে কোন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, সর্ববিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার মত পর্যাপ্ত সময়ও ইহার নাই। এইজন্য অনেক সময় পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাসনবিভাগগুলি শাসন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করিবার জন্য নূতন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে এবং পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনগুলিকে সবিস্তারে বিধিবদ্ধ করে। শাসনবিভাগ কর্তৃক এই আইন-প্রণয়ন-কার্যকে অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন-প্রণয়ন বলা হয়। এই ক্ষমতার বলে একদিকে যেমন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে অপর

পক্ষে সেইরূপ পার্লামেন্টের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-প্রণয়ন কার্য অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে রচিত আইনগুলি পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক অনুমোদন-সাপেক্ষ, সুতরাং এই পদ্ধতি দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই।

বিচার বিভাগ—ইংলণ্ডে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিবার জন্য দুই শ্রেণীর বিচারালয় আছে। লর্ড সভা হইল সর্বোচ্চ আদালত। ইংলণ্ডে বিচারপতিগণ যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-কার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গুরুতর মামলাগুলি বিশেষ করিয়া ফৌজদারী মামলা জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়। এখানকার বিচারালয়গুলি কোন আইনের বৈধতার প্রশ্ন করিতে পারে না। ফরাসী দেশের মত এখানে স্বতন্ত্র কোন শাসনবিভাগীয় আদালত নাই।

স্থানীয় শাসন—শহরাঞ্চল ও পল্লী অঞ্চলের জন্য দুই শ্রেণীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সমগ্র দেশটিকে লণ্ডন শহরের সহিত বাষট্টিটি কাউন্টিতে ভাগ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, তিরাশীটি কাউন্টি বরো আছে। কাউন্টিগুলিকে আবার শহরাঞ্চল জিলা ও গ্রামাঞ্চল জিলায় ভাগ করা হইয়াছে। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া এই জিলা গঠিত হয়। প্রত্যেক স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নির্বাচিত সভা আছে। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে এই সভা স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করে।

দল ব্যবস্থা—রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বৃটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি দলের পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে দলীয় সংগঠন আছে। বর্তমানে রক্ষণশীলদল সংখ্যাগরিষ্ঠদল হিসাবে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। শ্রমিক দলও বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। উদারনৈতিক দল পূর্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে সাম্যবাদীদলের বিশেষ কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই বলিলেও চলে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the privileges of the House of Commons in Britain. (C. U. 1941)

2. Discuss the position of the Cabinet in England To what extent has the Cabinet usurped the functions of Parliament ? (C. U. 1942)

3. Examine the following statements with regard to the British Constitution :

(*a*) 'The King never dies.'

(*b*) 'The King can do no wrong.' (C. U. 1943)

4. State the effect of the Parliament Act, 1911. Examine the effect of the Act on the position of the House of Lords. (C. U. 1949)

5 Trace the progress of a Money Bill in the British Parliament from its inception to Royal Assent. (C. U. 1951)

6. 'The British Legislature is anything but legislative in its main function.' Discuss. (C. U 1953)

7. Explain the relation of the British Prime Minister to the Sovereign, the Cabinet, the House of Commons and the Party. (C. U. 1954)

8. The theory is that the House (of Commons) controls the Government (in England)...It is equally true to say that Government controls the House (of Commons).

Examine the statement. (C. U. Hons. 1955)

9. "The House of Lords (in England) should be abolished, retained in its present form or reformed" With which of these views do you agree ? Give reasons for your answer. (C. U. 1955)

10. Discuss the relationship between the Cabinet and the House of Commons in the United Kingdom. (C. U. 1957)

11. "The English system of government is at once a monarchy, aristocracy and democracy"

Examine the statement. (C U 1958)

12. Discuss the position of the Cabinet in the British constitution with special reference to its relation to (*a*) the Crown and (*b*) Parliament (C. U. 1959)

13. Distinguish between a Public Bill and a Private Bill. What are the stages through which a Public Bill must pass before it can become an act of Parliament ? (C. U. 1960)

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র (U. S. S. R.)

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিধ্বংসী বিপ্লবের ফলে রুশ দেশের সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জারতন্ত্রের সহিত ইহার আনুষঙ্গিক সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া নিকোলাই লেনিন, স্ট্যালিন প্রভৃতি বলশেভিক নেতৃগণ মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে এক অভিনব শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জবরদস্তিমূলক উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সাম্যবাদী নেতাগণ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করেন। এই শাসনতন্ত্রটিকে পরবর্তী কালে সময়োপযোগী করিয়া গঠন করিবার জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আর একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই নূতন শাসনতন্ত্রে আরও কতিপয় রাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রটির নামকরণ হইল 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র'। এই নামকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, নামকরণের মধ্যে কোথাও 'রাশিয়া' শব্দটির উল্লেখ নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনব্যবস্থা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রচিত শাসনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরলোকগত সাম্যবাদী নেতা স্ট্যালিনের নামানুসারে এই শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ 'স্ট্যালিন শাসনতন্ত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Soviet Constitution)

১। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নিম্নলিখিত পনেরটি সদস্যরাষ্ট্রের (Union Republics) সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্রটি গঠিত :—১। রাশিয়া, ২। ইউক্রেন, ৩। বাইলো-রাশিয়া, ৪। আজারবাইজান,

৫। জর্জিয়া, ৬। আর্মেনিয়া, ৭। তুর্কমেনিয়া, ৮। উজবেকিস্তান, ৯। তাজাকস্তান, ১০। খিরগিজিয়া, ১১। কাজাকস্তান, ১২। মলডেভিয়া, ১৩। এস্তোনিয়া, ১৪। ল্যাটভিয়া, ১৫। লিথুয়ানিয়া। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখের একটি নূতন আইনের বলে কেরেলো-ফিনিশ রাজ্যটির স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ করিয়া ইহাকে রুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সদস্য-রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত একটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা হয়। উল্লিখিত পনেরটি সদস্যরাষ্ট্র ব্যতীত আরও তিনটি পৃথক শ্রেণীর আঞ্চলিক সরকার বা স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠান দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীটি সাধারণতঃ স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republics) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সদস্যরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু জাতিগুলির বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ধরণের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত সংখ্যালঘু জাতির জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর তাহাদের জন্য স্বশাসিত প্রদেশ (Autonomous Regions) গঠিত হইয়াছে। স্ব-শাসিত প্রদেশের নাগরিকগণ তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ভাষা, আচারপদ্ধতি ও কৃষ্টির উৎকর্ষসাধন করিবার অধিকার পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ, অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি জাতীয় অঞ্চল (National Areas) সৃষ্টি করা হইয়াছে। সদস্য-রাষ্ট্রগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় অঞ্চল পর্যন্ত এই চার শ্রেণীর স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথকভাবে সুপ্রিম সোভিয়েতের জাতিবর্গের সভায় যথাক্রমে পঁচিশ, এগার, পাঁচ ও একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র-কর্তৃক প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সহিত অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাষ্ট্রগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতিবিরোধী এইরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন, বাইলো-রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পৃথক প্রতিনিধির দ্বারা এই দুইটি সদস্যরাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হয়। তৃতীয়তঃ সদস্যরাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করিবার অধিকারও শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে সদস্যরাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার-নিরপেক্ষভাবে পৃথক সেনাবিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, উল্লিখিত চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর আঞ্চলিক সরকার পৃথক্‌ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকারী।

একটু সূক্ষ্মভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কার্যতঃ সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও সদস্যরাষ্ট্রীয় সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের নীতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কেন্দ্রীয়ভাবের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক সম্পর্ক বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, করস্থাপন, সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, মুদ্রাব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বামা ব্যবসায়, বিচারব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা করে। এতদ্ব্যতীত করধার্য ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন ব্যতীত কোন সদস্যরাষ্ট্রই নূতন কর প্রবর্তন করিতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত জাতীয় স্বার্থসংশিষ্ট নীতিগুলিও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন আইনের সহিত যদি কোন সদস্যরাষ্ট্র-প্রণীত আইনের বিরোধ হয় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনই বলবৎ হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সাম্যবাদী দলের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাধান্য সূচিত করে। এই শাসনব্যবস্থায় সরকার ও দলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যাঁহারা দলের নেতা তাঁহারাই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দলের নেতৃগণ প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত শাসন-পরিচালনার উপর অবাধ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বিভাগ থাকিলেও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার একদল লোকের হস্তেই কেন্দ্রীভূত।

২। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রিত করিয়া শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই হইল শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য। এই ব্যবস্থায় নিষ্কর্মা, পরজীবী সম্প্রদায়ের কোন স্থান নাই।

৩। সোভিয়েত শাসনতন্ত্র শুধু নাগরিক অধিকারগুলির তালিকা বিধিবদ্ধ করিয়া কর্তব্য শেষ করে নাই, নাগরিক অধিকারগুলি—বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকারগুলি যাহাতে কার্যকরী হয়, সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সোভিয়েত শাসনতন্ত্র হইল শুধু একমাত্র শাসনতন্ত্র, যে শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকারের সহিত নাগরিক কর্তব্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতা সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

৪। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উভয় পরিষদই সমান ক্ষমতার অধিকারী। কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, কি অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে, উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদের ক্ষমতার মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করা হয় নাই।

৫। শাসন-পরিষদের সংগঠনেও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পরিষদ আইনসভার উভয় পরিষদ-কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে। শাসন-পরিষদের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া গঠিত। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রিগণকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী (All-Union Ministers) বলা হয়। ইহারা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র-সম্পর্কিত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রিগণকে সদস্য রাষ্ট্রমন্ত্রী (Union-Republic Ministers) বলা হয়। ইহাদের কার্য হইল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অনুরূপ বিভাগগুলির সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা।

৬। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল প্রেসিডিয়াম। তেত্রিশ জন সদস্য লইয়া প্রেসিডিয়াম গঠিত। সুপ্রিম সোভিয়েতের যুক্ত অধিবেশনে এই সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রধানতঃ আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেও, প্রেসিডিয়াম শাসন-সংক্রান্ত ও বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতাও পরিচালনা করিয়া থাকে।

৭। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব হইল, ইহার বিচার-ব্যবস্থা। নির্বাচনপদ্ধতিতে সমুদয় বিচারকগণের নিয়োগ হয় এবং বিচার-কার্য পরিচালনায় জনগণের প্রতিনিধিগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করিবার ক্ষমতা কোন সোভিয়েত বিচারালয়ের নাই।

৮। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার একদলীয় শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থায় একমাত্র সাম্যবাদী দল ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য (Fundamental Rights and Duties in the Soviet Constitution)

সকল সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে শুধুমাত্র যে নাগরিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকে তাহা নয়, শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই মৌলিক অধিকারগুলির সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এরূপ কতকগুলি নাগরিক অধিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা অন্য কোন দেশের শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই। সবদেশের শাসনতন্ত্র-কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখ ছাড়াও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এরূপ কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা নাগরিকগণ এই মৌলিক অধিকারগুলির সহায়তায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। কাজ করিবার অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার প্রভৃতি এমন কতকগুলি অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক বিধিবদ্ধ ও কার্যে রূপায়িত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে যাহা অন্য কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। শাসনতন্ত্র-কর্তৃক নিম্নলিখিত অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(১) কাজ করিবার অধিকার (Right to Work)

এই অধিকার সংরক্ষিত হওয়ার ফলে বেকারসমস্যার সমাধান হইয়াছে। কোন কর্মঠ সোভিয়েত নাগরিক বেকার থাকিতে পারে না। নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার সাহায্যে বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছে। সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি হইল, যে কাজ করে না, সে খাইতেও পাইবে না ("He who does not work, neither shall he eat.')। এই ব্যবস্থা দ্বারা সমাজ হইতে শ্রমবিমুখ, পরজীবী সম্প্রদায়কে উৎসাদিত করিয়া শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার (Right to rest and leisure)

নাগরিকগণের যেরূপ চাকুরী পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে এবং কাজের পরিমাণ ও যোগ্যতা অনুসারে বেতন পাইবার নিশ্চয়তা আছে, তদ্রূপ বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার আছে। এইজন্য শ্রমিকদের দৈনিক সাত ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে হয় না ও বিশেষ আযাসসাধ্য কাজে চার ঘণ্টার অধিক এক-যোগে কাহাকেও কাজ করিতে হয় না। নিযুক্ত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী পূর্ণ বেতনে বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাল ছুটি পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্য দেশের সবত্র স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামাগার ও অবসর-বিনোদনের নানাবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বার্ধক্যে, অসুস্থ অবস্থায় অথবা অক্ষমতা ক্ষেত্রে সোভিয়েত নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবার অধিকারী।

(৩) শিক্ষার অধিকার (Right to Education)

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বিরাট অভিযান পরিচালনা করিয়া যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছে, সে-সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলেই একমত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর অধিবাসীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও নানাবিধ বৃত্তিমূলক উচ্চস্তরের শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞান বিষয়গুলির শিক্ষা ও গবেষণা ব্যাপারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আজ জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উচ্চস্তরের শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। পরবর্তী কালে উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বল্প বেতন দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে।

(৪) জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান অধিকার (Equality of Rights regardless of nationality, race and sex)

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের সর্ববিষয়ে সমান অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাজাতির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদান

করিবার সুব্যবস্থা করা সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান কীর্তি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যাহাতে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আত্মোন্নতি করিতে সক্ষম হয়, সেজন্য তাহাদের নিজস্ব লিপি, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত জীবনের সহায়ক নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। নারীদেরও জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

(৫) ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার (Freedom of Conscience)

বিদ্রোহের পর পরবর্তী কালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে শুধু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল তাহা নয়, অধিকন্তু রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে ধর্মসংগঠনগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহাদের বিলোপসাধন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের এই বিরূপ মনোভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। বর্তমানে সোভিয়েত নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে ধর্মমত পোষণ ও প্রচার করিতে পারে। ধর্মের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও সোভিয়েত নাগরিকগণের উপর অর্পিত হইয়াছে।

(৬) বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Speech and Expression)

সমস্ত সভ্য দেশেই জনগণের বাক্‌স্বাধীনতা একটি মূল্যবান মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে একটি শর্তে এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ শ্রমিকদের স্বার্থের সহিত সংগতি রাখিয়া এই মতামত প্রকাশের অধিকার পাইতে পারেন—'in conformity with the interests of the working people.' মতামত প্রকাশের দ্বারা যদি কোন মতে শ্রমিকদের স্বার্থের হানি হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ নির্বিচারে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন। এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোন্ মতামত শ্রমিকের স্বার্থের পরিপন্থী তাহা কে নির্ধারণ করিবে? সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র সাম্যবাদী দল-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকার জন্য এই অনুমান স্বাভাবিক যে, সাম্যবাদী সরকার যে মতামত শ্রমিকের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া বিবেচনা করিবেন, সে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিকেরই থাকিতে

পারে না। একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে যে দেশে অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়াছে, সেখানে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার কি পরিমাণে থাকিতে পারে, সে-সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এতদ্ব্যতীত সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, শিক্ষায়তন প্রভৃতি জনমত-গঠনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়া রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন জনমত-সৃষ্টি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(৭) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাধীনতা (Personal Freedom and inviolability of Home)

কোন ব্যক্তিকেই বিনা বিচারে বা সরকারী অভিযোক্তার বিনা অনুমোদনে আটক করা যায় না। অনুরূপভাবে চিঠিপত্রের ও পারিবারিক জীবনের অন্য বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছে। উল্লিখিত অধিকারগুলি নাগরিকগণ কি পরিমাণে ভোগ করিতে পারেন সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রাষ্ট্রের অথবা সাম্যবাদী দলের প্রতি আনুগত্যের অভাব বা দলীয় নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা সন্দেহক্রমে যে-কোন ব্যক্তিকেই নির্বিচারে আটক করা যায় এবং সরকার-পরিচালিত বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

(৮) আশ্রয় পাইবার অধিকার (Right of asylum)

শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত যে-সমস্ত বিদেশী স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সোভিয়েত দেশে আগমন করে, সোভিয়েত শাসনতন্ত্র সেই সমস্ত শ্রমিকের স্বার্থের ধারক বিদেশীকে আশ্রয় পাইবার অধিকার দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে-সমস্ত বিদেশী তাহাদের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কার্য-কলাপের জন্য অথবা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও আশ্রয় পাইবার অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

(৯) সংঘ গঠন করিবার অধিকার (Freedom to form organisations)

শ্রমিক সংঘ, সমবায় সমিতি, যুব সংঘ, বিজ্ঞানবিষয়ক সংঘ প্রভৃতি নানাবিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার সোভিয়েত নাগরিকগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হইল যে, অন্য সর্ববিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার থাকিলেও সোভিয়েত নাগরিককে রাজনৈতিক দল গঠন করিবার অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হইয়াছে। সাম্যবাদী দলই হইল সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র রাজনৈতিক দল।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের কোন উল্লেখ নাই। স্ট্যালিন শাসনতন্ত্রে তিন প্রকার সম্পত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা,— ১। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, ২। সমবায় ও যৌথ কৃষিসম্পত্তি ও ৩। ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্বোপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, পারিবারিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্রায়তনের কুটিরশিল্প, ব্যক্তিগত ব্যবহারোপযোগী তৈজস ও আসবাবপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নাগরিকগণ রাখিতে পারেন এবং এইগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করিতে পারেন। সুতরাং নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত নাগরিকগণ সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন।

মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties)

মৌলিক অধিকারগুলির সহিত কতকগুলি মৌলিক কর্তব্যের সন্নিবেশ হইল সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। নাগরিকগণ যেরূপ রাষ্ট্রের উপর কতকগুলি অধিকারের জন্য দাবী করিতে পারে রাষ্ট্রও তদ্রূপ নাগরিকগণের উপর কতকগুলি কর্তব্যপালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে পারে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হইল সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

(১) সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিধি অনুসারে প্রত্যেক সমর্থ নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল কাজ করা এবং কাজ করা একটা সম্মানের বিষয় বলিয়া সে দেশে পরিগণিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হইল, যে কাজ করে না সে খাইতেও পাইবে না। সোভিয়েত শাসনতান্ত্রিক বিধানানুযায়ী কাজ করা, আইন-কানুন মান্য করা,

শ্রমশৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনসাধারণ-সম্পর্কিত কর্তব্যগুলি নিষ্ঠা ও সততার সহিত সম্পাদন করা ও সমাজতান্ত্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের বিধিনিষেধগুলি যথাযথভাবে পালন করা সোভিয়েত নাগরিকগণের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

(২) সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-ব্যবস্থাই হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মূল উৎস। যাহারা এই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-ব্যবস্থার ক্ষতি করে, তাহারা সমগ্র জনসাধারণের শত্রু। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সোভিয়েত নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

(৩) স্বদেশ রক্ষার জন্য সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করা সোভিয়েত নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধকালে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্ত সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

(৪) স্বদেশদ্রোহিতা, পররাষ্ট্রের গুপ্তচর হিসাবে স্বদেশের স্বার্থের প্রতিকূল কার্য করা, সশস্ত্রবাহিনী হইতে পলায়ন করা প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যগুলি অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চরম শাস্তি প্রদান করা হয়। স্বদেশপ্রীতি ও রাষ্ট্রের প্রতি অচল আনুগত্য সোভিয়েত নাগরিকের পবিত্র ও সম্মানজনক কর্তব্য।

শাসনবিভাগ –The Executive

মন্ত্রিপরিষদ (The Council of Ministers)

শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্রিপরিষদ। অন্যান্য রাষ্ট্রে যেরূপ শাসকবর্গের মধ্যে একজন শাসকপ্রধান—রাজা অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণতঃ বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণ প্রেসিডিয়ামের সভাপতির নিকট তাঁহাদের পরিচয়পত্রাদি পেশ করেন, কিন্তু অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। ষাট জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের কার্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ-কর্তৃক সম্পাদিত হয়:—১। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের

মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি, ২। মন্ত্রিপরিষদের সহ-সভাপতিগণ, ৩। মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি, ৪। জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রব্যসম্ভার ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ-সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি, ৫। গঠন-কার্য-সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের রাষ্ট্রীয় কমিটির সভাপতি, ৬। ললিতকলা-সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি এবং ৭। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি-কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রিম সোভিয়েত দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ নির্বিচারে সমর্থন করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়; যথা,—(১) সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিদপ্তর (All-Union Ministry) ও (২) মূলরাষ্ট্রগুলির মন্ত্রিদপ্তর (Union-Republic Ministry)। প্রথমোক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন ও দ্বিতীয়টির কার্য হইল তাহাদের অধীন বিষয়সমূহ মূলরাষ্ট্রগুলির অনুরূপ নামের শাসন-বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা করা। কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম-কর্তৃক নির্ধারিত কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের পরিচালনাকার্য সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও মূলরাষ্ট্রীয় সরকারগুলির সহযোগিতায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। বর্তমানে বিমানশিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, বিদ্যুৎশিল্প, কয়লাশিল্প, নগরনির্মাণ, নৌবিভাগ প্রভৃতি একত্রিশটি বিভিন্ন দপ্তর সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রি-দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, সেনাবিভাগ, জনস্বাস্থ্য, বনবিভাগ, চলচ্চিত্র প্রভৃতি উনিশটি দপ্তর মূলরাষ্ট্রগুলির মন্ত্রিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিদপ্তরগুলির দীর্ঘ তালিকা হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু শিল্প-ব্যবস্থাপনার জন্যই বত্রিশ জন মন্ত্রী নিযুক্ত আছেন। অন্যান্য দেশের মন্ত্রিপরিষদের সহিত সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের পার্থক্য হইল যে, সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিলেই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হয় না, দেশের সমগ্র ধনোৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা সুপরিচালিত করিয়া সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে

অব্যাহত রাখা তাঁহাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এইজন্য তাঁহাদের একাধারে রাজনৈতিক জ্ঞান ও শিল্প পরিচালনা করিবার যোগ্যতা থাকা চাই।

প্রত্যেক মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য একটি করিয়া উপদেষ্টামণ্ডলী আছে। এই উপদেষ্টামণ্ডলী হইতে কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য লইয়া রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সমিতি (State Planning Commission) গঠিত হয়। (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বিধি দ্বারা একটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিদপ্তর (State Control Commission) সৃষ্টি করা হয়।) এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভা-কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। এই দপ্তরটি যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিদপ্তরগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার কার্য হইল, সমগ্র শাসনবিভাগের কার্যের উপর তদারক করা।

মন্ত্রিপরিষদের কার্য (Functions of the Council of Ministers)

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা হইল মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কার্য। মন্ত্রিপরিষদ-কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশগুলি যথাযথভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে কি না তাহা তদারক করা মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব। সমগ্র শাসন-বিভাগের কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা ইহার গুরু দায়িত্ব। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া নাগরিক অধিকার ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা, বৈদেশিক নীতি স্থির করা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য সশস্ত্রবাহিনী সংগঠন করা এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রিপরিষদের প্রত্যেক মন্ত্রীর উপর একটি বিভাগের শাসনভার ন্যস্ত থাকে। ইনি নিজ বিভাগীয় শাসনকার্য শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তানুযায়ী পরিচালনা করিয়া থাকেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকার্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ কোন বিভাগীয় ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রির সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারে; কিন্তু মূলরাষ্ট্রীয় বিভাগগুলির ভারপ্রাপ্ত কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত একেবারে বাতিল করিতে পারে না—প্রয়োজন হইলে ঐ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিতে পারে মাত্র।

মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব (Ministerial Responsibility)

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রিম সোভিয়েত-কর্তৃক নির্বাচিত হয়। শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, মন্ত্রিপরিষদ তাহাদের কার্যকলাপ ও নীতির জন্য আইনসভা অর্থাৎ সুপ্রিম সোভিয়েত অথবা সুপ্রিম সোভিয়েতের অবর্তমানে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকিবে। শাসনতন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, আইন-পরিষদে যে-কোন কক্ষের কোন সদস্য যদি মন্ত্রিপরিষদের কোন সদস্যকে প্রশ্ন করেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে তিন দিনের মধ্যে উক্ত প্রশ্নের মৌখিক অথবা লিখিত জবাব প্রদান করিতেই হইবে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি পার্লামেণ্টারি প্রথা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মন্ত্রিপরিষদের সমুদয় সদস্যই সাম্যবাদী দলের প্রকৃত কার্যকরী সংস্থা (Politbureau) কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। কার্যকরী সংস্থার মনোনয়ন সুপ্রিম সোভিয়েত শুধুমাত্র অনুমোদন করিয়া থাকে। আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে কোন সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদই আজ পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত হয় নাই। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের নিয়োগ ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণরূপে দলের কার্যকরী সংস্থা Politbureauর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আইনসভা শুধু এই সংস্থার সিদ্ধান্তগুলিকে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ন্যায় সমর্থন করে। সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদ যাহাতে তাহাদের খুশীমত বে-আইনী কার্যকলাপ করিতে না পারেন সেজন্য শাসনতন্ত্রের ছেষট্টি ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রিগণকে প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে ও প্রচলিত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদ-কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ ও নির্দেশ প্রচলিত আইন-বিরোধী হইলে সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সেই আদেশ ও নির্দেশ বাতিল করিতে পারে।

আভ্যন্তরীণ মন্ত্রিপরিষদ (The nner Cabinet)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ ষাট জন সদস্য লইয়া গঠিত। সুতরাং জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে এরূপ একটি বৃহৎ পরিষদ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সেইজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্ট্যালিনের সভাপতিত্বে এগার জন সদস্য লইয়া একটি কার্যকরী মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের

একজন সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বহু বৎসর পর্যন্ত স্ট্যালিন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাধারণতঃ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এই ক্ষুদ্রপরিষদ-কর্তৃকই স্বীকৃত হয়। সাম্যবাদী দলের কার্যকরী সংস্থা Polit-bureauর নেতৃস্থানীয় সদস্যগণকে লইয়া ঐ ক্ষুদ্র মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় ও দলের প্রধান নেতা সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় সাম্যবাদী দলের নেতৃগণ একাধারে পলিটব্যুরোর সদস্য, প্রেসিডিয়ামের সদস্য, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং বিভিন্ন কার্যকরী সংস্থার শাসনক্ষমতা নিজেদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন।

আইনসভা—The Legislature

সুপ্রিম সোভিয়েত (The Supreme Soviet of the U. S. S. R.)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইল সুপ্রিম সোভিয়েত। জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত (The Soviet of Nationalities) ও যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত (The Soviet of the Union) লইয়া সুপ্রিম সোভিয়েত গঠিত হয়।

প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র (Union Republic) হইতে পঁচিশ জন সদস্য, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republic) হইতে এগার জন, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রদেশ (Autonomous Region) হইতে পাঁচজন ও প্রত্যেক জাতীয় অঞ্চল (National Area) হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত গঠিত হয়। বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা হইল ৬৪০, যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত নাগরিকগণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক তিন লক্ষ ভোটদাতা একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত বর্তমানে ৭৩৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত। জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, সম্পত্তি প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেক আঠার বৎসর বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে এবং প্রত্যেক তেইশ বৎসর বয়স্ক সোভিয়েত নাগরিকই সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্য নির্বাচিত হইবার অধিকারী। ভোটদাতৃগণ প্রত্যাবর্তনের আদেশ (Recall) দ্বারা প্রতিনিধিদের সদস্যপদ হইতে অপসারিত করিতে পারেন। সুপ্রিম সোভিয়েতের কার্যকাল চারি বৎসর,

কিন্তু তৎপূর্বে প্রেসিডিয়াম এই সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। সাধারণতঃ বৎসরে সুপ্রিম সোভিয়েতের দুইটি অধিবেশন বসে, কিন্তু প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রেসিডিয়ামের আহ্বান-ক্রমে বিশেষ সভা আহূত হইতে পারে। উভয় পরিষদের অধিবেশনই একযোগে চলিতে থাকে।

প্রত্যেক পরিষদ একজন সভাপতি ও চারিজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন। উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতের সভাপতি ও জাতিপুঞ্জ সোভিয়েতের সভাপতি পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। উভয় পরিষদই সর্ববিষয়ে সমান ক্ষমতার অধিকারী। উভয় পরিষদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে উভয় পরিষদের সমসংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত একটি আপোষ সমিতি (Conciliation Committee) দ্বারা মতভেদ দূর করিবার চেষ্টা হয়। আপোষ সমিতি মতভেদ দূর করিতে অসমর্থ হইলে ইহা পুনরায় পৃথগ্‌ভাবে উভয় পরিষদ কর্তৃক আলোচিত হয়। ইহা সত্ত্বেও যদি বিরোধের মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে প্রেসিডিয়াম সুপ্রিম সোভিয়েত ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে।

সুপ্রিম সোভিয়েতের ক্ষমতা (Powers of the Supreme Soviet)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েত হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রযোজ্য সর্বাবধ আইন এই সভা-কর্তৃক রচিত হয়। সুপ্রিম সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করে। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডিয়ামের তেত্রিশ জন সদস্য এই সভা-কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণ এবং বিচারব্যবস্থার বিশেষ ক্ষমতাবিশিষ্ট পদাধিকারী প্রোকিউরেটর-জেনারেল (Procurator-General) এই সভা-কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল এই সভা। মূল-রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিচালিত হয় সেদিকেও এই সভার সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। কোন রাষ্ট্র যদি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানীয় সরকারের এলাকার পরিবর্তন করিতে হয়

অথবা নূতন এলাকা দ্বারা কোন নূতন আঞ্চলিক সরকার গঠিত হয়, তাহা হইলে সুপ্রিম সোভিয়েতের অনুমতিক্রমেই এইরূপ পরিবর্তন হইতে পারে। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের মূলনীতি নির্ণয়, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও তদুদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সশস্ত্রবাহিনী গঠন করিবার মূলনীতি এই সভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই সভা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্র ও মূল-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজস্বের বণ্টনব্যবস্থা নির্ধারিত করা ও নির্ধারিত বণ্টনব্যবস্থা যাহাতে কার্যকরী হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা ইহার একটি প্রধান কার্য। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব ও ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করা ব্যতীতও এই সভা রাষ্ট্রায়ত্ত বৈদেশিক বাণিজ্য, জীবন বীমা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ, ভূমিব্যবস্থা, শ্রমিক, স্বাস্থ্য, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি নানাবিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার অধিকারী। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন প্রণয়ন করা, নাগরিক সম্পর্কিত আইন ও বিদেশী-সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ণ অধিকারী হইল সুপ্রিম সোভিয়েত।

সুপ্রিম সোভিয়েতের ক্ষমতার তালিকা পর্যালোচনা করিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এই সভা হইল সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস। কিন্তু কার্যতঃ এই সভার ক্ষমতা নানাভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদ প্রায় দেড় হাজার সদস্য লইয়া গঠিত। এরূপ বৃহৎ আইনসভা আইন প্রণয়ন করা দূরে থাকুক, কোন বিষয়েই যথাযথ আলাপ-আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা করিবার পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সভার বৎসরে মাত্র দুইটি অধিবেশন হয় ও কোন অধিবেশনই ১৫ হইতে ২০ দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। সুতরাং এই স্বল্পকালের অধিবেশনে সুপ্রিম সোভিয়েতের পক্ষে ইহার উপর ন্যস্ত গুরু কর্তব্য যথাযথ-ভাবে সম্পাদন করা একরূপ অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডিয়াম, মন্ত্রিপরিষদ ও সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংস্থা দ্বারা সুপ্রিম সোভিয়েতের উল্লিখিত ক্ষমতা বহুল পরিমাণে সংকুচিত হইয়াছে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার সর্বক্ষেত্রে সুপ্রিম সোভিয়েত শুধুমাত্র সাম্যবাদী দলের নেতৃগণ কর্তৃক নির্ধারিত নীতির সমর্থন করিয়া থাকে। দলীয় ঐক্য ও সংহতি যেরূপ কঠোরতার সহিত

সংরক্ষিত হয়, তাহাতে দলের সমর্থকগণের পক্ষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নীতির বিরোধিতা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং সুপ্রিম সোভিয়েত সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ এই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে না।

সুপ্রিম সোভিয়েতের বৈশিষ্ট্য (Peculiarities of the Supreme Soviet)

১। শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী সুপ্রিম সোভিয়েত হইল, এই যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। আইন-প্রণয়ন ব্যতীতও এই সভা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নির্বাচন করে। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি যে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয়।

২। একমাত্র মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখা যায় যে, আইনসভার নিম্ন পরিষদ, উচ্চ পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষ করিয়া অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের অধিকতর ক্ষমতা সর্বদেশের শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার উভয় পরিষদই সর্ববিষয়ে সম-ক্ষমতার অধিকারী।

৩। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের সদস্যগণ চারিবৎসর কালের জন্য একই সময়ে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার জন্য উভয় পরিষদের সদস্যগণকে একইরূপ যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়। অন্যান্য দেশে উচ্চ পরিষদের সদস্যগণের নির্বাচনের জন্য পৃথক যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। উচ্চ পরিষদের কার্যকালও সাধারণতঃ দীর্ঘতর হয়।

৪। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদকেই প্রেসিডিয়াম তাহাদের কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। কিন্তু অন্য দেশে নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া গেলেও উচ্চ পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলে না।

৫। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উভয় পরিষদের সদস্যগণই জনগণের ভোট দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। একমাত্র মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা ব্যতীত অন্য কোন দেশে উচ্চ পরিষদের সদস্যগণের নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় না।

৬। সুপ্রিম সোভিয়েতের উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত, সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, সেই সকল সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ক্যানাডা বা অপর কোন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদ এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হয় না। ভারতের উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ রাজ্য-সভা (Council of States) অথবা মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা (Senate) সদস্য রাষ্ট্রগুলি হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়—সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ ঐ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির, যথা,—রুশ, ইউক্রেনীয়, তাজিক, কাজাক, উজবেগ, খিরগিজ্ প্রভৃতি—প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রদেশ, প্রত্যেক জাতীয় অঞ্চল যথাক্রমে ২৫, ১১, ৫ ও ১ জন করিয়া প্রতিনিধি উচ্চ পরিষদে প্রেরণ করিতে পারে। উচ্চ পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারগুলির সমান ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

৭। অন্যান্য দেশের আইনসভা একাধিক রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ও শাসননীতি নির্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র সাম্যবাদী দল ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব না থাকার ফলে আইনসভার কার্য নির্বিরোধে পরিচালিত হইতে পারে। সাম্যবাদী দলের নেতৃগণ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি দলের সমর্থকগণ বিনাবিচারে অনুমোদন করে। এইজন্য সুপ্রিম সোভিয়েতের বৎসরে মাত্র দুটি অধিবেশন বসে ও এই দুইটি অধিবেশন পনের হইতে কুড়ি দিনের অধিককাল স্থায়ী হয় না।

প্রেসিডিয়াম (The Presidium of the Supreme Soviet)

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অভিনবত্ব হইল ইহার প্রেসিডিয়াম। অন্যান্য দেশে শাসন-বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে একজন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন, যাঁহার নামে সমুদয় শাসনকার্য

পরিচালিত হয় এবং যিনি রাষ্ট্রের সমুদয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেও রাষ্ট্রের প্রধানরূপে প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। গ্রেট বৃটেনে রাজা এবং মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ ও ভারতে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকেন। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় এইরূপ কোন রাষ্ট্র-প্রধান নাই। তৎপরিবর্তে তেত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম সভা রাষ্ট্র-প্রধানের কার্য পরিচালনা করে। এইজন্য সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এই প্রেসিডিয়াম সভাকে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী (a Collegial President) বলা হইয়াছে।

প্রেসিডিয়াম আইনসভার স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) এবং আইনসভার অবর্তমানে ইহা সুপ্রিম সোভিয়েতের সমুদয় কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া থাকে। তেত্রিশজন সদস্য সমন্বিত এই প্রেসিডিয়ামে থাকেন, একজন সভাপতি, পনেরটি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি পনরজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক ও ষোলজন সাধারণ সদস্য। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ চার বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হন। চারবৎসর শেষ হইলে অথবা সুপ্রিম সোভিয়েত যদি তৎপূর্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নূতন নির্বাচনের পর নবগঠিত সুপ্রিম সোভিয়েত নির্বাচনের পর তিনমাসের মধ্যে অধিবেশনে মিলিত হইয়া নূতন প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণকে নির্বাচন করে। প্রেসিডিয়ামের সভাপতি সমুদয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা (Powers of the Presidium)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডিয়াম আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই হিসাবে ইহা বহু ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সভা শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার অধিকারী নয়, ইহা শাসন-বিভাগীয় ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও প্রয়োগ করিয়া থাকে। স্ট্যালিন শাসনতন্ত্রের ৪৯ ধারায় প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা উল্লিখিত হইয়াছে।

১। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডিয়াম সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের স্থান পূরণ করিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ সভাপতির নিকট তাঁহাদের

পরিচয়পত্র পেশ করেন এবং সভাপতি কর্তৃক তাঁহারা রাষ্ট্রদূত বলিয়া স্বীকৃত হন। গ্রেট বৃটেনের রাজা ও ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রেসিডিয়াম যোগ্য ব্যক্তিগণকে সম্মানসূচক পদবী, উপাধি, পদক ও নানাজাতীয় পারিতোষিক প্রদান করে। প্রেসিডিয়াম বৎসরে দুইবার সুপ্রিম সোভিয়েত সভাকে আহ্বান করিতে পারে এবং উভয় পরিষদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে উভয় পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া দুই মাসের মধ্যে নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে।

২। আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রেসিডিয়াম আইনানুযায়ী আদেশ প্রদান (Decree) করিতে পারে। প্রেসিডিয়ামের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা নাই বা সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক প্রণীত আইনকে ইহা বাতিল করিতে পারে না। সুপ্রিম সোভিয়েত বৎসরে মাত্র দুইবার স্বল্পকালের জন্য অধিবেশনে মিলিত হয়, সুতরাং অধিবেশনের এই অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে প্রেসিডিয়াম আইনানুযায়ী আদেশ জারী করিয়া শাসনব্যবস্থাকে চালু রাখে।

শাসনতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাদের কার্যের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েতের নিকট দায়ী। সুপ্রিম সোভিয়েতের অধি-বেশনের অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদ প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকে। অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির সুপারিশক্রমে প্রেসিডিয়াম মন্ত্রি-পরিষদের সদস্য নিয়োগ করিতে পারে অথবা নিযুক্ত কোন সদস্যকে ভারমুক্ত (release) করিতে পারে। অবশ্য এইরূপ নিয়োগ ও ভারমুক্তি সুপ্রিম সোভিয়েতের পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়া চাই।

৩। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডিয়াম ভিন্ন দেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করিতে পারে ও নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারে। সশস্ত্রবাহিনীর অধ্যক্ষ নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভায় অনুরূপভাবে প্রেসিডিয়াম পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত সন্ধি-চুক্তি সংখ্যাধিক্য ভোটে অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

৪। আপৎকালে প্রেসিডিয়াম দেশে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করিতে পারে এবং যুদ্ধ পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে। জরুরী অবস্থায় প্রেসিডিয়াম সামরিক আইন জারী করিতে পারে।

৫। আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ও শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীতও প্রেসি-

ডিয়ামকে বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার অধিকার ইহার আছে। প্রেসিডিয়াম সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আইনের সারমর্ম নির্ধারণ করে এবং এই অনুসারে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের অথবা কোন মূলরাষ্ট্রীয় মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত বা আদেশ আইনানুযায়ী না হইলে তাহা বাতিল করিবার ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রেসিডিয়ামের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা নাই, কিন্তু আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা আছে। যদি কোন মূলরাষ্ট্র প্রণীত আইনের সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আইনের সহিত বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে প্রেসিডিয়াম প্রথমোক্ত আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ এই ক্ষমতা প্রধান বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা প্রধান বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত না করিয়া প্রেসিডিয়ামকে এই ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে।

প্রেসিডিয়ামের প্রকৃতি (Nature of the Presidium)

প্রেসিডিয়ামের গঠন, প্রকৃতি ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ প্রেসিডিয়ামকে মুখ্যতঃ আইনসভার একটি স্থায়ী সক্রিয় সংস্থারূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী সুপ্রিম সোভিয়েত সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও ইহার সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ হইল প্রেসিডিয়াম। আইনসভাকর্তৃক সৃষ্ট ও আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও প্রেসিডিয়াম ইহার স্রষ্টাকে নিধন করিতে পারে। প্রধানতঃ, আইনসভার গুরু কার্যভার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইলেও এই অভিনব সংস্থাটি সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্ররূপে বিবেচিত হইতে পারে। সাম্যবাদী দলের অবিসংবাদী নেতৃত্ব সমগ্র দেশে প্রেসিডিয়ামের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শাসনক্ষমতা, আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা, বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা এবং সাম্যবাদী দলের নেতৃত্ব—সব কিছুই এই প্রেসিডিয়ামে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সাম্যবাদী দলের কার্যকরী সংস্থা পলিট্-ব্যুরো প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। সেইজন্য সাম্যবাদী নেতৃগণ এই অভিনব পদ্ধতিতে প্রেসিডিয়ামের মধ্য দিয়া তাঁহাদের দলীয় ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বিচারবিভাগ—The Judiciary

সুপ্রিম কোর্ট (The Supreme Court)

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালত হইল, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয় (Supreme Court)। এই বিচারালয় সাধারণতঃ ত্রিশজন বিচারক লইয়া গঠিত এবং সমুদয় সদস্যই পাঁচবৎসরের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েত-কর্তৃক নির্বাচিত হন। ইহার আদিম ও আপীল মামলা শুনিবার ক্ষমতা আছে। এই বিচারালয় পাঁচটি বিভাগের মারফৎ কায পরিচালনা করে, যথা,—ফৌজদারী, দেওয়ানী, সামরিক, রেলওয়ে এবং জলযান। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিষয়ের উপর ইহার আদিম বিচারাধিকার আছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিচারালয় হইতে আনীত সমস্ত আপীল মামলার শুনানী এই বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক প্রবর্তিত কোন আইনকে এই বিচারালয় নাকচ করিতে পারে না। এই বিচারালয়ের বিচারকার্য জনগণের প্রতিনিধি-বিচারকের (People's Assessors) সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

এতদ্ব্যতীত সমগ্রদেশে আবও কয়েক শ্রেণীর বিচারালয় আছে, যথা,—মূলরাষ্ট্রগুলির প্রধান বিচারালয়, স্ব-শাসিত প্রদেশ, স্ব-শাসিতঅঞ্চল ও জাতীয় এলাকার আদালতসমূহ। সর্বনিম্ন আদালত হইল জনসাধারণের আদালত (People's Court)। ইহা ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ আদালত (Special Court) সময়ে সময়ে সুপ্রিম সোভিয়েতের নির্দেশ অনুসারে গঠিত হয়। প্রত্যেক শ্রেণীব স্থানীয় বিচারালয়গুলির বিচাবপতিগণ স্থানীয় সোভিয়েত সভা কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। জনগণের আদালতের বিচারকগণ স্থানীয় নাগরিক কর্তৃক গোপন ভোটের দ্বারা তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ছোটখাট সামাজিক অপরাধের বিচার এখানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সমস্ত আদালতের বিচাবকার্যই নাগরিক-বিচারকের (Citizen Judges) সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiar Features of the Soviet Judicial System)

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইহার কতকগুলি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, জনগণের

প্রতিনিধিগণ এই বিচারকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। নির্বাচিত বিচারক ব্যতীতও এই বিচারালয়গুলির কার্য নাগরিক-বিচারক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই নাগরিক-বিচারকগণকে আদালতের স্থায়ী বিচারকের ক্ষমতাসম্পন্ন করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশের জুরীর মত ইঁহারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করেন না,—আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারেও ইঁহারা স্থায়ী বিচারকের সমক্ষমতার অধিকারী। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সমুদয় বিচারকার্যই নাগরিক-বিচারকগণের সাহায্যে পরিচালিত হয় বলিয়া সাধারণ নাগরিকগণ বিচারকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভোটদান ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোন নাগরিকই এই নাগরিক বিচারকের কার্য করিতে পারেন এবং এই নাগরিক-বিচারক যদি বিচারকার্যে দায়িত্বজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেন তাহা হইলে জনগণের নির্দেশে তাঁহাকে অপসারিত করা চলে। অন্যান্য দেশে বিচারালয়গুলি জনগণের সংস্পর্শ হইতে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জনসাধারণের মনে বিচারব্যবস্থা ও বিচারক-সম্পর্কে একটা অহেতুক ত্রাসের সঞ্চার করে। অনেকক্ষেত্রে বিচারকের সহিত বিচারপ্রার্থীর এরূপ চরম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় যে, বিচারপ্রার্থী কোনক্রমে বিচারকের নিকট হইতে সুবিচার আশা করিতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারব্যবস্থার সহিত জনসাধারণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে, বিচারব্যবস্থার দ্বারা গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্য অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানকার বিচার-পদ্ধতি অতি সহজ ও সরল এবং স্বল্পকালের মধ্যে বিচারকার্য শেষ করা হয়। এইজন্য বিচারপ্রার্থী পক্ষদ্বয়কে দীর্ঘদিন ধরিয়া বহু ব্যয়ে মামলা পরিচালনা করিতে হয় না। জনসাধারণের বোধগম্য পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার সহিত পাশ্চাত্ত্য অনেক দেশের বিচারব্যবস্থার সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সোভিয়েত বিচারকেরা সামাজিক হিতসাধন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য অপরাধীকে

এরূপভাবে শাস্তি প্রদান করেন যে, ভবিষ্যৎ জীবনে দণ্ডিত ব্যক্তি নিজেকে অপরাধ-মুক্ত রাখিয়া সুস্থ, কর্মক্ষম ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক জীবন যাপন করিতে পারে। সেইজন্য সোভিয়েত দেশে নূতন ধরণের জেলখানা গঠিত হইয়াছে। এই জেলখানায় দণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া যাহাতে সু-নাগরিক হইতে পারে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা হইল এক প্রকারের সামাজিক ব্যাধি। সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা এই সামাজিক ব্যাধির সামাজিক কারণ নির্ধারণ করিয়া তাহার সামাজিক-প্রতিষেধক প্রয়োগ করিয়া থাকে।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থায় আইনজীবীর বিশেষ কোন স্থান নাই। নির্বাচিত স্থায়ী বিচারক এবং নাগরিক বিচারকগণ অভিযোক্তা, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তথ্য আহরণ করেন। সেইজন্য এখানকার বিচারব্যবস্থা আদৌ ব্যয়সাপেক্ষ নহে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকই একই আইনের দ্বারা বাধ্য। আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমেই বিচারকার্য পরিচালিত হয় কিন্তু কোন ব্যক্তি ঐ ভাষায় অজ্ঞ হইলে তাহাকে অনুবাদকের সাহায্য প্রদান করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণের বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর বিচারকই জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং একমাত্র জনগণের প্রত্যাবর্তনের আদেশ ও বিশেষ বিচারব্যবস্থার দ্বারা তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকগণ দেশের প্রবর্তিত আইন ও জনমত ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট নতি স্বীকার করেন না। সুতরাং সোভিয়েত বিচারব্যবস্থাকে বে-সরকারী বিচারব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। অনেক সমালোচক বলেন যে, সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা অত্যধিক পরিমাণে জনমতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই ব্যবস্থা স্থায়ী বা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ-সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থা যে গণতন্ত্রসম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক অপরাধের বিচারকার্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচার-কার্য পরিচালনার সময় নাগরিক-বিচারকের সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারকার্য পরিচালনায় গণতান্ত্রিক আদর্শের কোন স্থান সোভিয়েত বিচারব্যবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রোকিউরেটর-জেনারেল (Procurator-General)

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় প্রোকিউরেটর-জেনারেল হইলেন একজন বিশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী শাসনকর্তৃপক্ষ। অন্য কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রোকিউরেটর-জেনারেলের অনুরূপ কোন কর্মচারী দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রোকিউরেটর-জেনারেল পদের সহিত অনেক দেশের ফৌজদারী মামলার অভিযোক্তা সরকারী উকিল পদের কিছু সাদৃশ্য আছে।

প্রোকিউরেটর-জেনারেল সাত বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইঁহার অধীনে বিভিন্ন আঞ্চলিক এলাকার প্রোকিউরেটরগণ নিযুক্ত থাকেন। আঞ্চলিক এলাকার প্রোকিউরেটরগণ সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকিয়া প্রোকিউরেটর-জেনারেলের নির্দেশমত তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। ইঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন।

প্রোকিউরেটর-জেনারেলের দপ্তরের প্রধান কার্য হইল সমগ্র শাসন-বিভাগের কার্যের তদারক করা। মন্ত্রিপরিষদ এবং অন্যান্য শাসনবিভাগীয় সংস্থা, সাধারণ কর্মচারিগণ ও নাগরিকগণ যাহাতে কোনরূপ বে-আইনী কার্য না করে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনরূপ অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত না হয় সেজন্য প্রোকিউরেটর-জেনারেল সর্বদা অবহিত থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নাগরিকগণ পর্যন্ত যাহাতে যথাযথ-ভাবে আইন মান্য করে তাহা তদারক করিবার সম্পূর্ণ ভার প্রোকিউরেটর-জেনারেলের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। বে-আইনী কার্য সংঘটিত হইলে নাগরিকগণের অভিযোগক্রমে অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। এই কার্যের জন্য তিনি

তাঁহার অধীন স্থানীয় প্রোকিউরেটরগণের সাহায্য পাইয়া থাকেন। প্রোকিউরেটর-জেনারেল বা তাঁহার অধীন প্রোকিউরেটরগণ নিজেরা কোন বে-আইনী কার্যের বিচার করিয়া অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন না। তাঁহাদের কার্য হইল, অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করিয়া অপরাধের তথ্য-সম্বলিত বিবরণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্যবাদীদল (Role of the Communist Party in the U. S. S. R.)

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থা দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল—সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত হয়। এখানে অন্য কোন দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। জনসাধারণের অন্য নানাবিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার থাকিলেও কোন রাজনৈতিক দল গঠন করিবার অধিকার নাই। সাম্যবাদী দলব্যবস্থার বিশেষত্ব হইল যে, দলের হস্তেই সমুদয় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে এবং দেশের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, শাসনকার্যের সকল বিষয়েই দলীয় প্রাধান্য অটুট থাকে। বস্তুতঃ, সাম্যবাদী দল ও সোভিয়েত সরকার এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে দলীয় প্রাধান্যের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ এবং শাসনকার্যে নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ—সকলেই এই সাম্যবাদী দলের সমর্থক। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আইনসভাগুলির এবং অন্যান্য নানাজাতীয় শাসনসংস্থাগুলির সদস্যনির্বাচন-কার্য এরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় যে, সাম্যবাদী দলের সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারে না।

সাম্যবাদী দলের আদর্শ ও কার্যকলাপ মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই নীতি উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব ও ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। রুশীয় সাম্যবাদিগণ মার্কসীয় নীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন। সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের দলীয় আদর্শে অত্যধিক পরিমাণে

আস্থাবান। তাঁহারা মনে করেন যে, একমাত্র সাম্যবাদী আদর্শ কার্যকরী করিয়া মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা সম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সাম্যবাদিগণ অন্ধভাবে তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণ করিয়া থাকেন। আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করিবার পথে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন আসে, নির্মম হস্তে তাঁহারা সেগুলিকে অপসারিত করেন। সেইজন্য দলীয় ঐক্য, সংহতি ও প্রাধান্য অটুট রাখিবার নিমিত্ত তাঁহারা যে-কোন পন্থা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করেন না। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা হইল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু সাম্যবাদিগণ গণতান্ত্রিক আদর্শে আদৌ বিশ্বাসী নহেন, তাই তাঁহারা বলপ্রয়োগ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার পক্ষপাতী। ক্ষমতা হস্তগত করিয়া এই ক্ষমতার প্রয়োগে তাঁহারা তাঁহাদের সাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী সমাজ গঠন করিতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং সাম্যবাদী জীবনদর্শনে যে মতভেদের কোন স্থান নাই, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অন্যের মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবই হইল সাম্যবাদী জীবনদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দলীয় সংগঠন (Party Organisation)

সাম্যবাদী দলের নিম্নতম সংস্থা হইল 'প্রাথমিক দলীয় সংগঠন' (Primary Party Organ)। দলীয় আদর্শে অত্যধিক পরিমাণে আস্থাবান ও অনুরক্ত কমপক্ষে তিনজন সদস্য লইয়া প্রাথমিক দলীয় সংগঠনগুলির সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক গ্রামে, শহরে, যৌথ কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায়, স্কুল-কলেজে সর্বত্র এই সংগঠনগুলি সক্রিয়ভাবে দলীয় আদর্শ ও নীতি প্রচারকার্যে লিপ্ত থাকে। প্রাথমিক সংগঠনগুলির একটি নির্বাচিত কার্যকরী সংস্থা থাকে। এই কার্যকরী সংস্থা দলীয় নীতি ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে ও নূতন সদস্য সংগ্রহ করে। প্রাথমিক সংগঠনগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শহরের বা জিলার সংগঠনগুলিতে (City or District Party Organisation) প্রেরণ করে। শহর বা জিলার দলীয় সংগঠন আঞ্চলিক দলীয় সংগঠনে (Regional Party Congress) তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণ করে। আঞ্চলিক দলীয় সভা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া সদস্য রাষ্ট্রের

দলীয় সভায় (Party Congress of the Union-Republics) প্রেরণ করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির দলীয় সভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় মহাসভা (All-Union Congress) গঠিত হয়। দলীয় মহাসভাই হইল সাম্যবাদী দলের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যকরী সংস্থা। দলীয় মহাসভা কর্তৃক দলীয় মূল নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবার পর গৃহীত হয়। নীতি গৃহীত হইবার পর কোন সদস্যই আর তাহার বিরোধিতা করিতে পারে না। বিরোধিতা করিলেই তাহাকে দল হইতে বহিষ্কার করা হয়। দলীয় মহাসভার সদস্যসংখ্যা এত অধিক যে, এই সভা দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য ৭০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Committee) নির্বাচিত হয়। এই সমিতির বৎসরে তিন-চারটি অধিবেশন বসে ও কার্যতঃ ইহাই দলীয় মহাসভার কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক আরও দুইটি ক্ষুদ্রতর সমিতি নির্বাচিত হয়, যথা—(১) রাজনৈতিক সংস্থা (Political Bureau or Politbureau) ও (২) ব্যবস্থাপনা সংস্থা (Organisational Bureau or Orgbureau)।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি দলীয় সংস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে রাজনৈতিক সংস্থাই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। দশ হইতে বারজন সদস্য লইয়া এই সংস্থা গঠিত হয় এবং প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত দুই-তিনজন সদস্যও এই সংস্থায় লওয়া হয়। সাম্যবাদী দলের প্রধান নেতৃগণকে লইয়াই এই সংস্থা গঠিত হয় এবং কার্যতঃ এই সংস্থা যুগপৎ দলীয় নীতি নির্ধারণ ও শাসনব্যবস্থার নির্ধারিত নীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে, এই সংস্থাই হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক। এই সংস্থার সদস্যগণই মন্ত্রিপরিষদ ও প্রেসিডিয়ামের প্রধান সদস্যরূপে দলীয় নীতিগুলিকে কার্যে রূপায়িত করিয়া থাকেন।

ব্যবস্থাপক সংস্থা দশ হইতে পনের জন সদস্য লইয়া গঠিত। এই সংস্থার প্রধান কার্য হইল সাম্যবাদী দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং এই উদ্দেশ্যে দলীয় সংগঠনগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। দলের প্রধান দপ্তরখানা (Secretariat) মস্কো শহরে অবস্থিত। পাঁচজন স্থায়ী কর্মসচিব ও অন্যান্য বহু কর্মী লইয়া দপ্তরখানা গঠিত হয়। দলের প্রধান কর্মসচিব

(First or General Secretary) একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত স্ট্যালিন স্বয়ং সাম্যবাদী দলের প্রধান কর্মসচিব ছিলেন।

দলের কেন্দ্রীয় সমিতি আর একটি সমিতি নির্বাচন করে। এই সমিতি হইল 'দলনিয়ন্ত্রণ সংস্থা' (Party Control Commission)। এই সংস্থার প্রধান কার্য হইল দলের নানাজাতীয় সংস্থা ও দলের সদস্যগণের কার্য-কলাপের উপর দৃষ্টি রাখা। দলের সদস্যগণ যাহাতে দলীয় বিধিনিষেধ অনুযায়ী তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করে, সেইজন্য এই নিয়ন্ত্রণসংস্থা গঠিত হইয়াছে। দলের নিয়মভঙ্গকারী সদস্যগণের বিরুদ্ধে এই সংস্থা অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে।

সাম্যবাদী দলীয় সংগঠনে নিম্নলিখিত নীতি কয়েকটি স্থান পাইয়াছে :

১। দলের উচ্চ নীচ—প্রত্যেক স্তরের সদস্যগণই নির্বাচন পদ্ধতিতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

২। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে দলের সদস্যগণের তাঁহাদের কার্যের জন্য দলীয় সংগঠনের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়।

৩। দলের নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়।

৪। নিম্ন স্তরের দলীয় সংগঠনগুলির পক্ষে উচ্চস্তরের দলীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া একান্তরূপে বাধ্যতামূলক।

সাম্যবাদী দলের সদস্যের যোগ্যতা ও দায়িত্ব (Qualification and Responsibility of Membership of the Communist Party)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে সাম্যবাদী দলের সদস্যসংখ্যা অনেক কম। সাম্যবাদী দলের সক্রিয় সদস্যসংখ্যার স্বল্পতার প্রধান কারণ হইল যে, সাম্যবাদী দলের সদস্য হইবার জন্য যে উচ্চ স্তরের যোগ্যতার প্রয়োজন হয় তাহা সচরাচর সাধারণ লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। দলের সদস্য তালিকাভুক্ত হইতে গেলে যে নিয়মানুবর্তিতা ও ত্যাগস্বীকারের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় তাহা অত্যুৎসাহী

ব্যক্তির পক্ষেও বাধাস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়। সাম্যবাদী দলের সদস্য সংখ্যা যাহাতে স্বল্প থাকে সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই দলের নেতৃগণ দলের সদস্য হওয়ার পক্ষে এইরূপ উচ্চস্তরের যোগ্যতা নির্ধারণ করিয়াছেন। দলের সদস্যগণের কতকগুলি গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হয়। এই কর্তব্য পালনের জন্য তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়। প্রথমতঃ, দলের সদস্যগণের মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতিগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই এবং এই নীতিগুলির প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ আস্থা থাকা একান্ত অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

দলীয় নীতি ও আদর্শকে সর্বোতোভাবে তাঁহাদের সমর্থন করিতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে দলের সদস্যগণকে আদর্শচরিত্রের কর্মঠ ব্যক্তি হওয়া চাই যাহাতে কর্মক্ষেত্রে অন্য লোক তাঁহাদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে। মদ্যপান ও বিবাহবিচ্ছেদ আইনের যথেচ্ছ সুবিধা গ্রহণ করা সাম্য-বাদী দলের সদস্যগণের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সবোপরি দলের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করা সদস্যগণের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দলীয় বিধিনিষেধ ভঙ্গ করিলে অপরাধ অনুসারে লঘু অথবা গুরু শাস্তি ভোগ অনিবার্য। দলের নেতাগণের পক্ষে দলীয় নীতির বিরোধিতা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্য তাঁহাদের নির্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করিতে হয়। সদস্যগণ একনিষ্ঠভাবে দলের সেবা করিলে অনেক উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসনকার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সাম্যবাদী দলের সক্রিয় সদস্যসংখ্যা সমগ্র দেশে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও অন্য উপায়ে সাম্যবাদী দল জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সাম্যবাদী প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা অন্য নানাবিধ সংঘ গঠন করিয়াছে। ভবিষ্যৎ নাগরিক কিশোর ও যুবকগণকে সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিবার জন্য তিন শ্রেণীর সংঘ গঠিত হইয়াছে। আট হইতে এগার বৎসর বয়স্ক শিশুগণকে লইয়া একটি শিশুসংঘ (Little Octobrists) গঠিত হয়। দশ হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক কিশোরগণকে লইয়া 'কিশোর সংঘ' (Pioneers) গঠিত হয়। আবার পনের হইতে ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবকগণকে লইয়া যুবসংঘ (Komsomol) গঠিত হয়। এই সকল সংঘের মধ্য দিয়াই জন-

সাধারণের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রমিকসংঘ (Trade Unions), সমবায়সমিতি (Co-operatives) প্রভৃতি সংঘগুলি দলীয় আদর্শ প্রচারকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করে।

সাম্যবাদী বিপ্লবের পর ৪৮ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সাম্যবাদ-নীতির স্রষ্টা ও বিপ্লবের প্রধান নায়কগণ একে একে তিরোহিত হইতেছেন। কিন্তু ব্যাপক শিক্ষা, প্রচারকার্য ও গঠনমূলক কার্যের দ্বারা সাম্যবাদের মূল-নীতি ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব জনসাধারণের মধ্যে এরূপভাবে সঞ্চারিত করা হইয়াছে যে, বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ এই নীতিতে আস্থাবান হইয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একদলীয় শাসন ও গণতন্ত্র (One Party rule in the U. S. S. R. and Democracy)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইল যে, এই শাসনব্যবস্থা একটি মাত্র রাজনৈতিক দল (সাম্যবাদী) দ্বারা পরিচালিত হয়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের ১২৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে, নাগরিকগণ শুধু সাম্যবাদী দলের সদস্য হইতে পারিবেন এবং কেবল মাত্র এই দলই প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারিবে। অন্য কোন রাজনৈতিক দল সোভিয়েত দেশে নাই বা থাকিতে দেওয়া হয় না। দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকার অর্থ হইল যে দেশের জনসাধারণের মতপার্থক্যের কোন অবকাশ বা সুযোগ নাই। সকল ব্যক্তিরই চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ভিন্নমুখী না হইয়া একমুখী হইতে হইবে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল কথা হইল চিন্তা করিবার বা মতামত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা (Freedom of thought and expression)। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও মতামত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতাকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ এবং এই বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। যেখানে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে স্বভাবতঃই স্বাধীন চিন্তা বা চিন্তার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গণতন্ত্রের অবসান ঘটে। যেখানে জনসাধারণ ভোট দিয়া শাসকগোষ্ঠীকে পরিবর্তন করিয়া অন্য শাসক-

গোষ্ঠী নিযুক্ত করিতে পারে না, সেখানে গণতন্ত্র অচল। সুতরাং একমাত্র সাম্যবাদী দল পরিচালিত সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা আর যাহাই হউক না কেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এই অভিযোগের উত্তরে সাম্যবাদিগণ বলেন যে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন বিশেষ শ্রেণী নাই এবং এজন্য কোন শ্রেণীবিরোধও নাই। সোভিয়েত রাষ্ট্র হইল মেহনতি জনসাধারণের রাষ্ট্র—কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক ও বুদ্ধিজীবী—সকলেই একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সাম্যের ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। এখানে সকলেই সমান ও পরস্পরের প্রতি সৌহাদ্যযুক্ত। ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকিবার মুখ্য কারণ হইল সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য এবং এই বৈষম্যের ফলে মতভেদ এবং মতভেদ হইল রাজনৈতিক দলের জন্মদাতা। ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের হানাহানির জন্যই অনেক দেশেই শ্রমিক দলের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। সোভিয়েত দেশে স্বার্থের কোন সংঘাত নাই, তাই ক্ষমতার অধিকার লইয়া কোন রাজনৈতিক দল বা উপদলের কলহ নাই।

ইহা ছাডা, সাম্যবাদিগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলে জাতীয় শক্তি ও সংহতির অপচয় ঘটে। জাতির সকল লোকই যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। একদলীয়, দ্বি-দলীয় বা বহু-দলীয় সকল শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দলের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায়ই ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটিমাত্র দল থাকিলে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বার্থ অধিকতর রূপে সুরক্ষিত হয়।

সাম্যবাদিগণ আরও বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এত বৈষম্য রহিয়াছে যে, সেখানে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতামত অভিব্যক্তি প্রহসনে পর্যবসিত হইয়াছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছে।

সুতরাং সোভিয়েত রাষ্ট্রে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা দ্বারা গণতান্ত্রিক আদর্শ আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা (Government of the Local Areas)

সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পনেরটি সদস্যরাষ্ট্র লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে রুশীয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রটি বৃহত্তম। এই প্রজাতন্ত্রে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্রে একটি করিয়া সুপ্রিম সোভিয়েত, মন্ত্রিপরিষদ্ ও প্রেসিডিয়াম আছে। সদস্যরাষ্ট্রের নাগরিকগণ কর্তৃক চার বৎসর কালের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সভাই হইল সদস্যরাষ্ট্রগুলির সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

স্ব-শাসিত প্রদেশগুলিতে অনুরূপ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এখানকার শাসনব্যবস্থাও একটি সুপ্রিম সোভিয়েত, একটি মন্ত্রিপরিষদ্ ও একটি প্রেসিডিয়াম লইয়া গঠিত।

অনুরূপভাবে স্ব-শাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার নিজস্ব আইনসভা (Soviet) থাকে। এই সভাগুলির সদস্যগণ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সোভিয়েত সভাগুলি শাসনকার্যের জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ্ (Executive Committee) নির্বাচিত করে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি (Economic Basis of the Soviet State)

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা বলা হইয়াছে। এখানে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে কৃষক-মজদুর লইয়া গঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি হইল মেহনতি জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ। মূলধনের মালিক, জমিদার বা ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিষ্কর্মা পরজীবী সম্প্রদায়ের এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রনৈতিক সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মেহনতি জনসাধারণ। মেহনতি জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষক-মজদুর ও সৈনিকের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোভিয়েত সভাই হইল রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইল এই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। বাইবেলে উল্লিখিত অর্থনৈতিক নীতি সাম্যবাদিগণ একটু বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বাইবেলের উপদেশ হইল 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাও' ('Earn thy bread by the sweat of your own brow') অর্থাৎ নিজে কাজ করিয়া নিজের অন্ন সংস্থান কর, অপরের পরিশ্রমলব্ধ ধনের অংশ গ্রহণ করিও না। কিন্তু সাম্যবাদ নীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল 'যে কাজ করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না'—('He who does not work neither shall he eat')। সোভিয়েত রাষ্ট্রে কাজ করা শুধু বাধ্যতামূলক নয়—ইহা সম্মানজনকও বটে। সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই মূলনীতি বলবৎ হইবার ফলে, পূর্বতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইহার অবশ্যম্ভাবী সহচর ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনিক কর্তৃক দরিদ্র শ্রেণীর নির্মম শোষণসহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ফলে বর্তমানে সোভিয়েত রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত মালিকানা নাই। দেশের সমগ্র সম্পদের মালিক হইল রাষ্ট্র অর্থাৎ জনসাধারণ—যাহাদের সমবেত পরিশ্রমের ফলে দেশের সম্পদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, দ্বিতীয়তঃ, যৌথ খামার সম্পত্তি ও তৃতীয়তঃ, সমবায় সমিতি সম্পত্তি। জমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী, বন, কল কারখানা, রেল, বিমান, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ, যন্ত্রপাতিসহ বড় বড় রাষ্ট্রীয় খামার, পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের অধিকাংশ আবাস-গৃহ হইল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পত্তি। যৌথ খামার ও সমবায় সমিতিগুলির সাধারণ সম্পত্তি হইল তাহাদের যন্ত্রপাতি, কারখানা-গৃহ, পালিত পশু, উৎপাদিত সম্পদ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয়, যৌথ ও সমবায় সম্পত্তি ব্যতীতও সোভিয়েত রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। স্বোপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, পারিবারিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্রায়তনের কুটির শিল্প, ব্যক্তিগত ব্যবহারোপযোগী তৈজস ও আসবাবপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যক্তিগত

সম্পত্তি হিসাবে নাগরিকগণ রাখিতে পারেন এবং এইগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করিতে পারেন। সুতরাং নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত নাগরিকগণ সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন কিন্তু যে সম্পত্তির মালিকানা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং যে সম্পত্তির সাহায্যে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করিয়া সমাজে অসম ধন-বণ্টন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, সেরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সোভিয়েত দেশে নাই। যাহারা কাজ করে, একমাত্র তাহারাই ভোগ করিতে পারে। সোভিয়েত দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র, যৌথ খামার ও সমবায় সমিতিগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়—মুনাফার লোভে নিছক ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয় না। সুতরাং উৎপাদিত সম্পদের মালিক ব্যক্তি-বিশেষ নয়—মালিক হইল উৎপাদনে নিযুক্ত কর্মিসমূহ। প্রত্যেক কর্মী তাহার সাধ্যমত কাজ করে এবং কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক পায় ('From each according to his ability, to each according to his work')। এইরূপে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে সোভিয়েত রাষ্ট্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দেশের মেহনতি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও যে দেশ নিরক্ষর কৃষি-প্রধান দেশ ছিল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে সে দেশ আজ ধনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে উন্নীত হইয়াছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্বগুলি হইল, (১) সমাজব্যবস্থা হইতে শ্রেণীভেদ দূর করা, (২) বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা, (৩) শিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও (৪) পতিতা-বৃত্তি নিরোধ করা। আয়ের বৈষম্য থাকিলেও সকলের জন্য হিতকর কর্ম-সংস্থান দ্বারা বেকারত্ব দূর করা হইয়াছে। অর্থের অভাবে কেহ নিরক্ষর থাকে না বা অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় মারা যায় না। বৎসরে প্রায় দুই কোটি লোককে সোভিয়েত সরকার পেন্সন দান করে এবং ৩০ লক্ষ লোককে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সরকারী খরচে স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠান হয়। ১৯২৭ সাল হইতে ছয়টি রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে উৎপাদন পরিমাণ এরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বর্তমানে শ্রমিকগণকে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে হয় না। ১৯৫৯ সালে

হইতে এই দেশে একটি সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সফল হইলে শ্রমিকগণকে সপ্তাহে ৩০।৩৫ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে হইবে না। অবশিষ্ট সময় তাহারা বিশ্রাম ও গঠনমূলক কাযে নিয়োগ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল এমন দেশ যেখানে মেহনতি জনসাধারণ সুস্থ জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারে। এইজন্য সাম্যবাদী নেতাগণ দাবী করেন যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র মেহনতি জনসাধারণকে লইয়া মেহনতি জনসাধারণের কল্যাণের জন্য মেহনতি জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiar Features of the Soviet Federation)

১৯৩৬ সালের স্টালিন শাসনতন্ত্রে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থাকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ন্যায় সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায়ও যুক্তরাষ্ট্র সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঙ্গিক রাজ্যসরকারগুলির অবস্থিতি, উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন, একটি সুপ্রিম কোর্টের অবস্থিতি প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্য-গুলি এই শাসনব্যবস্থায় বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এমন কতকগুলি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেজন্য ইহাকে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে সহজেই পৃথক করা যায়।

প্রথমতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পনেরটি আঙ্গিক রাজ্য লইয়া গঠিত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই আঙ্গিক রাজ্যগুলি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির ন্যায় শুধুমাত্র ভৌগোলিক বিভাগ নহে। সোভিয়েতের আঙ্গিক রাজ্যগুলি জাতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উজবেকিস্তান, কাজাকস্তান, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, প্রভৃতি আঙ্গিক রাজ্যগুলি পৃথক জাতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে নিছক জাতির ভিত্তিতে আঙ্গিক রাজ্যগুলি গঠিত হয় নাই। তবে এই ব্যবস্থার পক্ষে বলা চলে যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সোভিয়েত সরকার সংখ্যালঘু জাতিগুলির সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিতে পারিয়াছেন যাহা অনেক যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও আঙ্গিক রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন নীতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমগ্র দেশের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, করস্থাপন, সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, মুদ্রাব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বীমা, বিচারব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা করে। করধার্য ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন আঙ্গিক রাজ্য নূতন কর স্থাপন করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রাধান্য সত্ত্বেও আঙ্গিক রাজ্যগুলির কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতিবিরোধী এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই।

চতুর্থতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন, বাইলো-রাশিয়া প্রভৃতি আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে ভিন্নরাষ্ট্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে এই রাজ্যগুলি তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধিগণের দ্বারা স্ব স্ব কার্য পরিচালনা করে।

পঞ্চমতঃ, আঙ্গিক রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করিবার অধিকারও শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঙ্গিক রাজ্যগুলির এই অধিকারগুলি নামমাত্র অধিকারে পর্যবসিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত কোন আঙ্গিক রাজ্যই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস পায় নাই।

ষষ্ঠতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখনকার কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রিম সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকার ও আঙ্গিক রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার যে ভাগ হইয়াছে তাহা ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী করা হয় নাই।

সপ্তমতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একটি সুপ্রিম কোর্ট বিদ্যমান থাকিলেও এই বিচারালয় সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক প্রবর্তিত কোন আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না। এই ক্ষমতা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডিয়ামের উপর অর্পিত হইয়াছে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রায় সমুদয় যুক্তরাষ্ট্রেই আইনের বৈধতা বিচার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের (সাম্যবাদী) কর্তৃত্বে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলিয়া শাসনব্যবস্থার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে একদলীয় নেতৃত্ব দেখা যায়। একদলীয় নেতৃত্বের ফলে শাসনব্যবস্থার কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রসুলভ হইলেও কার্যতঃ ইহা কঠোরভাবে এককেন্দ্রীয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি (Structure of the Soviet State)

প্রায় ৬০টি বিভিন্ন জাতি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। জার শাসনকালে শাসনব্যবস্থা একান্তভাবে এককেন্দ্রীয় ছিল, কিন্তু বিদ্রোহের পর সাম্যবাদী নেতাগণ এই বিভিন্ন জাতিগুলির জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি ও অতীত ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পূর্বতন এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন করেন। কিন্তু অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একটি মূলগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রই বলপ্রয়োগে বিজয় দ্বারা অথবা বলপ্রয়োগে একটি জাতিকে অবদমিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ইহার সৃষ্টির প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সোভিয়েত নেতাগণ দাবী করেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র একান্তভাবেই একটি বহুজাতির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ঐক্য ও বন্ধুত্বের ফল। সাম্যের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন জাতি স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া এই অভিনব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। তাই এই যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, এই রাষ্ট্রান্তর্গত ক্ষুদ্র-বৃহৎ— প্রত্যেকটি জাতি ইহার স্বীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া এক বৃহত্তর

মানবসমাজ গঠন করিতে পারে। এই কারণে ওয়েব্‌স দম্পতি ও অধ্যাপক ল্যাস্কি সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে এক নূতন ধরণের সভ্যতা (A new type of civilization) আখ্যা দিয়াছেন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবার উদ্দেশ্যে চার শ্রেণীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র নিম্নলিখিত শাসন-সংস্থায় ভাগ করা হইয়াছে।

১। আঙ্গিক রাজ্য (Union Republic)

২। স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republic)

৩। স্ব-শাসিত প্রদেশ (Autonomous Region)

৪। জাতীয় অঞ্চল (National Area)

১। আঙ্গিক রাজ্য—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি আঙ্গিক রাজ্যের প্রত্যেকটি অপরাপর আঙ্গিক রাজ্যগুলির সমপর্যায়ভুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেকটি রাজ্যের নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে এবং এই শাসনতন্ত্র প্রত্যেকটি রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসন-সংস্থা সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক রচিত এবং প্রয়োজনমত সংশোধিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্য সমুদয় ক্ষমতাই আঙ্গিক রাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব ছাড়াও প্রত্যেকটি আঙ্গিক রাজ্যের নিজস্ব নাগরিকত্ব আছে, তবে এই উভয়বিধ নাগরিকত্বের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় পতাকা ছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যের স্বাধীনতা-সূচক নিজস্ব পতাকা আছে। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই নিজস্ব এলাকার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। কোন রাজ্যের বিনা সম্মতিতে রাজ্যের এলাকার পরিবর্তন করা যায় না। ইহা ছাড়া, আঙ্গিক রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুসারে ইহাদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী গঠন করিতে পারে ও পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। সর্বোপরি প্রত্যেকটি আঙ্গিক রাজ্য যেরূপ স্বেচ্ছায় এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে, সেইরূপ স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার শাসনতান্ত্রিক অধিকারও ইহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি আঙ্গিক রাজ্যই ইহার জনসংখ্যা ও আয়তন-নিরপেক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার

উচ্চকক্ষ জাতিপুঞ্জ সোভিয়েতে ২৫টি প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ কতকগুলি রাজ্যের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সমবায় বলা যাইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির এত ব্যাপক অধিকার দেখা যায় না।

২। স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র—স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি হইল আঙ্গিক রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় শাসন-সংস্থা—ইহারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ নহে। আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যে-কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র গঠন করিতে পারে। আঙ্গিক রাজ্যগুলির ন্যায় প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা আছে। ইহাদের নিজস্ব এলাকা আছে এবং এই এলাকার কোন পরিবর্তন করিতে হইলে শুধু সংশ্লিষ্ট আঙ্গিক রাজ্যের সম্মতি হইলে চলে না, এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রটিরও সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। এই প্রজাতন্ত্রগুলি ইহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং ইহাদের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য ইহাদের সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক স্থানীয় ভাষার সাহায্যে পরিচালিত হয়। ইহাদের স্বতন্ত্র পতাকা না থাকিলেও ইহারা সংশ্লিষ্ট আঙ্গিক রাজ্যের পতাকায় নিজস্ব নামাঙ্কিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারে। তবে এই স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না বা সশস্ত্র বাহিনীও গঠন করিতে পারে না অথবা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে পারে না। প্রত্যেক স্ব শাসিত প্রজাতন্ত্র সাম্যের ভিত্তিতে সোভিয়েত জাতিপুঞ্জ পরিষদে ১১ জন সদস্য নির্বাচন করিতে পারে। সমগ্র সোভিয়েত দেশে এরূপ ১৯টি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র আছে।

৩। স্ব-শাসিত অঞ্চল—অনেকগুলি আঙ্গিক রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। এই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে স্ব-শাসিত অঞ্চলগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-অধ্যুষিত প্রত্যেকটি অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান আছে। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের আঞ্চলিক সোভিয়েত ও শাসনপরিষদ (Executive Committee) সাহায্যে তাহাদের

আঞ্চলিক ভাষায় শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত অঞ্চল সাম্যের ভিত্তিতে সোভিয়েত জাতিপুঞ্জ পরিষদে ৫ জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া থাকে। সমগ্র সোভিয়েত দেশে এরূপ অঞ্চলের সংখ্যা হইল ১৩টি।

৪। জাতীয় এলাকা—জাতীয় এলাকাগুলি হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান। অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে তাহাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এইগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেকটি জাতীয় এলাকায় একটি করিয়া এলাকা সোভিয়েত ও শাসনপরিষদ্ আছে। ইহারা নিজস্ব ভাষায় ইহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি এলাকা সোভিয়েত জাতিপুঞ্জ পরিষদে একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। সমগ্র সোভিয়েত দেশে এরূপ জাতীয় এলাকার সংখ্যা হইল ১০টি।

সুতরাং দেখা যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেব কাঠামো এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া একটি বৃহত্তর জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে সমগ্র জাতীয় ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এরূপ সুনিপুণভাবে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান অন্য কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। এই চারিটি শাসন-সংস্থা হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এই বিভিন্ন অঙ্গগুলি সাম্যবাদী দলেব মধ্যবর্তিতায় সাম্যেব ভিত্তিতে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটি অভিনব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে।

সোভিয়েতের প্রকৃতি (Nature of the Soviet)

'সোভিয়েত' শব্দটির অর্থ হইল 'সভা'। এই সভা প্রতি গ্রামে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া অথবা প্রতি শিল্প-কারখানার শ্রমিক লইয়া বা সেনাদলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই সভার বৈশিষ্ট্য হইল যে, একমাত্র যাহারা নিজেরা কাজ করে তাহারাই এই সভার সদস্য হইতে পারে। মূলধনের মালিক, জমিদার বা ব্যবসায়ীর এই সভায় স্থান নাই।

সোভিয়েতগুলি দ্বি-বিধ কাজ করে। প্রথমতঃ, এই সোভিয়েত ব্যবস্থার সাহায্যে মেহনতি জনগণকে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সংগঠনের সাহায্যেই সাম্যবাদী দলের নীতি, নির্দেশ ও কার্যক্রম বলবৎ করা সম্ভব হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ ১। শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। পনেরটি সদস্যরাষ্ট্র লইয়া সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। চার শ্রেণীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত হইয়াছে। সদস্যরাষ্ট্রগুলির যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার শাসনতন্ত্রসম্মত ক্ষমতা থাকিলেও অন্য নানাপ্রকারে তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে আনা হইয়াছে।

২। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শোষণ মুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই হইল এই শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য।

৩। শাসনতন্ত্রে যুগপৎ নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪। আইনসভার উভয় পরিষদই সর্ববিষয়ে সমান ক্ষমতার অধিকারী।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপরিষদ দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া গঠিত। আইন-সভার সদস্যগণ যুক্ত অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করেন।

৬। আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক তেত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম হইল কার্যতঃ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এই সভার আইন-প্রণয়ন, শাসনকার্য ও বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

৭। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় বিচারপতি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং বিচারকার্যে নাগরিক বিচারকগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য—সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত নাগরিক অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র নাগরিকগণের কতক-গুলি কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে :—

। ১। কাজ করিবার অধিকার, ২। বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার, ৩। শিক্ষার অধিকার ৪। জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান অধিকার, ৫। ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার, ৬। বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ৮। আশ্রয় পাইবার অধিকার, ৯। সংঘ গঠন করিবার অধিকার।

সোভিয়েত নাগরিকের কর্তব্য হইল ঃ

১। কাজ করা, ২। আইন-কানুন মান্য করা ও শ্রমশৃংখলা রক্ষা করা, ৩। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা, ৪। সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করা।

শাসন বিভাগ—প্রায় সাত জন সদস্য লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদে যুক্ত অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া এই পরিষদ গঠিত হয়। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা হইল মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কার্য। সমগ্র শাসনবিভাগের কাযের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা ইহার প্রধান কর্তব্য। শাসনতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রিম সোভিয়েতের নিকট দায়ী।

আইনসভা—দুইটি পরিষদ—জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত লইয়া সুপ্রিম সোভিয়েত বা সোভিয়েত আইনসভা গঠিত। জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত সমগ্র দেশের নাগরিকগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। উভয় পরিষদের কার্যকাল চার বৎসর, কিন্তু তৎপূর্বে প্রেসিডিয়াম উভয় পরিষদই ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নির্বাচন, প্রেসিডিয়াম ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণকে নির্বাচন করা ইহার কায।

প্রেসিডিয়াম—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য দেশের মত রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অনুরূপ কোন উর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ নাই। তৎ-পরিবর্তে তেত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য পরিচালনা করে। প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নিবাচিত হইয়া থাকেন। প্রেসিডিয়াম আইনসভার অবিচ্ছেদ্য

অঙ্গ। এই সভা সরাসরি আইন প্রণয়ন করিতে না পারিলেও আইনানুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারে। সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদ ইহার নিকট দায়ী থাকে। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উভয় পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া দুই মাসের মধ্যে উহা নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। এই সভা রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে ও সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করে। সুপ্রিম সোভিয়েত-প্রণীত কোন আইনের সহিত মূল রাষ্ট্র-প্রণীত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে শেষোক্ত আইনকে এই সভা বাতিল করিতে পারে। সোভিয়েত শাসন-ব্যবস্থার সমুদয় ক্ষমতাই প্রেসিডিয়ামে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে।

বিচারবিভাগ—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায়ও কেন্দ্রীভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। সুপ্রিম কোর্ট হইল সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়। ইহার আদিম ও আপীল মামলা শুনিবার ক্ষমতা আছে। বিচারপতিগণ পাঁচ বৎসরের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হন। সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত আরও কয়েক শ্রেণীর বিচারালয় আছে। মূলরাষ্ট্রগুলির বিচারালয় এবং স্ব-শাসিত প্রদেশ, স্ব-শাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার বিচারালয়গুলি নিজ নিজ এলাকার মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করে। সমস্ত বিচারপতিই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সমস্ত মামলাই নাগরিকগণের প্রতিনিধি বিচারকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। বিচারপদ্ধতি সহজ, সরল ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়-সাপেক্ষ। রাজনৈতিক অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

শাসনবিভাগের কাজের তদারক করিবার জন্য একজন প্রোকিউরেটর-জেনারেল ও তাঁহার অধস্তন স্থানীয় অন্যান্য প্রোকিউরেটরগণ আছেন। আইনসভা কর্তৃক সাত বৎসরের জন্য প্রোকিউরেটর-জেনারেল নির্বাচিত হন। কোন বে-আইনী কার্য অনুষ্ঠিত হইলে প্রোকিউরেটর-জেনারেল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন।

দলব্যবস্থা—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র রাজনৈতিক দল হইল সাম্যবাদী দল। এই দলের প্রভাব শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাম্যবাদী দলের হস্তেই সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। দলীয় সংগঠনেও কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য দেখা যায়। প্রাথমিক

দলীয় সংগঠন হইল দলের নিম্নতম সংগঠন। তাহার পর শহর ও জিলার সংগঠন, আঞ্চলিক-সংগঠন, এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলির সংগঠন। সর্বোপরি হইল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় মহাসভা। এই সভা একটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংস্থা নির্বাচিত করে। কার্যকরী সংস্থা পলিটব্যুরো ও অর্গব্যুরো নামে আরও দুইটি ক্ষুদ্রতর সংস্থা নির্বাচিত করে। পলিটব্যুরো হইল দলীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস। ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ যাহাতে সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, সেজন্য সমগ্র দেশব্যাপী শিশুসংঘ, কিশোরসংঘ ও যুবসংঘ, গঠিত হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. State the salient features of the constitution of the U. S. S. R. (C. U. 1953, 1955 and 1965, Part I)

2. "The one-party system (in the U. S. S. R.) is not strictly speaking a type of party government at all."

Examine the statement (C. U. Hon. 1951)

3. Describe the fundamental rights and duties of a citizen in the U. S. S. R. (C. U. Hon. 1955)

4. "A working theory of the state must, in fact, be conceived in administrative terms."

Examine this statement in relation to the governments of the U. S. S. R. and the U. S A. (Andhra. 1938)

5. Briefly describe the judicial system of the U. S. S. R. (C U. 1956)

6. Broadly indicate the structure of the state in the U. S. S. R. (C. U. 1957)

7. Discuss how far the U. S. S. R. is a socialist state of workers and peasants.

Is there any scope for private enterprise in the U. S. S. R. (C. U. 1958)

8. Analyse the structure of the state in the U. S. S. R. and discuss in that connection the nature of the Soviet Federation. (C. U. 1960)

তৃতীয় অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A)

শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম আধুনিক প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ও কালক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে অন্যান্য দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপ হইতে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতি তাহাদের জাতিগত বিভেদ ভুলিয়া কিভাবে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাস আরম্ভ হয় তিন শ্রেণীর তেরটি স্বাধীন উপনিবেশ লইয়া। এই উপনিবেশগুলি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তাহাদের উপর করধার্য করিবার ক্ষমতা প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি সন্ধি সমবায়ের অধীনে একতাবদ্ধ হয়। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যখন এই উপনিবেশগুলি গ্রেট ব্রিটেনের সহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করিল তখন তাহারা এই সত্য বুঝিতে পারিল যে, একতাই তাহাদের প্রধান বল। স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য এই বিচ্ছিন্ন তেরটি উপনিবেশ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় মিলিত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কার্যকরী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি (Nature of the U. S A. Constitution)

শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ একাধারে জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। উপনিবেশ-গুলির অধিবাসিগণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনব্যবস্থাকে দক্ষ ও শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা

একজন আইনসভা নিরপেক্ষ ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী শাসনকর্তার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কার্যে অন্তর্বিভাগীয় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অবলম্বন করেন। তৃতীয়তঃ, গণশক্তির প্রাধান্ত বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নির্বাচন দ্বারা আইনসভার, শাসনবিভাগের ও বিচারবিভাগের সদস্যগণের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি মার্কিন শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, আইন-প্রণয়ন ও শাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টনব্যবস্থা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতাগুলি উভয় সরকারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় অনুল্লিখিত ক্ষমতার (Residuary Powers) অধিকারী হইল আঞ্চলিক সরকারগুলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির পৃথক আয়ের উৎস আছে। বিচার-বিভাগও অনুরূপভাবে গঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ব্যতীতও আঞ্চলিক সরকারগুলির পৃথক বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্তন আঞ্চলিক সরকারগুলির অনুমোদনসাপেক্ষ। কেন্দ্রীয় আইনসভা এককভাবে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব আনিতে পারিলেও আঞ্চলিক সরকারগুলির বিনা সম্মতিতে তাহা কার্যকরী করিতে পারে না। তবে শাসনতান্ত্রিক বিধানানুযায়ী প্রত্যেক অঞ্চলেই প্রজাতন্ত্রী সরকার চালু রাখিতে হইবে এবং কোন আঞ্চলিক সরকারেরই যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই।

মার্কিন শাসনতন্ত্রের উপাদানসমূহ (Elements of the U S A. Constitution)

মার্কিন শাসনতন্ত্র পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত : ১। প্রধান উপাদান হইল ফিলাডেল্‌ফিয়ায় রচিত আদি শাসনতন্ত্র। ফিলাডেল্‌ফিয়ার আহূত বিশেষ সভা কর্তৃক শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের কাঠামো প্রস্তুত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ

কালে প্রয়োজনানুসারে যাহাতে শাসনতন্ত্র বর্ধিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্রের সাবলীল পরিবর্ধনের কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেন নাই। ২। তাহার পর আজ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে ২৩টি সংশোধন-প্রস্তাব পাস হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের কঠোর অনমনীয়তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ২৩টি সংশোধন আইন গৃহীত হওয়াব ফলে আদি শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই সংশোধন আইনগুলির মধ্যে দাসত্ব-প্রথার বিলোপ সাধন, শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির সন্নিবেশ, স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রাপ্তি ও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা সিনেটের সদস্যগণের নির্বাচন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৩। যে-সমস্ত বিধিবদ্ধ আইন পরবর্তী কালে আদি শাসনতন্ত্রের পরিবর্ধনে সহায়তা করিয়াছে। আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কংগ্রেস সভা ও বিভিন্ন রাজ্যসভাগুলি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করিয়া শাসনতন্ত্রকে প্রয়োজনানুসাবে পুষ্ট করিয়াছে। ৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও নির্দেশগুলির দ্বারা শাসনতন্ত্রের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ইহার ব্যাখ্যা কবিবাব ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার উপর বহু নূতন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা করিবার এই ক্ষমতা প্রযুক্ত না হইলে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভা যে সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন, তাহা রাজ্যসরকারগুলিব আয়ত্তাধীন হইত। ৫। নানাবিধ প্রথাগত যে-সকল বিধান ও রীতিনীতি দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। আদি শাসনতন্ত্রে কেবিনেটের কোন উল্লেখ নাই। প্রথাগত বিধানের ভিত্তিতে কেবিনেট গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিও প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইরূপে প্রথাগত বিধান, বিচার বিভাগীয় নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা আদি শাসনতন্ত্রের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইযাছে।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the U. S. A. Constitution)

(১) শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'আলাস্কা'

এবং আগষ্টমাসে 'হাওয়াই' যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঊনপঞ্চাশৎ ও পঞ্চাশৎ রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে শুধুমাত্র অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলি উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত উভয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা সূচিত হয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয় (Written and rigid)। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি একটি নির্দিষ্ট দলিলে লিখিতভাবে সন্নিবদ্ধ আছে। কিন্তু কোন শাসনতন্ত্রের বিধানসমূহ সম্পূর্ণভাবে লিখিত থাকিতে পারে না। মার্কিন শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও নানাপ্রকারের প্রথাগত বিধান ও রীতিনীতি এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যন্ত অলিখিত প্রথা ও রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে মার্কিন শাসনতন্ত্র অনমনীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে আইনসভা ইহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষা বিশেষ ভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

(৩) শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) মার্কিন শাসনব্যবস্থার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রেট ব্রিটেনের অলিখিত শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হইল শাসনতন্ত্র। শাসনতন্ত্র একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে এবং অপরদিকে আইনসভা, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন দ্বারা প্রত্যেকের ক্ষমতা-প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করিয়া পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়াছে।

(৪) শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Supremacy of the Federal Judiciary) কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করে ও শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ বে-আইনী ঘোষণা করিয়া শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করে। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা, আঞ্চলিক কর্তৃত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

(৫) এই শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-

স্বাতন্ত্র্যীকরণ (Separation of Powers) নীতির পূর্ণপ্রয়োগ। শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শে এতটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই মতবাদের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আইন-প্রণয়ন, প্রশাসনিক কার্য ও বিচারকার্য যাহাতে পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শাসনকর্তৃপক্ষ আইন-পরিষদ্‌-নিরপেক্ষভাবে যাহাতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য আইনসভা-বহির্ভূত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয় ও রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী হইতে হয় না। অনুরূপভাবে আইনসভাও শাসন-কর্তৃপক্ষ-নিরপেক্ষ করিয়া গঠিত হয়। বিচারবিভাগও অন্য দুইটি বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকে।

(৬) মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইলে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। এইজন্য শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির কঠোরতা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের (Mutual check and balance) ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমস্ত নিয়োগ ও পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি কার্য আইনসভার উচ্চ কক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষ। অপরপক্ষে আইনসভা কর্তৃক রাষ্ট্রপতির বিনা সম্মতিতে আইন প্রণয়ন করা একরূপ অসম্ভব। বিচারপতিগণ আইনসভার উচ্চ কক্ষের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

(৭) শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, রাষ্ট্রপতি-প্রধান প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা (Presidential Republic)। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র থাকে না। পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত থাকিয়া উভয় বিভাগ স্ব স্ব কার্য পরিচালনা করে। এই শাসনতন্ত্রে রাজার কোন স্থান নাই। জনগণ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক বিচার (Comparative study of the British and the U. S. A. Constitutions)

যে তেরটি উপনিবেশ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম গঠিত হয়, তাহাদের

অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ইংলণ্ড হইতে আগত উদ্বাস্তু। দেশত্যাগ করিলেও তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও জাতীয় ঐতিহ্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়লাভ করিয়া তাহারা যখন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিল তখনও তাহারা মাতৃভূমির রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারে নাই। আপাত-দৃষ্টিতে গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রের সহিত মার্কিন শাসনতন্ত্রের বহু পার্থক্য থাকিলেও এই পার্থক্যগুলির অন্তরালে উভয় শাসনতন্ত্রের কতিপয় মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সাদৃশ্য—

প্রথমতঃ, বলা যায় যে বৃটিশ ও মার্কিন উভয় শাসনতন্ত্রই ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষা কবচ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। উভয় শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা। ইংলণ্ডে আইনের অনুশাসন (Rule of Law) সাহায্যে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত শাসনতন্ত্র, সুপ্রিম কোর্ট ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। পদ্ধতি ভিন্ন হইলেও শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল অভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত—রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু তিনি শাসন করেন না। তাঁহার যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তি থাকিলেও প্রকৃত ক্ষমতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বংশানুক্রমিক কোন রাজা না থাকিলেও নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাজার স্থান পূরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তিনি রাষ্ট্রের প্রধান এবং স্বদেশে ও বিদেশে তিনি রাজার ন্যায় সম্মানের অধিকারী।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের রাজা পার্লামেন্ট সভার বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে দেশের নানা সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের সম্পর্কে বক্তৃতা (Speech from the Throne) করেন, মার্কিন শাসনতন্ত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতিও কংগ্রেস সভার বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে কংগ্রেস সভায় তাঁহার লিখিত বাণী (Message) প্রেরণ করিয়া জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও নির্দেশ দান করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও এই শাসনতন্ত্রে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে বহু প্রথাগত বিধান (Conventions) স্থান পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কয়েকটি প্রধান অংশ এই প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উভয় দেশের কেবিনেটই এই প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। আবার কালক্রমে উভয় দেশেই এই প্রথাগত বিধানের কতকগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে আইনে পরিণত করা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, শুধু প্রথাগত বিধান নয়, উভয় দেশের শাসনতন্ত্রই প্রভূত পরিমাণে বিচারালয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই উভয় দেশের শাসনতন্ত্রকেই বিচারালয় সাহায্যে গঠিত (Judge-made) শাসনতন্ত্র বলা হয়।

ষষ্ঠতঃ, বৃটেনের ন্যায় মার্কিন শাসনতন্ত্রও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করে। বৃটেনের তৎকালীন উচ্চ কক্ষ লর্ড সভা যে ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও মর্যাদার অধিকারী ছিল মার্কিন দেশের উচ্চ কক্ষ সিনেট সভাকেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী করিয়া গঠন করা হইয়াছিল। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা যে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার প্রভাব মুক্ত হইয়া গঠিত হইয়াছিল তাহা নহে।

বৈসাদৃশ্য—

বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক বিচার করিতে গেলে প্রথমেই এই উভয় শাসনতন্ত্রের যে পার্থক্যের উপর দৃষ্টি পড়ে তাহা হইল, বৃটিশ শাসনতন্ত্র বৃটেনে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। আর মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয়। বৃটেনে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার আধার আর মার্কিন দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রই হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অলিখিত এবং নমনীয়। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে কি সাধারণ কি শাসনতান্ত্রিক উভয়বিধ আইনই সংশোধন করিতে পারে। অপরপক্ষে মার্কিন শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। কংগ্রেস সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক

আইন পরিবর্তন করিতে পারে না। সুতরাং বৃটেনে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক আইন সাধারণ আইন হইতে শুধু পৃথক নয়, ইহা বিশেষ মর্যাদারও অধিকারী।

তৃতীয়তঃ, বৃটেনে মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বর্তমান। এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা ইহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার বর্তমান। এই ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ কোন কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নহে এবং আইনসভাও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত।

চতুর্থতঃ, বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের প্রধান হইলেন একজন বংশানুক্রমিক রাজা—যিনি রাজত্ব করেন অথচ শাসন করেন না। অপর পক্ষে মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র (Federal Republic)। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান ও কর্ণধার। তিনি শাসন করেন কিন্তু রাজত্ব করেন না।

পঞ্চমতঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে রাজাসহ পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, মার্কিন দেশে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। শাসনতন্ত্রই হইল সকল ক্ষমতার উৎস।

ষষ্ঠতঃ, বৃটেনে আইনের অনুশাসনের সাহায্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত, মার্কিন দেশে এইরূপ আইনের অনুশাসন না থাকিলেও শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ আছে।

সপ্তমতঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হয় নাই এজন্য বৃটেনের বিচারবিভাগ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহে। মার্কিন শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার সূক্ষ্ম পৃথকীকরণ করা হইয়াছে এবং এই কারণে সে দেশের বিচারবিভাগ যথেষ্টরূপে স্বাধীনতা ভোগ করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের মধ্যে কতিপয় মূলগত সাদৃশ্য থাকিলেও গঠন প্রকৃতিতে এক শাসনতন্ত্র অপর শাসনতন্ত্র হইতে শুধু পৃথক নয়, বিপরীতও বটে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ

(The Federal Executive)

রাষ্ট্রপতি (The President)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে অন্ততপক্ষে চৌদ্দ বৎসর কাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুক্তরাষ্ট্রের স্বভাবজাত নাগরিক হইতে হইবে। তিনি চারি বৎসর কার্যকালের জন্য ভোটদাতৃগণ কতৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্র একটি নির্বাচনকেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি নির্বাচনকেন্দ্র সেই মূলরাষ্ট্র হইতে কংগ্রেস সভায় যত সংখ্যক প্রতিনিধি নিবাচন করে, ঠিক তত সংখ্যক প্রতিনিধিই ভোটদাতৃগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সেই কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত করে। এইরূপে নিবাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিয়া থাকেন। যাহাতে যোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নিবাচিত হইতে পারেন ও নির্বাচনকার্য যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ পরোক্ষ নির্বাচনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কিন্তু বর্তমানে শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হস্তগত হইয়াছে। প্রাথমিক ভোট-দাতৃগণ দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে ভোটদান করিয়া দলের সমর্থকগণকে রাষ্ট্রপতি নিবাচনের জন্য প্রতিনিধি স্থির করেন। এই প্রতিনিধিগণ দলীয় নির্দেশ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকেন। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পর্যায়ের ভোট গণনা হইলে কোন্ দল হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন তাহা অনুমান করা যায়। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বর্তমানে দৃশ্যতঃ পরোক্ষ হইলেও কার্যতঃ প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন ব্যাপারে প্রথম হইতেই একটি বিশেষ প্রথাগত বিধান গঠিত হইয়াছিল। বিধানটি হইল যে, একই ব্যক্তি পর পর দুই বারের বেশী রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট পর পর তিনবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ফলে এই বিধানটি

লঙ্ঘিত হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে একটি শাসনতান্ত্রিক আইন পাস করিয়া বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিই উপর্যুপরি দুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। সুতরাং প্রথাগত বিধানটি বর্তমানে আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যকলাপ (Powers and Functions of the President)

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার চারিটি উৎস আছে। প্রথম ও প্রধান উৎস হইল শাসনতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের অনেক বিধির অস্পষ্টতার জন্য বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও নির্দেশের প্রয়োজন হইয়াছে। বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা বহু নূতন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আইনসভা নূতন আইনের দ্বারা অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নূতন ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে। চতুর্থতঃ, প্রথাগত বিধান, রীতিনীতি ও পদ্ধতির প্রভাবেও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(১) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers)

সমগ্র শাসনব্যবস্থার প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইনগুলিকে বলবৎ করিতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, কেবিনেটের সদস্য, কূটনৈতিক দূত প্রভৃতি তিনিই নিয়োগ করিয়া থাকেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই সমস্ত নিয়োগই সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। নিয়োগব্যাপার সিনেটের পরামর্শ ও অনুমোদনসাপেক্ষ হইলেও, রাষ্ট্রপতি সিনেটের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই এই সমস্ত কর্মচারীকে বরখাস্ত করিতে পারেন। বৈদেশিক নীতিনির্ধারণ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি যথেষ্ট ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিতে তিনি দূত, কন্সাল প্রভৃতি কূটনৈতিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন ও বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত দূত, তাঁহার নিকটেই প্রেরিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক-নির্ধারণও তাঁহার একটি কর্তব্য। তিনিই দেশের সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক এবং আপৎকালে এই সশস্ত্রবাহিনী পরিচালনা করিবার ক্ষমতা তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। তবে কংগ্রেস সভার উভয় পরিষদের অনুমোদন

ব্যতিরেকে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার নিজস্ব অধিকার না থাকিলেও রাষ্ট্রপতি পররাষ্ট্রনীতি এরূপভাবে পরিচালিত করিতে পারেন যাহাতে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। পররাষ্ট্রনীতি-পরিচালনক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্তু পররাষ্ট্রের সহিত কোন গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করিতে হইলে, সে চুক্তি সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের বিনা অনুমোদনে কোন চুক্তি কার্যকরী হয় না।

(২) আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা (Legislative Powers)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অবলম্বিত হওয়ার ফলে আইন-প্রণয়নক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নানাপ্রকারে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজার মত কংগ্রেস সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে বা অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন না বা কংগ্রেস সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন না। কিন্তু প্রয়োজনক্ষেত্রে কংগ্রেস সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার সদস্য হইতে পারেন না ও কংগ্রেস সভায় উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহার নাই। তবে কংগ্রেস সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে তিনি তাঁহার লিখিত বাণী (Message) কংগ্রেস সভায় প্রেরণ করিতে পারেন। এই বাণীর মধ্যে দেশের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব ও আইনের খসড়া গ্রথিত থাকিতে পারে। কংগ্রেস সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি-প্রেরিত বাণী দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। কোন বিল কংগ্রেস সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলেও রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়া আইনে পরিণত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে তাঁহার স্বাক্ষর প্রদান না করিয়া অন্ততঃ সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন কার্য স্থগিত রাখিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কোন বিল অনুমোদন না করিলে দশ দিনের মধ্যে উক্ত বিলটিকে কংগ্রেস সভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত

বিল যদি কংগ্রেস সভা দ্বিতীয় বার দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা অনুমোদন করে, তাহা হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীতও আইনে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতির বিল অনুমোদন না করিবার এই ক্ষমতা চূড়ান্ত না হইলেও সাময়িকভাবে আইন পাস করার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে ও বিলটি পুনর্বিচারের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভায় প্রেরিত হইতে পারে। অনেক সময় কংগ্রেস সভা কোন কোন আইনকে বিস্তারিতভাবে সন্নিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ করিয়া থাকে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া অনেক নূতন নিয়ম-কানুন প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাই হইল রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারীর ক্ষমতা।

দলীয় রাজনীতির প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা আর একটি উপায়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কংগ্রেস সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়াই তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি নিজে একটি আইন পরিকল্পনা ও সংকলন করিয়া তাঁহার স্বদলীয় কোন কংগ্রেস সদস্যকে সেই বিলটি কংগ্রেস সভায় পেশ করিতে অনুরোধ করিতে পারেন বা দলের নেতা হিসাবে কোন সদস্যকে সেই বিল পেশ করিতে বাধ্য করিতেও পারেন। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি সাংবাদিক বৈঠকের (Press Conference) মধ্য দিয়াও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কংগ্রেস সভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সপ্তাহে দুইবার সাংবাদিকগণের বৈঠক আহ্বান করেন ও এই সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আইন-প্রণয়ন বিষয়ক মতামত ব্যক্ত করিয়া দেশের জনমতকে আইন-প্রণয়ন বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলেন। জনমতের দাবীতে কংগ্রেস সভা রাষ্ট্রপতি-নির্ধারিত বিষয়সমূহে আইন প্রণয়ন করিতে অনেক সময় বাধ্য হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মত আইন-প্রণয়ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও আইন-প্রণয়ন কার্যে তাঁহার পরোক্ষ প্রভাব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা কোন অংশে কম বলা চলে না। রাষ্ট্রপতিকে শুধু শাসনবিভাগের প্রধান বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও তাঁহার যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা আছে। এইজন্য মুনরো রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি শুধু

রাষ্ট্রপতি নহেন, প্রধানমন্ত্রীও বটে (President and Prime Minister combined)।

(৩) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers)

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি মার্জনা করিতে পারেন, শাস্তির পরিমাণ হ্রাস করিতে পারেন বা শাস্তিপ্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার আদেশ দান করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে দণ্ডিত ব্যক্তিসম্পর্কে রাষ্ট্রপতি এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতির সহিত কেবিনেটের সম্পর্ক (President in relation to the Cabinet)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সভা প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার শাসনতান্ত্রিক আইনসম্মত কোন অস্তিত্ব নাই। শাসনতন্ত্র বহির্ভূত এই মন্ত্রণাসভা দশজন বিভাগীয় কর্মসচিব লইযা গঠিত। এই কর্মসচিবগণ একান্তভাবেই রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সহকারী। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং তিনিই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। সচিবগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয় না। আইনসভার সহিত তাঁহাদের একমাত্র সম্পর্ক হইল যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁহাদের নিয়োগ সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। বর্তমানে সিনেটের এই অনুমোদনও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন কর্তৃক চার জন কর্মসচিব নিযুক্ত হন। তখনও পর্যন্ত এই মন্ত্রণা-সভা কেবিনেট নামে আখ্যাত হয় নাই। কর্মসচিবগণ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিতেন এবং রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঁহাদের সহিত মত-বিনিময় করিতেন। এইরূপে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই মন্ত্রণা-সভা কেবিনেট নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণা-সভাকে কেবিনেট বলিয়া অযথা নামকরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কেবিনেট শাসনপদ্ধতি বলিলে সাধারণতঃ কেবিনেট সদস্যগণকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী শাসকগোষ্ঠী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মার্কিন কেবিনেট ব্যবস্থায় কেবিনেট সদস্যগণ আদৌ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন। মার্কিন কেবিনেট সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন। কেবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নহেন, তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নির্দেশ-চালিত অধস্তন কর্মচারী মাত্র। কেবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতিকে যে পরামর্শ দান করেন রাষ্ট্রপতি তাহা গ্রহণ না করিতেও পারেন। যদিও রাষ্ট্রপতি নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একবার বা দুইবার তাঁহার মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করেন, তথাপি এই মন্ত্রণা-সভার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। কারণ কোন বিষয়ে দশজন মন্ত্রী যদি সম্মতি দান করেন এবং রাষ্ট্রপতি যদি অসম্মতি প্রকাশ করেন তাহা হইলে দশজনের সম্মতি উপেক্ষিত হইয়া এক রাষ্ট্রপতির অসম্মতি বলবৎ হইবে। মন্ত্রিগণের কোন যৌথ দায়িত্ব নাই, সুতরাং রাষ্ট্রপতি বিভাগীয় কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ করেন। সমগ্র কেবিনেট সভার একযোগে ভোটদান করিবার কারণও সচরাচর ঘটে না। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগ, পদচ্যুতি, বেতন ও কার্য-পরিচালনায় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার মন্ত্রণা-সভার উপর আদৌ নির্ভর করিতে হয় না।

রাষ্ট্রপতির সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক (President in relation to the Congress)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অত্যধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতির (শাসনকর্তৃপক্ষ) কংগ্রেসের (আইনসভা) সহিত কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। রাষ্ট্রপতি আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার মন্ত্রণা-সভার (Cabinet) সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইন-প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবেও তাঁহার বা তাঁহার

কর্মসচিবগণকে পদত্যাগ করিতে হয় না। এইরূপে রাষ্ট্রপতি আইনসভার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

অনুরূপভাবে কংগ্রেস সভাও রাষ্ট্রপতির প্রভাবমুক্ত। রাষ্ট্রপতি আইন-সভা আহ্বান করিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন না বা নির্ধারিত কার্যকালের পূর্বে কংগ্রেস সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন না।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতই মনে হয় যে, রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ বিশেষ করিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি গৃহীত হইলেও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (Mutual checks and balances) নীতি দ্বারা শাসনব্যবস্থা সক্রিয় ও সাবলীল রাখা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত না রাখিতে পারিলেও কংগ্রেস সভার বা যে-কোন কক্ষের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং উভয়-কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে তাঁহার স্বীয় বিবেচনা অনুসারে কংগ্রেস সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস সভার প্রত্যেক অধিবেশনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী বহু তথ্য-সম্বলিত তাঁহার বাণী (Message) কংগ্রেস সভায় প্রেরণ করেন। এই বাণীর মধ্যে দেশের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব ও আইনের খসড়া গ্রথিত থাকে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কংগ্রেস সভা রাষ্ট্রপতি-প্রেরিত বাণী দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়।

তৃতীয়তঃ, কোন আইনের প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হইলেও রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ব্যতীত তাহা আইনে পরিণত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি প্রস্তাবটিতে তাঁহার সম্মতি প্রদান না করিয়া অন্ততঃ সাময়িকভাবে আইন-প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কোন বিল অনুমোদন না করিলে দশ দিনের মধ্যে উক্ত বিলটিকে কংগ্রেস সভায় ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত বিল যদি কংগ্রেস সভা দ্বিতীয়বার

দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট দ্বারা অনুমোদন করে, তাহা হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত আইনে পরিণত হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া দুষ্কর হয়।

চতুর্থতঃ, দলীয় সংগঠনের সাহায্যে রাষ্ট্রপতি আইন-প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি স্বয়ং কোন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া স্বদলীয় কোন সদস্যের সাহায্যে আইনসভায় পেশ করিয়া দলীয় সংখ্যাধিক্যের বলে তাঁহার বাঞ্ছিত প্রস্তাবকে আইনের মর্যাদা দিতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতি তাঁহার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকের মারফৎও আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি তাঁহার অপরিসীম প্রভাব সহজেই কংগ্রেস সভার নেতৃবর্গের উপর বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারেন। সুতরাং আইনসভার সদস্য হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ না করিলেও রাষ্ট্রপতি যে নানাভাবে আইনসভার উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন—ইহা অনস্বীকার্য।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতির শাসনক্ষমতা ও কংগ্রেস সভা কর্তৃক বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমুদয় নিয়োগই সিনেট সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে সিনেট সভার সম্মতি অপরিহার্য। যুদ্ধ ঘোষণা করা বা শান্তিস্থাপন করিতে হইলে রাষ্ট্রপতির কংগ্রেস সভার উভয় পরিষদের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি (Position and influence of the President)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতই তাঁহাকে একজন অসীম প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্রনায়ক বলিয়া মনে হয়। এক গ্রেট ব্রুটেনের

প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাঁহার ক্ষমতা ও পদমর্যাদার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অধিকতর স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী। সত্য বটে গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী সমগ্র দেশের অবিসংবাদী নেতা ও জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে কমন্স সভা তথা ভোটদাতৃগণের নিকট তাঁহার কার্যের জন্য দায়ী। যতদিন পর্যন্ত তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনলাভে সমর্থ থাকেন ততদিন পর্যন্তই তিনি জাতীয় নেতা হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে না পারিলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাঁহার কার্যকাল শেষ হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট চারি বৎসর কার্যকালের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি-অনুসৃত শাসননীতি ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে ও শাসনকার্য-পরিচালনায় দক্ষতার অভাব হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে অপসারিত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কেবিনেট সভা, আইনসভা ও ভোটদাতৃমণ্ডলী-নিরপেক্ষভাবে তাঁহার শাসনক্ষমতা অধিকতর স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে পারেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সভাপতি ও নেতা হইলেও অন্যান্য কেবিনেট সদস্যের সমপর্যায়ভুক্ত। কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার সহকর্মী, অধস্তন কর্মচারী নহেন। তিনি তাঁহাদের পরামর্শ একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অনেক বিষয়ে অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার অধস্তন কর্মচারী, সহকর্মী নহেন। তিনিই তাঁহাদের নিয়োগ করেন, আবার তিনিই তাঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে বরখাস্ত করিতে পারেন। কেবিনেট সদস্যগণ শুধু বিভাগীয় কর্মসচিব মাত্র, রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে কোন মতেই বাধ্য নহেন। আইনসভার সহিত সম্পর্কেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা বহু পরিমাণে আইনসভা-নিরপেক্ষ হইয়া শাসনকার্য পরিচালিত করিতে পারেন। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। অধিকন্তু রাষ্ট্রপতি বাণী

প্রেরণ করিয়া ও তাঁহার ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইনসভার কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। ভোটদাতৃমণ্ডলীরও রাষ্ট্রপতির উপর কোন ক্ষমতা নাই। ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইলেও তাঁহার কার্যের জন্য ভোটদাতৃগণের নিকট তাঁহার নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে তাঁহাকে দায়ী হইতে হয় না। ভোটদাতৃগণ তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারে না। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বা উৎকোচ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করা যায়, কিন্তু তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে নিম্নপরিষদ্ কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইবে এবং অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র তাঁহাকে একাধারে ইংলণ্ডের রাজার পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাজা নাই, কিন্তু রাষ্ট্রপতিই রাজার স্থান পূরণ করিয়াছেন।

গ্রেট বৃটেনের রাজা ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি—British King and the President of the U. S. A.

রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির স্থান কয়েকটি বিষয়ে তুলনীয় হইলেও অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি উভয়েই রাষ্ট্রের প্রধান এবং দেশে-বিদেশে বহু সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় উৎসব ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইঁহারা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাষ্ট্রের যে অবাস্তব অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়, সেই অবাস্তব অস্তিত্বের বাস্তব প্রতীক হইলেন ইংলণ্ডে রাজা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাজা নাই, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁহার নিজের দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে রাজার সম্মান পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা জনসাধারণের নিকট যেরূপ প্রিয়, মার্কিন রাষ্ট্রপতিও তদ্রূপ মার্কিন জনসাধারণের নিকট প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। এইজন্য বলা হয় যে, "The President is the nearest and dearest substitute for a royal ideal the American possesses." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিই রাজার স্থান পূরণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি—উভয়েই রাষ্ট্রের প্রধান হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব করেন, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্য ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা রাষ্ট্র-প্রধান হইলেও শাসন বিভাগের প্রধান নহেন। কেবিনেট সদস্যগণই রাজার নামে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এজন্য রাজার কোন দায়িত্ব নাই, মন্ত্রিগণই দায়ী। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন প্রকৃত শাসনকর্তা। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু এই মন্ত্রিগণ সব বিষয়েই রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ন বিষয়ে আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। তিনি অপরাধীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনও করিতে পারেন। তিনি যে চার বৎসর কাল রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহার মধ্যে তিনি কাহারও নিকট দায়ী নহেন বা কাহারও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য নহেন। তিনি হইলেন প্রকৃত শাসক, আর রাজা হইলেন নামমাত্র শাসক। এইজন্য বলা হয়: "The English King reigns but does not govern, but the American President governs but does not reign."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী (The American President and the British Prime Minister)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়েই দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্ণধার ও এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়েই অসীম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়:

১। প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দুইটি নির্বাচনের ফলের উপর নির্ভর করে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভার সদস্য হিসাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হইলে রাজা কর্তৃক তিনি প্রধানমন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হন।

সুতরাং কার্যতঃ উভয়েই পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন ও উভয়ের নিয়োগ দুইটি নির্বাচনের উপর নির্ভর করে, যদিও নির্বাচনপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে পরিচালিত হয়।

২। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজার মত কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান না থাকায় রাষ্ট্রপতি আইনতঃ ও কার্যতঃ শাসনক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। শুধু প্রকৃত শাসনক্ষমতা পরিচালনা করা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারসমূহেও তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।। কিন্তু গ্রেট ব্রটেনের প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগকারী হইলেও আইনতঃ রাজাই হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান কর্মসচিব। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান-সমূহে রাজাই প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

৩। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির পদ শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। শাসন-তন্ত্রপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি অন্যনিরপেক্ষভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। অপরপক্ষে, ব্রটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা প্রধানতঃ প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়াই শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

৪। চতুর্থতঃ, আইনসভার সহিত সম্পর্কের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও উভয় পদের পার্থক্য অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। রাষ্ট্রপতি অনেক পরিমাণে আইনসভার প্রভাবমুক্ত এবং আইনসভাও অনুরূপভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না ও আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁহার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। কি সাধারণ আইন-প্রণয়নে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভাকে তাঁহার স্বমতে আনিতে বাধ্য করিতে পারেন না। অপরপক্ষে কংগ্রেস সভা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ, চুক্তি-সম্পাদন প্রভৃতি কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেও রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে না। গ্রেট ব্রটেনের প্রধানমন্ত্রী হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং দলের নেতা হিসাবে তিনি পার্লামেন্ট সভাকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ্ সহ প্রধানমন্ত্রী যে-নীতি অবলম্বন করেন, সাধারণতঃ কমন্স সভা তাহা অনুমোদন করে। কমন্স সভা মন্ত্রিপরিষদ্ কর্তৃক অনুসৃত নীতি সমর্থন না করিলে প্রধানমন্ত্রী

কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া কমন্স সভাকে স্বমতে আনিতে পারেন।

৫। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত ও এই কার্যকালের মধ্যে এক বিশেষ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহাকে কোন প্রকারেই পদচ্যুত করা যায় না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বৎসরের জন্য কমন্স সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু পার্লামেন্ট সভার সহিত মতবিরোধ ঘটিলে তাঁহার পদত্যাগ করিবার কারণ ঘটিতে পারে। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদা একদিকে যেরূপ পার্লামেন্ট সভার সহিত যথাসম্ভব মতৈক্য বজায় রাখিতে হয়, অন্যদিকে তদ্রূপ জনমতের পরিবর্তনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তাঁহাকে আইনসভা বা জনমতের উপর এতটা নির্ভর করিয়া চলিতে হয় না।

৬। ষষ্ঠতঃ, কেবিনেটের সহিত সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি তাঁহার দশজন কর্মসচিবকে সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে নিয়োগ করেন এবং প্রথাগত বিধানানুযায়ী ইঁহাদিগকে লইয়াই কেবিনেট গঠিত হয়। কেবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী হিসাবে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহাদের কার্যের জন্য তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে বরখাস্ত করিতে পারেন। গ্রেট বৃটেনের কেবিনেট সভা প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। কেবিনেট সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী, অধস্তন কর্মচারীমাত্র নহেন। প্রধানমন্ত্রী ইঁহাদিগকে মনোনয়ন করেন ও রাজা নিয়োগ করেন। বৃটিশ কেবিনেট যৌথভাবে পার্লামেন্ট সভার নিকট দায়ী।

উপ-রাষ্ট্রপতি (The Vice-President)

মার্কিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে হইলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, উপ-

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্যও অনুরূপ যোগ্যতা অপরিহার্য। আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে যে-প্রার্থী রাষ্ট্রপতির নিম্নে দ্বিতীয় অধিক সংখ্যক ভোট পাইতেন তিনিই উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে শাসনতন্ত্রের দ্বাদশ সংশোধনের দ্বারা উপ-রাষ্ট্রপতির স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুইটি বিশেষ নিয়ম আছে। প্রথমটি হইল যে, রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি একই ভৌগোলিক অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি একই রাজনৈতিক দলের সম-মতাবলম্বী না হইয়া নরম ও চরমপন্থী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শেষোক্ত এই নীতিটি কার্যক্ষেত্রে সর্বদা প্রযুক্ত হয় না।

রাষ্ট্রপতির সাময়িক অনুপস্থিতিকালে অথবা তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতি, অপসারণ অথবা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করাই হইল উপ রাষ্ট্রপতির প্রধান কার্য। সম্ভবতঃ ইহা বিবেচনা করিয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ সিনেট সভার সভাপতিত্ব করিবার ভার উপ-রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করেন। সিনেট সভার পরিচালনা-কার্যে উপ-রাষ্ট্রপতির স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র নাই বলিলেও চলে। বর্তমান যুগে উপ-রাষ্ট্রপতি-পদের গুরুত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ, কোন কোন রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতিকে আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে ও বৈদেশিক ব্যাপারের সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট উপ-রাষ্ট্রপতি ওয়ালেসের উপর অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার উপ-রাষ্ট্রপতি নিক্‌সনকে মধ্য-প্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করিবার নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উপ-রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, প্রয়োজনক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইলে যাহাতে তিনি রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।

মার্কিন কেবিনেট (The U S A Cabinet)

শাসনপরিচালনা-কার্যে সাহায্য করিবার জন্য দশজন কর্মসচিব নিযুক্ত

করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। এই দশজন বিভাগীয় কর্মসচিবকে লইয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণাসভা বা কেবিনেট গঠিত। উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই কেবিনেট সভা স্বীকৃত হয় নাই। বৃটিশ কেবিনেটের মতই যুক্তরাষ্ট্রীয় কেবিনেটও শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত একটা প্রথাগত সংস্থা। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি চারি বৎসর কালের জন্য ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং তিনি ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু বৃটিশ কেবিনেট সাধারণতঃ একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সম-মতাবলম্বী সদস্যদিগকে লইয়া গঠিত হয়। গ্রেট বৃটেনে কেবিনেট সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন ও এজন্য কিছু পরিমাণে তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইলেও প্রধানমন্ত্রীর অধস্তন কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হন না। তাঁহারা সকলেই আইনসভার সদস্য ও আইন-সভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা অনেক কম বলিয়া মনে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ বিভাগীয় কার্যনির্বাহক দপ্তরগুলির কর্মসচিবমাত্র, বৃটিশ কেবিনেটের সদস্যগণের মত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নহেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারেই তাঁহাদিগকে বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করিতে হয়। বৃটিশ কেবিনেটের সদস্যগণের মত বিভাগীয় কার্য-পরিচালনায় তাঁহাদের নিজস্ব কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই। তাঁহারা রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী মাত্র ও রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন ও আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং আইনসভার নিকট তাঁহাদের ব্যক্তিগত বা যৌথ কোন দায়িত্ব নাই। তাঁহারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী এবং এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। সুতরাং কেবিনেট শাসনব্যবস্থা বলিতে সাধারণতঃ যে জাতীয় শাসনব্যবস্থা বুঝায়, যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সভা তাহার পরিচায়ক নহে। কার্যতঃ এই সভা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অধস্তন কার্যনির্বাহক সংস্থামাত্র।

বৃটিশ কেবিনেট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট (British and the U S. A Cabinet Systems)

বৃটিশ কেবিনেট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেটের মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে অধিকতর মূলগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

সাদৃশ্য

১। উভয় দেশের কেবিনেট সভাই প্রথাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা ইহারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

২। বৃটেনের কেবিনেট সাধারণতঃ একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের—সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের—সদস্য লইয়া গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেটও রাষ্ট্রপতির সমর্থক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয়।

৩। বৃটেনে সরকারের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির মন্ত্রিগণকে লইয়া কেবিনেট গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দপ্তরগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিবগণকে লইয়া কেবিনেট গঠিত হয়।

৪। শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বৃটেনের রাজা প্রধানমন্ত্রিসহ অন্যান্য মন্ত্রিগণকে কেবিনেট সদস্য নিযুক্ত করেন, মার্কিন দেশেও রাষ্ট্রপতি তাঁহার কর্মসচিবগণকে নিয়োগ করেন।

৫। বৃটিশ কেবিনেট ব্যবস্থায় কেবিনেট সদস্যগণ সমপর্যায়ভুক্ত হইলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

উপরি-উক্ত সাদৃশ্যগুলি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সভাকে প্রকৃত কেবিনেট শাসনব্যবস্থা বলা যায় না। তাহার কারণ হইল যে, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় কেবিনেট শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব।

বৈসাদৃশ্য

১। বৃটিশ কেবিনেটের সদস্যগণকে পার্লামেণ্ট সভার সদস্য হইতেই হইবে। তাঁহারা পার্লামেণ্টের একটি কক্ষের সদস্যহিসাবে আইন-প্রণয়ন-কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির পূর্ণপ্রয়োগের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ কংগ্রেস সভার সদস্য নহেন এবং আইন-প্রণয়ন-কার্যে তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।

২। বৃটেনে কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার, বিশেষ করিয়া কমন্স সভার নিকট দায়ী এবং কমন্স সভার অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। আইনসভার সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই এবং আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাদের অপসারিত করিতে পারেন না।

৩। বৃটিশ কেবিনেট ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ঐক্যবদ্ধভাব এবং এই ঐক্য ও সংহতির উপর কেবিনেট ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সদস্যবৃন্দ যে শুধু এক রাজনৈতিক মতাবলম্বী হইবেন তাহা নহে, পার্লামেন্ট সভা সম্পর্কে সর্ববিষয়ে তাঁহাদের একমত হইতে হইবে। আইনসভা কর্তৃক একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগ করিতে হয়। বৃটেনে মন্ত্রিগণের যৌথ দায়িত্ব বর্তমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণের এরূপ কোন যৌথ দায়িত্ব নাই। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। রাষ্ট্রপতি যে-কোন সদস্যকে এককভাবে পদচ্যুত করিতে পারেন।

৪। বৃটিশ কেবিনেটের সিদ্ধান্তগুলি সাধারণতঃ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করিলেও তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

৫। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হইলেন সমপদস্থ সহকর্মিবর্গের নেতা এবং তাঁহার এই নেতৃত্বের জন্য সহকর্মিগণ তাঁহার আনুগত্য ও অগ্রাধিকার স্বীকার করেন।

অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন কেবিনেট সভার সর্বাধিনায়ক। কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার অধস্তন কর্মচারীমাত্র, সহকর্মী নহেন।

৬। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ কেবিনেট সভা দেশের প্রকৃত-শাসনক্ষমতার অধিকারী একটি সংস্থা, অপর

পক্ষে মার্কিন কেবিনেট হইল রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণাসভা মাত্র। রাষ্ট্রপতিই হইলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

মার্কিন কেবিনেটের বিভিন্ন বিভাগ (Cabinet Departments in the U S. A)

মার্কিন কেবিনেট বিগত ১৭৪ বৎসর ধরিয়া গঠিত হইয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ১৭৮৯ সালে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর দপ্তর ও অর্থমন্ত্রীর দপ্তর লইয়া রাষ্ট্রপতির কেবিনেটের সত্রপাত হয়। তারপর দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমে ক্রমে আরও আটটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়া বর্তমানে কেবিনেটের দপ্তর সংখ্যা দশ হইয়াছে। বিভাগগুলি হইল ঃ

১। রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী (The Secretary of State)

রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী হইলেন পররাষ্ট্র বিভাগের মুখ্যসচিব ও রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। অনেক রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীকে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করিয়া থাকেন। এই কারণে মার্কিন কেবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে রাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত সন্ধি বা চুক্তিপত্র এই দপ্তরেই রক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সীল-মোহরও তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকে। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে অন্যান্য সদস্যগণ অপেক্ষা তিনিই অগ্রাধিকার পাইয়া থাকেন এবং কেবিনেট সভায় রাষ্ট্রপতির দক্ষিণে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট থাকে। এই সকল কারণে অন্যান্য কেবিনেট সদস্যগণের সম-পর্যায়ভুক্ত হইলেও রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর মর্যাদা ও প্রাধান্য বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রত্যেক সদস্যই বাৎসরিক ১৫,০০০ ডলার বেতন পাইয়া থাকেন।

২। অর্থমন্ত্রী (The Secretary of the Treasury)

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থবিভাগের কর্তা হইলেন অর্থমন্ত্রী এবং ইঁহার কাজ অনেকটা বৃটিশ চ্যান্সেলর অব দি এক্স-চেকারের অনুরূপ। অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের কাজ হইল—যুক্তরাষ্ট্রীয় কর আদায়, জাতীয় কোষাগার হইতে প্রয়োজনীয় অর্থদান, মুদ্রা প্রস্তুত-করণ, কর ফাঁকি ও জালমুদ্রা সম্বন্ধে তদন্ত করা ইত্যাদি।

৩। **আইনমন্ত্রী (The Attorney-General)**

ইনি বিচার বিভাগের কর্তা এবং রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস ও অন্যান্য সরকারী বিভাগগুলির আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের পরামর্শদাতা। অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া অপরাধীর বিচারকার্য ও শাস্তির ব্যবস্থা করা এই বিভাগের কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

৪। **ডাক ও তার বিভাগীয় মন্ত্রী (Minister of the Post Office Department)**

এই বিভাগ কর্তৃক ডাক, তার ও বেতার পরিচালিত হয়। কার্যতঃ এই বিভাগটি হইল সরকারী একটি বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—ইহার বাৎসরিক আর্থিক আদান-প্রদানের পরিমাণ হইল ৭৫০ মিলিয়ন ডলার এবং প্রায় ৩ লক্ষ কর্মী এই বিভাগের কার্যে নিযুক্ত আছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (Minister of the Department of the Interior)

এই বিভাগ আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের ভারপ্রাপ্ত। সরকারী জমি ক্রয়-বিক্রয়, জরীপ, রেড ইণ্ডিয়ানদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, খনিজীবীদের নিরাপত্তা, এলাস্কার অধিবাসীদের শিক্ষা এবং ভার্জিন দ্বীপ প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকৃত স্থানগুলির শাসনব্যবস্থা এই বিভাগ পরিচালনা করে।

৬। **কৃষি মন্ত্রী (Minister of Agriculture)**

কৃষির উন্নতির জন্য কৃষিসহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন, বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং খাদ্য ও ঔষধ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ করা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কায।

৭। **বাণিজ্য মন্ত্রী (Minister of Commerce)**

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ব্যতীতও এই বিভাগ লোকগণনা, আলোক-স্তম্ভ, রাসায়নিক গবেষণাগার, ওজন, পেটেন্ট প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।

৮। **শ্রমমন্ত্রী (Minister of Labour)**

যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্রমজীবীদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করাই হইল এই বিভাগের কার্য। এই উদ্দেশ্যে শ্রমজীবী সম্পর্কে বিবিধ তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও

বিশেষ করিয়া নারী শ্রমজীবিগণের বিশেষ উন্নতিসাধন করা এই বিভাগের কর্তব্য।

৯। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (The Minister of Defence)

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এই বিভাগের কার্য।

১০। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ মন্ত্রী (Minister of Health, Education and Welfare)

জাতির স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামগ্রিক কল্যাণসাধন এই বিভাগের কর্তব্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (Federal Legislature—the Congress)

দুইটি পরিষদ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা বা কংগ্রেস গঠিত। উচ্চ পরিষদ সিনেট (Senate) নামে অভিহিত হয় ও নিম্ন পরিষদকে প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) বলা হয়। মূল রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি লইয়া সিনেট সভা গঠিত হয়, আর সমগ্র জাতির প্রতিনিধি লইয়া প্রতিনিধি পরিষদ্ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হইল, জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন-পরিষদের দুইটি কক্ষের সংগঠন পদ্ধতির মধ্য দিয়া এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী নীতির সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বৃটিশ পার্লামেন্টের মত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। বস্তুতঃ, কংগ্রেস সভা এক **অ-সার্বভৌম আইনসভা (Non-sovereign Law making body)** বলিয়া পরিচিত। বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা স্বৈর, কোন উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে উহা উদ্ভূত নহে। বৃটিশ পার্লামেন্ট সভা সর্ববিধ আইন প্রণয়ন করিতে পারে, এবং সর্ববিধ আইনের সংশোধন ও পরিবর্জন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল পার্লামেন্ট সভা। পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক রচিত কোন আইনই কোন বিচারালয় বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে না। এক কথায় পার্লামেন্ট সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত। কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কোন স্বৈর ক্ষমতা নাই। ইহার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত ও এই শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ইহার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা প্রযোগ করা বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস সভা-প্রণীত প্রত্যেকটি আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন-সাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিতে না পারিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত আইন পুনরায় কংগ্রেস সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমোদনে আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করা সহজসাধ্য নয়। তৃতীয়তঃ, বৃটিশ পার্লামেন্টের মত কংগ্রেস সভা শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার অধিকারী নহে। শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। চতুর্থতঃ, কংগ্রেস সভা যদি শাসনতন্ত্রবহির্ভূত কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রিম কোর্ট উক্ত আইনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র হইল সর্বক্ষমতার আধার, আর সুপ্রিম কোর্ট হইল এই ক্ষমতার রক্ষক। সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখিতে সহায়তা করে। ফলে আইনসভার ক্ষমতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

সিনেট সভার সংগঠন ও কার্যকলাপ (Composition and Functions of the Senate)

প্রত্যেকটি মূল রাষ্ট্র হইতে সমান প্রতিনিধিত্ব-নীতির ভিত্তিতে দুইজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া বর্তমানে মোট একশত সদস্য দ্বারা সিনেট সভা গঠিত। বর্তমানে সিনেট সভার সদস্যগণ মূল রাষ্ট্রগুলির জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সিনেটের সদস্যগণের অন্ততঃ তিরিশ বৎসর বয়স্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততপক্ষে নয় বৎসর কাল স্থায়িভাবে বসবাসকারী হওয়া চাই। সদস্যগণ ছয় বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন ও এই সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে যিনি উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

হইয়া থাকেন, তিনিই সিনেট সভার সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। প্রত্যেক নূতন অধিবেশন বসিবার পূর্বে সিনেট সভা ইহার সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া কতকগুলি বিশেষ কাযকরী সংস্থা (Committee) নিয়োগ করে ; যথা, অর্থবিষয়ক সংস্থা, পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত সংস্থা ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমেই প্রধানতঃ সিনেট সভা ইহার কার্য পরিচালনা করে।

(ক) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative Powers)

অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন ব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সিনেট সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা প্রতিনিধি-পরিষদের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অনেক সময় সিনেট সভা কর্তৃক আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রতিনিধি-পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত বিল সিনেটের অনুমোদন ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইতে পারে না। সিনেট সভার কার্যকাল দীর্ঘতর বলিয়া অনেকক্ষেত্রে প্রতিনিধি-পরিষদ আইন-প্রণয়নের দায়িত্ব সিনেট সভার হস্তে ন্যস্ত করে। সিনেট অর্থ-সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে না। আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রতিনিধি-পরিষদেই প্রথম উত্থাপিত হয়। কিন্তু যখন এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সিনেট সভায় প্রেরিত হয়, তখন সিনেট সভা ব্যাপকভাবে এই প্রস্তাবগুলির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। বস্তুতঃ, সিনেট সভা এই আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সংশোধন করিবার এইরূপ সুদূরপ্রসারী ক্ষমতার অধিকারী যে, এই প্রস্তাব-গুলির নাম ব্যতীত ধারা ও উপধারাগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করিতে পারে। সিনেট কর্তৃক সংশোধিত প্রস্তাবগুলি যখন ইহাদের প্রস্তাবকগণের নিকট প্রেরিত হয় তখন এই বিলের প্রস্তাবকগণের পক্ষে বিলটিকে তাঁহাদের উত্থাপিত বিল বলিয়া স্থির করা দুষ্কর হয়।

(খ) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers)

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যাহাতে যথেচ্ছভাবে শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে না পারেন, সেজন্য সিনেট সভাকে রাষ্ট্রপতির কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার কয়েকটি ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ,

কেবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইন অনুসারে প্রত্যেকটি নিয়োগের জন্য সিনেট সভার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ইহার অনুমোদন লাভ করিতে হয়। সিনেটের অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সাময়িকভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু এই নিয়োগগুলি সিনেটের পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়া চাই। নতুবা পরবর্তী অধিবেশন সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়।

বর্তমানে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত নিয়োগ করেন, সেই নিয়োগগুলির জন্য কার্যতঃ সিনেট সভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। এই নিয়োগ সম্পর্কে একটি নূতন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যে মূলরাষ্ট্রে নবনিযুক্ত কর্মচারীকে বহাল করেন, সেই মূলরাষ্ট্রের নির্বাচিত সিনেট সদস্যগণ যদি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নূতন নিয়োগ অনুমোদন করেন তাহা হইলে সাধারণতঃ সিনেট সভা ঐ নিয়োগ অনুমোদন করিয়া থাকে। এই প্রথাকেই সিনেট সভার শিষ্টাচার (Senatorial courtesy) বলা হয়।

আর একটি ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংযত রাখিবার উদ্দেশ্যে সিনেট সভার উপর শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি অপর রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারেন, কিন্তু সিনেট সভার পরামর্শ ও অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকরী হয় না। রাষ্ট্রপতি দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি শুধুমাত্র সিনেট সভার সাধারণ সংখ্যাধিক্যের অনুমোদনে গৃহীত হইতে পারে না; এজন্য সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন অপরিহার্য। রাষ্ট্রপতি উড্‌রো উইলসন্ সিনেট সভার সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সিনেট সভা এই চুক্তি অনুমোদন না করার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে এ চুক্তি কার্যকরী হয় নাই ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল না। রাষ্ট্রপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিয়া সিনেট সভা যে রাষ্ট্রপতি দ্বারা সর্বক্ষেত্রে প্রভাবিত হয় না তাহা প্রমাণ করিল। ইহাতে

পরবর্তী কালের রাষ্ট্রপতিগণ সিনেট সভার পরামর্শ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন।

(গ) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers)

সিনেটের উপর কিছু বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতাও অর্পিত হইয়াছে। রাষ্ট্রদ্রোহ, উৎকোচ-গ্রহণ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দের বিচারকার্য (Impeachment) সিনেট কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রতিনিধি-পরিষদ্ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবে এবং অভিযোগের বিচার করিতে পারে একমাত্র সিনেট সভা। সিনেট সভা যখন এইরূপ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বিচারকার্য পরিচালনা করে, তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে হইলে সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন অপরিহার্য।

(ঘ) অন্যান্য ক্ষমতা (Miscellaneous Functions)

এতদ্ব্যতীত সিনেট সভা আরও কতিপয় প্রথাভিত্তিক কার্য সম্পাদন করে। সরকারী কার্য পরিচালনায় কোন দুর্নীতি বা অপবাদের ক্ষেত্রে সিনেট সভা বিশেষ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করিয়া উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারে। এইজন্য অনুসন্ধান কমিটির সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ ও দলিলপত্রাদি তলব করিবার ক্ষমতা আছে। সিনেট সভা প্রতিনিধি-পরিষদের সহিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে এবং নবগঠিত কোন রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাজ্যভুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারে; উপ-রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থীই নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য ভোটপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সিনেট সভা সর্বাধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত দুইজন প্রার্থীর মধ্য হইতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিয়া থাকে।

সিনেট সভার গুরুত্বের কারণ (Causes of the Importance of the Senate)

লর্ড ব্রাইসের মতে অন্যান্য দেশের উচ্চ পরিষদের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। ফরাসী দেশের নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ইহার উচ্চ পরিষদের (Senate)

আইন প্রণয়ন বিষয়ে বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। সেখানে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে হইলে উচ্চ পরিষদের সম্মতির প্রয়োজন হয় কিন্তু কি সাধারণ আইন, কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন ইহার সম্মতি ব্যতিরেকেই পাস করা যায়। ফরাসী দেশের বর্তমান উচ্চ পরিষদ পূর্বতন উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ সিনেট সভার ক্ষমতা বা পদমর্যাদার অধিকারী হইতে পারে নাই। নিম্ন পরিষদই কার্যতঃ সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী। ব্রিটেনে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ঐ আইন সংশোধিত হইয়া লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। এই পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই আইন পাস করা সম্ভব হইয়াছে। অর্থ-সংক্রান্ত আইনসম্পর্কে লর্ড সভার প্রস্তাব উত্থাপন করিবার বা সংশোধন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। এক বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ছাড়া লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত বা শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতার অবসান ঘটিয়াছে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী। সুইজারল্যাণ্ডের উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ নিম্নপরিষদই প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা সম্পর্কে বলা যায় যে, এই সভা নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ দেখা যায় যে সিনেট সভা অধিকতর সক্রিয়ভাবে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। নিম্ন পরিষদের কার্যকাল মাত্র দুই বৎসরে সীমাবদ্ধ ; অপরপক্ষে, সিনেটের কার্যকাল ছয় বৎসর। স্বল্পকালস্থায়ী প্রতিনিধি-পরিষদ এইজন্য কোন দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব সাধারণতঃ গ্রহণ করে না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি সিনেটের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অর্থ-সংক্রান্ত কোন বিল সিনেট সভায় উত্থাপিত না হইতে পারিলেও সিনেট সভা ব্যাপকভাবে এই বিলগুলির সংশোধন করিতে পারে। সিনেট সভা তাহার এই সংশোধন-ক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করে যে, অর্থ-সংক্রান্ত বিলের এক নাম ছাড়া ইহার বিস্তারিত ধারা-উপধারাগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর অন্য কোন

দেশের উচ্চ পরিষদের এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ, সিনেট সভা রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যেকটি নিয়োগ সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত প্রত্যেকটি চুক্তির বৈধতা সিনেট সভার পরামর্শ ও অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য পদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে একমাত্র সিনেট সভাই এই অভিযোগের বিচার করিবার অধিকারী।

সিনেট সভার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার অনুমোদন ব্যতীত নিম্ন পরিষদ কোন বিল আইনে পরিণত করিতে পারে না। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন না করিতে পারিলেও ইহার অপরিসীম সংশোধন-ক্ষমতা আছে। একদিকে রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া সিনেট সভা স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবে বাধা দেয়, অপরদিকে নিম্ন পরিষদের অত্যধিক গণতান্ত্রিক হঠকারিতার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে।

সিনেট সভার এই অধিকতর ক্ষমতার প্রথম কারণ হইল যে, সিনেট সভা অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক—মাত্র একশত জন—সদস্য লইয়া গঠিত, সুতরাং স্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করিবার পক্ষে আদর্শ আইন-পরিষদ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার কার্যকালও দীর্ঘতর। ছয় বৎসরকাল স্থায়ী বলিয়া সিনেট সভা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করিতে পারে ও নিম্ন পরিষদ স্বল্পস্থায়ী বলিয়া সিনেটের হস্তেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন কার্যের ভার অর্পণ করে। তৃতীয়তঃ, সিনেট সভার সদস্যগণ অধিক বয়স্ক ও অপেক্ষাকৃত অধিকতর অভিজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের সদস্যগণ সাধারণতঃ নিম্ন পরিষদে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং এই সমস্ত কারণে দেশে ও বিদেশে সিনেটের সদস্যগণকে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী বলিয়া মনে করা হয়। চতুর্থতঃ, সিনেট সভার সদস্যগণ বর্তমানে আর মূলরাষ্ট্রগুলির আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র নহেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে মূলরাষ্ট্রের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা অধিকতর নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন।

সিনেট সভার অধিকতর গুরুত্বের আর একটি কারণ হইল যে, সিনেট সভার সদস্যগণ দল-নিরপেক্ষভাবে পরিষদের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা অবহিত থাকেন। পরিষদের ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষা করিবার একান্ত প্রচেষ্টা তাঁহাদিগকে দলীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একতাবদ্ধ করিয়াছে। যখনই কোন রাষ্ট্রপতি সিনেট সভার গৌরবময় ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করিবার ক্ষীণতম প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তখনই সিনেট সভা একযোগে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। সিনেটের এই ঐক্য ও সংহতি ইহার শক্তির একটি প্রধান উৎস। সিনেট সভার উপর শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে বলা যায় যে, সিনেট সভা সে গুরুদায়িত্ব এ যাবৎকাল দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সিনেট ও লর্ড সভা—The Senate and the House of Lords

গ্রেট বৃটেনের লর্ড সভা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আইনসভা অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে এবং এই প্রাচীনত্বের জন্য এই সভার যে একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য আছে তাহা অন্য কোন আইনসভার নাই। বৃটিশ পার্লামেণ্ট লর্ড সভা ও কমন্স সভা লইয়া গঠিত এবং লর্ড সভা হইল উচ্চ কক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসও সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ এই দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। লর্ড সভার মতই সিনেট হইল মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষ।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ও বৃটেনের লর্ড সভা—উচ্চ কক্ষ হিসাবে এই উভয়ের তুলনামূলক বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। গঠনপ্রকৃতি, কর্মপদ্ধতি এবং ক্ষমতার পরিধি—যে-কোন দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, এই উভয় কক্ষের পার্থক্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়া দেখা যায় যে, লর্ড সভা কাহারও প্রতিনিধি নহে। এই সভার ৯২৬ জন সদস্যের মধ্যে কতিপয় ধর্মযাজক লর্ড ও আইনজ্ঞ লর্ড ব্যতীত অধিকাংশ সদস্যই উত্তরাধিকারসূত্রে এই সভায় স্থান গ্রহণ করেন। ইঁহারা কাহারও নিকট দায়ী নহেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এরূপ স্ব-নির্বাচিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত সদস্য-সমন্বিত আইনসভা অচিন্তনীয়

ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সভার কর্ম-পরিচালনার একটি নিয়ম হইল যে, ৯২৬ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র তিনজন উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য চলিতে পারে এবং কোন বিল অনুমোদন করিতে হইলে ৩০ জন সদস্যের উপস্থিতি যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। এই নিয়মটি হইতে উচ্চ কক্ষ হিসাবে লর্ড সভার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সহজে অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত সদস্যগণ আজীবন সদস্য হিসাবে এই সভায় স্থান গ্রহণ করেন। সুতরাং জনমতের প্রভাব ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভাকে লর্ড সভার ঠিক বিপরীত বলা যাইতে পারে। আয়তন ও লোকসংখ্যা-নির্বিচারে প্রতি রাজ্য হইতে দুইজন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য লইয়া সিনেট সভা গঠিত। বর্তমানে সদস্যসংখ্যা হইল ১০০। সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং বলা যায় যে, লর্ড সভার গঠন-প্রকৃতি গণতান্ত্রিক নীতি-বিরোধী, আর সিনেট সভার গঠনপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র-সম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কর্মপদ্ধতির দিক দিয়া বিচার করিলেও সিনেটের যে সজীবতা ও কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়, লর্ড সভায় তাহা কখনও দৃষ্ট হয় না। কি সাধারণ আইন কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন—উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে সিনেট সভা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে যাহা লর্ড সভায় আদৌ দেখা যায় না।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই উভয় কক্ষের পার্থক্য আরও স্পষ্টতর হয়। লর্ড সভাকে সাধারণতঃ সংশোধনী সভা (Revising body) বলা হয়। আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা থাকিলেও আইন-প্রণয়নে বর্তমানে ইহার আর কোন অনুপ্রেরণা নাই। এক বৎসরের অধিক কাল এই সভা নিম্ন কক্ষের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতায় বাধা দিতে পারে না। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহার কোন ক্ষমতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—মাত্র তিনমাস কাল অর্থ-সংক্রান্ত আইন পাস করিতে বাধা দিতে পারে। সুতরাং হয় নিম্ন কক্ষের প্রস্তাবে সম্মতিদান করা নতুবা সাময়িক কালের জন্য বাধা দেওয়াই হইল বর্তমানে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক প্রধান কার্য। সুতরাং আইন-

সভার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ১৯১১ সালে লর্ড সভার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত শাসনকর্তৃপক্ষ (কেবিনেট) ইহার নিকট দায়ী নহে। বর্তমানে লর্ড সভার কোন সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হইতে পারেন না। তবে ২।৪ জন মন্ত্রী লর্ড সভা হইতে নিযুক্ত হন। ইহার মধ্যে লর্ড সভার সভাপতি লর্ড চ্যান্সেলর বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ক্ষমতা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, উচ্চ কক্ষ হিসাবে এই সভা সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ব্যাপক পরিবর্তন সাধনে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সিনেট সভা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উচ্চ কক্ষ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধি চুক্তিতে সম্মতিদান না করিয়া সিনেট ইহার স্বাধীন সত্তার পরিচয় দিয়াছে। সিনেট সম্পর্কে বলা যায় যে, এই সভা একদিকে রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবে বাধা দেয়, অপর-দিকে নিম্ন পরিষদের অত্যধিক গণতান্ত্রিক হঠকারিতার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার দিক দিয়াও উভয় উচ্চ কক্ষের তুলনা করা যাইতে পারে। গোষ্ঠিভুক্ত লর্ডগণের বিচার (যদিও বর্তমানে পরিত্যক্ত), পদস্থ রাজপুরুষগণের বিচার করা ব্যতীতও লর্ড সভা বৃটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালতের কার্য সম্পাদন করে। তবে আইনের বাধা না থাকিলেও মাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই এই সর্বোচ্চ আপীল আদালত গঠন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। তবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনেটের অনুমোদন অপরিহার্য। ইহা ব্যতীত নিম্নকক্ষের অভিযোগে সিনেট সভা বৃটেনের লর্ড সভার অনুরূপ-ভাবে পদস্থ কর্মচারিগণের বিচার করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করেন।

লর্ড সভা ও সিনেট সভার মধ্যে বর্তমানে এই ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে, মার্কিন শাসনতন্ত্রের আদি রচয়িতাগণ লর্ড সভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সিনেট সভাকে রূপায়িত করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে পার্লামেণ্ট আইন পাস হওয়ার পূর্ববর্তী কালে উচ্চ কক্ষ হিসাবে লর্ড

সভা শুধু প্রাচীনতম ছিল না, ক্ষমতায় ও ঐতিহ্যে লর্ড সভা ছিল পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয় উচ্চ কক্ষ। লর্ড সভা সাধারণ আইন-প্রণয়নে অগ্রণী ছিল, অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পরিবর্তন করিতে পারিত এবং লর্ড সভা হইতেই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইতেন। সুতরাং সেই সময় লর্ড সভাই ছিল বৃটিশ শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। তাই লর্ড সভার আদর্শে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভাকে শক্তিশালী করিয়া গঠন করা হইয়াছিল। সময়ের পরিবর্তনে লর্ড সভা আজ ক্ষমতাচ্যুত, আর সিনেট সভা স্বমহিমায় ক্ষমতাসীন।

প্রতিনিধি-পরিষদ

(The House of Representatives)

প্রতিনিধি-পরিষদের সংগঠন (Composition of the House of Representatives)

চারশত সাঁইত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রতিনিধি-পরিষদ হইল যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষ। প্রতিনিধিগণ অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হইবেন ও তাঁহাদের অন্ততঃপক্ষে সাত বৎসরকাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী হইতে হইবে এবং যে জিলা হইতে তাঁহারা নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন, সেই জিলার অধিবাসী হইতে হইবে। মূলরাষ্ট্রগুলির এলাকা নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দুই বৎসরের জন্য প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বর্তমানে প্রত্যেক ৩০২,৬৮৯ জনসংখ্যা প্রতি একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। শাসনতান্ত্রিক বিধানানুসারে প্রত্যেক রাজ্য হইতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতেই হইবে। প্রতিনিধি-পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তিনি সভার কার্য পরিচালনা করেন। বৃটেনের কমন্স সভার স্পীকারের মত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার দল-নিরপেক্ষ নহেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থিরূপে স্পীকার নিযুক্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং কমন্স সভার স্পীকার তাঁহার পক্ষপাতশূন্য দল-নিরপেক্ষতার জন্য যে মর্যাদার অধিকারী, তিনি সে মর্যাদার অধিকারী হইতে পারেন না।

প্রতিনিধি-পরিষদে বর্তমানে কুড়িটি বিশেষ কার্যকরী সংস্থা আছে।

কোন বিল আইনসভায় পেশ হইলে প্রথম পাঠের পরই উহা এইরূপ একটি বিশেষ সংস্থার নিকট প্রেরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা (Powers of the House of Representatives)

প্রত্যেকটি আইনের খসড়া প্রতিনিধি-পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে আইনে পরিণত হইতে পারে না। প্রতিনিধি-পরিষদ সকল প্রকার আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে এবং অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার একমাত্র অধিকারী হইল প্রতিনিধি-পবিষদ। প্রতিনিধি-পরিষদের যে-কোন সদস্যই আইনের প্রস্তাব পেশ কবিতে পারেন। এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রেব প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণ কমন্স সভার সদস্যগণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। গ্রেট বৃটেনে বে-সরকারী সদস্যগণের আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। সেখানে আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা সাধারণতঃ কেবিনেট সদস্যগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে, সুতরাং বে-সরকারী সদস্যগণের পক্ষে কেবিনেটের সমর্থন ব্যতিরেকে কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত করা কার্যতঃ একরূপ অসম্ভব। আইন-প্রণয়ন বিষয়ে মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের সভ্যগণের অব্যাহত ক্ষমতা থাকিলেও অন্য একটি বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা কমন্স সভার সদস্যগণের ক্ষমতা অপেক্ষা কম। কমন্স সভা কেবিনেট সভার নীতি ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদের হস্তে শাসনকর্তৃপক্ষের কার্যের উপর আদৌ কোন ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল সিনেট সভা। অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি-পরিষদ শাসনকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধি-পরিষদকে আহ্বান করিতে পারেন না, ইহার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন না বা প্রতিনিধি-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু গ্রেট্ বৃটেনে রাজা কমন্স সভার অধিবশন স্থগিত রাখিতে পারেন ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। সিনেট সভার সহিত একযোগে প্রতিনিধি-পরিষদ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে এবং শাসনতান্ত্রিক

আইনের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। ইহা যে-কোন বিষয়ে অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থী সংখ্যাধিক্য ভোট না পায় তাহা হইলে প্রতিনিধি-পরিষদ একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে।

ইংলণ্ডের কমন্স সভা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভা (British House of Commons and American House of Representatives)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শাসন-ব্যবস্থার উপর জনগণের প্রভাব সাধারণতঃ আইনসভার নিম্নকক্ষের গঠন-পদ্ধতি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং আইনসভার নিম্নকক্ষের গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদ বৃটিশ কমন্স সভার আদর্শে গঠিত হইলেও পরিবেশের পার্থক্যের জন্য এই উভয় কক্ষের গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। সদস্য সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ৪৩৭ জন সদস্য-সমন্বিত মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা বৃটিশ কমন্স সভা বৃহত্তর, কারণ ইহার সদস্যসংখ্যা হইল ৬৩৫। মার্কিন প্রতিনিধিগণ অন্ততঃ সাত বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ২৫ বৎসর বয়স্ক নাগরিক হইবেন এবং যে রাজ্য এলাকা হইতে নির্বাচিত হইবেন, সেই এলাকার অধিবাসীও হইতে হইবে। বর্তমানে প্রথাগত বিধান অনুযায়ী তাঁহাকে তাঁহার নির্বাচন এলাকারও অধিবাসী হইতে হইবে। অপরপক্ষে ইংলণ্ডে কমন্স সভার সদস্যগণের অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই এবং নির্বাচন এলাকায় অন্ততঃ তিনমাস বসবাস করা চাই। উভয় দেশেই নির্বাচন ব্যাপারে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উভয় দেশে সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হইলেও ইংলণ্ডের কমন্স সভা মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর প্রতিনিধিমূলক

আইনসভা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে প্রতি ৭০,০০০ লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ৩১৮,০০০ জন লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সুতরাং মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা কমন্স সভা চারগুণ অধিক প্রতিনিধিমূলক।

উভয় দেশের নিম্ন কক্ষের কাযকালের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কমন্স সভাব কার্যকাল হইল পাচ বৎসর, যদিও তৎপূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের কার্যকাল মাত্র দুই বৎসর এবং স্বল্প স্থায়িত্বের জন্য ইহার ক্ষমতা ও মর্যাদা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইংলণ্ডে রাজা কমন্স সভা আহ্বান করেন, প্রতিনিধি-পরিষদ শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত সময়ে সমবেত হয়।

গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতার দিক দিয়া উভয় কক্ষেব পার্থক্য আরও স্পষ্টতর। উভয় কক্ষই সভার কার্যপরিচালনা করিবার জন্য সভাপতি (স্পীকার) নির্বাচিত করে। নির্বাচনের পর কমন্স সভার স্পীকার দল-নিরপেক্ষভাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করেন। অপরপক্ষে প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার দলবিশেষের প্রতিনিধি হিসাবে সক্রিয়ভাবে বিতর্কে যোগদান করেন।

উভয় কক্ষেব স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থায়ও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলির সংখ্যা কমন্স সভার কমিটিগুলির সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইলেও এক অর্থ কমিটি ব্যতীত অন্যান্য কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের কমিটিগুলির চেয়ারম্যান সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। কমন্স সভায় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন ব্যাপারে বয়স অপেক্ষা যোগ্যতার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত কমন্স সভায় সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল (Public Bill) ও বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলের (Private Bill) মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা হয়, প্রতিনিধি পরিষদে আনীত বিলগুলির মধ্যে সেরূপ কোন পার্থক্য আদৌ করা হয় না। ইংলণ্ডে কমন্স সভা কর্তৃক আনীত বিলগুলির নীতি দ্বিতীয় পাঠ দ্বারা সুনির্ধারিত হইলে তারপর কমিটিতে পাঠান হয়, কিন্তু প্রতিনিধি-পরিষদে উত্থাপিত বিলগুলি প্রথম পাঠের পরই কমিটিতে প্রেরিত হয়।

সুতরাং ইংলণ্ডে বিলগুলির নীতি-নির্ধারণে কমন্স সভা যে সুযোগ পায়, মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ সে সুযোগ পায় না। এই ব্যবস্থার দ্বারা কমিটিগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর একটি বিষয়েও উভয় পরিষদের সংগঠনের পার্থক্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ সর্বদাই কর্মব্যস্ত। সদস্যগণ প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। অপর পক্ষে কমন্স সভায় এরূপ কোন কর্মব্যস্ততা বা সজীব বিতর্ক প্রায়শঃই বিরল। সদস্যগণের উপস্থিতির সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। ইংলণ্ডে কমন্স সভার এই ক্রিয়াশীলতার অভাবের কারণ হইল ইহার পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় দলের নেতাগণ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন এবং তাঁহারা সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব করেন। দলের সাধারণ সদস্যগণ শুধুমাত্র নেতাগণের নির্ধারিত-নীতি সমর্থন করেন।

ক্ষমতার দিক দিয়া আলোচনা করিলে উভয় কক্ষের পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়। নীতিগতভাবে কমন্স সভা এখনও পর্যন্ত বিচার-বিবেচনা ক্ষমতার, আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার ও অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত কমন্স সভা শাসন বিভাগকে (কেবিনেট) নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ শাসন বিভাগকে আদৌ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতির নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ও চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা উচ্চ কক্ষ সিনেট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও সিনেট সভা প্রায় ইহার সম-ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং প্রতিনিধিমূলক আইনসভা হইলেও মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদকে নিম্নকক্ষ হিসাবে কোন অগ্রাধিকার বা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করা হয় নাই।

উভয় দেশের নিম্ন কক্ষের আপেক্ষিক দোষ-গুণ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ মার্কিন দেশে উপযোগী, আর কমন্স সভা ইংলণ্ডে উপযোগী। বৃটিশ ও মার্কিন এই জাতিদ্বয়ের রাজনৈতিক দৃষ্টির পার্থক্যের ভিত্তিতে উভয় দেশের নিম্ন কক্ষ গঠিত হইয়াছে।

প্রতিনিধি-পরিষদের আপেক্ষিক দুর্বলতার কারণ (Causes of the relative weakness of the House of Representatives)

সকল দেশেরই নিম্ন পরিষদ উচ্চ পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। গ্রেট ব্রটেন, ডোমিনিয়নগুলি, ভারত, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আইনসভার নিম্ন পরিষদ আইন-প্রণয়ন ব্যাপার, আয়-ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি পরিষদের মধ্যে নিম্ন পরিষদই হইল কম ক্ষমতার অধিকারী। প্রতিনিধি-পরিষদের এই আপেক্ষিক দুর্বলতার একাধিক কারণ আছে।

প্রথমতঃ, প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণ শাসনতন্ত্রের নির্দেশানুসারে যে রাজ্য হইতে সদস্য নির্বাচিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সেই রাজ্যের অধিবাসী হইতেই হইবে। বর্তমানে একটি প্রথা জন্মিয়াছে যে, সদস্যগণের শুধুমাত্র সেই রাজ্যের অধিবাসী হইলে চলিবে না, তাঁহাবা যে জিলা-নির্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্বাচন-প্রার্থী হইবেন, তাঁহাদিগকে সেই জিলার বাসিন্দা হইতে হইবে। উপরি-উক্ত কঠোর নিয়মেব দ্বারা ভোটদাতার যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচন করিবার স্বাধীনতা এরূপভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে যে, প্রতিনিধি-পরিষদে নির্বাচন করিবার মত যোগ্যপ্রার্থী হয়ত সে নির্বাচনকেন্দ্রে দুর্লভ হইতে পারে। অপরপক্ষে যোগ্যপ্রার্থী থাকিলেও হয়ত বিরোধিতার ফলে তাহার নির্বাচন-সম্ভাবনা নাও থাকিতে পারে। সুতরাং প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যপদ সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রার্থী দ্বারা পূর্ণ হয়। এই কারণে প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জনসংখ্যার ভিত্তিতে একটির অধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না—সুতরাং ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা সিনেট সভার উপর অধিকতব গুরুত্ব আরোপ করে, কারণ বৃহদায়তন রাজ্যগুলির সমসংখ্যক (দুইটি) প্রতিনিধি তাহারা সিনেট সভায় প্রেরণ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, প্রতিনিধি-পরিষদের স্থায়িত্ব মাত্র দুই বৎসরকাল, অপরপক্ষে সিনেটের সদস্যগণ দীর্ঘ ছয় বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে কোন কার্যে মনঃসংযোগ করা সম্ভব নয়। নির্বাচনের পরই তাঁহাদের

পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। এইজন্য তাঁহারা আইন-প্রণয়ন ও অন্যান্য কার্যে সিনেটের নির্দেশে পরিচালিত হইয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে নিম্ন পরিষদের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও শাসন-কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিম্ন পরিষদই হইল চরম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেট সভাকে অর্থ-সংক্রান্ত আইন-সম্পর্কে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করিবার ফলে প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত বৈদেশিক চুক্তি ও নিয়োগ-গুলি সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ—এ বিষয়ে প্রতিনিধি-পরিষদের আদৌ কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাই। নিম্ন পরিষদের ক্ষমতার প্রধান কারণ হইল শাসনকর্তৃপক্ষের উপর ইহার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদ এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া একটি অধস্তন আইনসভায় পর্যবসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্রিটেনের কমন্স সভার নেতার ন্যায় প্রতিনিধি-পরিষদে এমন কোন নেতা নাই, যিনি জাতীয় নীতি-নির্ধারণে ও আইন-প্রণয়ন-কার্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারেন।

প্রতিনিধি-পরিষদের সভাপতি বা স্পীকার (The Speaker of the House of Representatives)

প্রতিনিধি-পরিষদ ইহার নিজস্ব সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি স্পীকার নামে পরিচিত। ইনি দলীয় ভিত্তিতে দলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। নির্বাচনের পরও তিনি নিজের দলের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করেন এবং সভার কার্য পরিচালনায় উগ্রভাবে দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন করেন। প্রতিনিধি-পরিষদে তিনিই হইলেন প্রথম ও প্রধান কর্মচারী এবং সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থল।

১৯১০ সাল পর্যন্ত প্রতিনিধি-পরিষদে স্পীকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সমুদয় কমিটিগুলির সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন করিতেন। তিনি সভার কার্য পরিচালনা করিবার নিয়ম প্রস্তুত করিবার কমিটিরও সদস্য থাকিতেন। স্পীকার তাঁহার অনুগামী দলসহ একটি ক্ষুদ্র শাসন পরিষদ গঠন করিয়া সরকারী কার্যের নীতি-নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করিতেন। সংক্ষেপে

বলা যায় যে, স্পীকারের ক্ষমতা এই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পদ মর্যাদায় তিনি কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির নিম্নস্থানে ছিলেন।

কিন্তু ১৯১০ সাল হইতে স্পীকারের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতার অবসান ঘটিতে থাকে। কমিটিগুলির সদস্য নির্বাচনের ক্ষমতা তাঁহার নিকট হইতে অপসারণ করা হয় এবং তিনি নিয়ম কমিটির সদস্যপদ চ্যুত হন। বর্তমানে তিনি আর অসাধারণ ক্ষমতাশালী না হইলেও কমন্স সভার স্পীকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী।

প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকারের কর্তব্য অনেক পরিমাণে কমন্স সভার স্পীকারের অনুরূপ। তিনি প্রতিনিধি-পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভার শৃংখলা বজায় রাখেন। সভার তর্ক-বিতর্ক পরিচালনা করেন। তিনি সভার কার্যের তালিকা এবং ভোট গ্রহণের ফলাফল ঘোষণা করেন। তিনিই সভার কার্য পরিচালনার নিয়ম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু প্রতিনিধি-পরিষদ সংখ্যাধিক্য ভোটে তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ নাও করিতে পারে। সভার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সমস্ত আইন, প্রস্তাব ও আদেশ-নির্দেশ স্বাক্ষর করেন। তিনি সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন এবং কোন্ বিল কোন্ কমিটিতে প্রেরিত হইবে ইহা লইয়া মতভেদ ঘটিলে স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। দলের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল তাঁহার দল কর্তৃক উত্থাপিত বিল যাহাতে পাস হয় এবং এবিষয়ে দলকে সর্বোতভাবে সাহায্য করা।

ইংলণ্ডের কমন্স সভার স্পীকারের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই উভয় স্পীকারের নির্বাচন-পদ্ধতি যে বিভিন্ন শুধু তাহাই নহে, আইন-সভার সহিত সম্পর্কে এবং ক্ষমতা পরিচালনা ক্ষেত্রেও উভয় স্পীকারের পার্থক্য অধিকতর সুস্পষ্ট। কমন্স সভার স্পীকার কোন দলের সদস্য হইলেও দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন না এবং নির্বাচনের পর দল-নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না এবং তিনি যতদিন খুসী স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। তিনি বক্তা (Speaker) রূপে পরিচিত হইলেও তাঁহার বক্তৃতা করিবার কোন সুযোগ হয় না। বর্তমানে তিনি মূক, নিষ্ক্রিয় ও দল-নিরপেক্ষ শ্রোতায় পর্যবসিত হইয়াছেন। তাঁহার ভোট-দান ক্ষমতাও প্রথাগত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তবে যে-কোন

বিষয়ে হউক না কেন কমন্স সভার স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। তিনিই অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রকৃতি নির্ধারণ করেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, কমন্স সভার স্পীকার হইলেন নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ। পক্ষান্তরে প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার হইলেন উগ্রভাবে সক্রিয়, দলীয় স্বার্থের প্রতিনিধি ও কিয়ৎ পরিমাণে স্বৈরাচারী। এই পার্থক্যের কারণ হইল যে, ইংলণ্ডে ক্ষমতাসীন দলের নেতাগণ কেবিনেট সদস্য হিসাবে কমন্স সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের কার্যসূচী রূপায়িত করিবার সুযোগ পান। সুতরাং স্পীকারের নেতৃত্বের কোন প্রয়োজন হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়া ক্ষমতাসীন দলের নেতাগণ—রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার কেবিনেট মন্ত্রিগণ আইন-সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের দলীয় নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে পারেন না। সেইজন্য প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার পরিষদে দলের নেতৃত্ব করিয়া দলীয় নীতি সমর্থন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি (Process of Law making in the U S. A.)

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সাধারণতঃ সকল দেশেই একরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-কোন কক্ষে আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে এবং উভয় কক্ষের সম্মতিতে প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়, তবে অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলি একমাত্র প্রতিনিধি-পরিষদেই উত্থাপিত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি বলবৎ থাকার দরুণ রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার কেবিনেট সদস্যগণ কংগ্রেস সভার সদস্য নহেন এবং সেজন্য কোন আইনের প্রস্তাব তাঁহারা উত্থাপন করিতে পারেন না। সাধারণ সদস্যগণই আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের উত্থাপক বিলটি পেশ করিলে বিলের শিরোনামা পরিষদের পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ও ইহার দ্বারা প্রথম পাঠ শেষ হয়। সুতরাং বিলের প্রথম পাঠটি একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এই সময় বিলটির সম্পর্কে কোনপ্রকার বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। অতঃপর বিলটি একটি বিশেষ সংস্থার নিকট প্রেরিত হয়। এই সংস্থা বা কমিটি বিলটির বিশদ আলোচনা করে এবং

প্রয়োজনক্ষেত্রে ইহার পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাদের বিবরণীসহ পরিষদে প্রেরণ করে। তাহার পর বিলটির দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বিরোধী-দল ভোট-গণনার দাবী করিতে পারেন ও সংখ্যাধিক্যের অনুমোদন লাভ করিতে পারিলে বিলটির তৃতীয় পাঠ আরম্ভ হয়। তৃতীয় পাঠও অনেকাংশে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। তৃতীয় পাঠ শেষ হইলে বিলটি অপর কক্ষে প্রেরিত হয় ও সেখানেও অনুরূপভাবে বিলের তিনটি পাঠ হয়। অপর কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তাঁহার নিকট উপস্থাপিত হইবার দশদিনের মধ্যে যদি তিনি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। যদি তিনি দশদিনের মধ্যে অনুমোদন না করেন বা পুনর্বিবেচনার জন্য কংগ্রেস সভার নিকট বিলটি ফেরত না পাঠান, তাহা হইলে তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকেই দশদিন অতিবাহিত হইবার পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত কোন বিল যদি কংগ্রেস সভা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা অনুমোদন করে, তাহা হইলেও বিলটি আইনে পরিণত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন (American Financial Legislation)

১৯২১ সালের একটি বিশেষ আইন (The Budget and Accounting Act of 1921) দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি পাস করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ হইতে ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিয়া বাজেটের ডাইরেক্টর বাৎসরিক একটি আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করেন। এই ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন এবং একমাত্র রাষ্ট্রপতিই এই হিসাব কংগ্রেস সভায় উপস্থাপিত করান। সুতরাং ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় দেশেই ব্যয়-বরাদ্দের নীতি-নির্ধারণে শাসনকর্তৃপক্ষই আইনসভাকে প্রাথমিক নির্দেশ দান করে। ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব প্রথম প্রতিনিধি-পরিষদে উত্থাপিত হয় এবং এই পরিষদ ব্যয়ের হিসাবটিকে বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করে।

কমিটি ব্যয়-বরাদ্দগুলি হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারে। কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইবার পর ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি পুনরায় প্রতিনিধি-পরিষদে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে প্রতিনিধি-পরিষদ ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির ব্যাপক পরিবর্তন করিতে পারে। ইংলণ্ডের কমন্স সভার এইরূপ পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। প্রতিনিধি-পরিষদ প্রস্তাবগুলি পাস করিলে উহা সিনেট সভার বিবেচনার্থ পাঠান হয়। সিনেট সভাও এই ব্যয়-বরাদ্দগুলির ব্যাপক পরিবর্তন করিবার অধিকারী। এইরূপে উভয় পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হইয়া ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি যখন একটা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে তখন উভয় পরিষদ কর্তৃক ব্যাপকভাবে পরিবর্তনের ফলে ইহাদের মৌলিক রূপ বিশেষ-ভাবে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ অথবা আইনসভা দায়ী তাহা বলা সু-কঠিন।

রাষ্ট্রপতির নামে ট্রেজারির সেক্রেটারী আয়ের প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন। যদিও প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে আয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার কোন বাধা নাই।

শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আনীত হউক আর আইনসভা কর্তৃক উত্থাপিত হউক, আয়-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি একটি পৃথক কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়। ইংলণ্ডেও এই আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি দুইটি পৃথক কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইলেও কমিটি দুইটি একই সদস্য সংখ্যা লইয়া গঠিত হয় বলিয়া আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডের ন্যায় কমিটি দুইটি যে শুধু পৃথক নামে অভিহিত হয় তাহা নহে, কমিটি দুইটির সদস্যগণও পৃথক পৃথক ব্যক্তি লইয়া গঠিত হয় এবং এই কারণে আয় ও ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে সংগতির অভাব দেখা যায়। ইহা ছাড়া, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করার দায়িত্বও ভাগ হইয়া যায়। এ কথা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্যগণ ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট সভার সদস্যগণ অপেক্ষা আয়-ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, মার্কিন দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুরপদ্ধতি দোষবিমুক্ত নহে। কারণ যে শাসনকর্তৃপক্ষ আয়-ব্যয়ের প্রাথমিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া আইনসভায় পেশ করেন, সে শাসন-কর্তৃপক্ষ আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের অর্থসংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের

প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। অবশ্য রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ-ভাবে বাণী প্রেরণ করিয়া অথবা অন্য পরোক্ষ উপায়ে আইনসভার উপর এসম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। ইংলণ্ডের আয়-ব্যয়-নির্ধারণ ক্ষমতা শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে কেন্দ্রীভূত, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে বিভক্ত।

মার্কিন ও বৃটিশ কমিটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiarities of the Committee Systems in the U. S A. and Great Britain)

যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলি বৃটেনেব কমন্স সভার কমিটি অপেক্ষা ভিন্ন পদ্ধতিতে গঠিত হয়। গ্রেট বৃটেনের কমন্স সভার সমস্ত রাজনৈতিক দল তাহাদের সদস্যসংখ্যার আনুপাতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিটিগুলি গঠন করিবার জন্য একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করিয়া থাকে। এই নির্বাচন কমিটি অন্যান্য কমিটিগুলিকে গঠন করে। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করিয়া তাহার হস্তে বিভিন্ন কমিটি গঠনের ভার অর্পণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে কমিটিগুলির সদস্যসংখ্যা অল্প। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পাঠের পর বিলগুলি কমিটিতে প্রেরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রেব আইনসভার কমিটিগুলি অধিকতব ক্ষমতাবিশিষ্ট। এই কমিটিগুলি প্রস্তাবিত আইনের ব্যাপক পরিবর্তন করিবাব অধিকাবী। কিন্তু বৃটেনে দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হইয়া বিলগুলির নীতি আইনসভা কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবার পর কমিটিতে প্রেবণ কবা হয়। কমিটিগুলি বিলের ছোটখাট পরিবর্তন করা ছাডা নীতিগত কোন ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নেব নেতৃত্বের ভার থাকে কমিটির সভাপতির উপর। তিনিই বিলটিকে পবিচালিত করিয়া একটি নির্দিষ্ট রূপ দান করেন। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে অনেক আইন কমিটি-সভাপতির নামে পরিচালিত হয়, যথা, 'রোজার আইন', 'স্মাবম্যান আইন' প্রভৃতি। বৃটেনে আইন-প্রণয়নের উদ্যোক্তা ও নেতা হইলেন একজন মন্ত্রী; বে-সরকারী সদস্যের আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবিবার সুযোগ নাই বলিলেও চলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইংলণ্ডে সাধারণ-সম্পর্কিত বিল এবং বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলের মধ্যে একটি পার্থক্য করা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন কমিটি কর্তৃক

এই দুই জাতায় বিল বিবেচিত হয় এবং ইহাদের পাস করিবার পদ্ধতিও বিভিন্ন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ কোন পার্থক্য করা হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগ (The Federal Judiciary)

শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক্ষমতা একটি সুপ্রিম কোর্ট এবং কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত নিম্নতর বিচারালয় দ্বারা পরিচালিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত আরও এগারটি সার্কিট কোর্ট ও ছিয়াশীটি জিলা কোর্ট কংগ্রেস সভা বিশেষ আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দশটি বিচারবিভাগীয় অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য দুই বা ততোধিক বিচারপতি লইয়া একটি সার্কিট আদালত গঠিত হইয়াছে। এই আদালতগুলি শুধুমাত্র জিলা আদালত হইতে আনীত আপীল মামলার বিচার করে। জিলা আদালতগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে ছিয়াশীটি জিলায় ভাগ করিয়া প্রত্যেক জিলার জন্য একটি করিয়া আদালত গঠিত হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের আদিম ক্ষমতাবহির্ভূত প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রাথমিক বিচারকার্য জিলা আদালত কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এখান হইতে সার্কিট আদালতে আপীল করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়গুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। দুই বা ততোধিক মূলরাষ্ট্রের মধ্যে অথবা যুক্তরাষ্ট্র ও মূলরাষ্ট্রের মধ্যে অথবা বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের নাগরিকগণের মধ্যে বিরোধ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের আইন বা চুক্তিপত্র-সম্পর্কিত কোন বিরোধ ; রাষ্ট্রদূত, কন্সাল, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অথবা নৌ-বিভাগ-সম্পর্কিত মামলা ইত্যাদি।

সুপ্রিম কোর্ট—কার্যকলাপ ও শাসনব্যবস্থায় ইহার উপযোগিতা (Power and Importance of the Supreme Court)

একজন প্রধান বিচারপতিসহ আটজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারপতিগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিশেষ বিচার-পদ্ধতির দ্বারা দণ্ডিত না হইলে তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। অতএব

মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুন মাস পর্যন্ত ওয়াশিংটন শহরে ইহার অধিবেশন চলে ও কোন বিচারবিষয়ক অভিমত প্রদান করিতে হইলে একযোগে অন্ততঃ ছয়জন বিচারকের উপস্থিতি অপরিহার্য। এই নিয়মের জন্য বিচারকার্যের দ্রুততা ব্যাহত হয়। বিচারপতিগণ নির্ধারিত বেতন পাইয়া থাকেন এবং কার্যকালে তাঁহাদের বেতন হ্রাস করা যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুপ্রিম কোর্টের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে শাসনতন্ত্রের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এই লিখিত শাসনতন্ত্র হইল শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত মূল আইন। কেন্দ্রীয় সরকার ও মূলরাষ্ট্রীয় সরকারগুলির কার্যক্ষেত্র শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিধারিত হইয়াছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্থির করিয়া দিয়া শাসনতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করিয়াছে। সুতরাং শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে এই শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং সেইজন্য শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগগুলিকে ও শাসনকর্তৃপক্ষকে শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে তাহাদের শাসন-পরিচালনা কার্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ সুপ্রিম কোর্টকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক করিয়া গঠিত করিয়াছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান কার্য হইল, শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগগুলি তাহাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা। যদি কোন পক্ষ শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্ট ঐরূপ কার্যকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে। অবৈধ বলিয়া ঘোষিত কোন নীতি বা আইন কার্যকরী করা যায় না। এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুপ্রিম কোর্ট কোন কার্য বা নীতি বা আইনকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে না। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সুপ্রিম কোর্টের নিকট ঐ বিষয়ে অভিযোগ আনয়ন করিলে সুপ্রিম কোর্ট ঐ বিষয় তৎক্ষণাৎ অবৈধ বলিয়া

ঘোষণা করে না বা সেগুলি সংশোধন করে না। সুপ্রিম কোর্ট শুধু শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করে এবং ব্যাখ্যাপ্রদানকালে ঐ বিষয়গুলি যদি শাসনতান্ত্রিক আইনের বিরোধী বলিয়া অনুমিত হয় তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করে। এইরূপে সুপ্রিম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষের বহু নির্দেশ ও কংগ্রেস সভা-প্রণীত বহু আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বাতিল করিয়াছে। সুতরাং আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার মধ্য দিয়া সুপ্রিম কোর্ট শাসনবিভাগের ও আইনবিভাগের ক্ষমতা-প্রয়োগের ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা বিভক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির উপর অর্পিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার ফলে শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকিলে শাসনব্যবস্থায় নানাবিধ বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচীর পরিধি-বিস্তারের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হইল। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল সময়ে এই সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করা সহজসাধ্য নয়, অথচ জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবাব নিমিত্ত এই ধবণের পরিবর্তনের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এরূপ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করিয়া পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল সুপ্রিম কোর্ট। এরোপ্লেন, বেতার প্রভৃতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিল। এরূপ স্থলে সুপ্রিম কোর্ট তাহার অনুমিত ক্ষমতানীতি (Doctrine of Implied Powers) প্রয়োগ করিয়া এই নূতন বিষয়গুলির উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। অনুমিত ক্ষমতানীতির অর্থ হইল সুপ্রিম কোর্ট ব্যাখ্যা-প্রদানকালে নির্দেশ দিতে পারে যে, যদিও নূতন বিষয়টির পরিচালনায় ভার শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত হয় নাই ; তথাপি শাসন-

তন্ত্রের অপর ধারাগুলি ব্যাখ্যা করিলে অনুমান করা যায় যে, এই নূতন বিষয়গুলির ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। এইরূপে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যাপ্রদানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাপ্রদান দ্বারা বহু বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক-পদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র অনেক পরিমাণে সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া মনে হয়।

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সুপ্রিম কোর্ট তাহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার বলে কংগ্রেস সভা-রচিত আইন বা রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত নির্দেশকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে। ফলে, কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিচারপতিগণ যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন না হন, তাহা হইলে বিচারকার্য পক্ষপাতদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুপ্রিম কোর্টের এই ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাকে অনেকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কংগ্রেস সভা-প্রণীত আইনের বৈধতা শেষ পর্যন্ত নয়জন বিচারপতির সংখ্যাধিক্যের অর্থাৎ পাঁচজন বিচারপতির মতের উপর নির্ভর করে। পাঁচজন বিচারপতি একমত হইলে যে-কোন আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের এই অত্যধিক ক্ষমতার দ্বারা আইন-প্রণয়নে কংগ্রেস সভার সার্বভৌমত্ব ও অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এইজন্য সুপ্রিম কোর্টের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে একাধিক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া সুপ্রিম কোর্টের হস্ত হইতে আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা অপসারিত করা। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত কোন আইন যদি কংগ্রেস সভা দ্বিতীয়বার অনুমোদন করে তাহা হইলে সে আইন সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের পুনরায় অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, অনেক সমালোচক বলেন যে, যদি সুপ্রিম কোর্টের হস্তে আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত রাখিতে হয় তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া উচিত যে, নয়জন বিচারপতির মধ্যে অন্ততঃ সাতজনের এ সম্পর্কে একমত হওয়া চাই। এই

ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা বলিতে হইবে যে, সুপ্রিম কোর্ট তাহার ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও মূল রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির ক্ষমতা সংযত রাখিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিতে সুপ্রিম কোর্ট এপর্যন্ত শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে নাই।

মার্কিন শাসনতন্ত্রে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (The system of mutual Checks and Balances in the U. S. A. Constitution)

মার্কিন শাসনতন্ত্রের আদি রচয়িতাগণ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভাজন নীতির পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অন্য-নিরপেক্ষ বিভাগরূপে গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁহারা এই ক্ষমতা বিভাজন নীতিটিকে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। কারণ, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতা একই হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে ক্ষমতার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। তাই ক্ষমতার এই অপব্যবহার রদ করিবার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের আদি রচয়িতাগণ বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করিবার জন্য পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার মূলকথা হইল যে, ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করিতে হইলে এক বিভাগের স্বৈর বা অবাধ ক্ষমতা অন্য বিভাগের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ—প্রত্যেককেই বিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী করা হইলেও এই ক্ষমতাসমূহ অন্য বিভাগের সহযোগিতা ও সম্মতিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি ও নিয়োগগুলি আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের অনুমোদনসাপেক্ষ। ইহার অর্থ হইল যে, যদিও সরকারী কার্যে কর্মচারী নিয়োগ করা ও চুক্তি সম্পাদন করা শাসনবিভাগের একচেটিয়া ক্ষমতাভুক্ত তথাপি এই শাসনবিভাগীয় কার্যে আইনসভা অংশ গ্রহণ করিতে পারে ও প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিয়োগ ও চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারে শাসনবিভাগের স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বাধা দিতে পারে। অনুরূপভাবে শাসন-

বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতিও আইনসভায় 'বাণী' প্রেরণ করিয়া, আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইনে সম্মতি বা অসম্মতি দান করিয়া এবং জরুরী আইন প্রণয়ন করিয়া আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আইনসভার উচ্চকক্ষ হইলেও সিনেট রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করিতে পারে। আবার রাষ্ট্রপতিও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মার্জনা করিয়া বিচার বিভাগীয় ক্ষমতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেস (আইনসভা) প্রণীত আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, আবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের সংখ্যা ও বেতন পরিমাণ কংগ্রেস কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ক্ষমতা বিভাজন নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই। কারণ আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার এই তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিই অপর বিভাগীয় কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এক বিভাগ অন্য বিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকারী হওয়ার ফলে একদিকে যেরূপ বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্র, সহযোগিতা ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে, অপরদিকে তদ্রূপ অন্তর্বিভাগীয় বিরোধ এবং বিরোধের ফলে সরকারী কার্যে অহেতুক বিলম্ব ও অনিবার্য অযোগ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের ফলে বিভাগীয় দায়িত্ববোধও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে বা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে এককভাবে দায়ী করা যায় না, কারণ শাসনবিভাগীয় এই দুইটি কাজই সিনেট সভার সম্মতিসাপেক্ষ। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে এই ভারসাম্য নীতি প্রবর্তনের ফলে বিভাগীয় স্বৈরাচার কি পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে তাহা বিচারসাপেক্ষ। অধিকন্তু এই নীতি গ্রহণের ফলে শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বহীনতা ও অহেতুক বিলম্ব বৃদ্ধি পাইয়া শাসনকার্যে অনেকক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব সৃষ্টি করিয়াছে। তবে দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়া পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি প্রয়োগের ত্রুটিগুলি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ (Federal Centralisation in the U. S. A.)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাক্কালে অসম্পূর্ণ বা দুর্বল যুক্তরাষ্ট্ররূপে জন্ম লাভ করে। এই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নিতান্তরূপে সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু কালক্রমে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের—রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার—ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া রাজ্য সরকারগুলির অগ্রাধিকার ও মর্যাদা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত কারণে কেন্দ্রীয় (জাতীয়) সরকারের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

প্রথমতঃ, শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী আইন অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নূতন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ইহাকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী করিয়াছে। এইরূপে শাসনতন্ত্রের ষোড়শ সংশোধন আইন কেন্দ্রীয় সরকারকে যে-কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর কর ধার্য ও ধার্য কর আদায় করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। এইরূপে আদায়ীকৃত করের কোন অংশই রাজ্য সরকারগুলিকে দিবার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় হিসাবে এই বিচারালয় সর্বদাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য সম্পর্কে অত্যধিক অবহিত। এই বিচারালয় ইহার অনুমিত ক্ষমতা নীতি (Doctrine of Implied Powers) প্রয়োগ করিয়া আদি শাসনতন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আজ সমগ্র যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর নূতন নূতন

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে তাহার ফলেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতির ফলে রাজ্যগুলির ভৌগোলিক সীমানার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। অন্তঃরাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষ্টিগত আদান-প্রদান এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই সমস্ত অন্তঃরাজ্য সম্পর্ক একমাত্র জাতীয় সরকার ব্যতীত কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্যা স্থানীয় সমস্যা হইতে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে এবং এই কারণে এই সমস্যাগুলির সমাধান একমাত্র জাতীয় সরকার জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে করিতে পারেন। ফলে জাতীয় সরকারের ক্ষমতা অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে তাহাদের নীতি নির্ধারণ করে। এই নীতি গঠনে প্রাদেশিকতার স্থান নাই। সুতরাং বিশেষ রাজনৈতিক দল পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে ইহা স্বাভাবিক।

পঞ্চমতঃ, ভারতের ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জাতীয় সরকার শিক্ষার প্রসার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচার, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সাহায্যের মধ্য দিয়া রাজ্য সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রাদেশিকতার ভাব বিনষ্ট করিয়া জাতীয় ঐক্য তথা জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। কোন ঐক্যবদ্ধ জাতিই তাহার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নয়। মার্কিন দেশের জনসাধারণও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতাশালী করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই জাতীয়তাবোধের ফলেই মার্কিন জাতীয় সরকার ধনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শক্তিতে আজ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্য

(Federalism in the United States of America and the Soviet Union)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উভয়ই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও এই উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ ফাইনার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে উভয় যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ফাইনারের মতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে (ক) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও (খ) শাসন ক্ষমতার বিভাগ, দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় আংগিক রাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সদস্য প্রেরণ, তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সরকারগুলির পৃথক আয়ের উৎসের ব্যবস্থা করা হয়, চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিশেষ বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য দুইজাতীয় বিচারালয় থাকে, পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে আংগিক রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার গঠনপ্রকৃতি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং এই গঠনপ্রকৃতি সব রাজ্যেই সমান হয়। ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আংগিক রাজ্যগুলির জাতীয় সরকার সম্পর্কে আনুগত্য ও ব্যবচ্ছেদ (Allegiance and Secession) সম্পর্কে সুনির্ধারিত নিয়ম থাকে।

উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে বিচার করিলে মনে হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্র, অপরপক্ষে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করা হইয়াছে। ক্ষমতা বিভাজন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা একান্তভাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়া রাজ্য সরকারগুলিকে অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। সুতরাং আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল ও রাজ্য সরকারগুলিকে শক্তিশালী করিয়া গঠন করা হইয়াছিল।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন ও শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়গুলির মূলনীতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যগুলি নানাজাতি ও নানা সম্প্রদায়ের জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। এই রাজ্যগুলির কোনটিই একজাতি বা এক সম্প্রদায় লইয়া গঠিত হয় নাই। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যগুলির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র একটি জাতি লইয়া গঠিত।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রেব অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির স্থানীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকিলেও তাহারা সার্বভৌম যুক্তবাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়। কোনমতেই তাহারা যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত শাসনতন্ত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ আত্মঘাতী ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত, আংগিক রাজ্যগুলিকে আরও দুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। এই রাজ্যগুলি তাহাদের নিজস্ব জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিরপেক্ষভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাহত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যগুলি অন্তর্বিপ্লব ও বিদেশী আক্রমণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নিরাপত্তা রক্ষা করিবার অধিকার দাবী করিতে পারে, ইহাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারে এবং নিজস্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও স্থানীয় কর ধার্য করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইলেও যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার বা নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করিবার অথবা পররাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার ইহাদের নাই।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে

দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র সোভিয়েত দেশের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ও কার্যে রূপায়িত করেন। কৃষি, ক্ষুদ্র, বৃহৎ শিল্প, অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থা সব কিছুই কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার শতাংশ নিয়ন্ত্রণও দেখা যায় না। রাজ্যগুলি তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত উপরি-উক্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, উভয় যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট এবং আংগিক রাজ্যগুলি হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ সিনেটের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিম্নকক্ষ অপেক্ষা অধিক।

ষষ্ঠতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের আইনসভা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের পরিবর্তন করিতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রিম সোভিয়েত এককভাবে ইহার ইচ্ছামত ক্ষমতা বিভাজন পরিবর্তন করিতে পারে এবং এইরূপে আংগিক রাজ্যগুলির ক্ষমতা সংকুচিত করিতেও পারে।

সপ্তমতঃ, প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র নির্ধারিত পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে। শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য আইনগুলিকে অসিদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রধান বিচারালয় এই উভয় সরকারের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু সোভিয়েত সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমতা নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত প্রিসিডিয়াম নামক একটি অভিনব সংস্থার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র বলিতে সাধারণতঃ যে প্রকৃতির শাসনব্যবস্থা বুঝা যায়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের

প্রবর্তন হয় এবং ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অল্পবিস্তর পরিমাণে মার্কিন আদর্শে গঠিত হইয়াছে। হেনরি ও বিয়াট্রেস্ ওয়েব্ সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে এক নূতন ধরণের সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওয়েব্ দম্পতির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও এক অভিনব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ও পরিবেশে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়, তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের পটভূমিকা ও পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য থাকিবে তাহা স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির আলোচনা করিতে গেলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা একটিমাত্র রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একই নীতি অনুসৃত হয়। সুতরাং কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি এই যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির প্রাবল্য দেখা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সহজেই দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া রাজ্য সরকারগুলির আদি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত স্বাধীন সত্তা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

শাসনব্যবস্থায় মূলরাষ্ট্রগুলির স্থান (Position of the States in the Union)

বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নবগঠিত আলাস্কা ও হাওয়াই রাজ্যসহ পঞ্চাশটি মূল রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত। প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রে একজন নির্বাচিত গভর্ণর, একটি দ্বি-পরিষদ আইনসভা, একটি রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ক্ষমতা-স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা বন্টিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার-গুলির উপর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর সেই সমুদয় ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে—(১) যেগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয় নাই এবং (২) যেগুলি প্রয়োগ

করিতে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে নিষেধ করা হয় নাই অর্থাৎ শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত-ক্ষমতার তালিকা ও শাসনতন্ত্র কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারগুলির পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষমতার তালিকা দেখিলে আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়। সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয়।

আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Obligation of the State Governments)

শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে মূলরাষ্ট্রগুলি স্বাধীনভাবে তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিবার অধিকারী। স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিবার যে নির্দিষ্ট অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার কোনপ্রকারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত। তাহারা নিজ ইচ্ছামত তাহাদের শাসন-পরিষদ, আইনসভা ও বিচারবিভাগ গঠন করিতে পারে। তাহাদের পৃথক করধার্য করিবার ক্ষমতা আছে। প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়া তাহারা তাহাদের শাসনতন্ত্রও পরিবর্তন করিতে পারে। কোনরূপ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাইবার অধিকার দাবী করিতে পারে তাহাদের নিজ ইচ্ছামত তাহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে রাজ্যসরকারগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে কোন সংশোধন-প্রস্তাবই বৈধ বিবেচিত হয় না। সুতরাং শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা মূলরাষ্ট্রগুলির একটি প্রধান অধিকার বলিয়া গণ্য হয়।

প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা মূলরাষ্ট্রগুলির একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে ও যেগুলির প্রয়োগ আঞ্চলিক সরকারগুলির পক্ষে শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে সমুদয় ক্ষমতা তাহারা কোনক্রমেই প্রয়োগ করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, একক বা সম্মিলিতভাবে তাহারা

কখনই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তন-পদ্ধতি (Amendment of the Constitution)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় শাসনতন্ত্রের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে একটি জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন পদ্ধতিটিকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, উত্থাপিত প্রস্তাবকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করিতে হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পরিবতন করা হইয়া থাকে।

১। শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদ কংগ্রেস সরাসরিভাবে উত্থাপন করিতে পারে, কিন্তু এই সংশোধনের প্রস্তাব সিনেট সভা ও প্রতিনিধি-পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

২। দ্বিতীয়তঃ, মূলরাষ্ট্রগুলির আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক আইন-সভা কংগ্রেসকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সভা (Convention) আহ্বান করিবার অনুরোধ করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে আহূত বিশেষ সভা সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে।

কিন্তু যে পদ্ধতিতেই সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপিত হউক না কেন, সংশোধন-প্রস্তাব বৈধ ও কার্যকরী করিতে গেলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাহা সমর্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সংশোধনের প্রস্তাবগুলি দুই রকম পদ্ধতিতে অনুমোদিত হইতে পারে।

(১) প্রথমতঃ, মূলরাষ্ট্রগুলির মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের আইন-সভাগুলি অর্থাৎ পঞ্চাশটি মূলরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ আইনসভা যদি সংশোধন-প্রস্তাব অনুমোদন করে, তাহা হইলে প্রস্তাবটি বৈধ ও কার্যকরী হয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, মূলরাষ্ট্রগুলির আইনসভার পরিবর্তে প্রত্যেকটি মূল-রাষ্ট্রে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সভা আহূত হইতে পারে এবং সমগ্র মূল-

রাষ্ট্রে আহূত বিশেষ সভায় তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যক মূলরাষ্ট্রীয় বিশেষ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সংশোধন-প্রস্তাব কার্যকরী হয়। উল্লিখিত দুইটি পদ্ধতির কোন্‌টির দ্বারা সংশোধন-প্রস্তাব সমর্থিত হইবে, তাহা কংগ্রেস সভা স্থির করে।

শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের পদ্ধতির এই জটিলতার জন্য আজ পর্যন্ত মাত্র তেইশটি সংশোধন সম্ভব হইয়াছে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংশোধন-কার্য সহজসাধ্য না হইলেও প্রথাগত বিধানের উদ্ভব ও বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা দ্বারা শাসনতন্ত্রের বহু সংশোধন সাধিত হইয়াছে।

দলব্যবস্থা (Party System in the U S A)

বর্তমান যুগে শাসনক্ষমতা ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া কোন শাসনকর্তৃপক্ষই তাহাদের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে না। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত জনগণের সমর্থন একান্ত অপরিহার্য। তাই প্রত্যেক দেশে ক্ষমতার প্রয়োগকারী ব্যক্তি বা সংসদ কোন নির্দিষ্ট দলের সমর্থনপুষ্ট হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

মার্কিন দেশে সর্বপ্রথম রাজার প্রতি অনুরক্ত ধনিক শ্রেণী ও স্বদেশের প্রতি অনুরক্ত দরিদ্র শ্রেণী—এই দুইটি দল ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর শাসনতন্ত্র গঠনের প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় দল (Federalists) ও গণতান্ত্রিক দলের (Democrats) অভ্যুত্থান ঘটে। প্রধানতঃ ধনিক শ্রেণী লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় দল গঠিত ছিল। এই দলটির নীতি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা,—অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক দলের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকারগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা রক্ষা করা। ১৮৫০ সালে প্রজাতন্ত্রী (Republicans) ও গণতন্ত্রী (Democrats) নামক দুইটি দলের আবির্ভাব হয়। প্রজাতন্ত্রী দলের ঘাঁটি হইল উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি, আর গণতন্ত্রী দল দক্ষিণাঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় লইয়া গঠিত ছিল। গণতন্ত্রী দল দাসত্ব প্রথার সমর্থক ছিল, অপরপক্ষে প্রজাতন্ত্রী দল এই প্রথার বিরোধী ছিল। ১৮৬১ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইয়া দাস-ব্যবসায় রহিত হয়।

ফলে, সাধারণতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী দল দুইটির মতানৈক্যেরও প্রায় অবসান ঘটে।

বর্তমানে মার্কিন রাজনীতি ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত দুইটি দলের অস্তিত্ব থাকিলেও এই দুইটি দলের পার্থক্য নাম মাত্র। যে সমস্ত কারণে একটি দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান ঘটে মার্কিন দেশে সেই সমস্ত কারণের নিতান্ত অভাব দেখা যায়। মার্কিন শাসনতন্ত্র এরূপ নিপুণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়াছে যে, এ সম্পর্কে বা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন-পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদের ফলে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন দেশ এসিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যক্ষ যোগসূত্রহীন যে, পররাষ্ট্র সম্পর্কিত মতভেদের ফলেও এদেশে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান সম্ভব নহে। সর্বশেষে বলা যায় যে, যে অর্থনৈতিক কারণে অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, মার্কিন দেশে সেই অর্থনৈতিক কারণও প্রায় অবর্তমান। দেশে বুভুক্ষু দরিদ্র শ্রেণী নাই বলিলেও চলে। মার্কিন দেশের অধিবাসী অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, অধিকাংশ অধিবাসীই রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট না হইয়া অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছে। সুতরাং মার্কিন দেশে দুইটি দল থাকিলেও দলীয় পার্থক্য কম।

তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও এই দলীয় সমর্থনপুষ্ট হইয়া পরিচালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নীতিগত প্রভেদ খুব কম। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও মূলরাষ্ট্রীয় সরকারের কতকগুলি উচ্চপদের জন্য কর্মচারী মনোনয়ন করা হইল দলগুলির প্রধান কার্য। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল দেখা যায়, যথা—প্রজাতন্ত্রী দল (Republican Party) ও গণতন্ত্রী দল (Democratic Party)। প্রত্যেকটি দলের প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে একটি প্রাথমিক সংঘ আছে। এই প্রাথমিক সংঘ হইতে সদস্য নির্বাচিত হইয়া প্রতি জিলার সভায় প্রেরিত হয়। জিলা সভার উপরে থাকে মূলরাষ্ট্রীয় সভা। রাষ্ট্রিয় সভার প্রধান কার্য হইল রাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য কর্মচারী মনোনয়ন করা এবং জাতীয় মহাসভায়

প্রতিনিধি প্রেরণ করা। জাতীয় মহাসভা দলীয় নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া থাকে।

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দল-ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার

(Comparative Study of the English and the American Party System)

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় ব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য আছে। উভয় দেশেই দুইটি প্রধান দল দেখা যায়। ইহা ছাড়া, উভয় দেশেই ছোট ছোট ২।১টি দল আছে। উভয় দেশেই দলের কেন্দ্রীয় উচ্চতম, জাতীয় ও স্থানীয় সমিতি আছে। নিম্নতম সমিতিগুলি উচ্চতর সমিতিগুলির কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। দলের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উভয় দেশেই স্থানীয় সংগঠন ব্যতীত আরও বহু ক্লাব ও সমিতি গঠিত হইয়াছে। উভয় দেশেই এই দলগুলির কার্য আইনানুসারে পরিচালিত হয় এবং দলগুলি বিপ্লবাত্মক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে না।

কিন্তু উভয় দেশের এই দলীয় সংগঠনের সাদৃশ্যের অন্তরালে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল সরকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। দলীয় নীতিই হইল সরকারী নীতি এবং কেবিনেট সদস্যগণ দলের নেতা হিসাবে দল-নির্ধারিত নীতি কার্যে রূপায়িত করেন। কিন্তু মার্কিন দেশে রাজনৈতিক দল আইন-বহির্ভূত রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। সরকারের সহিত দলের কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র বা শাসনব্যবস্থায় দলের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল দলীয় নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে। নীতি নির্ধারণই হইল দলের প্রধান কাজ, কিন্তু মার্কিন দেশে দলগুলির প্রধান কাজ হইল ভোটদাতাগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা ও দলের প্রার্থী নির্বাচন করা। দলীয় নীতি নির্ধারণ কার্যে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে দলের সদস্যগণ রাজনীতির চর্চা করিলেও পেশাদারী রাজনীতিবিদ্ নহেন। কিন্তু মার্কিন দেশে দলের সদস্যগণের অনেকেই পেশাদারী রাজনীতিবিদের কাজ করেন। ইংলণ্ডে দলের নেতা থাকিলেও মার্কিন দেশের মত দলের কোন সর্বেসর্বা প্রভু (Boss) নাই।

সংক্ষিপ্তসার

১। শাসনতন্ত্রের উপাদান

১। আদি শাসনতন্ত্র। ২। তেইশটি সংশোধন আইন। ৩। কংগ্রেস সভা কর্তৃক প্রণীত আইন। ৪। বিচারবিভাগীয় নির্দেশ। ৫। প্রথাগত বিধান।

২। শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয়। মূলরাষ্ট্রীয় সরকারগুলিই হইল অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী।

(২) প্রধানতঃ লিখিত হইলেও শাসনতন্ত্রে প্রথাগত বিধান ও বিচার-বিভাগীয় নির্দেশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

(৩) অনমনীয়—সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। পরিবর্তন-পদ্ধতি জটিল।

(৪) শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য—শাসনতন্ত্র হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

(৫) শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা হয়। শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ বিচারালয় কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে।

(৬) শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ—তাহা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে।

(৭) রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা—শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভা পরস্পর প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য পরিচালনা করে।

৩। শাসনকর্তৃপক্ষ—রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসনবিভাগের প্রধান। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক, চৌদ্দ বৎসরকাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী স্বভাবজাত নাগরিক রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারেন। চারি বৎসরকালের জন্য তিনি পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং একাদিক্রমে দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতি বহু ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আইন বলবৎ করা ছাড়াও প্রধান প্রধান পদে সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে কর্মচারী নিয়োগ

করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন। উভয় সভার সম্মতিক্রমে যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন করিতে পারেন। সেনাবিভাগের তিনিই সর্বাধিনায়ক।

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও কংগ্রেস সভায় বাণী প্রেরণ করিয়া বা ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইন-প্রণয়নের উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। দলের সমর্থকগণের মাধ্যমেও তাঁহার আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে দণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি মার্জনা করিতে পারেন বা দণ্ড স্থগিত রাখিতে পারেন।

ভোটদাতৃগণ, আইনসভা বা কেবিনেট সভার নিকট রাষ্ট্রপতি দায়ী নহেন। তাঁহার চারিবৎসর কার্যকালের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। এ বিষয়ে তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন।

কেবিনেট—যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেবিনেটের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে দশজন কর্মসচিব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া কেবিনেট গঠিত হয়। ইঁহারা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করিলেও রাষ্ট্রপতির সহকর্মী বলিয়া পরিগণিত নহেন। তাঁহারা সকলেই রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী ও পৃথগ্‌ভাবে তাঁহার নিকট দায়ী। বৃটিশ কেবিনেটের মত ইঁহারা আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার নিকট ইঁহাদের কোন যৌথ দায়িত্বও নাই।

আইনসভা—কংগ্রেস—কংগ্রেস অ-সার্বভৌম আইনসভা বলিয়া পরিচিত: কারণ—১। এই সভার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত। ২। রাষ্ট্রপতির ভিটো ক্ষমতার দ্বারা সীমায়িত। ৩। শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করিতে অক্ষম। ৪। কংগ্রেস-প্রণীত আইন সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনী ঘোষিত হইতে পারে। সিনেট ও প্রতিনিধি-পরিষদ লইয়া কংগ্রেস সভা গঠিত।

সিনেট—প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র হইতে ছয় বৎসরের জন্য দুইজন সদস্য নির্বাচিত হইয়া মোট একশতজন সদস্য লইয়া সিনেট গঠিত। সিনেটের সদস্যগণ অন্ততঃ তিরিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই এবং মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

সিনেট সভা সমস্ত দেশের উচ্চ পরিষদগুলির মধ্যে সবাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিগণিত হয়; তাহার কারণ—১। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ সিনেট সভাই আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ২। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিতে না পারিলেও সিনেট সভা এই বিলগুলি ব্যাপকভাবে সংশোধন করিতে পারে। ৩। রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা, নিয়োগ, চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সিনেট সভাই বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি পাইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। সিনেটের সদস্যগণের প্রত্যক্ষ নিবাচনপ্রথা, সদস্যগণের সংখ্যাল্পতা ও দীর্ঘতর কার্যকাল ইহার ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণ।

প্রতিনিধি-পরিষদ—সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে চারিশত পঁইত্রিশ জন জাতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া প্রতিনিধি-পরিষদ গঠিত হয়। ইহার কার্যকাল মাত্র দুই বৎসর। আইন-প্রণয়ন করা ও অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা ইহার প্রধান কায। শাসনবিভাগের উপর ইহার কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নাই। শাসনবিভাগও প্রতিনিধি-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না।

আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি ও কমিটি ব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি পার্লামেণ্ট সভার আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এখানে প্রথম পাঠের পরই বিল কমিটিতে প্রেরিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। তবে ইহাদের ক্ষমতা অধিকতর ব্যাপক। ইহারা যে-কোন বিলের ব্যাপক পরিবর্তন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে কমিটির সভাপতিগণের ক্ষমতা অনেক বেশী। তাঁহারাই বিলগুলি পরিচালনা করেন।

বিচারবিভাগ—একটি সুপ্রিম কোর্ট, এগারটি সার্কিট কোর্ট ও ছিয়াশীটি জিলা কোর্ট লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগ গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট হইল সর্বোচ্চ বিচারালয়। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারপতিসহ আটজন সাধারণ

বিচারপতি লইয়া সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। বিচারপতিগণ অসদাচরণ না করিলে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন।

শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখা ইহার প্রধান কর্তব্য। শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া সুপ্রিম কোর্ট শাসনবিভাগ ও আইনসভার ক্ষমতা সংযত রাখিয়াছে। এই ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়া শাসনতন্ত্রের অনমনীয় ভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মূলরাষ্ট্রগুলির অধিকার ও কর্তব্য—পঞ্চাশটি মূলরাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ইহাদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি আছে:

১। শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নিরপেক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতা; ২। স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ও পৃথক করধার্য করিবার অধিকার; ৩। শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার ইত্যাদি।

তাহাদের কর্তব্য হইল: ১। প্রজাতন্ত্রী সরকার অব্যাহত রাখা; ২। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যপরিধির মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা; ৩। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ না করিবার বাধ্যবাধকতা।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি—পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করা ও অনুমোদিত হওয়া এই দুইটি স্তরে শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইয়া থাকে। কংগ্রেস সভার দুই পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা সংশোধন-প্রস্তাব সমর্থিত হইয়া মূলরাষ্ট্রগুলির মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ আইনসভার অনুমোদন লাভ করিলে সংশোধন-প্রস্তাব কার্যকরী হয়। সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন করিবার নিমিত্ত অনেক সময় মূলরাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ সভার আহ্বান করা হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ—আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং রাজ্যসরকারগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল ছিল। কিন্তু কালক্রমে কতিপয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তির প্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া কেন্দ্রীয় প্রাধান্য বৃদ্ধি

পাইয়াছে। শক্তিগুলি হইল, ১। শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইন, (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ব্যাখ্যাগত সিদ্ধান্ত, (৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি, (৪) জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান, (৫) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্যদান ও (৬) সংবাদপত্রগুলি কর্তৃক প্রাদেশিকতার পরিবর্তে জাতীয়তা প্রচার বৃদ্ধি।

দলব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্রী দল ও গণতন্ত্রী দল—এই দুইটি রাজনৈতিক দল সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দল দুইটির মধ্যে নীতিগত পার্থক্য অপেক্ষা সংগঠনের পার্থক্য বেশী। নির্বাচনপ্রার্থী এবং স্থায়ী কর্মচারী মনোনীত করা দলগুলির প্রধান কাজ। প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে অবস্থিত প্রাথমিক দলীয় সংগঠন হইতে জাতীয় মহাসভা পর্যন্ত ইহাদের অনেকগুলি দলীয় সংগঠন আছে।

প্রশ্নাবলী

1 Contrast the salient features of the constitutions of Great Britain and the United States of America (C U 1941)

2. "In England, the legislature is supreme, in the United States, the constitution is supreme" Examine this proposition (C U 1946)

3. Compare the Cabinet in the United States of America with the Cabinet in Britain (C U. 1950)

4 Describe the position of the Senate in the Constitutional system of the United States of America. (C U. 1957)

5 Discuss the position of the President of the United States of America in relation to the Cabinet (C U. 1959)

6. Describe the composition of the American Senate and discuss why it is called the most powerful Second Chamber in the World. (C U. 1960)

চতুর্থ অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

সুইজারল্যাণ্ড (Switzerland)

সুইজারল্যাণ্ড দেশটি আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও একাধিক কারণে ইহার শাসনব্যবস্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। একটি মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কিভাবে জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয়—এই তিনটি ভিন্ন ভাষাভাষী পৃথক্ জাতি তাহাদের জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারে, সুইজারল্যাণ্ড হইল তাহার একমাত্র প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাহাদের জাতীয় জীবনের প্রধান অনুপ্রেরণা হইল—একটি গভীর দেশাত্মবোধ, আর এই দেশাত্মবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সুইস জাতি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যে উৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আজ সমগ্র সভ্য জগৎ কর্তৃক আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ড তেরটি ক্যান্টনের একটি দুর্বল সন্ধি-সমবায় ছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের সন্দারবন্দের যুদ্ধের ফলে তাহারা তাহাদের মধ্যে দৃঢ়তর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া একটি নূতন সংবিধান প্রণয়ন করিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রচিত নূতন সংবিধান অনুসারে সুইজারল্যাণ্ড একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইল। নূতন সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষমতা না দিবার ফলে শীঘ্রই একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিবার দাবীতে গণ-আন্দোলন সুরু হইল। ইহার ফলে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বতন সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার অর্পিত হইল।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Constitution)

১। বর্তমান সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র উনিশটি ক্যান্টন ও ছয়টি অর্ধক্যান্টন লইয়া গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হইয়াছে, সুইস যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপভাবে

কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে। শাসনতন্ত্র-কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যান্টন সরকারগুলি। ক্যান্টন সরকারগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইলেও তাহাদিগকে তিনটি বিশেষ শর্ত পালন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। প্রথমতঃ, ক্যান্টনগুলিতে প্রজাতন্ত্রী সরকার (Republican Government) বজায় রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ক্যান্টনগুলি কর্তৃক রচিত তাহাদের নিজস্ব সংবিধান একমাত্র গণভোট-পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ক্যান্টনগুলির সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রবিরোধী কোন বিষয় সন্নিবেশিত থাকিতে পারিবে না। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসনতন্ত্রে যে শুধু উভয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহা নয়, কতকগুলি ব্যাপারে উভয় সরকারের ক্ষমতাপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াও দিয়াছে। তবে ক্ষমতার ভাগ হইলেও সুইস শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মত অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার ভাগ করে নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কার্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে মতবিরোধ ঘটিলে ক্যান্টন সরকারগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

২। লিখিত এবং বহু তথ্যসম্বলিত সুইস শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা দ্বিগুণ দীর্ঘতর। লিখিত হইলেও বহু অ-লিখিত বিধান এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নাগরিকত্ব অর্জনের নিয়মাবলী রচনা করিবার ক্ষমতা আইনতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইলেও কার্যতঃ ক্যান্টন সরকারগুলিই এই ক্ষমতা পরিচালনা করে। এই শাসনতন্ত্রে নাগরিকের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক বিধানানুযায়ী যে-কোন ক্যান্টনের নাগরিক হইলেই আপনা হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়।

৩। অন্যান্য দেশের লিখিত শাসনতন্ত্রের মত সুইস শাসনতন্ত্রে কোনরূপ নাগরিক অধিকারপত্র (Bill of Rights) নাই। ইহা সত্ত্বেও নাগরিকগণের বাক্স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত অধিকারগুলি সুস্পষ্টভাবে

শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে চতুর্থ ধারায় বলা হইয়াছে যে, সকল সুইস নাগরিক আইনের চক্ষে সমান এবং কোন নাগরিকই জন্ম, পদবী বা পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে কোন বিশেষ অধিকার বা মর্যাদা পাইতে পারে না। কোন অপরাধীর জন্য স্বতন্ত্র আদালত গঠন করিয়া বিশেষ বিচার-ব্যবস্থা আইন কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই এবং রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।

৪। সুইস শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। অনমনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

৫। সুইস শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্য বিধান নীতি বিশেষ স্থান পায় নাই। ফলে, সুইস আইন-সভা প্রশাসনিক সমুদয় ক্ষমতারই অধিকারী। কিন্তু আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে আইনসভার ক্ষমতা গণ-নির্দেশাধিকার দ্বারা সীমায়িত হইয়াছে।

৬। শাসনতন্ত্রের আর একটি অভিনবত্ব হইল ইহার বিচারব্যবস্থা। সুইজারল্যাণ্ডে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় বিদ্যমান থাকিলেও এই বিচারালয় অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত নহে। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় শাসনতন্ত্রের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হয় না। আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা এই বিচারালয়ের নাই।

৭। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত সুইস শাসনতন্ত্রে আরও দুইটি অভিনব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ হইল সুইজারল্যাণ্ড যেখানে শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত না করিয়া একাধিক ব্যক্তির অর্থাৎ একটি মন্ত্রিপরিষদের (Plural Executive) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যই সমক্ষমতার অধিকারী। গণ-নির্দেশ (Referendum), গণ-প্রস্তাব অধিকার (Initiative) ও প্রত্যাবর্তনের আদেশ (Recall) প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি এই দেশেই কার্যকরী হইয়াছে।

সুইস ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের পার্থক্য (Contrast between the Swiss and the U. S. A. Constitutions)

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র মার্কিন শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়

ভিত্তিতে গঠিত হইলেও এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতিতে বহু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, ক্ষমতা ভাগ হইলেও সুইস শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মত সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতা ভাগ করে নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলক ভাবে কাজ করিতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধ ঘটিলে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশই অগ্রাধিকার পায়।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক এক ব্যক্তির (রাষ্ট্রপতির) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সুইস দেশে শাসনক্ষমতা একাধিক ব্যক্তি অর্থাৎ সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভোটদাতাগণ কর্তৃক পরোক্ষে নির্বাচিত হন, আর সুইস শাসনকর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভার উভয়কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ সিনেট সুইস উচ্চকক্ষ রাজ্য-পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ও বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন সিনেট সভার অনুমোদন সাপেক্ষ।

পঞ্চমতঃ, গণভোট ও গণ-নির্দেশাধিকারের সাহায্যে সুইস শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু মার্কিন শাসনতন্ত্র এরূপ সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

ষষ্ঠতঃ, সুইস আইনসভা-প্রণীত আইনগুলি গণভোটের অনুমোদন-সাপেক্ষ হইতে পারে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণভোট দ্বারা আইনসভার আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা সংকুচিত হয় নাই।

পরিশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা (কংগ্রেস)-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে কিন্তু সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে এইরূপ আইনসভার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় নাই।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiar Features of the Swiss Federalism)

অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, সুইস শাসনতন্ত্রে এই শাসনব্যবস্থাকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া সন্ধিসমবায় (Swiss Confederation) বলা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি ক্ষুদ্র এই দেশটি নানা জাতির, নানা ভাষার ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত হইলেও ইহারা আজ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করিতেছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় এই তিনটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, সুইস যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বিভাজন হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বিভাগের ন্যায় এখানে কেন্দ্রীয় ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার ভাগ হয় নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ন্যায় সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না। কিন্তু এ সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, নির্বাচকমণ্ডলী গণপ্রস্তাব অধিকার প্রয়োগ করিয়া আইনসভা-প্রণীত আইন বাতিল করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ রাজ্য পরিষদ একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান। এই পরিষদের সদস্যগণ ক্যান্টন সরকারগুলি কর্তৃক রচিত আইনানুসারে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে কোন হাত নাই। এইজন্য কোন কোন ক্যান্টন হইতে উচ্চকক্ষের সদস্যগণ সরাসরি গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হন আবার কোথায়ও বা ক্যান্টন আইনসভা ইহাদিগকে নির্বাচন করে।

সদস্যগণের কার্যকালও ক্যান্টনগুলি কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুসারে স্থির হয় বলিয়া একবৎসর হইতে চারবৎসর পর্যন্ত এই কার্যকালের পার্থক্য দেখা যায়। সদস্যগণকে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষের সদস্যগণের ন্যায় কেন্দ্রীয়

সরকার কর্তৃক বেতন ও ভাতা দেওয়া হয় না। তাঁহারা নিজ নিজ ক্যাণ্টন সরকার হইতেই তাঁহাদের বেতন পাইয়া থাকেন।

পঞ্চমতঃ, সুইস যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত না করিয়া একাধিক ব্যক্তির অর্থাৎ একটি মন্ত্রিপরিষদের (Plural Executive) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন (Distribution of Powers in the Swiss Federal System)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন। সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সাধারণ ব্যাপারগুলির শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির শাসন রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। আবার কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্ম (concurrent) এই তিন ভাগে ভাগ করা হয় এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলি একযোগে শাসন পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু সকল যুক্তরাষ্ট্রেই প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়।

ক্ষমতা বণ্টন বিষয়ে সুইস যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। সুইস শাসনতন্ত্র কর্তৃক শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সুনির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই, পরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রের সীমা সুনির্দিষ্ট করিয়া ক্যাণ্টন সরকারগুলির উপর অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ অর্পণ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র অবশ্য ক্যাণ্টন সরকারগুলির শাসনক্ষমতার উপরও কতিপয় নিষেধ আরোপ করিয়াছে।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় (কেন্দ্রীয়) সরকারের ক্ষমতাগুলি আংশিকভাবে একেবারে স্বকীয় বা অন্যনিরপেক্ষ এবং আংশিকভাবে যুগ্ম অর্থাৎ ক্যাণ্টন-গুলির সহিত একযোগে প্রযোজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান স্বকীয় ক্ষমতা হইল—পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা, সেনাবাহিনী গঠন করা ও শিক্ষা দেওয়া, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ,

রেলপথ, মুদ্রা ও ব্যাংক নোট, ওজন ও জলশক্তির যথাযথ ব্যবহার প্রভৃতি। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, মৎস্যের চাষ ও শিকার, শিল্প, বীমা ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলি হইল যুগ্ম তালিকাভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত যুগ্মবিষয়ক আইন ক্যান্টনগুলিতেও প্রযোজ্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতার উপর যে সমস্ত নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল :—(১) কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ ধর্মমত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না বা ধর্মমতের জন্য কাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইবে না অথবা ধর্মমত কাহারও বিবাহক্ষেত্রে বাধা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে না। (২) কোন রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দান করিবার ব্যবস্থা-সম্বলিত কোন আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা পাস করিতে পারিবে না।

ক্যান্টন সরকারগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইলেও তিনটি বিশেষ শর্ত তাহাদের মানিয়া চলিতে হয়। প্রথমতঃ, ক্যান্টনগুলিতে প্রজাতন্ত্রী সরকার বজায় রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ক্যান্টনগুলি কর্তৃক রচিত তাহাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র একমাত্র গণভোট পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ক্যান্টনগুলির সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র-বিরোধী কোন বিষয় সন্নিবেশিত থাকিতে পারিবে না। সুতরাং ক্ষমতার ভাগ হইলেও সুইস শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকার-গুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মত অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার ভাগ করে নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কার্য করিতে পারে।

সুইস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federal Systems in Switzerland and the U. S A.)

মার্কিন দেশ যেরূপ আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত, সুইস দেশ তদ্রূপ প্রকৃত কার্যকরী গণতন্ত্র (Real democracy in operation) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উভয় দেশের শাসনব্যবস্থাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে এবং সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে গঠিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ দুইটি

প্রধান বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইস যুক্তরাষ্ট্রের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই একই কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে তেরটি বিভিন্ন স্বাধীন উপনিবেশ ছিল এবং এই উপনিবেশগুলি অনেক পরিমাণে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ স্বার্থে এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে। সুইস দেশেও অনুরূপভাবে স্বাধীন ক্যান্টনগুলি কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের স্বাধীন সত্তা পরিহার করিয়া একটি রাষ্ট্র-সমবায় (Confederation) গঠন করে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হইয়াছে, সুইস যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হইয়াছে। শাসনতন্ত্রকর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যান্টন সরকারগুলি। উভয় যুক্তরাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসনতন্ত্র যে উভয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহা নয়, কতকগুলি ব্যাপারে উভয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস যুক্তরাষ্ট্রে উভয় দেশের রাজ্য ও ক্যান্টন সরকারগুলির পক্ষে প্রজাতন্ত্রী সরকার বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

আর একটি বিষয়েও বর্তমানে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় দেশেই আর্থিক সাহায্যদান, রাজনৈতিক দল ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়া স্থানীয় সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দৃষ্ট হয়।

উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে উভয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

উভয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির ও ক্যান্টনগুলির যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরবর্তী কাল হইতে সময়ের বিবর্তনে তাহাদের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও জাতিত্ব বিসর্জন দিয়া আজ এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে

সুইস জাতি এক অখণ্ড জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও সুইস দেশে বিভিন্ন জাতির অধিবাসিগণের এখনও পর্যন্ত তাহাদের ভাষাগত বা ধর্মগত বিভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো ও রেড্ ইণ্ডিয়ান ব্যতীত অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহ দীর্ঘদিন একত্র বসবাস ও একই জীবন যাপন-পদ্ধতির ফলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে এক অবিমিশ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত জার্মান ভাষাভাষী ক্যাণ্টনের পার্শ্বে ফরাসী ভাষাভাষী ক্যাণ্টন দেখিতে পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুরূপভাবে সুইস যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাণ্টনগুলি হইল অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। শাসনতন্ত্র কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে যে সমুদয় ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, তৎসমুদয়ই ক্যাণ্টন সরকারগুলির ক্ষমতা-ভুক্ত। ক্যাণ্টন সরকারগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য পরিষদে শুধু যে সদস্য নির্বাচন করিতে পারে তাহা নহে, সদস্যগণের নির্বাচন-পদ্ধতি ও কার্যকাল এমনকি সদস্যগণের বেতন পর্যন্তও ক্যাণ্টন সরকারগুলি স্থির করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সরকারগুলির এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা নাই। ইহা ছাড়া, ক্যাণ্টনের সরকারী কর্মচারিগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্য হইতে পারেন। এরূপ বিধান অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে নাই।

সুইস ক্যাণ্টনগুলির ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি অপেক্ষা যে আরও অধিক ব্যাপক তাহা শাসনতন্ত্রের ৯নং ধারার বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র বা কোন ক্যাণ্টনের স্বার্থের প্রতিকূল না হইলে ক্যাণ্টনগুলি সীমানা সম্পর্কিত বা সরকারী অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে।

আর একটি বিষয়েও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত বিভাগগুলিই—শাসন, আইন-প্রণয়ন ও বিচার—একই রাজ্য ওয়াশিংটন শহরে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি বিভিন্ন ক্যাণ্টনে অবস্থিত—বের্ন-এ আইনসভার অধিবেশন বসে, আর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কাজ হয় লুজানে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির শাসন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু সুইস দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা-

ভুক্ত বহু বিষয়ের শাসনকার্য ক্যান্টন সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকার এই বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও কার্যতঃ ক্যান্টন সরকারগুলি এই বিষয়গুলি পরিচালনা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থার ফলে সুইস যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারীর সংখ্যা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক স্বল্প।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সুইস রাষ্ট্রীয় সরকার ক্যান্টনগুলির উপর কোন প্রকার প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করিতে পারে না। প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করিতে না পারিলেও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক্যান্টনগুলিকে বিপুল পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য সরকারগুলিও কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এইরূপ আর্থিক সাহায্য পাইলেও সুইস যুক্তরাষ্ট্রে এই সাহায্যের পরিমাণ অত্যধিক। যুক্তরাষ্ট্রীয় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের শতকরা ৫৫ ভাগ আয় সুইস দেশে ক্যান্টনগুলিকে সাহায্য দিবার বাবদ ব্যয় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের রক্ষক হিসাবে ইহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির শাসনতন্ত্র নির্ধারিত সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের এ ক্ষমতা নাই। সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ক্যান্টন সরকারগুলির ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিলে ইহার কোন বিচার বিভাগীয় প্রতিকার নাই।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উভয় যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য সম্পর্কে তিনটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। প্রথমং, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগ হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ ভাবে ক্ষমতার সম্পূর্ণ ভাগ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা সুইস কেন্দ্রীয় সরকার ক্যান্টন-গুলির উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্ট আইনসভা-প্রণীত আইনকে যেরূপভাবে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের সে ক্ষমতা নাই। এই কারণেও সুইস্ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ
(The Federal Executive—The Federal Council)

সংগঠন ও কার্যকলাপ (Organisation and Functions)

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অন্যান্য দেশের মত একজন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুইস যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত সাতজন মন্ত্রী লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ গঠিত হয়। আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে অথবা আইনসভার সদস্য নন এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিগণ নির্বাচিত হইতে পারেন। চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইলেও তাহাদের পুনর্নির্বাচনে বাধা নাই এবং বাস্তবিক কোন কোন মন্ত্রীকে দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর-কাল পর্যন্ত একাদিক্রমে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। নির্ধারিত কার্য-কালের মধ্যে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। প্রচলিত নীতি অনুযায়ী কোন একটি ক্যান্টন হইতে একাধিক মন্ত্রী নির্বাচিত করা হয় না। মোট জন-সংখ্যার অধিকাংশ জার্মান-ভাষাভাষী হইলেও জার্মান-ভাষাভাষী ক্যান্টনগুলি হইতে পাঁচজন মন্ত্রীর অধিক নির্বাচিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ প্রতি বৎসর পরিষদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন রাষ্ট্রপতি ও এক-জন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। কোন ব্যক্তি এক বৎসরের অধিককাল রাষ্ট্র-পতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। পর বৎসর উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে সাতজন সদস্যের প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে উপ-রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি সমগ্র সুইস যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President of the Swiss Confederation) বলিয়া পরিচিত হন। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কিন্তু কার্যতঃ অন্যান্য সহকর্মিগণ অপেক্ষা তিনি কোন শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতার অধিকারী নহেন।

শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের প্রধান কর্তব্য হইল, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে

ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল' শাসনব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে। গ্রেট ব্রটেনের কেবিনেট সভার অনুরূপভাবে সুইস শাসন-পরিষদের সদস্যগণ প্রধানতঃ আইনসভার সদস্যবর্গ হইতে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন ও আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। মোটের উপর আইনসভার ইচ্ছা দ্বারাই তাঁহারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। অপরপক্ষে মার্কিন শাসনব্যবস্থার অনুরূপভাবে সুইস শাসন-পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলেই তাঁহাদের আইনসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। এইরূপে সুইস শাসন-পরিষদ ব্রটিশ কেবিনেট শাসনব্যবস্থা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থার সমুদয় গুণের অধিকারী হইয়াছে। এই যুক্তব্যবস্থা দ্বারা সুইস শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্বের সহিত দায়িত্বশীলতার সমন্বয়সাধন করা হইয়াছে।

সুইস শাসন-পরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার দল-নিরপেক্ষ সার্বজনীন ভিত্তি। গ্রেট ব্রটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের মত সুইস শাসন-পরিষদ একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় না। পরন্তু এই পরিষদের সদস্যগণ দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইঁহারা দেশের জনমতের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিতে পারেন। বিভিন্ন মতের ধারক হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের ঐক্য ও সংহতি এরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কোন সদস্যেরই কখনও পৃথগ্‌ভাবে পদত্যাগ করিবার কারণ ঘটে না। চারি বৎসর কার্যকাল অতিবাহিত হইলে পরিষদ-সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে পুনর্নিবাচিত হইয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন—ইহা হইতে তাঁহাদের জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের কার্য (Functions of the Federal Council)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের উপর শাসনতন্ত্র কর্তৃক ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। শাসন-পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করে।

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনা করে।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক, সাধারণ ও বিশেষ আইনগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিগুলি যথাযথভাবে বলবৎ করা।

৩। ক্যাণ্টনগুলির সহিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ক্যাণ্টনগুলি যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং ক্যাণ্টনগুলি যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনগুলি যথাযথভাবে বলবৎ করে সেজন্য প্রয়োজনক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

৪। শাসন-পরিষদ স্ব-শাসন উদ্দেশ্যে নূতন আইনের প্রস্তাব জাতীয় সভার বিবেচনার্থ প্রেরণ করিতে পারে এবং জাতীয় সভাও বিশেষ আইন প্রণয়নের জন্য শাসন-পরিষদকে অনুরোধ করিতে পারে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত বিশেষ নিয়োগগুলি ব্যতীত অন্য সমুদয় নিয়োগগুলি শাসন-পরিষদ করিয়া থাকে।

৬। ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে সম্পাদিত পারস্পরিক চুক্তি বা পররাষ্ট্রের সহিত ক্যাণ্টনগুলির চুক্তি শাসন-পরিষদ পরীক্ষা করে এবং এই চুক্তিগুলি কার্যকরী হইতে গেলে শাসন-পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন। যদি কোন চুক্তি শাসন-পরিষদ বে-আইনী বা শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া মনে করে তাহা হইলে শাসন-পরিষদ জাতীয় সভাকে এই চুক্তি বাতিল করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারে।

৭। শাসন-পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক স্থির করে এবং বহিরাক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করে। দেশের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা ইহার প্রধান দায়িত্ব।

৮। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং জরুরী অবস্থায় এই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীও নিযুক্ত করিতে পারে।

৯। যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় সভায় পেশ করা।

১০। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশগুলি বলবৎ করাও ইহার কার্য। ইহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী কর্মচারিগণের আচরণ সম্পর্কে

অভিযোগগুলির বিচার করা শাসন-পরিষদের কার্য। অবশ্য শাসন-পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগীয় আদালতে আপীল করা যায়।

সুইস রাষ্ট্রপতি (The President of the Swiss Confederation)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সহিত সুইস রাষ্ট্রপতির তুলনা করা চলে না। সুইস রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, পদমর্যাদা বা প্রতিপত্তি উপরি-উক্ত রাষ্ট্রপ্রধানদ্বয়ের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি অপেক্ষা বহুপরিমাণে কম।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সাতজন সদস্যের অন্যতম। অন্যান্য সদস্যগণ যে পদ্ধতিতে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত, রাষ্ট্রপতিও তদনুরূপভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আইনসভা তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ব্যক্তিও এক বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি বলিয়া মনোনীত করে। রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি হিসাবে বা সুইস যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণকে নিয়োগ করেন না,—অন্যান্য সদস্যগণের মতই তিনি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন সভায় মতবিরোধের ফলে উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি একটি ভোট দিতে পারেন। অন্যান্য সদস্যের ন্যায় তিনি একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি পর পর দুই বৎসর রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারেন না। তবে তিনি তাঁহার সহকর্মিগণ অপেক্ষা কিছু অধিক বেতন পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে তিনিই সভাপতিত্ব করেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও পদস্থ ব্যক্তিগণকে তিনিই আহ্বান করেন। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং তাঁহার সহকর্মিগণ প্রথাগতভাবে তাঁহার অগ্রাধিকার ও নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও সুইস রাষ্ট্রপতিকে কোনদিক দিয়াই শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় বলা যায় না।

বৃটিশ কেবিনেট ও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পার্থক্য
(Contrast between the British Cabinet and the Swiss Federal Council)

সাত জন সদস্য-সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council) হইল সুইস যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ বা কেবিনেট। এই পরিষদের গঠন, প্রকৃতি ও ক্ষমতায় বৃটিশ ও মার্কিন কেবিনেটের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ইহা এই উভয় দেশের কেবিনেট হইতে পৃথক। বৃটিশ কেবিনেটের সহিত ইহার নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায়।

প্রথমতঃ, গ্রেট বৃটেনের কেবিনেটের সকল সদস্যকেই আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেন্টের সদস্য হইতেই হইবে, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনে সাধারণতঃ একটি রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে, সেই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেবিনেট গঠন করেন। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের শাসন পরিষদের সদস্যগণ দল হিসাবে নহে, ব্যক্তিগত গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ, বৃটেনে কেবিনেট সদস্যগণ দলের নেতা হিসাবে পার্লামেন্টে নেতৃত্ব করেন এবং দলীয় নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ দলীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হন না। আইনসভা নির্ধারিত নীতিই তাঁহারা কার্যে রূপায়িত করেন।

চতুর্থতঃ বৃটেনে একদলীয় শাসনব্যবস্থা থাকার ফলে কেবিনেট কমন্স-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত হয় এবং সর্বদা কমন্স সভার সমর্থন পায়। এই কারণে বৃটিশ কেবিনেট শুধু শাসনক্ষমতার অধিকারী নহে—আইন-প্রণয়নেও ইহা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ শুধু শাসনক্ষমতার অধিকারী, আইন-প্রণয়নে এই পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উপর একান্ত নির্ভরশীল।

পঞ্চমতঃ, এক জরুরী অবস্থা বা যুদ্ধকাল ব্যতীত বৃটিশ কেবিনেট একটি-মাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয়, অপর পক্ষে সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বিভিন্ন দলের সদস্যগণ লইয়া গঠিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, একই নীতির সমর্থক একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া

বৃটিশ কেবিনেট গঠিত হয়। মতানৈক্য ঘটিলেও কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন না। কেবিনেটে সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানিয়াই চলিতে হয়। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ এই বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন। তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী একযোগে কাজ করিয়া গেলেও পরিষদের যে-কোন সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে আইনসভায় বক্তৃতা করিতে পারেন এবং কার্যতঃ করিয়াও থাকেন।

সপ্তমতঃ, বৃটেনে কেবিনেটের ঐক্য ও সংহতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রক্ষিত হয়। তিনিই কেবিনেটের স্থায়ী সভাপতি এবং তিনি বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রিগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া যায়। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় এরূপ কোন সর্বাধিনায়ক নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হয় এবং ইহার কার্যকালও আইন দ্বারা নির্ধারিত।

মার্কিন কেবিনেট ও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পার্থক্য (Contrast between the U. S. A. Cabinet and the Swiss Federal Council)

প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতার অধিকারী হইলেন এক ব্যক্তি। ভোটদাতাগণ কর্তৃক চার বৎসরের জন্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে সমুদয় শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি স্বয়ংই কয়েকজন সচিব নিযুক্ত করেন। এই সচিবগণ সর্বতোভাবে রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী এবং এককভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যের জন্য আইনসভা বা অন্য কাহারও নিকট দায়ী নহেন। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি শাসন-পরিষদের উপর ন্যস্ত। সাতজন সম-ক্ষমতা সম্পন্ন সদস্য লইয়া গঠিত এই শাসন-পরিষদ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি থাকিলেও এই রাষ্ট্রপতির পরিষদীয় অন্যান্য সদস্যগণ অপেক্ষা বিশেষ কোন ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি নাই। অন্যান্য সদস্যের

ন্যায় তিনিও একটি বিভাগের প্রধান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি দেশে ও বিদেশে যে সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারী সুইস্ রাষ্ট্রপতি সেরূপ কোন পদমর্যাদার অধিকারী নহেন।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক নিয়োগ-ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। তিনি দেশের শাসন বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক ও যুদ্ধকালে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনা করিতে পারেন। কিন্তু সুইস্ রাষ্ট্রপতি শুধু নিজের বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারেন। আপৎকালে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সৈন্যদল গঠন করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইনসভা-প্রণীত আইন সাময়িকভাবে বাতিল করিতে পারেন ও পরোক্ষভাবে আইন-প্রণয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। সুইস্ রাষ্ট্রপতির এরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার সুক্ষ্ম বিভাগের ফলে রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার সচিববৃন্দ আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আইন সভার বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন না। অপরপক্ষে সুইস যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য না হইলেও আইনসভার উভয়কক্ষে উপস্থিত থাকিয়া শাসন-সংক্রান্ত বিতর্কের উত্তর দিতে হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, সুইস শাসন-ব্যবস্থা বৃটিশ ও মার্কিন শাসন-ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিয়া গঠিত হইয়াছে।

সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ সমূহ (Departments of the Swiss Federal Council)

সাতজন সদস্য লইয়া সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত। প্রত্যেক সদস্যই এক একটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। বিভাগগুলি হইল ১। রাজনৈতিক বিভাগ (Political Department), ২। অর্থ ও শুল্ক বিভাগ (Finance and Custom), ৩। আভ্যন্তরীণ বিভাগ (Interior), ৪। বিচার ও পুলিশ বিভাগ (Justice and Police), ৫। প্রতিরক্ষা বিভাগ (Military Affairs), ৬। জাতীয় অর্থনৈতিক বিভাগ (Public Economy) ও ৭। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ (Posts and Telegraph).

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—জাতীয় সভা
(The Federal Legislature—the National Assembly)

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত, যথা,—রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়পরিষদ।

রাজ্যপরিষদ (The Council of States)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার অনুরূপভাবে সুইজারল্যাণ্ডের উচ্চ পরিষদ গঠিত হইয়াছে। উনিশটি বড় ক্যাণ্টনের প্রত্যেকটি হইতে দুইজন ও ছয়টি অর্ধক্যাণ্টন হইতে একজন করিয়া—মোট চুয়াল্লিশ জন সদস্য লইয়া রাজ্যপরিষদ গঠিত। সদস্যগণের নির্বাচন-পদ্ধতি ও কার্যকাল ক্যাণ্টনগুলি কর্তৃক পৃথগ্‌ভাবে নির্ধারিত হয়। কোন কোন ক্যাণ্টনে সদস্যগণ ক্যাণ্টন আইনপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন, আবার কোথায়ও বা গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হয়। একবৎসর হইতে চারবৎসর পর্যন্ত তাঁহাদের কার্যকাল নির্ধারিত হইতে পারে। সদস্যগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ ক্যাণ্টন সরকারগুলি বহন করে। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার অনুরূপ কোন বিশেষ ক্ষমতা সুইস রাজ্যপরিষদের নাই। আইনতঃ নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ রাজ্যপরিষদের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম।

জাতীয়পরিষদ (The National Council)

বর্তমানে সুইস জাতীয়পরিষদ একশত ছিয়ানব্বুই জন সদস্য লইয়া গঠিত। সমানুপাতিক ভোটপদ্ধতির ভিত্তিতে জাতীয়পরিষদের সদস্যগণ জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতি চব্বিশ হাজার জন লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোক ব্যতীত প্রতি কুড়ি বৎসর বয়স্ক পুরুষ নাগরিক ভোটদান করিতে পারে। ক্যাণ্টন যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, প্রত্যেকটি ক্যাণ্টন হইতে অন্ততঃপক্ষে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেই। ক্যাণ্টন হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ক্যাণ্টনের সমগ্র জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রতিনিধিগণ চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

রাজ্যপরিষদের মতই জাতীয়পরিষদ সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি জাতীয়পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন। সুইস আইনসভার পক্ষে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহূত হইবার প্রয়োজন হয় না। শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট দিনে ইহার অধিবেশন বসে। ইহা ছাড়া, অতিরিক্ত অধিবেশনের জন্য জাতীয়পরিষদের এক-চতুর্থাংশ সদস্যের অথবা পাঁচটি ক্যাণ্টনের অনুরোধের আবশ্যক হয়।

দুইটি পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ নিম্ন পরিষদ অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করা আইনসভার প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধঘোষণা অথবা শান্তিস্থাপন করিতে হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। সাধারণতঃ, উভয় পরিষদ পৃথগ্‌ভাবে অধিবেশন পরিচালনা করে, কিন্তু নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করিবার কালে উভয়ের যুক্ত অধিবেশনের প্রয়োজন হয়: ১। রাষ্ট্রপতি, সহ-রাষ্ট্রপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি, প্রতিরক্ষা-বিভাগের সেনাপতি প্রভৃতির নিয়োগ ব্যাপারে, ২। আইন সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানকল্পে ৩। দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করিবার উদ্দেশ্যে। সুইজারল্যাণ্ডে কমিটি-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই।

সুইস আইনসভা রাষ্ট্রীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হইলেও দুই প্রকারে ইহার ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে বলা যায়। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদকে ইহা ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জনগণের প্রত্যক্ষ-ভাবে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দ্বারা আইনসভার সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গণভোট, গণপ্রস্তাব প্রভৃতি অধিকার দ্বারা আইনসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে।

সুইস্ শাসনবিভাগের সহিত আইনসভার সম্পর্ক (Relation between the Swiss Executive and the Legislature)

সুইস্ শাসনকর্তৃপক্ষ বৃটিশ ও মার্কিন শাসনকর্তৃপক্ষ—এই উভয়ের আদর্শে গঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে সুইস্ শাসনব্যবস্থা এই উভয় শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পরিহার করিয়া গুণগুলির সার্থক উত্তরাধিকারী হইতে সমর্থ

হইয়াছে। বৃটেনে 'কেবিনেট' বলিতে যাহা বুঝায়, সঠিকভাবে বলিতে গেলে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ' বলিতে তাহা বুঝায় না। বৃটেনের মন্ত্রিসভার মত সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আইনসভার নিকট কোন যৌথ দায়িত্ব নাই। আইনসভা কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ-নির্ধারিত নীতি সমর্থিত না হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পদত্যাগ করিতে হয় না বা তাহাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। যখনই আইনসভা ইহার নীতি সমর্থন করে না তখন পরিষদ আইনসভার ইচ্ছানুযায়ী ইহার নীতি পরিবর্তন করিয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকে। বৃটিশ কেবিনেটের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, একই নীতির সমর্থক একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া কেবিনেট গঠিত (Political homogeneity)। মতানৈক্য ঘটিলেও কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন না। অপরপক্ষে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত এবং আইনসভায় তাঁহারা তাঁহাদের বক্তৃতা ও ভোট দ্বারা পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ চারবৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন এবং পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। সাধারণতঃ, আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে শাসন-পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হইলেও আইনসভার সদস্য-বহির্ভূত ব্যক্তিও নির্বাচিত হইতে পারেন। শাসন-পরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন, আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দান করিতে পারেন না। আইনসভা শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে প্রশ্ন করিতে পারে, কিন্তু পদচ্যুত করিতে পারে না। আইনসভা শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে পদচ্যুত করিতে পারে না এবং শাসন-পরিষদের সদস্যগণ পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন—এই দুইটি কারণে সুইস শাসন-পরিষদের স্থায়িত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসন-পরিষদও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (The Federal Tribunal)

একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় বর্তমানে ছাব্বিশ

হইতে আটাশজন বিচারপতি লইয়া গঠিত। ইহা ছাড়াও স্থায়ী বিচারপতি-গণের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করিবার জন্য এগার হইতে তেরজন বিচারপতি নিযুক্ত থাকেন। বিচারপতিগণ ছয় বৎসরের জন্য আইন-পরিষদের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সুইস প্রথা অনুসারে তাঁহারা বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলে পুনর্নির্বাচন দ্বারা তাঁহাদের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত রাখা হয়।

এই বিচারালয়ের আদিম ও আপীল মামলা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যান্টনগুলির মধ্যে অথবা বিভিন্ন ক্যান্টনগুলির মধ্যে দেওয়ানী আইন-সম্পর্কিত মামলার বিচার এই আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়। ক্যান্টন বিচারালয়গুলি হইতে আনীত মামলাগুলির আপীল শুনিবার ইহার অধিকার আছে। বারজন জুরীর সাহায্যে ফৌজদারী মামলার বিচারও করিতে পারে। রাষ্ট্রদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগগুলির বিচারকার্য এই আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আর একটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র-বিরোধী অথবা জাতীয় সভা-প্রণীত আইন-বিরোধী বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ক্যান্টনগুলি প্রণীত আইন শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বলিয়া বাতিল করিতে পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার অনুরূপ ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করিবার ক্ষমতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনের বৈধতা-সম্পর্কে বিবেচনা করিবার পূর্ণ অধিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রিম কোর্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে এই ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে জনসাধারণের হস্তে। জনসাধারণই গণভোট দ্বারা আইনের বৈধতার প্রশ্নের সমাধান করে। ইহা ছাড়া, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক অধিকার-সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শাসনবিভাগীয় বিচারালয়রূপেও কার্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতি (Method of Amendment of the Constitution)

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। অনমনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের

পরিবর্তন সাধন করা দুঃসাধ্য নহে। দুইটি পদ্ধতিতে সাধারণতঃ শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরিবর্তনের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় সভার দ্বারা উত্থাপিত হইতে পারে। এই প্রস্তাব জাতীয় সভার উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে গণভোটের জন্য প্রেরিত হয়। অধিকাংশ ক্যান্টনের সংখ্যাধিক্য ভোটদাতার সম্মতি পাইলে সংশোধন প্রস্তাব কার্যকরী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা তাহাদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় সংশোধন-প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারে। সংশোধন-প্রস্তাবটি একটি সম্পূর্ণ বিলের আকারে (Formulated Initiative) অথবা সাধারণ প্রস্তাবরূপে (Unformulated Initiative) আইনসভার নিকট প্রেরিত হইতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আইনসভার অনুমোদন থাকিলে প্রস্তাবটিকে ক্যান্টনগুলি ও জনসাধারণের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। আইনসভা যদি প্রস্তাবিত বিলটি অনুমোদন না করে তাহা হইলে আইনসভা ঐ সম্পর্কে নূতন বিল অথবা প্রত্যাখ্যান প্রস্তাব এবং গণভোটের সাহায্যে প্রস্তাবিত বিলটিকে ভোটদাতৃগণের নিকট প্রেরণ করিতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আইনসভার সম্মতি থাকিলে আইনসভা সাধারণ প্রস্তাবটিকে একটি বিলের আকারে ক্যান্টনগুলি ও জনসাধারণের অনুমোদনের জন্য পেশ করে। উভয় ক্ষেত্রেই সংশোধন-প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হইতে গেলে অধিক সংখ্যক ক্যান্টন ও অধিকসংখ্যক ভোটদাতৃগণ কর্তৃক সমর্থিত হওয়া চাই।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Government)

প্রত্যেকটি ক্যান্টনে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি মহাসভা (Grand Council) আছে। এই সভাই ক্যান্টনের আইন-প্রণয়নের অধিকর্তা। তবে মহাসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা গণভোট, গণপ্রস্তাব অধিকার দ্বারা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচ হইতে সাতজন প্রতিনিধি লইয়া প্রত্যেক ক্যান্টনের শাসন-পরিষদ (Administrative Council) গঠিত। আপেন্‌জেল, ইউরি, গ্ল্যারাস্ ও আন্‌তার ওয়াল্‌ডেন্ নামক চারিটি ক্ষুদ্র ক্যান্টনে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্তমান আছে।

সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিক লইয়া গঠিত সাধারণ সভা (General Assembly) এই ক্যান্টনগুলির শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ সভা পাঁচজন সদস্য-সম্বলিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচন করে। এই সমিতি শাসন-সংক্রান্ত দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে।

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় সেনাবিভাগ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিবার জন্য সুইস সরকার স্থায়ী সেনাবিভাগ রাখিতে পারে না। এইজন্য দেশে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তিত করা হইয়াছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই যুদ্ধে যোগদানের জন্য আহ্বান করা যায়।

দলব্যবস্থা (Party System)

সুইজারল্যাণ্ডে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকিলেও শাসন-পরিচালনা কার্যে রাজনৈতিক মতামতের পার্থক্যের উপর আদৌ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না বলিয়া দলগুলির বিশেষ কোন প্রতিপত্তি নাই। সেইজন্যই বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ কোন একটি মাত্র দলের সমর্থক লইয়া গঠিত হয় না। ইহাদের মতান্তর থাকিলেও দলাদলি নাই এবং জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ইহারা দলীয় মত বিসর্জন দিয়া থাকেন।

সুইস্ দেশে কয়েকটি বিশেষ কারণে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা যায় না। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের (Federal Council) সদস্যগণ দলের ভিত্তিতে নিযুক্ত হন না এবং একবার নিযুক্ত হইলে সদস্যগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত বহুদিন উক্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। সুতরাং শাসন-পরিষদে সদস্য নির্বাচনকালে দলীয় কর্মতৎপরতার আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ পুরাতন সদস্যগণই পুনর্নিযুক্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, গণভোট, গণ-নির্দেশ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তিত থাকার ফলে আইনসভার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং আইনসভার সদস্য নির্বাচনকালেও দলীয় মনোভাব ও দলীয় কর্মতৎপরতার অভাব দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী পদগুলিতে গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নিযুক্ত করা

হয়। এই পদগুলির বেতন পরিমাণও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। সুতরাং সরকারী নিয়োগ ব্যাপারের ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থসাধনের সুযোগও নাই। এতদ্ব্যতী সুইস্ জনসাধারণ জাতীয় স্বার্থকে সকল অবস্থায়ই দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে অভ্যস্ত। সুতরাং এই দেশে সংকীর্ণ দলীয় মনোভাবের অভাব দেখা যায়। অন্যান্য দেশের মত সুইস্ রাজনৈতিক দলগুলি জাতি, ভাষা বা ধর্মমতের পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত নয়।

সুইস্ দেশে ফরাসী দেশের মত বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

১। ক্যাথলিক রক্ষণশীল দল (The Catholic Conservative Party)

এই দলটি ক্যান্টনগুলির স্বাধীনতার সমর্থক। পূর্বাপর এই দল জাতীয় সরকারের ক্ষমতা প্রসারণের বিরোধিতা করে। পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা এই দল বিশেষভাবে দাবী করে।

২। চরম পন্থীদল (The Radical Party)

এই দল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষপাতী। ইহারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ইঁহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়ন বিষয়ে গণ-নির্দেশ প্রবর্তনের সমর্থক। পররাষ্ট্র সম্পর্কে এই দল-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ সমর্থন করে।

৩। কৃষকদল (The Farmers' Party)

কৃষির সংস্কার, কৃষির উন্নয়ন ও কৃষিস্বার্থের সংরক্ষণ—ইহাই হইল এই দলের উদ্দেশ্য। কৃষিজাত দ্রব্যের দেশীয় বাজার রক্ষা করিবার জন্য ইহারা বিদেশজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন সমর্থন করে। এই দল ক্যান্টন সরকার অপেক্ষা জাতীয় সরকারের উপর অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করে। ইহারা জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার পক্ষপাতী।

৪। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দল (The Social Democratic Party.)

এই দল শ্রমিক সংঘ ও সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোক লইয়া গঠিত।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দল ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে। সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হইলেও এই দল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই উভয়ের সংযোগ সাধনের পক্ষপাতী। এই দল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের উগ্র সমর্থক।

ইহা ছাড়াও, শ্রমিক দল (Labour Party), স্বতন্ত্র দল (Independent Party), উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দল (Liberal Democratic Party) প্রভৃতি আরও কতিপয় দল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (Methods of Direct Democracy)

সুইজারল্যাণ্ড দেশ গণতন্ত্রের আদি জন্মভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে গণ-নির্দেশাধিকার (Referendum) ও গণপ্রস্তাব অধিকার (Initiative) কার্যকরী হওয়ার ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সার্থক হইয়াছে।

গণ-নির্দেশাধিকারের অর্থ হইল যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে আইনের খসড়াকে চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত করিতে হইলে সে খসড়া আইন জনগণের সংখ্যাধিক্য দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন জনসাধারণের নিকট বিবেচনার্থ প্রেরিত হয়। যদি জনসাধারণ অধিক ভোটে খসড়াটি সমর্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত হয়; আইনসভার আর পৃথক্ অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। জনগণের এই নির্দেশ-অধিকার বাধ্যতামূলক (compulsory) বা ঐচ্ছিক (optional) হইতে পারে। কোন কোন্ বিষয়ে এই নির্দেশাধিকার বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত হইবে শাসনতন্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে। সাধারণতঃ, শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন, গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ আইন ও অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে এই অধিকার বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ঐচ্ছিক গণ-নির্দেশ গ্রহণ করা হয় তখন, যখন (১) একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক (৩০,০০০) অথবা ৮টি ক্যান্টন এই অধিকার দাবী করে। ক্যান্টন সরকারগুলির ক্ষেত্রেও এই দুই জাতীয় গণ-নির্দেশাধিকার প্রয়োগ করা হয়।

গণপ্রস্তাব অধিকারের অর্থ হইল যে, নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সেই আইনের

একটি খসড়া আইনসভার বিবেচনার্থ পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই খসড়াটি বিবেচনার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি নির্বাচকমণ্ডলী ভোটাধিক্যে সেই খসড়াটি অনুমোদন করে তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে। আইন-প্রণয়নের এই সরাসরি অধিকার দুই প্রকারে হইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী যে খসড়া আইনটি আইনসভার নিকট পেশ করিবে সেটি যদি বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ণাংগ গণপ্রস্তাব (Formulated Initiative) বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণ-বর্জিত আইনের প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ গণপ্রস্তাব (Unformulated Initiative) বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় ও ক্যান্টনের শাসনতান্ত্রিক আইনের ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত দুই প্রকারের গণপ্রস্তাব প্রয়োগ করা যায়। পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা যদি মিলিতভাবে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব করে ও প্রস্তাবটি যদি বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত আকারে আইনসভার নিকট পেশ হয় তাহা হইলে ইহাকে পূর্ণাংগ গণপ্রস্তাব বলা হয়।

গণ-নির্দেশ ও গণপ্রস্তাব একটি অন্যটির পরিপূরক। গণপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল অপ্রস্তাবিত আইনের সূচনা করা, আর গণ-নির্দেশের উদ্দেশ্য হইল প্রস্তাবিত আইনকে না-মঞ্জুর করা। আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করিতে অনিচ্ছুক, গণপ্রস্তাব আইনসভাকে সেই আইন প্রণয়নে বাধ্য করে। অপর পক্ষে জনমত উপেক্ষা করিয়া আইনসভা যদি কোন আইন জনগণের উপর প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হয় তাহা হইলে গণ-নির্দেশ প্রয়োগ করিয়া সেইরূপ আইনকে কার্যকরী হইতে দেওয়া হয় না। সুতরাং উভয় পদ্ধতিই জনমতের বিজয় ঘোষণা করে।

সুইস্ গণতন্ত্র ও ইহার সাফল্যের কারণ (Causes of the Success of Swiss Democracy)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ডে যেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তদ্রূপ হয় নাই। দেশের স্বল্প আয়তন এই সাফল্যের একটি কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা একমাত্র কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুইজারল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র না হইলেও ক্ষুদ্র দেশ আরও অনেক আছে, কিন্তু কোথায়ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এতটা সাফল্য-

মণ্ডিত হইতে দেখা যায় নাই। দেশটি ক্ষুদ্র বলিয়া জনগণের মধ্যে পারস্পরিক মতের বিনিময় সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে ও কম সময়ে জনমত সংগ্রহ করিবার সুযোগ থাকায় শাসনকার্যে জনমতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক কাঠামো ইহার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। গ্রেট বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে চূড়ান্ত রকমের ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ধনবৈষম্য না থাকার ফলে এদেশে কোন বংশগত অভিজাত শ্রেণী বা শাসকসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয় নাই। অধিকাংশ অধিবাসীই সম-ব্যবসায়ী ও সম-সামাজিক মর্যাদার অধিকারী বলিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যপরিচালনা করিবার শিক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং কোনরূপ শ্রেণীবিরোধ দ্বারা সুইজারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যাহত হয় নাই। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বহুদিন হইতে ইহার নিরপেক্ষতা নীতি এই দেশকে ধ্বংসাত্মক সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। ফলে, একদিকে জনসাধারণ শান্তিপ্রিয় নাগরিক হইয়া গঠিত হইয়াছে, অন্যদিকে তাহাদের মধ্যে সহনশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহনশীলতা ও অপরের মতামত-সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব সুইস জাতির একটি প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও একযোগে দলবদ্ধভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া এত জনপ্রিয় হইয়া থাকেন যে, একই সদস্য বহুদিন পর্যন্ত পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। শাসন-পরিষদের সাতজন সদস্যই পর্যায়ক্রমে এক বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কি পরিমাণে তাঁহারা গণতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। আত্মকর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থাকিয়া তাঁহারা জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এরূপ বিবেচক নাগরিক অন্যদেশে দুর্লভ। গণভোট, গণপ্রস্তাব অধিকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি রাজনৈতিক জীবনে তাঁহাদের সংযম ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়া গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতির সমন্বয়ে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকগণের মধ্যে যে বলিষ্ঠ ও সহনশীল দেশাত্মবোধের উন্মেষ হইয়াছে,

তাহার ফলে সুইস জাতি গণতন্ত্রের সার্থক ধারকরূপে আজ সমগ্র সভ্য-জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইলেও সুইস শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগ হয় নাই। উনিশটি ক্যাণ্টন ও ছয়টি অর্ধক্যাণ্টন লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।

২। লিখিত শাসনতন্ত্র। অন্যান্য শাসনতন্ত্র হইতে অপেক্ষাকৃত বহু বিস্তারিত।

৩। শাসনতন্ত্রে কোন অধিকারপত্র নাই।

৪। অনমনীয় শাসনতন্ত্র।

৫। শাসনকর্তৃপক্ষ সমক্ষমতাপন্ন একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত ও প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক-পদ্ধতির দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ—যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ—আইনসভার উভয় পরিষদ কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত সাতজন সদস্য লইয়া শাসন-পরিষদ গঠিত। ইঁহাদের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সদস্যগণ আইনসভার সদস্য না হইলেও আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া ইঁহাদের পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে না। কার্যকাল শেষ হইলেও সদস্যগণ পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার গুণগুলির অধিকারী হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—জাতীয় সভা—রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়-পরিষদ লইয়া জাতীয় সভা গঠিত। চুয়াল্লিশ জন ও একশত ছিয়ানব্বই জন সদস্য লইয়া যথাক্রমে রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়পরিষদ গঠিত হয়।

সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও জাতীয়পরিষদের ক্ষমতা কার্যতঃ অনেক

বেশী। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, সন্ধিচুক্তি-অনুমোদন, যুদ্ধ-ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন করা আইনসভার প্রধান কার্য। রাষ্ট্রপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি নিয়োগ ও দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তি-মার্জনার জন্য উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আবশ্যক। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা আইনসভার ক্ষমতা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দ্বারা ছয় বৎসরের জন্য ছাব্বিশ হইতে আটাশ জন বিচারপতি নির্বাচিত হইয়া প্রধান বিচারালয় গঠিত হয়। এই বিচারালয়ের আদিম ও আপীল বিচারের ক্ষমতা রহিয়াছে। ক্যান্টন সরকারগুলি রচিত আইন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-রচিত আইনের উপর ইহার সে ক্ষমতা নাই। শাসনবিভাগীয় বিচারালয়রূপেও ইহার কিছু কার্য সম্পাদন করিতে হয়।

শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি : ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক উত্থাপিত ও গৃহীত সংশোধন-প্রস্তাব অধিকাংশ ক্যাণ্টন ও অধিকাংশ ভোট-দাতার অনুমোদনে কার্যকরী হয়।

২। পঞ্চাশ সহস্র ভোটদাতার লিখিত আবেদনক্রমে আইনসভা সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই আইনসভাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাবটিকে গণ-ভোটের জন্য পেশ করিতে হয়।

প্রশ্নাবলী

1. "Real democracy in operation" How far is this characterisation true of the Swiss Constitution ?

(Madras 1937)

2. Discuss the position and functions of the Federal Executive in the Swiss Constitution. (C. U. 1955)

3. State the main features of the Swiss System of Government. (C. U. 1958)

4. Explain how the Swiss Constitution provides for direct popular legislation. (C. U. 1959)

প্রশ্ন ও উত্তরের ইংগিত

বৃটিশ শাসনতন্ত্র

1 Contrast the salient features of the Constitutions of Great Britain and the United States

উঃ ইঃ—বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক বিচার করিতে গেলে প্রথমেই এই উভয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্যের উপর দৃষ্টি পড়ে। পার্থক্যগুলি হইল: ১। বৃটিশ শাসনতন্ত্র বৃটেনে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে, আর মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয়। ২। বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অলিখিত ও নমনীয় মার্কিন শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। ৩। বৃটেনে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা, আর মার্কিন দেশে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা। ৪। বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, অপর পক্ষে, আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র। ৫। বৃটিশ শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রাধান্য, আর মার্কিন দেশে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। ৬। বৃটেনে আইনের অনুশাসন দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ৭। বৃটিশ শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতা পৃথকীকরণ করা হয় নাই, এজন্য বৃটেনের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। মার্কিন শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার সূক্ষ্ম পৃথকীকরণ সাহায্যে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা হইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে উভয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে বহু পার্থক্য থাকিলেও এই পার্থক্যগুলির অন্তরালে উভয় শাসনতন্ত্রের কতিপয় মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

(পৃ: ১৪৮—১৫১)

2. Discuss the relation between the Laws and Conventions of the Constitution of England. Discuss Dicey's views on the nature of the sanction behind them.

উঃ ইঃ—বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত, যথা, (১) শাসনতান্ত্রিক আইন ও (২) প্রথাগত বিধান। আইনগুলি

আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়, আর প্রথাগত বিধানগুলি আইনসভা-নিরপেক্ষ-ভাবে সৃষ্টি হয়। আবার আইনগুলি বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা যায়। কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বিচারালয় সাহায্যে বলবৎ করা যায় না। তবে বর্তমানে যাহা প্রথাগত বিধান বলিয়া পরিগণিত কালক্রমে সেগুলি আইনে পরিণত হইতে পারে—যথা, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন। প্রথাগত বিধানগুলি প্রচলিত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ধিত হইলেও শেষ পর্যন্ত এই বিধানগুলির ভিত্তিতেই নূতন আইন সৃষ্টি হয়।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিবার প্রধান কারণ হইল জনমতের প্রভাব, আইন ভঙ্গ করিবার ভয়ে নহে। (পৃঃ ৫—৮)

3. Discuss the position of the Crown in the British Constitution.

উঃ ইঃ—বৃটিশ শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন রাজা। রাজাকে কেন্দ্র করিয়াই বৃটিশ শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে। যদিও বর্তমানে রাজা রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন তথাপি তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতা কালক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া রাজতন্ত্রে আরোপিত হইয়াছে। বর্তমানে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট সভার সদস্যগণের সম্মতি ক্রমে কেবিনেট সদস্যগণ এই প্রতিষ্ঠানগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রাজার ক্ষমতা জনগণের প্রতিনিধিগণ দ্বারা অব্যাহতভাবে পরিচালিত হয়। রাজা স্ব-ইচ্ছায় কোন কার্য করিতে পারেন না। সুতরাং বলা হয় যে, রাজার মৃত্যু নাই এবং তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই।

রাজার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা না থাকিলেও ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তি শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে। রাজা মন্ত্রিগণকে উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন, নিষেধ করিতে পারেন এবং পরামর্শ দান করিতে পারেন। রাজাই হইলেন জাতির উচ্চ আদর্শের প্রতীক ; সমগ্র কমনওয়েল্থভুক্ত রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের একমাত্র নিদর্শন। রাজার অভাবে এই ঐক্য বিনষ্ট হইতে পারে। (১৪—২০ পৃষ্ঠা)

4. What constitutes the Executive in England? Describe its relation to the legislature.

উঃ ইঃ—গ্রেট ব্রটেনের শাসনকর্তৃপক্ষকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা, রাজা, কেবিনেট ও স্থায়ী আমলাতন্ত্র। রাজা হইলেন নামসর্বস্ব প্রধান, রাজাসহ কেবিনেট হইল রাজনৈতিক ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসনকর্তৃপক্ষ, কেবিনেট হইল প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ এবং কার্যকালের স্থায়িত্বের জন্য আমলাতন্ত্রকে স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়।

রাজার সহিত আইনসভার সম্পর্ক হইল যে, রাজা আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজা আইনসভা আহ্বান করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে পারেন বা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইন-প্রণয়নে রাজার সম্মতি অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে রাজার এই ক্ষমতা মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

কেবিনেট হইল প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ। কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার সদস্য এবং তাঁহারা তাঁহাদের শাসননীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার বিশেষ করিয়া কমন্স সভার নিকট দায়ী। কিন্তু বর্তমানে কেবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে পার্লামেন্ট সভা শুধু কেবিনেট নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমে সমর্থন জ্ঞাপন করে। আইনসভা কর্তৃক সৃষ্ট হইলেও বর্তমানে কেবিনেট আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। (পৃঃ ১৪, ২৯— ৩২)

5 How is the British House of Lords composed? Is it now a very important limb of the British Legislature?

উঃ ইঃ—গ্রেট ব্রটেনের আইনসভার উচ্চ কক্ষ হইল লর্ডসভা। ছয়টি বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৯১০ জন সদস্য লইয়া এই প্রাচীন আইনসভা গঠিত, যথা, ১। রাজবংশের কতিপয় ব্যক্তি, ২। জন্মগত উত্তরাধিকার-সূত্রে নির্বাচিত লর্ডগণ, ৩। স্কটল্যাণ্ডের নির্বাচিত ১৬ জন লর্ড, ৪। ২৮ জন আইরিশ লর্ড, ৫। ২৮ জন ধর্মযাজক, ৬। আইন বিশারদ লর্ডগণ।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই আইনের সংশোধন হওয়ার ফলে লর্ডসভার আইন-প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে। এই সভা শাসনকর্তৃপক্ষকেও নিয়ন্ত্রণ করিতে অক্ষম। সুতরাং ক্ষমতার দিক দিয়া এই সভার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। তবে এই সভা একটি প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। ইহার গুরুত্ব-

পূর্ণ বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে এবং বহু খ্যাতনামা ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই সভার সদস্যপদ অলংকৃত করিয়া থাকেন। কেবিনেট গঠনে এই সভার অবদান উপেক্ষণীয় নহে। কমন্স সভার দ্রুত আইন-প্রণয়নে বাধা দিয়া এই সভা দেশে জনমত জাগ্রত করিতে পারে। ইহা ছাড়া, এই সভা আইনের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে পারে এবং বিতর্ক-বিহীন আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। সুতরাং এই সভাকে একেবারে অকেজো বলা সমীচীন নহে। (পৃঃ ৪৪—৪৬, ৪৮—৪৯)

6. Distinguish between a Public Bill and a Private Bill. What are the stages through which a Public Bill must pass before it can become an Act of Parliament

উঃ ইঃ—আইনের প্রস্তাবগুলিকে প্রধানতঃ সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়া (Public Bill) ও বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়া (Private Bill) বলা হয়। সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়াগুলির বিষয়বস্তু জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন, দেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ বা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার আইন। এই খসড়াগুলি বে-সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত হইবার কোন আইনগত বাধা না থাকিলেও সাধারণতঃ সরকারী সদস্যগণ (মন্ত্রিমণ্ডলী) কর্তৃক উত্থাপিত হয়।

বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি সাধারণতঃ বে-সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক আইনসভায় পেশ করা হয়। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত ব্যাপার হইল এই বিলগুলির বিষয়বস্তু। কোন শহরে নূতন মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্টি করা বা কোন নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা, ইত্যাদি বিশেষ স্বার্থের জন্য এই আইনগুলির প্রণয়ন করা হয়। উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির কিছু পার্থক্যও আছে।

সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়াগুলি নিম্নলিখিতভাবে আইনে পরিণত হয়। ১। খসড়া প্রণয়ন, ২। আইনসভায় পেশ করা, ৩। প্রথম পাঠ, ৪। দ্বিতীয় পাঠ, ৫। কমিটিতে প্রেরণ, ৬। কমিটি কর্তৃক বিবরণ প্রদান, ৭। তৃতীয় বা শেষ পাঠ। একটি কক্ষ কর্তৃক এইরূপে খসড়াটি অনুমোদিত হইলে অপর কক্ষেও অনুরূপ পদ্ধতির সাহায্যে বিলটি

পাস করিতে হয়। উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাজার সম্মতিতে খসড়াটি আইনে পরিণত হয়। (পৃঃ ৫৮—৬০)

7 "The English system of Government is at once a monarchy, aristocracy and democracy."

Examine the statement.

উঃ ইঃ—বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র—অতীত, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। বৃটেনের বংশানুক্রমিক রাজা হইলেন রাজতন্ত্রের প্রতীক। কিন্তু রাজা বর্তমানে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়া গণতন্ত্র প্রসারের সহায়ক হইয়াছেন। লর্ডসভা হইল অভিজাততন্ত্রের নিদর্শন। কিন্তু বৃটেনের এই অভিজাত শ্রেণী স্থায়ী নহে—অভিজাত শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান। বর্তমানে কার্যতঃ ক্ষমতাবিহীন অভিজাততান্ত্রিক লর্ডসভার অস্তিত্বের দ্বারা বৃটেনে গণতন্ত্রের প্রসার কোনমতেই বাধা পায় নাই। জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমন্সসভাই হইল বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতীক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান উৎস। সুতরাং শাসনতন্ত্রের কাঠামো মিশ্র হইলেও গণতান্ত্রিক আদর্শই বৃটেনের শাসনব্যবস্থার প্রধান কার্যকরী শক্তি।

(পৃঃ ৮৫—৮৬)

8 "The British Legislature is anything but legislative in its main functions." Discuss.

উঃ ইঃ—উপরি-উক্ত মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ পার্লামেন্ট আর যাহাই করুক না কেন আইন-প্রণয়ন কার্যে ইহার কোন ক্ষমতা নাই। পার্লামেন্ট সভার কার্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, লর্ডসভার আইন-প্রণয়নে কার্যতঃ কোন ক্ষমতা নাই। কমন্সসভা সাধারণ আইন ও অর্থ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বর্তমানে এই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার অনুপ্রেরণা কেবিনেটের হস্তগত। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেন্টের বে-সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত হইতে পারে না। পার্লামেন্টের সদস্যগণ শুধু কেবিনেট কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনগুলি সমর্থন করিয়া যান। হয়ত বা ইহার সমালোচনা করিতে পারেন—কিন্তু সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে অক্ষম। সত্য বটে, কেবিনেট সবকিছু কাজই পার্লামেন্টের

সম্মতিক্রমে করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পার্লামেন্ট কেবিনেট অনুসৃত নীতি ও কেবিনেট প্রস্তাবিত আইন সমর্থন না করিয়া পারে না। কারণ, কেবিনেট ইচ্ছা করিলে কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নিবাচনের আদেশ দিতে পারে। বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনও কেবিনেটের সমর্থন না পাইলে পাস পাওয়া দুরূহ। সুতরাং আইন প্রণয়ন করা বৃটিশ আইনসভার কাজ হইলেও এই সভা কার্যতঃ আইন প্রণয়ন করে না, শুধু আইন-প্রণয়নে সম্মতি দান করে। (পৃঃ ৫২—৫৩, ৩২—৩৮)

9 Discuss the position and functions of the Privy Council in the British system of Government

উঃ ইঃ—প্রিভি কাউন্সিল হইল রাজার মন্ত্রণাসভা। নর্মান রাজাদের সময় ইহার উৎপত্তি হইয়া কালক্রমে ইহা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়। প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, জরুরী অবস্থায় রাজাকে পরামর্শদান করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক কাউন্সিলার লইয়া গঠিত কেবিনেটের উৎপত্তি হয়। কালক্রমে এই কেবিনেটই রাজার প্রকৃত মন্ত্রণা-সভায় পরিণত হয় ও মূল সংস্থা প্রিভি কাউন্সিল নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের আইনসিদ্ধ অস্তিত্ব থাকিলেও মন্ত্রণা সভা হিসাবে ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। এই সভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় ৩৩০। সদস্যগণ রাজা কর্তৃক আজীবন সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়া থাকেন। রাজার অভিষেক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে এই সভার সদস্যগণ মিলিত হইয়া থাকেন। বর্তমানে এই সভার কার্য শিক্ষা ও কৃষি সংস্থা, বিচারকার্য পরিচালনা সংস্থা প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। সপরিষদ রাজাদেশ প্রবর্তন করাই হইল বর্তমানে এই সভার প্রধান কার্য। (পৃঃ ২১—২২)

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র

10 State the salient features of the Constitution of the U. S. S R

উঃ ইঃ—১। পনেরটি আঞ্চিক রাজ্যের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত। শাসনতন্ত্রের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যথা, আঞ্চিক রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার অধিকার, স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করিবার অধিকার ইত্যাদি। ২। এই শাসনতন্ত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। ৩। শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার ও অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা ও নাগরিক কর্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৪। আইনসভার উভয় পরিষদকে সমান ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। ৫। দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া এই রাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ আইনসভার উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন। ৬। আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত ৩৩জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম হইল এই শাসনতন্ত্রের আর একটি অভিনবত্ব। ৭। শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল নির্বাচন পদ্ধতিতে নিযুক্ত বিচারপতিগণ লইয়া গঠিত বিচারালয়। বিচারকার্যে নাগরিক বিচারকগণের নিয়োগও বিচার-ব্যবস্থার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ৮। এই শাসনতন্ত্রের আর একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার এক-দলীয় (সাম্যবাদী) শাসনব্যবস্থা। (পৃঃ ৯৮—১০২)

11 Describe the fundamental rights and duties of a citizen in the U. S. S R

উঃ ইঃ—সর্বদেশের শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখ ব্যতীতও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এরূপ কতকগুলি কার্যকরী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, যাহার দ্বারা নাগরিকগণ এই মৌলিক অধিকারগুলির সহায়তায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হন। মৌলিক অধিকারগুলির সহিত কতকগুলি মৌলিক কর্তব্যের সন্নিবেশ হইল সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অধিকারগুলি হইল :

১। কাজ করিবার অধিকার, সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি হইল, যে কাজ করে না, সে খাইতেও পাইবে না। এই ব্যবস্থার দ্বারা সমাজ হইতে শ্রমবিমুখ পরজীবী সম্প্রদায় উৎসাদিত করিয়া শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২। বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার। শ্রমিকগণকে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে হয় না। তাহাদের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। ৩। শিক্ষার অধিকার—প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। টাকার অভাবে কেহই অশিক্ষিত থাকে না। ৪। সকলের সমানাধিকার—স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে। ৫। ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার—সোভিয়েত নাগরিকগণ বর্তমানে স্বাধীনভাবে ধর্মমত পোষণ ও প্রচার করিতে পারেন। ৬। বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা—নাগরিকগণ শ্রমিকগণের স্বার্থের সহিত সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। ৭। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাধীনতা—বিনা বিচারে বা সরকারী অভিযোক্তার বিনা অনুমোদনে কাহাকেও আটক করা যায় না। চিঠিপত্রের ও পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করিবার অধিকারও নাগরিকগণকে প্রদত্ত হইয়াছে। ৮। আশ্রয় পাইবার অধিকার—কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীগণ সোভিয়েত দেশে আশ্রয় পাইতে পারেন। ৯। সংঘ গঠন করিবার অধিকার—রাজনৈতিক দল গঠন করা ব্যতীত অন্য সর্ববিধ সংঘ নাগরিকগণ গঠন করিতে পারে।

মৌলিক কর্তব্য : ১। প্রত্যেক সমর্থ নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হইল কাজ করা, ২। আইন-কানুন মান্য করা ও শ্রম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, ৩। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা ও ৪। সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করা।

(পৃঃ ১০২—১০৭)

12. Describe the Constitution and functions of the Supreme Soviet of the U. S. S. R.

উঃ ইঃ—সুপ্রীম সোভিয়েত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ। জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত—এই দুইটি পরিষদ লইয়া সুপ্রিম সোভিয়েত গঠিত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী

বিভিন্ন জাতিগুলির প্রতিনিধি লইয়া জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত গঠিত। সমগ্র দেশের নাগরিকগণের প্রতিনিধি লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত গঠিত। উভয় পরিষদের কার্যকাল ৪ বৎসর কিন্তু তৎপূর্বে প্রেসিডিয়াম উভয় পরিষদই ভাঙ্গিয়া দিতে পারে।

উভয় পরিষদই সমান ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নির্বাচন, প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচন, সুপ্রিম-কোর্টের বিচারপতিগণকে নির্বাচন করা ইহার কার্য। (পৃঃ ১১১- ১১৫)

13. Give a brief account of the Constitution and functions of the Council of Ministers in the Soviet Constitution.

উঃ ইঃ—সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদ প্রায় ৬০ জন সদস্য লইয়া গঠিত। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ নির্বাচিত হন। দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া এই পরিষদ গঠিত হয়।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা ও বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক শাসনব্যবস্থা চালু রাখা ইহার প্রধান কার্য। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, বৈদেশিক নীতি স্থির করা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা, এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত। মন্ত্রিপরিষদ ইহার কার্যের জন্য সুপ্রিম সোভিয়েত এবং সুপ্রিম সোভিয়েতের অবকাশকালে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী। (পৃঃ ১০৭—১১০)

14. How is the Presidium of the Supreme Soviet composed? Enumerate its functions.

উঃ ইঃ—অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাজা বা রাষ্ট্রপতি নাই। তৎপরিবর্তে ৩৩ জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য পরিচালনা করে। প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

প্রেসিডিয়াম আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সভা সরাসরি আইন প্রণয়ন করিতে না পারিলেও আইনানুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারে। সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদ এই সভার নিকট দায়ী থাকে। সুপ্রিম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ

ঘটিলে উভয় পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া দুই মাসের মধ্যে উহা নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। এই সভা রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে ও সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করে। সুপ্রিম সোভিয়েত প্রণীত কোন আইনের সহিত আঙ্গিক রাজ্য প্রণীত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে এই সভা শেষোক্ত আইনকে বাতিল করিতে পারে। সুতরাং সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক, শাসনবিষয়ক ও বিচারবিষয়ক ক্ষমতাগুলি প্রেসিডিয়ামে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। (পৃঃ ১১৫—১১৮)

15. Briefly describe the judicial system in the U. S. S. R.

উঃ ইঃ—সুপ্রিম সোভিয়েত কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ৩০জন বিচারপতি লইয়া গঠিত সুপ্রিম কোর্ট হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়। ইহার আদিম ও আপীল মামলা শুনিবার ক্ষমতা আছে। ইহার কার্য ৫টি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনসভা প্রণীত কোন আইনকে এই বিচারালয় নাকচ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, আঙ্গিক রাজ্যগুলির, স্ব-শাসিত প্রদেশ, স্ব-শাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার প্রধান বিচারালয় আছে। সর্বনিম্ন আদালত হইল জনসাধারণের আদালত। সুপ্রিম সোভিয়েতের নির্দেশে প্রয়োজনমত বিশেষ আদালতও গঠিত হইতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীর স্থানীয় বিচারালয়গুলির বিচারকগণ স্থানীয় সোভিয়েত সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সমস্ত বিচারালয়ের কার্যই নাগরিক-বিচারকের সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—১। বিচারকগণ নির্বাচিত হন, ২। বিচার-কার্যে নাগরিক-বিচারকগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, ৩। স্বল্পব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে স্থানীয় ভাষায় বিচারকার্য পরিচালিত হয়, ৪। শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হইল অপরাধীকে পরবর্তী জীবনে সু-নাগরিক করিয়া গড়িয়া তোলা।

(পৃঃ ১১৯—১২২)

16. Broadly indicate the structure of the state in the U. S. S. R.

উঃ ইঃ—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া একটি বৃহত্তর জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে

সমগ্র জাতীয় ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এরূপ সুনিপুণভাবে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান অন্য কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। ১। আঞ্চিক রাজ্য, ২। স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, ৩। স্ব-শাসিত অঞ্চল ও ৪। জাতীয় এলাকা—এই চারিটি হইল সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রত্যেকটি স্বায়ত্তশাসনশীল সংস্থা পৃথগ্‌ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় ইহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকারী। (পৃঃ ১৩৫—১৩৮)

17. Discuss the role of the Communist Party in the Soviet system of Government.

উঃ ইঃ—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র রাজনৈতিক দল হইল সাম্যবাদী দল। এই দলের প্রভাব শাসনসংস্থাগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সাম্যবাদী দলের হস্তেই সমুদয় ক্ষমতা-কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। দলের পলিটব্যুরো নামক সংস্থা হইল দলীয় ক্ষমতার উৎস। (পৃঃ ১২৩—১২৪)

18. Discuss how far the U. S. S. R. is a socialist state of workers and peasants

Is there any scope for private enterprise in the U.S.S.R.?

উঃ ইঃ—সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া শোষণমুক্ত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হইল সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থার মূলনীতি হইল 'কাজ করা' এবং যাহারা কাজ করে না তাহারা ভোগ করিতে পাবে না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহাদের কোন স্থান নাই। কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও বুদ্ধিজীবী কর্মঠ ব্যক্তিগণই হইল সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রকৃত নাগরিক এবং এই কর্মিবৃন্দের প্রতিনিধি লইয়াই সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা গঠিত।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমগ্র সম্পত্তির মালিক হইল রাষ্ট্র অথবা যৌথ-খামার বা সমবায় সমিতি—কোন ব্যক্তি-বিশেষ নয়। স্বোপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, পারিবারিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্রায়তনের কুটিরশিল্প ও ব্যক্তিগত ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য নাগরিকগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে রাখিতে পারেন এবং এইগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করিতে পারেন। মুনাফার লোভে নিছক ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন কারবার পরিচালিত হইতে পারে না। (পৃঃ ১৩০—১৩৩)

মার্কিন শাসনতন্ত্র

19. What do you mean by the Constitution of the United States of America today? Explain how the Constitution of the U. S. A. has changed since it first came into existence.

উঃ ইঃ—মার্কিন শাসনতন্ত্র হইল লিখিত। পাঁচটি উপাদান লইয়া বর্তমান শাসনতন্ত্র গঠিত, যথা, ১। আদি শাসনতন্ত্র, ২। ২৩টি সংশোধন আইন, ৩। কংগ্রেস সভা ও বিভিন্ন রাজ্যসভাগুলি কর্তৃক রচিত শাসন-তান্ত্রিক আইন, ৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত ভাষ্য। নানাবিধ প্রথাগত বিধান।

আদি শাসনতন্ত্র নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কংগ্রেস সভা কর্তৃক পরিবর্তন ব্যতীত প্রথাগত বিধানের উৎপত্তি এবং বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা আদি শাসনতন্ত্র বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রথাগত বিধানের ভিত্তিতেই মার্কিন কেবিনেট গঠিত হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট ইহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার উপর বহু নূতন ক্ষমতা অর্পণ করিবার ফলে মূল শাসনতন্ত্রের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। (পৃঃ ১৪৪—১৪৬)

20. An American writer has said that the Constitution of the U. S. A. is more flexible than the British one. How would you justify this view point?

উঃ ইঃ—সাধারণতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও মার্কিন শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় বলা হয়, কারণ, বৃটিশ শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে সাধারণ আইনসভা কর্তৃক পরিবর্তিত হয়। অপর পক্ষে, মার্কিন শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক জটিল পদ্ধতি ব্যতীত পরিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছাড়াও প্রথাগত বিধানের উৎপত্তি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাত্র ২৩টি সংশোধন সাধিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার ক্ষমতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত

দ্বারা ধীরে ধীরে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ তাহা কল্পনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য উপায়ে মার্কিন শাসনতন্ত্রের সহজ পরিবর্তন সম্ভব। এইজন্য বলা হয় যে, মার্কিন শাসনতন্ত্রও বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ন্যায় সুপরিবর্তনীয়।

(পৃঃ ৩৮৩—৩৮৫—১ম খণ্ড)

21. Discuss the position of the President of the U. S. A. in relation to his Cabinet and to the Congress.

উঃ ইঃ—দশজন সচিব লইয়া মার্কিন কেবিনেট গঠিত। রাষ্ট্রপতি ইহাদের নিযুক্ত করেন এবং তিনিই ইঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন। সচিবগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী এবং তাঁহাদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। তাঁহারা রাষ্ট্রপতিকে যে পরামর্শদান করেন, রাষ্ট্রপতি তাহা গ্রহণ না করিতেও পারেন।

ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যনীতি প্রয়োগের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনকর্তৃপক্ষ (রাষ্ট্রপতি) ও আইনসভা (কংগ্রেস) পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। রাষ্ট্রপতি ভোটদাতাগণের দ্বারা পরোক্ষে নির্বাচিত হন। আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয় না। আবার আইনসভাও রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণমুক্ত। রাষ্ট্রপতি আইনসভা আহ্বান করিতে বা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পরোক্ষ সংযোগ আছে। (পৃঃ ১৫৬—১৫৯)

22. Describe the composition of the American Senate and discuss why it is called the most powerful Second Chamber in the world

উঃ ইঃ—প্রত্যেকটি রাজ্য হইতে সমান প্রতিনিধিত্ব-নীতি অনুসারে ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত দুইজন প্রতিনিধি লইয়া মোট ১০০ জন সদস্য দ্বারা সিনেট সভা গঠিত। সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং এই সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি সিনেট সভার সভাপতিত্ব করেন।

সিনেট সভার অনুমোদন ব্যতীত নিম্ন পরিষদ কোন্ বিল আইনে পরিণত করিতে পারে না। অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপিত করিতে না পারিলেও সিনেট এই বিলগুলির ব্যাপক পরিবর্তন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতির

নিয়োগক্ষমতা ও পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত চুক্তি করিবার ক্ষমতা এই সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার ক্ষমতাও এই সভার হস্তে ন্যস্ত। (পৃঃ ১৭২—৭৩, ১৭৫—১৭৮)

23. Discuss the position and functions of the Supreme Court in the constitutional system of the U S. A.

উঃ ইঃ—যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট হইল সর্বোচ্চ বিচারালয়। ইহার আদিম ও আপীল বিভাগীয় ক্ষমতা আছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে এই বিচাবালয় ইহার আদিম বিচারক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পাবে: ১। যুক্তবাষ্ট্র কর্তৃক কোন আঙ্গিক রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২। আঙ্গিক রাজ্যগুলিব পারস্পরিক অভিযোগ, ৩। রাষ্ট্রদূত, কন্সাল প্রভৃতি সংক্রান্ত মামলা, ৪। একটি আঙ্গিক রাজ্য ও অন্য রাজ্যের নাগরিকগণের মধ্যে বিরোধ, ৫। যুক্তরাষ্ট্রেব বিরুদ্ধে কোন আঙ্গিক রাজ্যের অভিযোগ। আপীল ক্ষমতা—১। যুক্তরাষ্ট্রীয় নিম্নতম বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২। আঙ্গিক বাজ্যের বিচারালয়ে বিচারীকৃত যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলাব অভিযোগ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুপ্রিম কোর্ট হইল শাসনতন্ত্রের রক্ষক। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি ও সরকারের বিভাগগুলি যদি শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতার বহির্ভূত কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে এই বিচারালয় ঐরূপ কার্যকে শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে। ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্রের বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করিয়া শাসনতন্ত্রের অনমনীয় ভাব দূর করিয়াছে। (পৃঃ ১৯৫—১৯৭)

24. "The judiciary in the United States has a competence far beyond that of the judiciary of the United Kingdom."

উঃ ইঃ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অতুলনীয়। ইহা ব্যাপক আদিম বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এরূপ ব্যাপক

আদিম ক্ষমতা নাই। আপীল মামলার বিচারক্ষেত্রেও ইহার ক্ষমতা অন্যান্য দেশের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট আইনসভা-প্রণীত আইনগুলিকে শুধু শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া অসিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে তাহা নয়, এই বিচারালয় আইনসভা-প্রণীত আইনের গুণাগুণ বিচার করিতে পারে। এইরূপে মার্কিন দেশের সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তবে এ স্থলে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার আপীল শুনিবার ক্ষমতা নাই। (পৃঃ ১৯৩—১৯৭)

25. Compare the place of parties in the working of the Constitutions of the United States and Great Britain.

উঃ ইঃ—গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—উভয় দেশেই দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল দেখা যায়। দলের সংগঠনও উভয় দেশেই প্রায় একই নীতিতে পরিচালিত হয়। উভয় দেশে দলের কার্য আইনের গণ্ডির মধ্যে পরিচালিত হয় এবং দলগুলি বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি বর্জন করিয়া চলে। কিন্তু গ্রেট বৃটেনে দলীয় নীতিই হইল সরকারী নীতি এবং ক্ষমতায় আসীন শাসকগণ হইলেন দলের প্রতিনিধি মাত্র। মার্কিন দেশে দলের কাজ হইল ভোটদাতাগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা ও প্রার্থী নির্বাচন করা। গ্রেট বৃটেনে দল সরকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মার্কিন দেশে দল সরকারের বাহিরে কাজ করে। (পৃঃ ২০৯)

সুইস শাসনতন্ত্র

26 Discuss the main features of the Swiss Constitution.

উঃ ইঃ—১। উনিশটি ক্যান্টন ও ছয়টি অর্ধ-ক্যান্টন লইয়া সুইস যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইলেও সুইস শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগ হয় নাই। ২। এই শাসনতন্ত্র বিস্তারিতভাবে লিখিত। ৩। শাসনতন্ত্রে কোন অধিকার-পত্র না থাকিলেও বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ৪। অনমনীয় হইলেও শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। ৫। এই শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্য বিধাননীতি বিশেষ স্থান পায় নাই। ৬। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানে শাসনক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির (মন্ত্রিপরিষদের) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ৭। গণ-নির্দেশ, গণ-প্রস্তাব অধিকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি এই শাসনতন্ত্র দ্বারা বলবৎ করা হইয়াছে। (পৃঃ ২১৭—২১৮)

27. Point out the characteristic features of the Federal Council of Switzerland and discuss its position in relation to the Federal Assembly.

উঃ ইঃ—সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত সাতজন সদস্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিষদ গঠিত হয়। আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে অথবা আইনসভার সদস্য নন এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিগণ নির্বাচিত হইতে পারেন। মন্ত্রী নির্বাচিত হইলে তাঁহারা আর আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না, তবে তাঁহারা আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন ও আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইলেও ইঁহাদের পুনর্নির্বাচনে বাধা নাই এবং নির্ধারিত কার্যকালের মধ্যে ইঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। আইনসভা কর্তৃক এই পরিষদের নীতি বা কার্যক্রম অনুমোদিত না হইলেও ইঁহারা পদত্যাগ করেন না। আইনসভার ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইঁহারা ইঁহাদের কার্যক্রমের পরিবর্তন সাধন করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

থাকেন। এইরূপে সুইস শাসনব্যবস্থায় গ্রেট বৃটেনের 'পার্লামেণ্টারী' শাসনব্যবস্থা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল' শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

এই শাসন পরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল শাসনক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না হইয়া সম-ক্ষমতাসম্পন্ন সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। পরিষদ-পতি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিলেও তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। তিনি এক বৎসরের অধিককাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।

সুইস শাসনপরিষদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দল-নিরপেক্ষ সার্বজনীন ভিত্তি। এই পরিষদ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইঁহারা দেশের জনমতের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিতে পারেন। বিভিন্ন মতের ধারক হওয়া সত্ত্বেও পরিষদ সদস্যগণের ঐক্য ও সংহতি এরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কোন সদস্যেরই কখনও এককভাবে পদত্যাগ করিবার কারণ ঘটে না। (পৃঃ ২২৭, ২৩৫—২৩৬)

28. Discuss the method of amendment of the Swiss Constitution.

উঃ ইঃ—১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক উত্থাপিত ও গৃহীত সংশোধন প্রস্তাব অধিকাংশ ক্যান্টন ও অধিকাংশ ভোটদাতার অনুমোদনে কার্যকরী হয়।

২। পঞ্চাশ সহস্র ভোটদাতার লিখিত আবেদনক্রমে আইনসভা সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আইনসভাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাবটিকে গণভোটে দিতে হয়। (পৃঃ ২৩৭—২৩৮)

29. Explain how the Swiss Constitution provides for direct popular legislation.

উঃ ইঃ—সুইজারল্যাণ্ডে দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়নের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথমটি হইল গণ-নির্দেশাধিকার। ইহার অর্থ হইল আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন ভোটদাতাগণের নিকট বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়। যদি ভোটদাতাগণ

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে খসড়াটি সমর্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত হয়। আইনসভার আর পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। গণ-নির্দেশাধিকার বাধ্যতামূলক বা ঐচ্ছিক হইতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল গণপ্রস্তাব অধিকার। ইহার অর্থ হইল যে, নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সেই আইনের একটি খসড়া আইনসভার বিবেচনার্থে পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই খসড়াটি বিবেচনার জন্য ভোটদাতাগণের নিকট পুনরায় পাঠাইতে পারে। নিবাচকমণ্ডলী ভোটাধিক্যে খসড়াটি অনুমোদন করিলে তাহা আইনে পরিণত হয়।

সুতরাং গণপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল অপ্রস্তাবিত আইনের সূচনা করা, আর গণনির্দেশের উদ্দেশ্য হইল প্রস্তাবিত আইন না-মঞ্জুর করা।

(পৃঃ ২৪০—২৪১)

30. How are the judges of Federal Court in Switzerland chosen ? What is its role in maintaining the balance of power between the Confederation and the Canton ?

উঃ ইঃ—সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণ ছয় বৎসরের জন্য আইনসভার উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সুইস দেশের প্রথা অনুসারে তাঁহারা বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলে পুনর্নির্বাচন দ্বারা তাঁহাদের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত রাখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যান্টনগুলির মধ্যে অথবা বিভিন্ন ক্যান্টনগুলির মধ্যে দেওয়ানী আইন-সম্পর্কিত মামলার বিচার এই আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র-বিরোধী অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইন-বিরোধী বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ক্যান্টনগুলি প্রণীত আইন শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বলিয়া বাতিল করিতে পারে। (পৃঃ ২৩৬—২৩৭)

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সুইস্ গণতন্ত্রের সাফল্যের কারণ .	২৪২
সুপ্রিম কোর্ট (মার্কিন) ...	১৯৩
সুপ্রিম কোর্ট (সোভিয়েত) ...	১১৯
সুপ্রিম সোভিয়েত ...	১১১
স্থানীয় শাসনব্যবস্থা (বৃটেন)	৮০
স্থানীয় শাসনব্যবস্থা (সুইস্)	২৩৮
স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ ...	৪২
স্পীকার (বৃটিশ) ...	৫৪
„ (মার্কিন) ...	১৮৭
ক্ষ	
ক্ষমতাবিভাজন (সুইস্) ...	২২১

রাষ্ট্রতত্ত্ব

তৃতীয় খণ্ড

শাসন-পদ্ধতি

অবতারণা—Introduction

কোন দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করিতে গেলে কতিপয় সাধারণ ও সেই দেশে প্রচলিত কতিপয় বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক সংজ্ঞা বা ধারণার সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই ধারণাগুলির সহিত সম্যক পরিচয় না ঘটিলে সে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হয়। শাসনব্যবস্থার নিয়ামক হইল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা অল্প-বিস্তর অপরিবর্তিত থাকিলেও আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা-সম্পর্কিত ধারণার বহুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং এই পরিবর্তনের ফলে শাসন-ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সর্বদেশেই শাসনব্যবস্থার মূল উৎস হইল সেই দেশে প্রচলিত শাসনতন্ত্র বা সেই দেশের সংবিধান (Constitution)। সুতরাং সংবিধান কি এবং ইহার তাৎপর্য ও গুরুত্ব কি সে সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা না থাকিলে কোন দেশেরই শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। এইরূপ আরও কতিপয় ধারণা আছে যেগুলি সম্পর্কে পরিচয় আবশ্যক, যথা, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, ইত্যাদি। শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত এইরূপ কতিপয় সাধারণ ধারণা ব্যতীতও বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থা-সংশ্লিষ্ট কিছু বিশেষ ধারণা আছে, যে ধারণাগুলির সহিত পরিচিত না হইলেও সেই দেশগুলির শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় প্রথাগত বিধান (Conventions of the Constitution), প্রথাগত আইন (Common Law), নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitu-

tional Monarchy) প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ ধারণা স্থান পাইয়াছে। অনুরূপভাবে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় দলীয় একনায়কতন্ত্র (One Party Rule), নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি (Fundamental Rights and Duties of Citizens) কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মার্কিণ শাসনব্যবস্থায় অধিকারের সনদ (Bill of Rights), পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (Mutual Checks and Balances) বিশেষভাবে কার্যকর করা হইয়াছে। গণনির্দেশাধিকার (Referendum) ও গণ-প্রস্তাব অধিকার (Initiative) সুইস্ শাসনব্যবস্থার তুলনাবিহীন বৈশিষ্ট্য। সমষ্টিগত প্রশাসন (Plural Executive) হইল সুইস্ শাসনব্যবস্থার আর একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কোন দেশের শাসন-পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে প্রচলিত এই সাধারণ ও বিশেষ ধারণাগুলির আলোচনা করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্র—The State

রাষ্ট্রসংজ্ঞা সম্পর্কে সকলেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূভাগ, সুসংহত শাসনযন্ত্র ও সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের লক্ষণ। রাষ্ট্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার সমানাধিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌমিকতার বলেই রাষ্ট্র মৌলিক, স্বৈর, অসীম, অবিভাজ্য ও স্থায়ী ক্ষমতার অধিকারী। অপর পক্ষে এই সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরের অযোগ্য এবং সাময়িক অপপ্রয়োগ বা অব্যবহারের ফলে এই ক্ষমতা বিনষ্ট হয় না। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও পররাষ্ট্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সমভাবেই প্রযোজ্য।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা-সম্পর্কিত প্রচলিত এই ধারণা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পরিবর্তিত হইয়া রাষ্ট্র আজ সার্বভৌমিকতাবিহীন সংগঠনে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষ্টিমূলক প্রভৃতি ব্যক্তিসমষ্টি লইয়া গঠিত নানা জাতীয় অসংখ্য স্বতন্ত্র সংঘ আবির্ভাবের ফলে রাষ্ট্রের পূর্বতন স্বৈর ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়াছে। কারণ এই সমুদয় সমাজ—

হিতকর সংঘের স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। জনমত আজ সদাজাগ্রত ও সচেতন। তাই একনায়কতন্ত্রেও জনমত সহসা উপেক্ষিত হইতে পারে না।

পররাষ্ট্র সম্পর্কেও রাষ্ট্রের এই অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা আজ অতীতের এক স্মৃতিমাত্র রূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। রাষ্ট্র হইল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং পররাষ্ট্র সম্পর্কে ঔপনিবেশিকবাদ ও যুদ্ধবাদ প্রচার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ করিয়া সভ্যতা-বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া কোন রাষ্ট্রেরই অধিকারভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যে সার্বভৌমিকতার বলে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা ও সাম্য বিনষ্ট করিতে পারে, সে সার্বভৌমিকতা হইল মানবধর্ম-বিরোধী ও বিধ্বংসী—তাই আজ আন্তর্জাতিক আইনের বন্ধন ক্রমশই কঠোর হইতেছে, আন্তর্জাতিক জনমত শক্তিশালী হইতেছে এবং সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের নির্দেশ অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে সমগ্র মানবজাতি আজ বস্তুগত ও ভাবগত আদান-প্রদানে লিপ্ত হইয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে, স্থানগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া পরস্পর আত্মঘাতী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা 'দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে' নীতির অনুসরণ করা অধিকতর শ্রেয়ঃ। এই উপলব্ধির ফলেই আজ শক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র (The State as a power-system) কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে (Welfare System) পরিণত হইতে চলিয়াছে। মহামতি প্লেটোর ভাষায় কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল—সকল মানুষকেই সুখী করা (To make all men happy)। মানুষের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন করাই হইল এইরূপ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আধুনিক রাষ্ট্রগুলির কর্মপরিধি ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চরম সমস্যা হইল ব্যক্তিস্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন করা। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে এই প্রচেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু সমাধান হয় নাই। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের মাধ্যমে যদি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় তাহা হইলে স্বাধীনতা (Liberty) ও কর্তৃপক্ষের

(Authority) চিরন্তন বিরোধের অবসান ঘটিবে। শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে ও সাহায্যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কার্যকর করা হয়। সুতরাং দেশের শাসনব্যবস্থা এরূপভাবে গঠিত হওয়া দরকার যাহাতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সফল হয়।

শাসনতন্ত্র বা সংবিধান—Constitution

শাসনযন্ত্র বা সরকার হইল রাষ্ট্রের সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ। শাসনযন্ত্রের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা বলবৎ করা হয়। অপর পক্ষে প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা শাসক-শাসিতের আইনগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোথাও বা এই আইনগত সম্পর্ক শাসকের ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক শাসিতের সম্মতি অনুসারে নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক দেশে এই শাসক-শাসিত সম্পর্ক যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে ও শাসকশ্রেণী স্বৈরাচারী না হইতে পারে, সেজন্য কতকগুলি মৌলিক বিধি-নিষেধ দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এই মৌলিক বিধি-নিষেধগুলিই বর্তমানে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় করে। এই কারণে এই মৌলিক বিধি-নিষেধগুলিকে সাধারণ আইন হইতে স্বতন্ত্র রাখা হয় এবং অধিকতর মর্যাদা দেওয়া হয়। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণকারী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এই আইনগুলির সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বলা হয়। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকিতে পারে অথবা অংশতঃ লিখিত ও অংশতঃ অ-লিখিত আকারে থাকিতে পারে। শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ বিধি-নিষেধগুলি দেশের আইনসভা বা বিশেষ গণসভা কর্তৃক রচিত হইতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের রাজা নিজেকে ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে এই আইনের আওতাভুক্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক আইন প্রবর্তন করিতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজা জন কর্তৃক ১২১৫ খৃষ্টাব্দে মহাসনদ (Magna Carta) প্রবর্তন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও অ-লিখিত আইনের সমষ্টি যাহা একদিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ অপরদিকে শাসক শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। কোন দেশের শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই দেশের রাষ্ট্রগঠনকালীন মূল শাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শাসনতন্ত্রের সংশোধন আইনসমূহ—এই উভয়ের সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলা হয়।

শাসনতন্ত্রকে অনেক সময় অ-লিখিত (Unwritten) ও লিখিত (Written) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ কর্তৃক পূর্ব-পরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না—ইহা ক্রমবিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রধানতঃ পুষ্ট হয়। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অপর পক্ষে লিখিত শাসনতন্ত্র পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি পরিষদ কর্তৃক রচিত হয়। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক এই শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে লিখিত থাকে।

শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞান-সম্মতও নয়। কারণ কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা সম্পূর্ণরূপে অ-লিখিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে যাহাকে সাধারণত অ-লিখিত বলা হয়, লিখিত অংশও তাহাতে আছে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত শাসনতন্ত্রেও অ-লিখিত অংশ আছে।

শাসনতন্ত্র হইল জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। জাতীয় জীবন-দর্শন ও আদর্শ পরিবর্তনের সহিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনও জাতীয় জীবনে অপরিহার্য। সুতরাং জাতীয় জীবনের অগ্রগতির প্রয়োজনেই শাসনতন্ত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি সহজ কি জটিল এই পার্থক্যের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রকে নমনীয় (Flexible) ও অনমনীয় (Rigid) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যদি দেশের সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়ন-পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র-বিষয়ক আইনও ভোটাধিক্যে পরিবর্তন করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়, যথা, বৃটিশ শাসনতন্ত্র। পার্লামেণ্ট সভা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতেই যে-কোন শাসনতান্ত্রিক আইন রদ-বদল করিতে পারে।

অপর পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় বলিয়া পরিচিত। এই শাসনতন্ত্রের যদি একটি সামান্যতম পরিবর্তনও করিতে হয়, তাহা হইলে এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। সাধারণ আইনসভা

কংগ্রেস সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্রের কোন অংশ পরিবর্তন করিতে পারে না। মার্কিণ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে এক বিশেষ জটিল পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। মার্কিণ শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে কংগ্রেস সভার দুই পরিষদের মোট সদস্যদের $\frac{2}{3}$ অংশকে এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইবে, বিকল্পে ৫০টি রাজ্যের $\frac{2}{3}$ রাজ্য দ্বারা এই সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি সভা (Convention) আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হইবে। এইরূপে সমর্থিত সংশোধন প্রস্তাব $\frac{3}{4}$ রাজ্যের আইনসভা কিংবা আহূত সভার উপস্থিত $\frac{3}{4}$ সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। এইরূপে উত্থাপিত ও সমর্থিত সংশোধন প্রস্তাবগুলি আইনসম্মত বলিয়া কার্যকর হয়।

শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত পার্থক্যও মূলগত পার্থক্য নহে—কারণ কোন শাসনতন্ত্রই চূড়ান্তভাবে নমনীয় বা চূড়ান্তভাবে অনমনীয় হইতে পারে না। শাসনতন্ত্র হইল মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন। এই চিন্তাধারা পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শাসনতন্ত্রের সময়োপযোগী পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। যদি শাসনতন্ত্র কঠোরভাবে অনমনীয় হয়, তাহা হইলে এরূপ শাসনতন্ত্র নিশ্চিতরূপে ভঙ্গুর হইবে। তাই যে সমস্ত স্থলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয়, সে সমস্ত স্থলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি-বহির্ভূত উপায়ে শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। এইরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথা (Convention) ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Judicial Review) সাহায্যে শাসনতন্ত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন সম্ভব হইয়াছে।

গণতন্ত্র—Democracy

গণতন্ত্র সংজ্ঞাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বোধ হয় সর্বাধিক বিতর্কিত বিষয়। গ্রীসদেশের অন্তর্গত প্রাচীন এথেন্সবাসিগণ গণতন্ত্র লইয়া বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেও বহু পূর্ব হইতেই জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা দেখা যায়। আধুনিক কালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসীদেশ ও বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক আদর্শ নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতি আধুনিক কালে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই আজ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের

প্রভাব অল্পবিস্তর পরিমাণে বিস্তার লাভ করিতেছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, পৃথিবীর কোন দেশকেই বিশুদ্ধ বা নিষ্কলঙ্ক গণতন্ত্র বলা যায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য গণতন্ত্র কি তাহা জানা আবশ্যক।

বর্তমানে গণতন্ত্রের যে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছে তদনুসারে জনগণের কল্যাণে জনগণ দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন গণতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী হইল গণতন্ত্রের আদর্শ। আধুনিক গণতন্ত্রের শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি হইল: প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন দ্বারা পরোক্ষ গণশাসন প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, দায়িত্বশীল সরকার, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন ও ব্যাপক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

দেশের আইনানুসারে নির্ধারিত প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাগণের দ্বারা আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন তাঁহারা সরকার গঠন করিয়া দলের সমর্থনে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে সরকারের সমালোচনা করিয়া জনমত জাগ্রত রাখে। সরকার গঠনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইহার জনমত-বিরোধী কার্যকলাপের ফলে জনসমর্থন হারাইলে বিরোধী দল পুনর্নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকার গঠন করে। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল জনসমর্থন। এই শাসনব্যবস্থায় সরকার যে শুধু জনগণ অথবা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নিকট দায়ী তাহা নহে, এই শাসনব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক দলই দীর্ঘস্থায়ী হইয়া দলীয় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ও সাবলীল গতি রুদ্ধ করিবার সুযোগ পায় না। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইবার অর্থ হইল গণতন্ত্রের অপমৃত্যু। ইংলণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন। সুতরাং যত অধিক সংখ্যায় ও অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে শাসনকার্যের সহিত যুক্ত করা যায়, গণতন্ত্র হয় তত ব্যাপক। গণতন্ত্রের নীতি হইল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power)। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতীত নানা

স্তরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান গঠন করা এবং এই সমুদয় শাসন প্রতিষ্ঠান-গুলিকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বাবলম্বী ও দায়িত্ব-শীল করিয়া তোলা। কেন্দ্রীয় উপদেশ ও কেন্দ্রীয় সাহায্য কাম্য হইলেও এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত থাকাই হইল গণতন্ত্র-সম্মত নীতি।

উপরে গণতন্ত্রের যে রূপরেখার বর্ণনা দেওয়া হইল তাহা শুধু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কাঠামোর একটি চিত্র। এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে অ-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও গণতন্ত্র-বিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকিয়া সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের ও সাফল্যের অন্তরায় ঘটায়। সুতরাং সমাজব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশের বিচারব্যবস্থায় যাহাতে স্বাধীনতা ও সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হয় গণ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাহায্যে সে পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনপ্রতি এক ভোট প্রবর্তন দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্পূর্ণ থাকে।

গণতন্ত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সংগতি নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিসত্তার সমান স্বীকৃতি, মূল্য ও মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং ইহার ফলে আত্ম ও পর অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল এক বলিষ্ঠ মানবগোষ্ঠী জন্মলাভ করে। সকলেই যদি পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল হয় তাহা হইলে মৈত্রীভাব স্বভাবজাতভাবেই মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং গণতন্ত্র মানুষের আত্মিক উন্নতির সহায়কও বটে।

সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর করা পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তাৎপর্য হইল কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার। গণতন্ত্রে সকলেই কাজ করিয়া গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। গণতন্ত্রে ব্যক্তিমাত্রই অনশন, বেকারত্ব ও সহানুভূতিহীন মালিকের ভয়মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া সমাজকে উপকৃত করিতে পারে এবং প্রতিদানে সমাজ ও ব্যক্তিকে তাহার কাজের ন্যায্য মূল্য প্রদান করিতে কার্পণ্য করে না। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র হইল সেই ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার ফলে সমাজে সকলের জন্য পর্যাপ্তের ব্যবস্থা না হওয়ার পূর্বে মুষ্টিমেয় লোক অনাবশ্যক আধিক্যের অধিকারী হইতে পারিবে না।

("There must be sufficiency for all before there is superfluity for the few")।

গণতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্য শর্ত হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেরই সমভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিচার পাইবার অধিকার স্বীকৃত হয়। গণতন্ত্রে বিচারব্যবস্থা এরূপভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হইবে যে, ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও অনভিজাত সকলেই প্রচলিত বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থাবান থাকিয়া সমভাবে সুবিচার পাইতে পারে। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় যেন অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় অধিকতর সুবিচার ক্রয় করিতে না পারে।

এতদ্ব্যতীত গণতন্ত্রের আর একটি রূপ আছে যাহার অবর্তমানে গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকে। এই রূপটি হইল ইহার পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত বা আন্তর্জাতিক রূপ। গণতন্ত্র হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্রষ্টা ও রক্ষক। যে গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্রষ্টা ও রক্ষক হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির দাবি রাখে সেই গণতন্ত্রের পক্ষে পররাষ্ট্র-সম্পর্কে যুদ্ধবাদ নীতি গ্রহণ করিয়া সভ্যতা-বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া মারাত্মক গণতন্ত্র-বিরোধী কার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে গণতন্ত্র পররাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি উদাসীন সে গণতন্ত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা ও সাম্যের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্র ও যুদ্ধবাদ পরস্পর-বিরোধী, কারণ গণতন্ত্র হইল সৃষ্টিকামী (Creative) আর যুদ্ধবাদ হইল ধ্বংসাত্মক (Destructive)।

রাজতন্ত্র—Monarchy

রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতা একই ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। এই ব্যবস্থায় রাজাই হইলেন রাষ্ট্রের একমাত্র কর্ণধার। রাজতন্ত্র সাধারণত জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করে। কদাচিৎ রাজা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন। প্রাচীন রোম, পোল্যাণ্ড ও ভারতে এইরূপ নির্বাচিত রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়।

রাজতন্ত্র আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা, অসীম ক্ষমতা-বিশিষ্ট রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ও নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Constitutional or Limited Monarchy)। অসীম ক্ষমতা-বিশিষ্ট রাজতন্ত্রে রাজার ইচ্ছায়ই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। এই শাসনব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—"আমিই রাষ্ট্র—I am the state"। সুতরাং রাজা ও রাষ্ট্রে এই শাসনব্যবস্থায় কোনও ভেদ থাকে না।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে একজন রাজা শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিলেও কার্যতঃ তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তিনি নামসর্বস্ব রাজা-রূপে বিরাজ করেন। তাঁহার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। রাজার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এইজন্য এই শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয় রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না (The king reigns but does not govern)। ইংলণ্ডে এইরূপ রাজতন্ত্র বর্তমানে প্রচলিত আছে।

একনায়কতন্ত্র—Dictatorship

একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একজন নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় ও রাষ্ট্রের সকল কার্যকলাপ একক নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে যে কোন উপায়েই হউক একত্রিত করিয়া নেতা ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

একনায়কতন্ত্র আবার তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা, সামরিক, ব্যক্তিগত ও দলগত। দলগত একনায়কতন্ত্র আবার ফ্যাসিষ্ট ও সাম্যবাদী শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

সামরিক একনায়কতন্ত্র বহু প্রাচীন হইলেও বর্তমান যুগেও ইহার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পায় নাই। যখনই সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক সেনাবাহিনীর সাহায্যে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া সেনাবাহিনীর সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তখন এই শাসনব্যবস্থাকে সামরিক একনায়কতন্ত্র বলা হয়। ফরাসী দেশে নেপোলিয়নের শাসন, স্পেন দেশে

জেনারেল ফ্রাংকোর শাসন ও অতি আধুনিক কালে পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের শাসন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা এক ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রাচীন কালে রোমকগণ জাতীয় বিপদ উপস্থিত হইলে রাষ্ট্র-পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব একজন নেতার হস্তে অর্পণ করিতেন। এইরূপে খৃঃ পূঃ ৪৫ খৃষ্টাব্দে জুলিয়াস সিজারকে রোমের একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

দলীয় একনায়কত্ব প্রধানতঃ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে জন্মলাভ করে। এই সময়ে অনেক দেশের সরকারই যুদ্ধোত্তরকালীন সমস্যাগুলির সমাধানে ব্যর্থকাম হওয়ার ফলে এই সমস্ত দেশে দলীয় একনায়কত্বের আবির্ভাব হয়। ইতালিতে মুসোলিনী এই সামাজিক অসন্তোষের সুযোগ লইয়া তাঁহার ফ্যাসিষ্ট দল গঠন করেন এবং এই দলের সাহায্যে আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া বল প্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করেন। জার্মানীতেও প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতে হের হিট্‌লার নাৎসী দলের সমর্থনে ও সাহায্যে ক্ষমতা দখল করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় রুশ দেশে লেনিন ও তাঁহার সহকারী-দ্বয় স্তালিন ও ট্রট্‌স্কির নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল জার শাসনের অবসান ঘটাইয়া বলপ্রয়োগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে। দৃশ্যতঃ দলীয় সমর্থনপুষ্ট হইলেও রুশ একনায়কতন্ত্র ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী একনায়কতন্ত্র হইতে মূলতঃ পৃথক। ইতালির ফ্যাসিষ্ট দল ও জার্মানীর নাৎসী দল শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কৃষক-মজদুর, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল—কোন শ্রেণীগত বৈষম্যের ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই। কিন্তু রুশিয়ায় সাম্যবাদী দল একমাত্র সর্বহারাদের—কৃষক-শ্রমিক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ছিল। এই কারণে রুশিয়ার সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রকে দলগত একনায়কতন্ত্র আখ্যা না দিয়া শ্রেণীগত একনায়কতন্ত্র আখ্যা দেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। রুশিয়ায় স্তালিনের নেতৃত্বে, ইতালিতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ও জার্মানীতে হিট্‌লারের নেতৃত্বে যে দলগত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, অতি স্বল্পকাল মধ্যে এই দলগত একনায়কতন্ত্র এই তিন জন নেতার জীবদ্দশায় ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

একনায়কতন্ত্রের মূল নীতি হইল এক জাতি, এক রাষ্ট্র ও এক নায়ক। অবাধ দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দলের নেতা ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি সব কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়। একনায়কতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্র সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং ব্যক্তির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দূরের কথা, কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়।

রুশীয় একনায়কতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সোভিয়েত একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীকে উৎখাত করিয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ লেনিনের মতে শতকরা ৯০ জন শোষিত সর্বহারার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা আর শতকরা ১০ জন শোষক পুঁজিপতির উপর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই-জন্য সোভিয়েত নেতাগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারাদের শাসনকে গণতন্ত্র বলিয়া দাবি করেন। সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র সামাজিক জীবনে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বর্তমানে দলীয় একনায়কতন্ত্র ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক আদর্শের মূল সূত্রগুলি গ্রহণ করিতেছে। এমন কি স্পেনদেশ, ইতালি ও জার্মানীতে যথাক্রমে ফ্রাংকো, মুসোলিনী ও হিট্‌লার নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আইন-সিদ্ধ করিয়াছিলেন। সোভিয়েত দেশের শাসনব্যবস্থায় এমন কি বিচারব্যবস্থায়ও নানা জাতীয় জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং বলা যায় যে, যে-কোন জাতীয় একনায়কতন্ত্র হউক না কেন, ইহা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী।

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—Unitary and Federal Governments

এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারী ক্ষমতাসমূহের কেন্দ্রীকরণ নীতি (Principle of Centralisation) আর যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি (Principle of Decentralisation) অনুসৃত হয়। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই ব্যবস্থায় সরকারের প্রশাসনিক, আইন প্রণয়ন ও বিচার ক্ষমতাগুলি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়। এরূপ রাষ্ট্রে প্রাদেশিক, জেলা প্রভৃতি নানা জাতীয় স্থানীয় সরকার থাকিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইহার ইচ্ছামত এই সমস্ত স্থানীয় সরকারগুলিকে কিছু কিছু ক্ষমতা দিতে পারে। এই ক্ষমতাগুলি পরিচালনা ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি মাত্র হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে এই স্থানীয় সরকারগুলিকে ভারমুক্ত করিতে পারে। সুতরাং এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ বা বিকেন্দ্রীকরণ হয় না। শুধুমাত্র অন্যের উপর নির্দিষ্ট কার্যভার অর্পণ করা হয় এবং এই অর্পণের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাস পায় না। সুতরাং এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সর্বক্ষমতার আধার। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু আছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ক্ষমতার ভাগ ও বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশের সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতীতও পাশাপাশি কতকগুলি রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকার থাকে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতাই একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। উভয় সরকারই সংবিধানে উল্লিখিত নিজ নিজ ক্ষমতাগুলি অন্যনিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করে। ক্ষমতা পরিচালনা ব্যাপারে উভয় সরকারের মধ্যে যদি কোন বিরোধ ঘটে তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি বিচারালয় এই বিরোধ নিষ্পত্তি করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নীতি অনুসৃত হয় এবং এই নীতি বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব বণ্টনেরও ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিণ দেশে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং কালক্রমে এই শাসনব্যবস্থা ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইস দেশ, রাশিয়া ও ভারতে বিস্তার লাভ করে।

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় যেরূপ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলির সম্পর্ক সর্বত্র সমান নহে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও তদ্রূপ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ক সর্বত্র সমরূপ (uniform) নহে। মার্কিণ, সুইস্ ও সোভিয়েত এই তিনটি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকিলেও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্ক তিনটি দেশেই এক ধরনের নহে।

পার্লামেণ্ট-প্রধান ও রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা—Parliamentary and Presidential Governments

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার সম্পর্কের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাকে উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাগণ মন্ত্রি-সংসদ গঠন করিয়া একজন নামসর্বস্ব রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অধীনে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রি-সংসদ ইঁহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রি-সংসদের পদত্যাগ করিতে হয়—আবার মন্ত্রি-সংসদও ক্ষেত্র বিশেষে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। এই শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ মন্ত্রি-সংসদ প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার নিকট এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকে। এই ব্যবস্থায় শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাসনব্যবস্থা চালু আছে।

রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা ক্ষমতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও আইনসভা পরস্পর অন্যনিরপেক্ষভাবে স্ব স্ব কার্য পরিচালনা করে। শাসন কর্তৃপক্ষ আইনসভার নিকট দায়ী নহে এবং আইনসভার আস্থা-অনাস্থার উপর শাসন কর্তৃপক্ষের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। শাসন কর্তৃপক্ষও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার প্রচলিত। শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় হইলেন নির্বাচিত

রাষ্ট্রপতি। তিনি ও তাঁহার সহকারিবৃন্দ আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে কার্য পরিচালনা করেন, অপর পক্ষে আইনসভাও রাষ্ট্রপতি-নিরপেক্ষভাবে ইহার কার্য পরিচালনা করে। শাসন কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নাই।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—Socialistic State

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ ব্যক্তিগত ক্ষমতায় আস্থাবান, তাই তাঁহারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষে মত পোষণ করেন। এই মত অনুসারে অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়, প্রধানতঃ তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়।

সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন না তাই তাঁহারা রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যবস্থা করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সকল সময় ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি অসম প্রতিযোগিতার ফলে সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাহাদের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই সমস্ত ব্যক্তির আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণসাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই ব্যক্তিগত জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শুধু একটি রাজনৈতিক সংস্থা নহে, ইহা মূলতঃ নির্দিষ্ট কার্যক্রম-সমন্বিত একটি অর্থনৈতিক সংস্থাও বটে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার গুরু দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধনোৎপাদনের সমুদয় উপায় ও ধনবণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। উদ্দেশ্য হইল, অত্যধিক ধন ও আয়বৈষম্য দূর করিয়া সকলের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্র মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রেল, ডাক, তার, সর্বপ্রকার পরিবহণ

ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংক, জীবনবীমা প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আর্তজনের সেবা প্রভৃতি সমুদয় কার্যই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে কার্য করিবে এবং প্রতিদান হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কাজের ন্যায্য মজুরি পাইবে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহাই হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি চিত্র। কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ও ব্যক্তিগত মালিকানা নির্মূল করিয়া পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করা কতদূর সম্ভব তাহা বিচারসাপেক্ষ। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী কালে লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে সে দেশে পূর্ণ সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হয়। কিছুদিন পর এই পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদের কিছু সংশোধন করা হয়। বর্তমানে সে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা যৌথ, সমবায় ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা ভিত্তিতে পরিচালিত হইলেও ব্যক্তিগত মালিকানা একেবারে লোপ পায় নাই। পারিবারিক ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। উৎকট ধনবৈষম্য না থাকিলেও সে দেশে আয়-বৈষম্য এখনও আছে। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক জীবনে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সোভিয়েত দেশের জনজীবনে অত্যল্প কালের মধ্যে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে যে ব্যক্তিগত কল্যাণ সম্ভব সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লো-ভাকিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব-জার্মানী প্রভৃতি কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য হইল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা। কিন্তু ভারত সরকার অতি ধীরে ধীরে ও বিক্ষিপ্তভাবে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। জমিদারী প্রথার বিলোপ, কয়েকটি ব্যাংক ও জীবনবীমাগুলির জাতীয়করণ, রাজন্য ভাতার বিলোপ সাধন প্রভৃতি কতিপয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ পর্যন্ত গ্রহণ

করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাগুলির দ্বারা দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দূর করা সম্ভব হয় নাই।

মৌলিক অধিকার—Fundamental Rights

মানুষ সামাজিক জীব। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য সে সমাজে বাস করে। সামাজিক মানুষ হিসাবে সে সমাজের নিকট হইতে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা পায় যেগুলির সাহায্যে তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশ সম্ভব হয়। সমাজের নিকট হইতে মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তির সহায়ক দাবি-গুলিকে অধিকার বলা হয়। কিন্তু কোন অধিকারই অবাধ বা অসীম নয়। যে-কোন অধিকার হউক না কেন, সকল অধিকারই আইনসম্মত ও সমাজ-কল্যাণকর হওয়া চাই।

মানুষের অধিকারগুলি অসীম বা চিরন্তন না হইলেও এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে যেগুলি মানুষের আত্ম উপলব্ধি ও চরিত্র বিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয় এবং এইজন্য এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন ধর্মমত পোষণ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। এই অধিকারগুলি যাহাতে অন্য ব্যক্তির বা শাসন-কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যাহত না হয় তজ্জন্য অনেক দেশে শাসনতন্ত্রে একটি অধিকারের সনদ (Bill of Rights) সংযোজনা করা হয়। অধি-কারের সনদে মানুষের এই প্রাথমিক অধিকারগুলি স্থান পায়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করা হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং এই কারণে এই অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়। অনেক সময় বিশেষ সনদ বলে এই অধিকারগুলি সংরক্ষিত হয়। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা জন কর্তৃক স্বীকৃত অধিকারের মহাসনদ (Magna Carta) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সংবিধানে অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ থাকিবার প্রথম ও প্রধান কারণ হইল যে, সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকিলে এই অধিকারগুলিকে সরকার সহজে অস্বীকার করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে বিধিবদ্ধ থাকিলে বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনব্যবস্থায়ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারচ্যুত হইবার সম্ভাবনা রহিত হয়। তৃতীয়তঃ, সংবিধানে লিখিত থাকিলে অধিকার-গুলি সম্পর্কে জনগণের একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে এবং এজন্য তাহারা সর্বদা অবহিত থাকে। যদি কোন কারণে অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে জনগণ ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠিতে পারে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে অধিকার লংঘনকারীর বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের দাবি করিতে পারে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে সর্বপ্রথম অধিকারের এক সুদীর্ঘ তালিকা-সমন্বিত সনদ সংযোজিত হয়। কিন্তু এই তালিকা নিখুঁত বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কারণ শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে. শাসনতন্ত্রভুক্ত হয় নাই বলিয়া অন্যান্য অধিকারগুলিকে অস্বীকার বা সংকোচ করা চলিবে না। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য বিচারালয়গুলি আইনের নূতন নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন অধিকার সৃষ্টি করিয়াছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থিত অধিকার সংকোচন করিয়াছে।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে সাধারণ মৌলিক অধিকারসমূহ ব্যতীত এরূপ কতিপয় মৌলিক অধিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা অন্য কোন দেশের শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই। কাজ করিবার অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার প্রভৃতি এমন কতকগুলি অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক বিধিবদ্ধ ও কার্যে রূপায়িত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে যাহাতে অধিকারগুলি ব্যক্তিগত ও সমষ্টি-গত জীবনে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির সহিত নাগরিকগণের কতিপয় মৌলিক কর্তব্যের সমাবেশ মৌলিক অধিকারগুলিকে অর্থবহ ও পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে।

ভারতের সংবিধানে নাগরিকগণের সাত দফা মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই অধিকারগুলি এরূপ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা এরূপভাবে সংকুচিত করা

হইয়াছে যে, জনসাধারণ এই অধিকারগুলি ভোগ করিবার সুযোগ খুব কমই পাইবে।

পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ভিত্তিতে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্রীকরণ—Separation of Powers with Mutual Check and Balance

সরকারের সামগ্রিক ক্ষমতা তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative Power), শাসন পরিচালনা ক্ষমতা (Executive Power) ও বিচার ক্ষমতা (Judicial Power)। আইন-সভা, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচার বিভাগ যথাক্রমে সরকারের উপরি-উক্ত তিনটি ক্ষমতা পরিচালনা করে। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী বলা হয় যে, এই তিনটি বিভাগীয় কার্য পৃথক রাখা প্রয়োজন এবং এই পৃথকীকরণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির হস্তে প্রত্যেক বিভাগীয় কার্য ন্যস্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক বিভাগ স্বাধীনভাবে কার্য করিবে যাহাতে এক বিভাগের উপর অন্য বিভাগ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। যদি একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির হস্তে একাধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বৈরাচারী শাসন রদ করিবার জন্য ক্ষমতার পৃথকীকরণ একান্ত আবশ্যক।

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার যুগে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে কল্যাণ-ব্রতী রাষ্ট্রে (Welfare State) ক্ষমতা পৃথকীকরণ দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত করিবার প্রয়োজনীয়তা আর নাই বলিলেও চলে। বর্তমানে সরকারের কার্য এতই জটিল হইয়াছে যে, সরকারের সমুদয় কার্যই এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার—এই তিনটি কার্য শুধু জটিল নহে, ইহার প্রত্যেকটি কার্য সম্পাদনের জন্য বিশেষ দক্ষতার আবশ্যক। এইজন্য বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা অপেক্ষাও সরকারের কার্য যাহাতে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়, সেইজন্য ক্ষমতার পৃথকীকরণ অধিকতর কাম্য। কিন্তু ক্ষমতার এই পৃথকীকরণ একরূপভাবে

পরিকল্পিত ও কার্যে রূপায়িত হইবে যে, বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র, সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় থাকে। এই পারস্পরিক ভারসাম্যের অবর্তমানে সরকারী কার্য পরিচালনার সামগ্রিক দক্ষতা ব্যাহত হয় ও সরকারী কার্যে বাধা সৃষ্টি হয়।

সরকারী কার্য পরিচালনায় এই ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি-জনিত বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিভাগগুলির মধ্যে অন্তর্বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা প্রয়োজন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতি (শাসন কর্তৃপক্ষ), কংগ্রেস (আইনসভা) ও সুপ্রীম কোর্ট (বিচার বিভাগ)—এই তিন বিভাগের মধ্যে মতভেদের ফলে বিরোধ সৃষ্টি হইয়া সরকারী কার্য বহুবার ব্যাহত হইয়াছে। মার্কিণ শাসনতন্ত্রের রচয়িতা-গণ ক্ষমতার চূড়ান্ত পৃথকীকরণ নীতির অপপ্রয়োগ রদ করিবার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার মূল কথা হইল যে, ক্ষমতার অপব্যবহার রদ করিতে হইলে এক বিভাগের স্বৈর বা অবাধ ক্ষমতা অন্য বিভাগের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ—প্রত্যেককেই বিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী করা হইলেও এই ক্ষমতাসমূহ অন্য বিভাগের সহযোগিতা ও সম্মতিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী মার্কিণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি ও নিয়োগগুলি আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের অনুমোদনসাপেক্ষ। এইরূপে প্রত্যেক বিভাগের কার্য অপর বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমর্থিত হইতে হয়।

সমষ্টি-পরিচালিত প্রশাসন—Plural Executive

শাসন পরিষদ যদি এক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হয় এবং শাসনকার্য যদি একাধিক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে এই শাসন পরিষদকে সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ (Plural Executive) বলা হয়। মন্ত্রিসংসদ চালিত শাসনব্যবস্থায় একাধিক ব্যক্তি যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় একজন নেতা বা প্রধানমন্ত্রী থাকেন। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম হইলেও একমাত্র তাঁহার নেতৃত্বেই মন্ত্রিমণ্ডলীর ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হয় এবং অনেক

বিষয়েই প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। তিনি পদত্যাগ করিলেই সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নামেই মন্ত্রিসভার পরিচয়।

সমষ্টিগত শাসন পরিষদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সুইস্ শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়। সুইস্ শাসন পরিষদ (Federal Council) সাতজন সমক্ষমতা-বিশিষ্ট সদস্য লইয়া গঠিত। ইঁহাদের মধ্যে একজন এক বৎসরের জন্য সভাপতি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষমতার দিক দিয়া এই সভাপতি অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা উচ্চতর বা বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী নহেন। শাসন পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব শাসন পরিষদের সাতজন সদস্যই সমভাবে বহন করেন। প্রত্যেক সদস্য স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিয়া পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন। একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ-বিষয়ে শাসন পরিষদের সভাপতির কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে সভাপতি একটি অতিরিক্ত ভোটদান করিয়া মতবিরোধ নিষ্পত্তি করিতে পারেন। সভাপতির পদটি আনুষ্ঠানিক ও সম্মানজনক মাত্র।

— —

প্রথম অধ্যায়

শাসন-পদ্ধতি

যুক্তরাজ্য—United Kingdom

যুক্তরাজ্য—United Kingdom

গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থার সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে এই দেশটি সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জানা আবশ্যক। অতলান্তিক মহাসাগরে অবস্থিত এই দ্বীপমালা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তিনটি জনপদ লইয়া গ্রেট বৃটেন গঠিত, যথা, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স। এই তিনটির মধ্যে আবার ইংলণ্ড জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ঐতিহ্যে, শিল্প-বাণিজ্যে ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান জনপদ। গ্রেটবৃটেন ও উত্তর-আয়ারল্যাণ্ডের সমবায়ে যে রাষ্ট্র গঠিত তাহাকে যুক্তরাজ্য (United Kingdom of Great Britain and Ireland) বলা হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ড বিভক্ত হয়। এই বিভাগের ফলে দক্ষিণ-আয়ারল্যাণ্ডের ২৬টি কাউন্টি ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স ও সমগ্র আয়ারল্যাণ্ডের সমবায়ে গঠিত যুক্তরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করে। এই নূতন রাষ্ট্রের নাম হয় আইরিশ সাধারণতন্ত্র (Irish Republic—EIRE)। উত্তর-আয়ারল্যাণ্ড যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া গেলেও কিছুটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হয়। উত্তর-আয়ারল্যাণ্ডের নিজস্ব পার্লামেণ্ট আছে এবং ইহার শাসন বিভাগ এই পার্লামেণ্টের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। যুক্তরাজ্যের সন্নিকটে আইল অব্ ম্যান (Isle of Man) ও চ্যানেল্ আইল্যাণ্ড (Channel Islands) নামক দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ইহাদের স্বতন্ত্র আইনসভা, শাসনব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা থাকিলেও ইহারা গ্রেট বৃটেনের অধীন প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বৃহত্তর যুক্তরাজ্যের চূড়ান্ত শাসন কর্তৃত্ব যুক্তরাজ্যের পার্লামেণ্ট সভার উপর ন্যস্ত।

বৃহত্তর যুক্তরাজ্য বহু জাতি লইয়া গঠিত। স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে অন্য তিনটি প্রদেশের মত স্বতন্ত্র আইনসভা না থাকিলেও এই দুইটির জন্য দুইজন পৃথক ভারপ্রাপ্ত কেবিনেট মন্ত্রী আছেন। অধিকন্তু স্কটল্যাণ্ডের বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা ইংলণ্ডে প্রচলিত ব্যবস্থা হইতে কিছুটা পৃথক।

শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি—Nature of the British Constitution

সংসদীয় গণতন্ত্রের (Parliamentary Democracy) উদ্ভাবন, ইহার প্রতিষ্ঠা ও প্রচার হইল সভ্যতার অগ্রগতিতে বৃটিশ জাতির প্রধান অবদান। আর এই সংসদীয় গণতন্ত্র অবলম্বন করিয়া বৃটেনে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্থ হইল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে আইনসভা গঠন, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা, ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তন ও ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা। বৃটেনেই সর্বপ্রথম এই শাসনব্যবস্থা উদ্ভাবিত ও কার্যকর হয় এবং পরবর্তী কালে বৃটেনের আদর্শে অন্যান্য দেশে এই শাসনব্যবস্থার প্রচলন হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, বৃটেনের এই শাসনব্যবস্থা দীর্ঘদিনের ক্রম-বিবর্তনের ফল। জাতীয় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে এই শাসনব্যবস্থা পরিকল্পিত, গঠিত ও পুনর্গঠিত হইয়াছে এবং এই গঠন ও পুনর্গঠনের কার্য এখনও চলিতেছে। জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে এবং পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ভাঙা-গড়া চলিতেছে। এই শাসনব্যবস্থা গতিশীল, স্থিতিশীল নহে।

প্রাচীন রোমকগণও সাধারণতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। কিন্তু বৃটেনের শাসনব্যবস্থার বিবর্তন বিপরীতমুখী। এখানে স্বৈরতন্ত্র হইতে নানা অবস্থাবিপর্যয় ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। বৃটেনে গণতান্ত্রিক আদর্শের দিকে এই অগ্রগতি কেবলমাত্র ক্রমওয়েলের কয়েক বৎসর শাসনকাল ব্যতীত অন্য কোন সময়ে কোন কারণে ব্যাহত হয় নাই। শাসনতন্ত্রের এইরূপ অখণ্ড ধারাবাহিকতা পৃথিবীর আর কোন দেশের শাসনতন্ত্রে দেখা যায় না।

এখন প্রশ্ন হইল যে, কেন একমাত্র গ্রেট্ বৃটেনে এই গণতান্ত্রিক আদর্শের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা হইল এবং কি কারণে এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে সচরাচর সাবলীল গতিতে পরিবর্তিত হইতেছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, প্রধানতঃ তিনটি কারণে বৃটেনে শাসন-ব্যবস্থার এই স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই দ্বীপমালার ভৌগোলিক অবস্থান এই দেশকে বহিঃপ্রভাবমুক্ত রাখিয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জ ইয়ুরোপের প্রধান ভূখণ্ড হইতে প্রায় ২০ মাইল সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং এই বিচ্ছিন্নতাই এই দ্বীপপুঞ্জে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন শাসনব্যবস্থা বিকাশ ও বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, কেল্ট, স্যাক্সন্, নরম্যান্, ডেন প্রভৃতি নানা জাতির সংমিশ্রণে গঠিত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ প্রথম হইতেই বিদেশী প্রভাবমুক্ত থাকিবার ফলে অতিমাত্রায় স্বাধীনতা-প্রিয় হইয়া উঠে এবং এই স্বাধীনতা রক্ষার সহায়ক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই মিশ্র জাতি পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে, সর্বত্রই ইহারা জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, অপরপক্ষে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমেরিকা-প্রবাসী বৃটিশ অধিবাসিগণের ধ্বনি ছিল—'বিনা প্রতিনিধিত্বে কর দিব না' (No taxation without representation)। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, বর্মা প্রভৃতি এক সময়ে বৃটিশ-শাসিত দেশ-সমূহও এই মিশ্র জাতির সংস্পর্শে আসিয়া স্বাধীনতা-প্রিয় হইয়া উঠে এবং কালক্রমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, বৃটেনের অধিবাসিগণ কোন দিনই কোন কারণে তাহাদের শাসনব্যবস্থাকে লিখিতভাবে এক বা একাধিক দলিলে সীমাবদ্ধ করিয়া ইহার স্বাভাবিক ও সাবলীল গতিকে রুদ্ধ করিবার প্রয়াস পায় নাই। ইহার কারণ হইল যে, এই জাতি অতিরিক্ত মাত্রায় বাস্তবতা-পন্থী। রাজনৈতিক নীতি অপেক্ষা রাজনৈতিক বাস্তবতায় অধিকতর বিশ্বাসী হইবার ফলে বৃটিশ জাতি তাহাদের শাসনব্যবস্থাকে কখনও নির্দিষ্ট, আইনবদ্ধ বা অনমনীয় করে নাই। এই কারণে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন অনুসারে ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে।

শাসন-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ—Growth of the Constitution

গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে-কোন শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তৎপূর্বে গ্রেট বৃটেনের শাসনপদ্ধতির সহিত পরিচয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জগৎ সভ্যতার অগ্রগতিতে ইংরাজ জাতির একটা প্রধান অবদান হইল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন। এইজন্য বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে পৃথিবীর প্রাচীনতম শাসনতন্ত্র এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট সভাকে পৃথিবীর সমুদয় আইনসভার মাতৃস্থানীয়া বলা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও সর্বদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অল্পবিস্তর পরিমাণে গ্রেট বৃটেনের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থা শুধু যে খুব প্রাচীন তাহা নয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, এই শাসনব্যবস্থার অখণ্ড ধারাবাহিকতা। অন্যান্য দেশে তাহাদের অধুনা-প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সহিত পূর্বতন শাসনব্যবস্থার আদৌ কোন যোগসূত্র নাই; সেখানে পুরাতন শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া নূতন শাসনব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে। ফরাসী, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে পূর্বতন শাসনব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের বর্তমান শাসনব্যবস্থা পূর্বতন শাসনব্যবস্থার বিবর্তনের ফল। গ্রেট বৃটেনে অতীত ও বর্তমান শাসনব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র নষ্ট হয় নাই। রাজনৈতিক কারণে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করিয়া পুরাতন ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করা হইয়াছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের এই সহজ ও সময়োপযোগী পরিবর্তনশীলতার জন্য গ্রেট বৃটেনে বিনা রক্তপাতে শাসনব্যবস্থার সংস্কার সম্ভবপর হইয়াছে। শাসনব্যবস্থার এই স্বাভাবিক ও সাবলীল গতি বৃটিশ জাতি কোনও দিন কোন কারণে ব্যাহত হইতে দেয় নাই। তাই গ্রেট বৃটেনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও রাজতন্ত্র, রাজার মন্ত্রণাসভা (Privy Council), লর্ডসভা প্রভৃতি শাসনব্যবস্থার অতি সুপ্রাচীন বিভাগগুলি আজও বর্তমান আছে।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের সহিত অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল যে, অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের মত বৃটিশ শাসনতন্ত্র কতকগুলি লিখিত বিধি-নিষেধ দ্বারা সীমান্বিত নহে। বৃটিশ শাসনতন্ত্র একটি ক্রমবর্ধমান জীবন্ত শক্তি; জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহারই

পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হইতেছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্র একমাত্র লিখিত আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হয় নাই, পরন্তু লিখিত আইন অপেক্ষা অ-লিখিত প্রথাগত বিধান, বিচারবিভাগীয় অনুশাসন, শাসন-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা অধিকতরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একাধিক উৎস পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাসী দেশের অনেক লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রেট বৃটেনের কোন নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এইরূপ অভিমতের অসারতা প্রমাণিত হয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাসীদেশের অধিবাসিগণ শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলিতে এক বা একাধিক লিখিত দলিল বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শাসনতন্ত্র শব্দটি একমাত্র লিখিত শাসনতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ব্যাপক অর্থে শাসন-তন্ত্র বলিতে লিখিত ও অ-লিখিত—সর্ববিধ বিধি-নিষেধগুলিকে বুঝায়, যদ্দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কোন দেশেরই শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা সম্পূর্ণরূপে অ-লিখিত হইতে পারে না। লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ থাকিতে পারে, অপরপক্ষে অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকিতে পারে। কিন্তু বৃটিশ শাসনতন্ত্র মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র বা ফরাসী দেশের শাসন-তন্ত্রের ন্যায় বিধিবদ্ধ এক বা একাধিক দলিলে সীমায়িত নয় বলিয়া গ্রেট বৃটেনে কোন শাসনতন্ত্র নাই একথা বলা অযৌক্তিক।

শাসনতন্ত্র শব্দটির অর্থের পার্থক্যহেতু 'শাসনতন্ত্র-বিরোধী' (Unconstitutional) এই সংজ্ঞাটি গ্রেট বৃটেনে ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। গ্রেট বৃটেনে রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা আইনানুগ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার দেশের কোন বিচারালয়ের নাই। পার্লা-মেণ্টে প্রণীত আইন নীতিজ্ঞান-বিরোধী বা জনমত-বিরোধী অথবা প্রচলিত প্রথা-বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু এই আইনের বৈধতা সম্বন্ধে কেহই প্রশ্ন করিতে পারে না। অপরপক্ষে, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেস-রচিত আইন বা প্রেসিডেণ্টের নির্দেশকে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। বিচারালয় কর্তৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত আইন কার্যকরী হয় না। সুতরাং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রে

'শাসনতন্ত্র-বিরোধী' শব্দটি বে-আইনী অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে 'শাসনতন্ত্র-বিরোধী' শব্দটি নীতিজ্ঞান-বিরোধী বা জনমত বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু কখনই 'বে-আইনী' অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্রের উৎস—Sources of the Constitution

গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত—(ক) শাসনতান্ত্রিক আইন (Laws of the Constituion) ও (খ) প্রথাগত বিধান (Conventions of the Constitution)। শাসনতান্ত্রিক আইন-গুলি হইল কতকগুলি বিধিবদ্ধ আইনের সমষ্টি, যাহা বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা হয়। কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না, সুতরাং সেগুলিকে আইনের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি নিম্নলিখিত উপাদান লইয়া গঠিত :—

(১) ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র—Certain Charters and Constitutional Landmarks

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান অংশ কতকগুলি ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র লইয়া গঠিত। ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মহাসনদ, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের অধিকারের আবেদন-পত্র, ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকারের বিল, ১৭০৭ ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্তি চুক্তিপত্র প্রভৃতি এই শাসনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ। যদিও উপরি-উক্ত সনদ ও চুক্তিপত্রগুলির অধিকাংশ পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক প্রণীত হয় নাই, তথাপি কেহই এই সনদ-গুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না।

(২) পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন—Statutes

উল্লিখিত সনদ ও চুক্তিপত্রগুলি ছাড়াও পার্লামেন্ট সভা-রচিত আইন এই শাসনতন্ত্রকে নানাভাবে পুষ্ট করিয়াছে। নির্বাচনব্যাপার, ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে ও সরকারী নানাবিধ কার্যপরিচালনা করিবার নির্দেশদান করিয়া পার্লামেন্টে যে-সমস্ত আইন রচিত হইয়াছে, সেগুলি বর্তমান শাসনতন্ত্রের

একটি বিরাট অংশ। এই আইনগুলির মধ্যে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইন, ১৮৩২, ১৮৬৭ ও ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনগুলি, ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩) বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত—Judicial Decisions

বিচারপতিগণ বিচারকালে শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত আইনের যেরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন তদ্দ্বারাও শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন ঘটে। বিচারপতিগণ প্রচলিত আইন বা সনদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার সময় অনেক নূতন আইন সৃষ্টি করেন। এইরূপে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রায় সকল দেশের শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের উপর বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব সম্পর্কে ডাইসি বলেন যে, এই শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন অপেক্ষা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষাকল্পে বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে। এইরূপে সোমারসেটের মামলায় ইংলণ্ডে দাসত্ব প্রথার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়; হাওয়েলের মামলায় বিচারপতিগণের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয় ও বুসেলের মামলায় জুরিগণের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) প্রথাগত আইন—Common Law

জাতীয় জীবনের অবশ্যম্ভাবী সহচররূপে কতকগুলি আচারপদ্ধতি ও রীতিনীতি গড়িয়া উঠে। এগুলির দ্বারা জাতীয় জীবন বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনগুলি পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত হয় না অথবা রাজা কর্তৃক অর্ডিন্যান্সরূপে বলবৎ করা হয় না। এই আইনসভা-নিরপেক্ষ রীতিনীতি ও পদ্ধতিগুলি বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃতিলাভ করিয়া আইনের মর্যাদা লাভ করে। গ্রেট বৃটেনে এইরূপ বহু প্রথাগত আইন শাসনতন্ত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। জুরির বিচার, বাক্‌স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রথাগত আইনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রথাগত বিধান—Conventions

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অংশ

প্রথাগত বিধানের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার [illegible]; এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে গঠিত হইয়াছে। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইহার সৃষ্টি হয় নাই। বৃটেনে যখনই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই পার্লামেন্ট-প্রণীত শাসনতান্ত্রিক আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রথাগত বিধানের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। এইজন্য গ্রেট বৃটেনে রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের সহিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন সংঘাত হয় নাই।

প্রথাগত বিধান বলিতে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত এমন কতকগুলি বিধি-নিষেধ বুঝায়, যাহা পার্লামেন্ট সভা নিরপেক্ষভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরম্পরাগত প্রথা ও নজিরগুলি এত প্রাচীন এবং জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের সহিত এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, এই প্রথাগত বিধানগুলি ছাড়া বৃটিশ শাসনতন্ত্রের কার্যকারিতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। এই প্রথাগত বিধানগুলি রাজার, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গের ও শাসনকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রথাগত বিধানগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা না গেলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমুদয় ব্যক্তি ইহা মানিতে বাধ্য। প্রথাগত শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলি যে শুধু আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত তাহা নয়, এই বিধানগুলি ভঙ্গ করিলে শাসনকর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বিচারালয়ের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

প্রথাগত শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

রাজা ও মন্ত্রিসভা-সম্পর্কিত প্রথাগত বিধান হইল প্রথম শ্রেণী। রাজার ক্ষমতা সম্পর্কে একটি প্রথাগত বিধান হইল যে, রাজা পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক অনুমোদিত বিল নাকচ করিবেন না। এই বিধান অনুযায়ী পার্লামেন্ট সভাকে বৎসরে অন্ততপক্ষে একটি অধিবেশনের জন্য ডাকিতে হইবে। পার্লামেন্টে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের মন্ত্রি-সংসদ গঠন করিবার অধিকার থাকে ও সেই দলের নেতা রাজা কর্তৃক প্রধান-মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের লর্ড সভার

সদস্যগণের মধ্য হইতে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইলেও বর্তমানে প্রথাগত বিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীকে কমন্স সভার সদস্য হইতে হইবে মন্ত্রিসংসদ তাঁহাদের কার্যের জন্য কমন্স সভার নিকট দায়ী এবং এই সভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর একজোটে পদত্যাগ করিতে হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধানগুলি পার্লামেন্ট সভার কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লর্ড সভা যখন প্রধান বিচারালয় হিসাবে আপীল মামলার বিচার করে, তখন নয় জন মনোনীত আপীল লর্ড ব্যতীত অন্য কোন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। কমন্স সভার স্পীকার দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হইলেও নির্বাচনের পর দল-নিরপেক্ষ থাকেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে প্রত্যেকটি খসড়া আইন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবে—এই বিধিটিও প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একটি প্রথাগত বিধান হইল যে, ভোটদাতৃমণ্ডলীর নির্দেশ ব্যতীত সরকার কোন বিতর্কমূলক আইন পার্লামেন্ট সভায় পেশ করিবে না। এই বিধানটি গ্রেট বৃটেনে গণসার্বভৌমত্ব নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রথাগত বিধানগুলি গ্রেট বৃটেনের সহিত ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সম্পর্ক নির্ধারিত করে। বহুদিন পর্যন্ত এই সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতা ও চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টমিনস্টার আইন পাস করিয়া প্রথাগত বিধানগুলির অধিকাংশকে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্তমানে এই কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রধানমন্ত্রিগণ মধ্যে মধ্যে সম্মেলনে মিলিত হইয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

প্রথাগত বিধানগুলির অনুমোদন—Sanction behind Conventions

এখানে প্রশ্ন হইল যে, এই প্রথাগত বিধানগুলি আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও কেন মানিয়া চলা হয়? এইগুলি না মানিলেও ভঙ্গকারীকে কোনরূপ শাস্তিভোগ করিতে হয় না। ডাইসি বলেন, প্রথাগত বিধান অনুসারে যদি শাসনকার্য পরিচালিত না হয় তাহা হইলে এই প্রথাগত

বিধানভঙ্গের ফলে শাসনতান্ত্রিক আইন অ-কার্যকরী হইয়া উঠিবে ও ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যাঘাত জন্মিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাইসি বলেন যে, পার্লামেন্ট সভার যদি বৎসরে অন্ততঃপক্ষে একবার অধিবেশন না হয় তাহা হইলে বাৎসরিক সৈন্য-আইন ও অন্যান্য আয়ব্যয়-সংক্রান্ত আইন পাস হইবে না। অনুরূপভাবে কমন্স সভার আস্থাহীন ও নির্বাচনে পরাজিত কোন মন্ত্রিসংসদ যদি পদত্যাগ না করে, তাহা হইলে এই উভয়ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক সংকট উপস্থিত হইয়া শাসনকার্য ব্যাহত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী বজায় রাখা বা মন্ত্রিসংসদের শাসনকার্য পরিচালনা করা উভয় কার্যই বে-আইনী হইবে এবং শাসনকর্তৃপক্ষের এইরূপ বে-আইনী কার্য বিচারালয়ের নির্দেশ দ্বারা রহিত করা সম্ভব হইবে না।

ডাইসি-প্রদত্ত উল্লিখিত যুক্তি প্রথাগত বিধান মানিয়া চলার পক্ষে উপযুক্ত কারণ বলিয়া মনে হয় না। সার্বভৌম শক্তির অধিকারী পার্লামেন্ট সভা ইচ্ছা করিলে সৈন্য-সংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দ-সম্পর্কে স্থায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। অপরপক্ষে, এমন কতকগুলি প্রথাগত বিধান আছে যেগুলি না মানিলেও আইনভঙ্গ করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, লর্ড সভা যখন আপীল মামলার বিচার করে তখন নয় জন মনোনীত আইনজ্ঞ লর্ড ছাড়াও লর্ড সভার অন্য সদস্যগণ উপস্থিত থাকিয়া বিচারকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতে আইন ভঙ্গ করা হয় না।

প্রথাগত বিধান ভঙ্গ করিলে আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ হইবে—ইহাই প্রথাগত বিধান মানিবার প্রকৃত কারণ নহে। প্রথাগত বিধানগুলি মানিবার প্রকৃত কারণ হইল যে, শাসকগোষ্ঠী এই অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রথা ও অভ্যাসগুলিকে শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে কতকগুলি নৈতিক নির্দেশ ও বিধি বলিয়া মনে করেন। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় একদল লোক সমগ্র জাতির আস্থা ও বিশ্বাসভাজন হইয়া অবশিষ্টাংশকে শাসন করে। শাসক শ্রেণী জনগণের যে আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, সেই আস্থা ও বিশ্বাসের মূল এই প্রথাগত বিধানগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রথাগত বিধানগুলি—বিরোধী কার্য করিয়া জনগণ কর্তৃক ন্যস্ত আস্থা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করিবার দুঃসাহস কোন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির থাকিতে পারে না। তাই জনগণের আস্থা হারাইলে মন্ত্রিগণসহ

প্রধানমন্ত্রী স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই পদত্যাগ করেন। এইরূপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-বিজয়ী দুর্ধর্ষ চার্চিল, ইডেন, ম্যাকমিলন প্রভৃতি প্রধানমন্ত্রিগণ প্রথাগত বিধানের নির্দেশের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছেন।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিবার দ্বিতীয় কারণ হইল জনমতের প্রভাব, আইন ভঙ্গ করিবার ভয় নহে। এই প্রথাগত বিধানগুলি যথাযথভাবে মানিয়া না চলিলে শাসনকার্যে নানাবিধ বিশৃংখলা উপস্থিত হয়। এই বিশৃংখলার জন্য জনমত ক্ষুব্ধ হইয়া শাসকবর্গের প্রতি আস্থাহীন হইবে। ফলে, পরবর্তী নির্বাচনকালে শাসকবর্গ জনমতের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবে। রাজা যদি প্রথাগত বিধানগুলি না মানিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন তাহা হইলে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। কমনওয়েলথ-সংক্রান্ত প্রথাগত বিধানগুলি না মানিয়া চলিলে গ্রেট বৃটেনের জাতীয় স্বার্থের হানি হইতে পারে। গ্রেট বৃটেনের আর্থিক ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী রাখিবার নিমিত্তই কমনওয়েলথ-সম্পর্কিত প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলা একান্ত অপরিহার্য। যদি প্রথাগত বিধান মানিয়া চলা না হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লর্ডসভা লয়েড জর্জের বাজেট প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রথাগত বিধান ভঙ্গ করে। ইহাতে জনমত ক্ষুব্ধ হয় এবং প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন পাস হয় যাহার ফলে লর্ডসভা কার্যতঃ ইহার সাধারণ ও অর্থ-সংক্রান্ত আইন পাস করিবার ক্ষমতা হারায়। সমাজের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য-বিধান রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রথাগত বিধানগুলির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন ও শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যবধান পরিদৃষ্ট হয়, প্রথাগত বিধানগুলি তাহা দূর করিয়া শাসনব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করিয়া কার্যকরী রাখিতে সহায়তা করে। প্রথাগত বিধানগুলির অবর্তমানে শাসকশ্রেণীর পক্ষে জনমত অনুসারে গণতান্ত্রিক আদর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই শাসনকর্তৃপক্ষ জাতীয় সংহতি ও সম্মান রক্ষার জন্য স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া প্রথাগত বিধানগুলি মান্য করেন।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলা হয় বলিয়া গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রে বিশেষ পরিবর্তনশীলতা বিদ্যমান আছে। সহজ পরিবর্তনশীলতার জন্য এই ভঙ্গকারীকে সময়োপযোগী করিয়া সংস্কার করা সম্ভব। প্রথাগত বিধান-বিধান অনুসা

গুলির জন্যই গ্রেট বৃটেনে আজ সার্বজনীন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব হইয়াছে। রাজা কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন—এই প্রথাগত বিধান দ্বারা গ্রেট বৃটেনে আজ গণসার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথাগত বিধানগুলির জন্যই আজ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ গ্রেট বৃটেনের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গ্রেট বৃটেনের মর্যাদা ও শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

আইন ও প্রথাগত বিধান—Law and Conventions

গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক আইন ও প্রথাগত বিধানগুলির মধ্যে কতিপয় পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, আইনগুলি আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়, অপরপক্ষে প্রথাগত বিধানগুলি আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি হয়। কিন্তু বর্তমানে যাহা প্রথাগত বিধান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে কালক্রমে সেগুলি আইনে পরিণত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ডোমিনিয়নগুলির সহিত গ্রেট বৃটেনের যে রাজনৈতিক সম্পর্ক বহুদিন পর্যন্ত প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টমিন্ষ্টার আইন পাস হওয়ার ফলে সেই সমুদয় প্রথাগত বিধানের অধিকাংশই আইনে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আইনগুলি বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা যায়, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বিচারালয় সাহায্যে বলবৎ করা যায় না। তৃতীয়তঃ, আইন আইনসভা কর্তৃক আকস্মিকভাবে প্রণীত হয়, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি সকলের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, প্রথাগত বিধানগুলি প্রচলিত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ধিত হইলেও শেষ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথাগত বিধানগুলিকে ভিত্তি করিয়াই নূতন আইনের জন্ম হয়।

প্রথাগত আইন ও প্রথাগত বিধান—Common Law and Conventions

প্রথাগত আইন ও প্রথাগত বিধানের কোনটিই আইনসভা কর্তৃক সৃষ্ট

নহে। প্রথাগত আইনগুলি বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা যায়, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বিচারালয় সাহায্যে বলবৎ করা যায় না। প্রথাগত বিধানগুলি দেশাচার হইতে উদ্ভূত, অপরপক্ষে প্রথাগত আইনগুলি বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জন্মলাভ করিয়াছে।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—Characteristics of the Constitution

(১) এককেন্দ্রীয়—Unitary

গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার এককেন্দ্রীয় (Unitary) শাসনব্যবস্থা। শাসনকার্য-পরিচালনা-সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃটেনের আঞ্চলিক সরকারগুলির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি আঞ্চলিক সরকারগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি বা সংকোচ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার কোন বিভাগ হয় নাই। আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে বৃটিশ পার্লামেন্ট সর্বেসর্বা।

(২) প্রধানতঃ অ-লিখিত ও নমনীয়—Mainly unwritten and flexible

দ্বিতীয়তঃ, এই শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত ও সহজে পরিবর্তনশীল (Mainly unwritten and flexible)। ১২১৫ খৃষ্টাব্দের মহাসনদ, ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকারের বিল, ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন প্রভৃতি কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক আইন লিপিবদ্ধ হইলেও এই ঐতিহাসিক শাসনতন্ত্রের একটা বিরাট অংশ প্রথাগত বিধান ও রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনতন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার পরিবর্তনশীলতা। পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্র অতি সহজে পরিবর্তন করিতে পারে। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত এই শাসনতন্ত্র

পরিবর্তন করিবার নিমিত্ত কোনরূপ জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। অন্যান্য অনেক দেশের মত গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। পার্লামেন্ট সভা উভয়-বিধ আইন-প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কে সর্বেসর্বা।

(৩) পার্লামেণ্টের প্রাধান্য—Parliamentary Sovereignty

পার্লামেন্ট সভার আইনগত প্রাধান্য (Sovereignty of Parliament) বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব। পার্লামেন্ট সভা সর্ববিধ আইন-প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করিবার ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন-সম্পর্কিত এই অবাধ ক্ষমতা পার্লামেন্ট সভা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই—এ বিষয়ে পার্লামেন্টকে স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী বলা যাইতে পারে। বৃটেনের বিচারালয়গুলি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনগুলির ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই এগুলির বৈধতাসম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা শাসন-তন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয় কংগ্রেস সভা-প্রণীত আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু আইন-প্রণয়ন বিষয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টের এরূপ অবাধ ক্ষমতা আছে যে, এ-সম্পর্কে একজন লেখক বলিয়াছেন যে, পার্লামেন্ট সভা পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ও নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর সব কিছুই করিতে পারে (It can do anything and everything except that it cannot unsex.)। বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সভা একাধারে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন কর্তা। এই কারণে গ্রেট বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন আইনগত পার্থক্য নাই। উভয় প্রকার আইনের উপরই পার্লামেন্টের প্রাধান্য সু-প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে অর্থে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সভা-প্রণীত কোন্ আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বাতিল করা যাইতে পারে, গ্রেট বৃটেনে সে অর্থে সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন পার্লামেন্ট-প্রণীত কোন আইনকে বে-আইনী বলা চলে না।

বর্তমানে পার্লামেন্ট সভার এই আইনগত সার্বভৌমত্ব কেবিনেট সভার ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীতে পার্লামেন্ট সভা যে সমস্ত ক্ষমতার বলে শক্তিশালী মন্ত্রিপরিষদের পতন ঘটাইয়াছে, আজ আর পার্লামেন্ট সভা সে সমস্ত ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী নয়। আইনতঃ পার্লামেন্ট সভার আইন-প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয়নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে নানাকারণে এই ক্ষমতাগুলি মন্ত্রিপরিষদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। পার্লামেন্ট সভা কার্যতঃ শুধু মন্ত্রিসংসদ-নির্ধারিত কার্য-ক্রমের নিষ্ক্রিয় সমর্থকে পর্যবসিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও, বর্তমান সময়ে জনমতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া পার্লামেন্ট সভা কোন কার্য করিতে পারে না। বৃটেনের জনমত এত সজাগ ও সচেতন যে, পার্লামেন্ট সভা জনমতের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন না করিয়া কোন আইন-প্রণয়ন বা নীতি-নির্ধারণ করিতে সাহসী হয় না। পার্লামেন্ট সভা যে-কোন আইন-প্রণয়ন বা বাতিল করিতে পারে, কিন্তু বর্তমান পার্লামেন্ট পরবর্তী কোন পার্লামেন্টের অবাধ আইন-প্রণয়ন ক্ষমতাকে সংকুচিত করিতে পারে না।

(৪) ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির অভাব—No Separation of Powers

গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না (No Separation of Powers)। আইনসভা, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগ—এই প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। গ্রেট বৃটেনে রাজা একাধারে শাসনবিভাগের প্রধান ও আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁহার বিচারবিভাগীয় কিছু ক্ষমতাও আছে। লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড সভার সভাপতি, মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য এবং সর্বোচ্চ আপীল আদালতের বিচারপতি। সুতরাং একাধারে তিনি আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের সদস্য; সুতরাং তাঁহাকে এই তিন প্রকার ক্ষমতারই অধিকারী বলা যাইতে পারে। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের আইন-সভার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। ক্ষমতা-স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার এই একত্রীকরণে ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে

বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বৃটেনে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের মত সূক্ষ্ম ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি প্রযুক্ত না হইলেও সাধারণভাবে ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে না।

(৫) আইনের অনুশাসন—Rule of Law

আইনের প্রাধান্য বা আইনের অনুশাসন (Rule of Law) শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ডাইসির মতে আইনের এই অনুশাসন তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, গ্রেট বৃটেনের সাধারণ প্রচলিত আইন ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করে। কোন বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে না বা তাহার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আইনের দ্বারা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়। যদি কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়, তাহা হইলে 'হেবিয়াস্ করপাস্' আইনের বলে বন্দী ব্যক্তিকে কোন আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে ও আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ কোনক্রমে তাহার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনে আইনের চক্ষে সকলেই সমান। সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী সকলেই এক আইন মানিতে বাধ্য ও আইনভঙ্গকারী হিসেবে সকলেই একই আদালতের অধীন। ফরাসী দেশের মত বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের বিচারের জন্য পৃথক আইন বা পৃথক আদালত নাই। তৃতীয়তঃ, অন্য অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা নাগরিক অধিকারগুলি স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়, কিন্তু বৃটেনে নাগরিক অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। বৃটেনে জাতীয় জীবনের নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাগরিক অধিকারগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বিচারালয়গুলি এই স্বতঃস্ফূর্ত অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া ইহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করিয়াছে। অন্য দেশে নাগরিক অধিকারের উৎস হইল শাসনতান্ত্রিক আইন, আর বৃটেনে আদালত কর্তৃক স্বীকৃত ও নির্ধারিত নাগরিক অধিকার হইল শাসনতন্ত্রের ভিত্তি।

ডাইসি-প্রদত্ত আইনের অনুশাসনের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা অধুনা বৃটেনে কতদূর প্রযোজ্য সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। সত্য বটে, ফরাসী দেশের মত বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ বিচারের জন্য স্বতন্ত্র কোন আইন নাই, কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পাবলিক্ প্রটেক্শন আইন ও নানাপ্রকার বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা বৃটেনে সরকারী কর্মচারীদের অনেক পরিমাণে সাধারণ আইনের অধিকার বহির্ভূত করা হইয়াছে।

(৬) পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা—Parliamentary Government

গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত (Cabinet System) সরকার বর্তমান। শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রেট বৃটেনে বর্তমানে মন্ত্রিসংসদ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট সভা কার্যতঃ মন্ত্রি-সংসদের নিষ্ক্রিয় সমর্থক দলে পরিণত হইয়াছে।

(৭) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র—Constitutional Monarchy

গ্রেট বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) প্রতিষ্ঠিত। বংশানুক্রমিক রাজা নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু কার্যতঃ তাঁহার ক্ষমতা নানারূপ শাসনতান্ত্রিক আইন ও প্রথাগত বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। বৃটেনের রাজা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না (He reigns but does not govern)।

(৮) অবাস্তবতা—Unreality

বৃটেনের শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার অবাস্তবতা (Unreality)। ইহার কারণ হইল যে, শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কার্যক্ষেত্রে ঐ নীতির প্রয়োগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশে শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলি ও বাস্তবক্ষেত্রে ইহাদের প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, কিন্তু বৃটেনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুসারে রাজা সমস্ত

ক্ষমতার উৎস, তিনি মন্ত্রিগণকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রাজার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই।

(৯) অখণ্ড ধারাবাহিকতা—Unbroken continuity

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার অখণ্ড ধারাবাহিকতা (Unbroken continuity) যাহা অন্য কোন দেশের শাসনতন্ত্রে পরিলক্ষিত হয় না। অন্য দেশের শাসনব্যবস্থায় অতীতের সহিত বর্তমানের আদৌ কোন যোগসূত্র নাই, কিন্তু বৃটেনে রাজা, প্রিভি কাউন্সিল, লর্ড সভা প্রভৃতি শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশগুলি আজ পর্যন্ত অতীতের সহিত বর্তমানের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র প্রমাণিত করিতেছে।

(১০) প্রথাগত বিধান—Conventions

এই শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহাতে বহু প্রথাগত বিধান স্থান পাইয়াছে এবং এই বিধানগুলি শাসনতন্ত্রের বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সাহায্য করিয়াছে। এই প্রথাগত বিধানগুলির অস্তিত্বের জন্যই এই শাসনতন্ত্রকে অলিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। এই বিধানগুলির জন্যই গ্রেট বৃটেনে শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কার্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়।

(১১) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ভিত্তিক—Based on Judicial Decisions

বৃটিশ শাসনতন্ত্র মূলতঃ বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত (Judge-made Constitution) বলিয়া কথিত হয়। গ্রেট বৃটেনের নাগরিকগণ আজ যে সমস্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারী তাহার অধিকাংশই বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইয়াছে, যথা, বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

(১২) দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা—Two-party System

দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি বৃটিশ শাসনব্যবস্থার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বৃটেনে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত এবং এই

শাসনব্যবস্থার অর্থ হইল দলীয় শাসন। দলীয় শাসনের দোষ হইল যে, দেশে বহুদলের অস্তিত্ব থাকিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধিক দল মিলিত হইয়া সরকার গঠন করে, কিন্তু দলগুলির মধ্যে নীতিগত পার্থক্যের ফলে এই সাময়িক সম্মেলন ভঙ্গুর হয় ও সরকারের পতন ঘটে। সরকারের সচরাচর পরিবর্তনের ফলে দেশের প্রগতিমূলক কার্য ব্যাহত হয়। দেশে দুইটি মাত্র দল থাকিলে একদিকে যেমন জনমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, অপরদিকে তদ্রূপ সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই দুইটি প্রধান দল পর্যায়ক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে। একটি দল শাসন করে, অপর দল বিরোধী দলরূপে সরকারী কার্যের গঠনমূলক সমালোচনা করে। এইরূপে দুইটি দলের পর্যায়ক্রম শাসনে জনমত সজাগ থাকে ও শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এখন বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটা সংজ্ঞা নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই শাসনতন্ত্র কতকগুলি জটিল নীতি, প্রতিষ্ঠান ও বাস্তব অভ্যাস লইয়া গঠিত। ইহা কতকগুলি সনদ, বিধিবদ্ধ আইন, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, প্রথাগত আইন, পরম্পরাগত প্রথা ও শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সমষ্টি। এই শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু একটি মাত্র উৎসে সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু বহু উৎস হইতে ইহার বিষয়বস্তু আহরণ করিতে হয়। এই শাসনতন্ত্র একটি সম্পূর্ণ বা পরিসমাপ্ত শাসনতন্ত্র নয়। ইহা ক্রমবর্ধমান শাসনতন্ত্র।

ইংলণ্ডে পৌর অধিকার—Civil Liberty in England

বৃটিশ শাসনতন্ত্রে দুইটি আপাত-বিরোধী বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি হইল পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা, আর দ্বিতীয়টি হইল নাগরিকগণের পৌর অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। বৃটেনে পার্লামেন্টের প্রাধান্য সর্বব্যাপী। এই সর্বব্যাপী প্রাধান্যের বলে পার্লামেন্ট সভা যে-কোন প্রকারের আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করিতে পারে এবং যে-কোন প্রথাগত বিধানকে অবৈধ বলিতে পারে। পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনকে বাতিল করিবার ক্ষমতাযুক্ত উচ্চতর কোন কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ডে নাই। সুতরাং আইনতঃ পার্লামেন্ট অবাধ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এক নিজ ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা দ্বারা ইহার ক্ষমতা সীমায়িত নহে।

এখন প্রশ্ন হইল যে, এইরূপ অবাধ ক্ষমতা-যুক্ত পার্লামেন্টের বিদ্যমানে ইংলণ্ডে ব্যক্তিস্বাধীনতা কিভাবে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। পার্লামেন্ট ইহার অবাধ আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা অনায়াসে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে পার্লামেন্টকে বাধা দিবার কোন শক্তি নাই। সুতরাং পার্লামেন্টের প্রাধান্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা পরস্পর-বিরোধী।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রয়োজনানুসারে এরূপভাবে গঠিত হইয়াছে এবং এই শাসনতন্ত্রের পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও প্রথাগত বিধানগুলি শাসনতন্ত্রের সহিত এরূপ দৃঢ় সম্পর্কযুক্ত যে, একমাত্র গুরুতর জাতীয় আপৎকাল ব্যতীত অন্য কোন সময়ে কোন কর্তৃপক্ষই এই পবিত্র ঐতিহ্য বা প্রথাগত বিধানগুলিকে লংঘন করিতে সাহসী হন না। ফরাসী দেশ ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পৌর অধিকারগুলির অনুরূপভাবে হেবিয়াস্ কর্পাস আইনের সুবিধা পাইবার, আবেদনের ও অস্ত্র বহন করিবার অধিকার প্রভৃতি কয়েকটি পৌর অধিকার ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র কর্তৃক যথাক্রমে ১৬৭৯ ও ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের আইনের দ্বারা সংরক্ষিত করা হইয়াছে। কিন্তু বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি পৌর অধিকারের অপর অংশ শাসনতান্ত্রিক আইন সাহায্যে সংরক্ষিত হয় নাই। এই অধিকারগুলি অতি প্রাচীন প্রথাগত আইন (Common Law) দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছে। এই জাতীয় পৌর অধিকারগুলি যত সময় পর্যন্ত না অন্যের সমজাতীয় পৌর অধিকারগুলির বিরোধী হয়, তত সময় পর্যন্ত প্রথাগত আইনগুলি এই অধিকারগুলিকে রক্ষা করে। ইংলণ্ডে পৌর অধিকারের প্রধান রক্ষা-কবচ হইল আইনের অনুশাসন (Rule of Law)। এই আইনের অনুশাসনই সর্বক্ষেত্রে নাগরিকগণের পৌর অধিকার রক্ষা করে। কিন্তু এই আইনের অনুশাসন-নীতি পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত নহে। এতৎসত্ত্বেও এই আইনের অনুশাসন-নীতি ইংলণ্ডের প্রথাগত আইনের দ্বারা এরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে যে, পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন ও বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত উভয়েই আইনের অনুশাসনকে স্বীকৃতি দান করিয়াছে।

সত্য বটে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে দেশে আপৎকালীন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে নাগরিকগণের পৌর অধিকারগুলি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ

করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সাময়িককালের জন্য গ্রহণ করা হয় এবং জরুরী অবস্থা অন্তে পৌর অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

সুতরাং ফরাসী দেশ বা মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপভাবে ইংলণ্ডে পৌর অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক সুরক্ষিত না হইলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে পৌর অধিকারগুলি কম সুরক্ষিত নহে। একমাত্র শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ হইলেই যে পৌর অধিকারগুলি সর্বাধিক সুরক্ষিত হয়, একথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। নাগরিকগণের সদাজাগ্রত দৃষ্টিই হইল অধিকারগুলির প্রধান রক্ষা-কবচ। ইংলণ্ডে শক্তিশালী জনমত, প্রভাবশালী সংবাদপত্র ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য পৌর অধিকারগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে।

ইংলণ্ডে আইনের অনুশাসন—Rule of Law in England

আইনের অনুশাসন বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফরাসী বা মার্কিণ দেশে নাগরিক অধিকারসমূহ শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বৃটেনে ব্যক্তিগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য ব্যাপারে নাগরিক অধিকারগুলি অনেক ক্ষেত্রে কোন লিখিত আইন দ্বারা সুরক্ষিত হয় নাই। ইংলণ্ডে আইনের অনুশাসনই পৌর অধিকারগুলির প্রধান রক্ষা-কবচরূপে পরিগণিত হয়।

অধ্যাপক ডাইসির মতে আইনের অনুশাসন তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ, কোন ব্যক্তিই সাধারণ বিচারালয় কর্তৃক আইনানুমোদিতভাবে অবধারিত আইনভঙ্গ হেতু দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনপ্রকারে দণ্ডনীয় হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তি আইনের আওতার বহির্ভূত নহে। পদমর্যাদা-নির্বিচারে প্রত্যেক ব্যক্তিই দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণ বিচারালয়ের অধিকারভুক্ত। অর্থাৎ সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক সকলেরই কার্যকলাপ একই সাধারণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আইনভঙ্গ ক্ষেত্রে সকলেই প্রতিষ্ঠিত সাধারণ বিচারালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত। ফরাসী বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত সরকারী কর্মচারীদের জন্য পৃথক আইন ও পৃথক বিচার-ব্যবস্থা ইংলণ্ডে নাই। ইংলণ্ডে আইনের চক্ষে সকলেই সমান এবং আইনগত এই সার্বজনীন

সাম্য ইংলণ্ডে এরূপ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, একমাত্র রাজা বা রাণী ব্যতীত কেহই এই আইনের আওতার বহির্ভূত নহে। এমন কি রাজার বে-আইনী কার্যকলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী দায়ী হন এবং বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকারী কর্মচারিগণ তাঁহাদের সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের ত্রুটির জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাধারণ বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডনীয় হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য দেশে নাগরিক অধিকারগুলির উৎস হইল শাসনতান্ত্রিক আইন, আর বৃটেনে বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃত ও নির্ধারিত নাগরিক অধিকার হইল শাসনতন্ত্রের ভিত্তি। বৃটেনে জাতীয় জীবনের নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাগরিক অধিকারগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বিচারালয়গুলি এই স্বয়ংস্ফূর্ত অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করিয়াছে।

সুতরাং ইংলণ্ডে নাগরিক অধিকারগুলির কোন ঘোষণা-পত্র না থাকিলেও ইংলণ্ডের বিচারপতিগণ আইনের অনুশাসনের ভিত্তিতে নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের বিচার করিয়া নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, বাক্-স্বাধীনতার অধিকার ও সভাসমিতি করিবার অধিকার ইংলণ্ডে আইনের অনুশাসন সাহায্যে এরূপভাবে সুরক্ষিত করা হইয়াছে যে, সকল শ্রেণীর নাগরিকগণই বিনা বাধায় নিরঙ্কুশভাবে এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তিকেই বিনা বিচারে আটক করা যায় না। উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই আটক রাখিয়া তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা যায় না। যদি কোন ব্যক্তিকে এইরূপে বিনা বিচারে সরকারী কোন কর্তৃপক্ষ আটক করে তাহা হইলে 'হেবিয়াস্ কর্পাস' আইনের বলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উপযুক্ত বিচারের দাবী করিতে পারে। এই আইনের বলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারালয়ে হাজির করাইয়া তাহার দোষ প্রমাণিত করিতে হইবে। দোষ প্রমাণ না হইলে সে মুক্তি পাইবে।

অনুরূপভাবে, বাক্-স্বাধীনতাও সুরক্ষিত করা হইয়াছে। যে-কোন ব্যক্তি আইনানুমোদিতভাবে তাহার মতামত মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রকাশ করিতে পারে। শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ না করিয়া জনসাধারণের একত্র সমাবেশ দ্বারা সভাসমিতি করিবার অধিকারও এই আইনের অনুশাসনের দ্বারা

সুরক্ষিত হয়। এই কারণে ইংলণ্ডের নাগরিকগণের বিবিধ মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য কোন লিখিত ঘোষণা-পত্রের প্রয়োজন হয় নাই।

ইংলণ্ডে সকলের জন্যই একই আইন ও একই বিচার-ব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু ইউরোপের অন্যত্র বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশে সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী এই উভয়ের জন্য পৃথক আইন ও পৃথক বিচারব্যবস্থা বর্তমান। সরকারী কর্মচারিগণ সরকারী কার্যের জন্য অভিযুক্ত হইলে সাধারণ আইনের দ্বারা সাধারণ বিচারালয়ে তাহাদের বিচার হয় না। এজন্য পৃথক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই বিচারালয়গুলি স্বতন্ত্র আইন প্রয়োগ করিয়া এই জাতীয় অভিযোগগুলির বিচার করে।

সুতরাং দেখা যায় যে, ইংলণ্ডে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী কোন সরকারী কর্মচারী বা বে-সরকারী ব্যক্তি নাই। সরকারী কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন-বহির্ভূত কোন কাজ নিজেদের খুসীমত করিতে পারেন না। শাসনকর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আইনের অনুশাসন দ্বারা অবধারিত-রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র সুরক্ষিত করা হইয়াছে।

সমালোচনা—Criticism

ডাইসি কর্তৃক প্রদত্ত আইনের অনুশাসনের ব্যাখ্যার কতিপয় ত্রুটি দেখা যায়। অধ্যাপক জেনিংস ডাইসির বিশ্লেষণের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, ডাইসির মতে আইনের অনুশাসন নীতির প্রথম অংশ অর্থাৎ আইনের প্রাধান্য গ্রেট ব্রটেনে বিশেষভাবে কার্যকর হইয়াছে। তাঁহার মতে একমাত্র বৃটেনের অধিবাসিগণই এই আইনের প্রাধান্যের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারেন। ডাইসির এই মত আইনের প্রাধান্য নীতিকে অতি-রঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করিয়াছে। আইনের প্রাধান্য নীতির তাৎপর্য হইল স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অনুপস্থিতি বা অবসান। জেনিংসের মতে এমন কি ইংলণ্ডেও এই আইনের প্রাধান্য বলবৎ থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অবসান ঘটে নাই। বিচারালয়গুলি ইহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা অর্থাৎ বিচার-পদ্ধতির সমালোচনা করা রহিত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত আইনের প্রাধান্য সকল দেশেই বর্তমান।

এমনকি একনায়কতন্ত্র-শাসিত দেশেও নেতা কর্তৃক রচিত আইনের প্রাধান্য বলবৎ থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, আইনের অনুশাসন নীতির দ্বিতীয় তাৎপর্য হইল, আইনের চক্ষে সকলেই সমান অর্থাৎ সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী সকলেই এক পর্যায়ভুক্ত—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার বা কর্তব্য নাই। ডাইসির এই ব্যাখ্যাও সত্য নহে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকারী কর্মচারীর যে ক্ষমতা আছে, সাধারণ নাগরিকের সে ক্ষমতা নাই। একজন বিচারক কোন ব্যক্তিকে জুরী হিসাবে কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে, কিন্তু কোন সাধারণ নাগরিক অপর নাগরিকের উপর এরূপ আদেশ জারি করিতে পারে না। অনুরূপভাবে শ্রমমন্ত্রীর পক্ষে বেকারভাতা প্রদান করিবার বাধ্যতা-মূলক কর্তব্য আছে যাহা একজন সাধারণ নাগরিকের নাই। আরও বলা যায় যে, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাবে যে ধনবৈষম্য উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলেও এই আইনগত সাম্যনীতি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। বিচার ক্ষেত্রে ধনবৈষম্যের ফলে দরিদ্রগণ অর্থের অভাবে সমান সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকে।

তৃতীয়তঃ, ডাইসির মতে বৃটেনের শাসনতন্ত্র সাধারণ বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ নাগরিকের অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নাগরিক অধিকার সাধারণ আইন দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এ মত সম্পূর্ণ গ্রহণ-যোগ্য নহে। কারণ বৃটিশ শাসনব্যবস্থার মূলনীতি পার্লামেন্টের প্রাধান্য কোন বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার পরিবর্তে জনগণের দীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডাইসির বিশ্লেষণের প্রধান ত্রুটি হইল যে, তিনি শুধু প্রথাগত আইনভিত্তিক অধিকারগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধিবদ্ধ আইন কর্তৃক নির্ধারিত অধিকারগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ডাইসির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাবই ইহার কারণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে ডাইসি প্রদত্ত ব্যাখ্যা আর প্রযোজ্য নহে। শক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র আজ জন-সেবামূলক রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে। ইহার ফলে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি ক্রমাগত বিশেষ প্রসার লাভ করিতেছে। জন-সেবামূলক কার্যগুলি সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে

রাষ্ট্রের নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রয়োজনীয় অসংখ্য আইন প্রণয়ন করিবার জন্য পার্লামেন্টের পর্যাপ্ত সময়ও নাই ও আইন প্রণয়নের বিশেষ জ্ঞানও নাই, তাই পার্লামেন্ট শুধু আইনের কাঠামো স্থির করিয়া দেয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন-গুলিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। 'স-পরিষদ রাজ আজ্ঞা' (Orders-in-Council) অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন-প্রণয়ন হইল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার ফলেও বর্তমানে আইনের অনুশাসন নীতির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

আইনের অনুশাসনের গুরুত্ব হ্রাস—Decline of the Rule of Law

বর্তমানে বাস্তবক্ষেত্রে আইনের অনুশাসনের প্রভাব নানাকারণে হ্রাস পাইতেছে। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, যদি কোন সরকারী কর্মচারীর কাজের দ্বারা কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া সাধারণ বিচারলয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন তাহা হইলে এই ক্ষতিপূরণ সরকারই করিয়া থাকেন—সরকারী কর্মচারীর কোন দায়িত্ব নাই। এই কারণে সরকারী কর্মচারিগণ তাঁহাদের সাধারণ-সম্পর্কিত কর্তব্য সম্পাদনে আইনের অনুশাসন-নীতিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা নাও দিতে পারেন। ইহার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেন্ট কারখানা-সংক্রান্ত, শিক্ষা-সংক্রান্ত নানাপ্রকার আইন পাস করিয়া সরকারী কর্মচারিগণের উপর কিছু বিচার করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। ইহার ফলে সাধারণ বিচারালয়গুলির বিচারবিষয়ক ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া আইনের অনুশাসনের ক্ষেত্র সংকুচিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন (Delegated Legislation), স-পরিষদ রাজআজ্ঞা (Orders-in-Council) ও অনুমোদন-সাপেক্ষ আদেশ (Provisional Orders) প্রভৃতি প্রকৃত আইন না হইলেও বিচারালয়গুলি ইহাদের বৈধতা বিচার করিতে পারে না। সুতরাং এই বিষয়গুলির দ্বারাও বিচারালয়গুলির বিচারক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে। ফলে, আইনের অনুশাসনের ক্ষেত্রও সীমায়িত হইয়াছে।

শাসনকর্তৃপক্ষ—The Executive

গ্রেট বৃটেনের শাসনকর্তৃপক্ষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা,—রাজা, কেবিনেট সভা ও স্থায়ী আমলাতন্ত্র। রাজা হইলেন শাসনকর্তৃপক্ষের নামসর্বস্ব প্রধান, রাজাসহ কেবিনেট সভা হইল রাজনৈতিক ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসনকর্তৃপক্ষ, কেবিনেট সভা হইল প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ এবং কার্যকালের স্থায়িত্বের জন্য আমলাতন্ত্রকে স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়।

রাজা ও রাজতন্ত্র---The King and the Crown

বৃটিশ শাসনব্যবস্থার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার অবাস্তবতা অর্থাৎ এই শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক নীতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে বিশেষ ব্যবধান দেখা যায়। গ্রেট বৃটেনের রাজার পদমর্যাদা, ক্ষমতা, কার্যাবলী ও বিশেষ ক্ষমতাবলী পর্যালোচনা করিলে এই অবাস্তবতার সন্ধান পাওয়া যায়। যদি প্রশ্ন করা যায় যে, কে গ্রেট বৃটেন শাসন করে? তদুত্তরে নীতিগতভাবে বলিতে হয় যে, রাজা শাসন করেন। কারণ রাজাই হইলেন গ্রেট বৃটেনের সর্বোচ্চ সম্মানিত ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। হাজার বৎসর পূর্বে তিনি যেরূপ সিংহাসনের মুকুটধারী ছিলেন, বর্তমানেও সেইরূপ আছেন। রাজার ক্ষমতাবলীও অক্ষুণ্ণ আছে। তাহা হইলে প্রশ্ন হইল নীতির সহিত বাস্তবতার ব্যবধান কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে হইলে গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সহিত একটু পরিচিত হওয়া দরকার। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জন্ কর্তৃক মহাসনদ স্বীকার করিয়া লইবার সময় হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমাগত রাজার হস্ত হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া সেই ক্ষমতাসমূহ জনপ্রতিনিধি লইয়া গঠিত পার্লামেন্টের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এইরূপে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে লাগিল এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution, 1688) ফলে রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতার কার্যতঃ অবসান ঘটিল। গৌরবময় বিপ্লবের তাৎপর্য হইল যে, এই বিপ্লবের ফলে যে শুধু এক রাজার পরিবর্তে অন্য রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তাহা নয়, এই বিপ্লবের ফলে রাজা কার্যতঃ

সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত হইয়া নামমাত্র রাজারূপে পরিগণিত হইলেন। তাঁহার সমুদয় ক্ষমতা পার্লামেন্টে হস্তান্তরিত হইল। পূর্বে রাজা ব্যক্তি হিসাবে নিজ ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমুদয় ক্ষমতা পরিচালনা ও প্রয়োগ করিতে পারিতেন, কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে বর্তমানে রাজার নামে পার্লামেন্ট অথবা এই সভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসংসদ ক্ষমতাগুলি পরিচালনা করেন। সত্য বটে, রাজা সশরীরে এখনও বর্তমান আছেন। তাঁহার মুকুট আছে, সিংহাসন আছে, জাঁক-জমক আছে, পরামর্শদাতা আছে, ক্ষমতাও আছে। কিন্তু পূর্বে রাজা তাঁহার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। বর্তমানে মন্ত্রিগণই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া রাজার নামে সেই সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করে। সুতরাং রাজা এখন রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। ব্যক্তি রাজার পরিবর্তে রাজা এখন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছেন এবং এই রাজতন্ত্র রূপ প্রতিষ্ঠানই (The Crown as an institution) হইল রাজার সমুদয় ক্ষমতার আধার। এই আধারে রক্ষিত ক্ষমতাগুলি কেবিনেট সভা পার্লামেন্টের সম্মতিতে প্রয়োগ করে। ব্যক্তি রাজার পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আবির্ভাবের ফলে বলা হয় যে, রাজা মৃত; রাজা দীর্ঘজীবী হউন (The King is dead; long live the Crown)। ইহার অর্থ হইল যে, এক রাজার মৃত্যু ঘটিলে অন্য রাজা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন, কিন্তু ইহাতে রাজকীয় ক্ষমতা কোন মতে ক্ষুণ্ণ হইবে না। দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে রাজা এখন এক আইনগত ধারণায় অর্থাৎ রাজতন্ত্রে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার বহিরাবরণ অক্ষুণ্ণ থাকিলেও তিনি অন্তঃসারশূন্য হইয়া মন্ত্রিসভার ক্রীড়নক হইয়াছেন। সত্য বটে, আইনতঃ এখনও রাজতন্ত্র সর্বক্ষমতার আধার। রাজাই প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিয়োগ করেন, তিনি পার্লামেন্ট সভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং এই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করিতে পারেন। তিনি দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত সমুদয় ক্ষমতাই রাজার হস্তে ন্যস্ত, কিন্তু কোন রাজাই আর নিজ ইচ্ছামত এই সমুদয় ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন না। জনগণের প্রতি পার্লামেন্টের আস্থাভাজন মন্ত্রিসভাই হইল বর্তমানে পূর্বতন রাজকীয় ক্ষমতাসমূহের অধিকারী। রাজা কতদূর ক্ষমতা-হীন হইয়াছেন তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইল রাজা অষ্টম

এডওয়ার্ড। তিনি নিজের বিবাহ ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ না করিবার ফলে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্যক্তি রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিতে পারেন, সিংহাসনচ্যুত হইতে পারেন অথবা তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। কিন্তু রাজকীয় ক্ষমতার আধার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের অবসান নাই, মৃত্যু নাই। গ্রেট বৃটেনের রাজা আজ গণশক্তির ধারকরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজার ক্ষমতা সার্বজনীন ক্ষমতায় পর্যবসিত হইয়াছে, আর এই ক্ষমতা গণ-প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

রাজতন্ত্র সম্পর্কিত উত্তরাধিকার আইন---Title and Succession to the Crown

গৌরবময় বিপ্লবের ফলে রাজার শাসনাধিকার পার্লামেন্ট সভার মাধ্যমে প্রকাশিত জনগণের সম্মতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সিংহাসনের অধিকার সম্পর্কে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট এক আইন পাস করে। এই আইন অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে কোন রাজপুত্র রাজা হইতে পারিবেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সব সময়ই অগ্রাধিকার পাইবেন। কিন্তু যিনি রাজা হইবেন তাঁহাকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী হইতেই হইবে। রাজা অপুত্রক হইলে রাজার জ্যেষ্ঠ কন্যা সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। যদি রাজার কোন প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী উত্তরাধিকারী না থাকেন, তাহা হইলে পার্লামেন্ট সভার কোন নূতন পরিবারের উপর রাজতন্ত্র আরোপিত করিয়া নূতন রাজবংশ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ওয়েস্টমিনস্টার আইন (Statute of Westminster, 1931) পাস হইবার ফলে বৃটিশ পার্লামেন্ট সাধারণতন্ত্রভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের বিনা সম্মতিতে এককভাবে এই উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করিতে পারে না।

রাজকীয় ক্ষমতা---Powers of the Crown

আইনতঃ রাজার বহুবিধ ক্ষমতা আছে। রাজার ক্ষমতাগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যায় :—

(ক) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা—Executive and Administrative Powers

রাজা শাসনবিভাগের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসংসদের অন্যান্য সদস্যদের তিনি নিয়োগ করেন এবং বিচারক ব্যতীত অন্য সকলকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাজা। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁহার যুদ্ধঘোষণা, শান্তিস্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন করিবার অধিকার আছে। স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব রাজার হস্তে ন্যস্ত। পররাষ্ট্রনীতি-নির্ধারণ, বিদেশে দূতপ্রেরণ ও বৈদেশিক দূতগ্রহণ করাও রাজার অন্যতম কর্তব্য। শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে তিনি আইন কার্যকরী করেন ও সমুদয় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

(খ) আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Legislative Powers

রাজাসহ পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী। রাজার বিনা সম্মতিতে কোন আইনই বিধিবদ্ধ আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাজা আইন নাকচ করিতে পারেন, কিন্তু ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কালে রাজা কর্তৃক এই ক্ষমতা আর প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া ইহা বর্তমানে অকার্যকরী। রাজার আহ্বানে পার্লামেন্ট সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় ও রাজার নির্দেশে পার্লামেন্ট সভার অধিবেশন স্থগিত থাকে। তিনি ইচ্ছা করিলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন ও প্রয়োজন হইলে পূর্বতন সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পার্লামেন্ট পুনর্গঠন করিবার নিমিত্ত নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। সরকারী কর্মচারীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাজা আদেশ জারী করিতে পারেন। এই আদেশগুলিকে সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) বলা হয়।

আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে রাজার এখন আর নিজস্ব বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশসমূহের উপর রাজার জরুরী আদেশ ঘোষণা করিবার বিশেষ ক্ষমতাও সংকুচিত হইয়াছে। পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের কাঠামোকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য উহার যে বিস্তারিত বিধানের প্রয়োজন তাহার ভার বর্তমানে রাজশক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু পার্লামেন্ট-

প্রণীত আইনকে বিস্তারিত করিবার যে ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক রাজশক্তির উপর অর্পিত হইয়াছে—ইহা রাজার নিজস্ব ক্ষমতা নহে।

(গ) আইন না-মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা—Veto Power

পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে হইলে রাজার সম্মতি অপরিহার্য। রাজা পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত কোন খসড়া আইনে সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকিয়া আইনের প্রস্তাবটিকে পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত করিতে না দিতে পারেন। কিন্তু রাজার এই আইন না-মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পর আর প্রযুক্ত হয় নাই এবং দীর্ঘকাল অপ্রয়োগের ফলে এই ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন রাজা যদি মন্ত্রিগণের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন প্রস্তাবে সম্মতি দানে বিরত থাকেন তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক সংকট অনিবার্য। রাজার প্রত্যাখ্যানের ফলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে রাজাকে বিরোধীদলের নেতাকে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের জন্য আহ্বান করিতে হইবে। কিন্তু যে কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদল বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়াছিল সে সভা নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদকে সমর্থন না করিবার ফলে রাজার পক্ষে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন অসম্ভব হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রাজা কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। রাজার এইরূপ অ-গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে জনমত ক্ষুব্ধ হইবার ফলে নূতন নির্বাচনের ফল নিশ্চিতরূপে রাজার বিরুদ্ধে যাইবে। তখন রাজার পদত্যাগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। গ্রেট বৃটেনে গণতান্ত্রিক আদর্শ এতই সুদৃঢ় যে, রাজা কখনই পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনে সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকিতে পারেন না।

বর্তমানে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনে সম্মতিপ্রদানও আর রাজার ব্যক্তিগত কার্য নয়। এই সম্মতিদান একটি রাজকীয় পরিষদের (Royal Commission) উপর ন্যস্ত।

(ঘ) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা—Judicial Powers

রাজশক্তি হইল ন্যায়বিচারের একমাত্র পরিবেশক। রাজা বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন ও পার্লামেণ্ট সভার অভিভাষণ-ক্রমেই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ হইতে প্রিভি-

কাউন্সিলে যে আপীল করা হয়, সেই আপীলসমূহের বিচার করিয়া প্রিভি কাউন্সিল রাজাকে ইহার মন্তব্য জ্ঞাপন করে এবং রাজা সেই আপীলসমূহের রায় প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত, দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করিবার অথবা দণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করিবার একমাত্র অধিকারী হইলেন রাজা।

(ঙ) বিবিধ ক্ষমতা—Miscellaneous Powers

রাজা ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ধর্মমহামণ্ডলের তিনিই হইলেন প্রধান। আর্চবিশপ ও বিশপগণকে তিনি নিয়োগ করিয়া থাকেন। রাজা সমস্ত সম্মানের উৎস। যোগ্য ব্যক্তিগণকে তিনি বিবিধ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করেন। তিনি লর্ড উপাধি প্রদান করিয়া কোন ব্যক্তিকে লর্ড সভার সদস্য নিযুক্ত করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, গ্রেট বৃটেনে রাজা আইনতঃ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা অতীতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, বর্তমানেও বৃদ্ধি পাইতেছে ও ভবিষ্যতেও বৃদ্ধি পাইবে। আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কার্যাবলী যতই প্রসারিত হইবে, সেই কার্যাবলী রূপায়িত করিবার জন্য ক্ষমতাও ততই বৃদ্ধি পাইবে। পার্লামেন্ট নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া রাজকীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ করিবে।

রাজকীয় ক্ষমতার উৎস—Sources of Royal Powers

রাজার এই বিবিধ ক্ষমতার দুইটি উৎস আছে। প্রথমটি হইল পার্লামেন্ট প্রণীত আইন (Parliamentary Statutes) আর দ্বিতীয়টি হইল রাজার আদিম বিশেষ ক্ষমতাবলী যাহা এখনও পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয় নাই (Preroga-tives)। পার্লামেন্ট আইন পাস করিয়া যে সমস্ত ক্ষমতা সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির উপর অর্পণ করিয়াছে তৎসমুদয়ই রাজার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার যে কর্তৃত্ব করে তাহাও রাজার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক কালে অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার ফলে রাজকীয় ক্ষমতা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

রাজার আদিম বিশেষ ক্ষমতাগুলি পার্লামেন্ট-নিরপেক্ষ অর্থাৎ যে ক্ষমতাগুলি পার্লামেন্ট কর্তৃক রাজার উপর আরোপিত হয় নাই এবং যেগুলি তিনি এবং তাঁহার কর্মচারিবৃন্দ পার্লামেন্ট-নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করিতে পারেন। রাজার এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি প্রথাগত আইন (Common Law) ভিত্তিক। এই প্রথাভিত্তিক ক্ষমতাগুলি আইনতঃ স্বীকৃত না হইলেও বিচারালয় কর্তৃক স্বীকৃত হয়। কারণ প্রথাগত আইনগুলিও বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। পার্লামেন্ট সভা আহ্বান করা, যুদ্ধ ঘোষণা করা, সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করা, সরকারী কার্যে নিয়োগ ও পদচ্যুতি প্রভৃতি হইল রাজার আদিম স্বৈরক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। রাজার এই আদিম ক্ষমতার কিছু অংশ পার্লামেন্ট আইনের দ্বারা রদ করিয়াছে, কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ রাজার হস্তে ন্যস্ত আছে। আবার পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়াও রাজার হস্তে নূতন নূতন বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

বর্তমানে এই দুই জাতীয় ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করিবার কোন যুক্তি নাই। পার্লামেন্ট প্রদত্ত ক্ষমতাই হউক আর রাজার স্বকীয় ক্ষমতাই হউক, রাজা স্বয়ং নিজ ইচ্ছানুসারে কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে পারেন না।

রাজার বিশেষ অধিকার ও নিষ্কৃতি—**Privileges and Immunities of the Crown**

গ্রেট বৃটেনের সর্বোচ্চ রাজশক্তি কতিপয় বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি সাধারণ নাগরিকগণের অনুরূপভাবে সম্পত্তি অর্জন, ভোগ, দখল ও হস্তান্তর করিবার অধিকারী। কিন্তু তিনি সাধারণ আইনের দ্বারা বাধ্য নহেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা যায় না বা কোনও বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার নির্দেশ জারী করা যায় না। কোন প্রদেয় অর্থ না দিবার কারণে তাঁহার কোন দ্রব্য আটক করা যায় না বা কোন মামলায় তাঁহাকে প্রতিবাদী করা যায় না। পার্লামেন্ট রাজার ব্যয় নির্বাহার্থে অর্থ মঞ্জুর করিয়া থাকে। এই ব্যয়কে সিভিল লিষ্ট (Civil List) বলা হয়। বর্তমানে বাৎসরিক ৪৭৫,৪০০ পাউণ্ড এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন খাতে ধার্য একাধিক ব্যয় সমবায়ে রাজকীয় সমগ্র ব্যয় নির্ধারিত হয়।

রাজার মৃত্যু নাই—The King never dies

রাজার ক্ষমতাগুলি আলোচনা করিলে ইহা অনুমান করা যায় যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিহিসাবে রাজা ও শাসকপ্রধান হিসাবে রাজশক্তির একটি পার্থক্য বিদ্যমান। এডওয়ার্ড, জর্জ প্রভৃতি হইলেন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, যাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ে গ্রেট বৃটেনের রাজকীয় উত্তরাধিকার আইন অনুসারে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অপরপক্ষে রাজতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠানবিশেষ, যাহাকে সর্ববিধ রাজশক্তির ধারক ও নিয়ামক বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষ রাজার মাধ্যমেই এই সমুদয় রাজশক্তি মন্ত্রিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজা শুধু স্বাক্ষর-কারী যন্ত্র হিসাবেই শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। এইজন্ত বলা হয় যে, গ্রেট বৃটেনের রাজার মৃত্যু নাই। মানুষ হিসাবে কোন ব্যক্তি অমর হইতে পারে না। ব্যক্তি হিসাবে বৃটেনের রাজারও মৃত্যু হয় এবং এক রাজার মৃত্যুর পর অন্য ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে এক রাজার মৃত্যু হইলে রাজকীয় ক্ষমতার অবসান হয় না। রাজকীয় ক্ষমতা পরবর্তী রাজার নামে মন্ত্রিসংসদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। সুতরাং রাজার মৃত্যু নাই বলিলে বুঝা যায় যে, ব্যক্তিহিসাবে রাজার মৃত্যুতে রাজকীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা কোনক্রমেই ব্যাহত হয় না।

রাজা কোনরূপ অন্যায় করিতে পারেন না—The King can do no wrong

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা কোন অন্যায় কার্য করিতে পারেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে কোন অন্যায় কার্যের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না। রাজাকে দোষী করিয়া কোন আদালতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, রাজার অন্যায় কার্যের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ আনয়ন করা না যায় তাহা হইলে কেহ না কেহ এই অন্যায়ের জন্য দায়ী হইবেন। বৃটেনে আইনের অনুশাসন বর্তমান থাকার জন্য কোন অপরাধী বিনা বিচারে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। সুতরাং রাজার নামে অনুষ্ঠিত অন্যায় বা অপরাধের জন্য কাহাকেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই নীতি কার্যকরী হওয়ার ফলে বৃটেনে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসংসদের উদ্ভব হইয়াছে।

রাজার নামে প্রচারিত প্রত্যেকটি নির্দেশ কোন-না-কোন মন্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত হয় ও এই নির্দেশের জন্য মন্ত্রিগণ দায়ী হইয়া থাকেন। যেহেতু রাজার নিজস্ব কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার নাই, সেইহেতু কোন কার্যের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না। যে কর্মচারীর দ্বারা বে-আইনী কার্য সম্পাদিত হয়, তাঁহাকেই অভিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন রাজকর্মচারীই অন্যায় বা বে-আইনী কার্য করিয়া রাজার আদেশের অজুহাতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। রাজা নিজে যখন অন্যায় কার্য করিতে পারেন না তখন স্বভাবতই তাঁহার অন্যায় আদেশ প্রদান করিবারও ক্ষমতা নাই। সুতরাং বৃটেনে কোন সরকারী কর্মচারী রাজাদেশের দোহাই দিয়া বে-আইনী কার্যের জন্য নিষ্কৃতি পায় না।

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে রাজার বিশেষ অনুগত মন্ত্রী আর্ল অব ড্যানবির বিরুদ্ধে কমন্স সভা মহা-অভিযোগ (Impeachment) আনয়ন করে। উক্ত আর্ল বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হন। বিচারকালে আর্ল রাজার নির্দেশের দোহাই দিয়া ও এমনকি রাজার ক্ষমা-পত্র উপস্থাপিত করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট সভা আর্লকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করে। এই মহা-অভিযোগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে উপরি-উক্ত শাসনতান্ত্রিক নীতিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার কারণ—Reasons for the Survival of Monarchy

রাজার ক্ষমতা আলোচনা করিলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই উঠে যে, ক্ষমতাবিহীন নামসর্বস্ব রাজতন্ত্র বজায় রাখিয়া গ্রেট বৃটেনের কি লাভ। অন্যান্য দেশে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডেও এই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিলে জাতীয় ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। ইহা ছাড়া, বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে পুরাতন ব্যবস্থা-সম্মত রাজতন্ত্র অচল। সুতরাং কোন দিক দিয়াই এই রাজতন্ত্রের সমর্থন পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার অনেকগুলি কারণ প্রদর্শিত হয়। ইংরাজ জাতি নানাবিষয়ে প্রগতিশীল হইলেও রক্ষণশীলতা তাহাদের জাতীয়

চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতীয় চরিত্রের এই রক্ষণশীলতার জন্যই তাহারা রাজতন্ত্ররূপ একটি অতি সুপ্রাচীন ও তাহাদের জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠানটির বিলোপ সাধন করে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ইংলণ্ডে কোন দিনই গণতন্ত্রের প্রসারকে ব্যাহত করে নাই। রাজার ব্যক্তিগত সমুদয় ক্ষমতাই বর্তমানে রাজতন্ত্রের উপর আরোপিত হইয়া গণশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। বস্তুতঃ, রাজার ক্ষমতাগুলি এখন জনসাধারণের শক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে। তাই রাজতন্ত্রের সহিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন বিরোধ হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, রাজতন্ত্র ঈশ্বরানুমোদিত শাসনব্যবস্থা—এই বিশ্বাস এখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের মনে কার্যকরী আছে। এই বিশ্বাসই রাজতন্ত্র শাসনব্যবস্থার প্রতি সাধারণের একটি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিয়া শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ়তর রাখিতে সমর্থ হয়। সাধারণ লোকে আজও পর্যন্ত রাজার উপর একটি অতি-মানবীয় ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বা একদলীয় নায়ক জনসাধারণের নিকট হইতে এতটা আনুগত্য বা বশ্যতা দাবী করিতে পারেন না। সুতরাং রাজতন্ত্র ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, বাস্তবতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান অপরিহার্য। রাজার পরিবর্তে যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় একজন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী শাসকপ্রধান রাজপদে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট সভার সর্বময় কর্তৃত্ব লোপ পাইবে ও বৃটেনে বহু শতাব্দী ধরিয়া অর্জিত গণসার্বভৌম আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা আছে। অপরপক্ষে, ফরাসী দেশের পূর্ব-রাষ্ট্রপতির ন্যায় একজন নামসর্বস্ব ও নিষ্ক্রিয় রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিযুক্ত হন, তাহা হইলেও অবস্থার উন্নতি দূরে থাকুক, নিকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে। সুতরাং দেখা যায় যে, রাজার পরিবর্তে উপযুক্ত অন্য কোন শাসকপ্রধানের অভাবহেতু রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন করা হয় নাই।

পঞ্চমতঃ, সমগ্র জাতীয় জীবনের উপর রাজতন্ত্র বহুকাল হইতে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও জাতীয় জীবনের সামাজিক ও নৈতিকক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। জাতীয় জীবনে রাজা হইলেন উচ্চতর আদর্শের প্রতীক। রাজার অবর্তমানে জাতীয় জীবনের এই আদর্শ মান ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে।

ষষ্ঠতঃ, বেজহটের মতে রাজার এখনও পর্যন্ত তিনটি প্রধান ক্ষমতা অব্যাহত আছে। রাজা মন্ত্রিসংসদকে নিষেধ করিতে পারেন, উৎসাহিত করিতে পারেন এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন। এই তিনটি ক্ষমতার বলে রাজা মন্ত্রিবর্গকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কার্য হইতে নিরস্ত করিতে পারেন এবং জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন। একথা সত্য যে, মন্ত্রিমণ্ডলী রাজার অনুরোধ ও নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য নহে; কিন্তু রাজা যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন ও তাঁহার পরামর্শ যদি যুক্তিযুক্ত হয় তাহা হইলে মন্ত্রিসংসদের পক্ষে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করা অসম্ভব হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রিসংসদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা রাজার পরামর্শ অনেক সময় অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রিসংসদ সাময়িক কালের জন্য শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা একটা নির্দিষ্ট দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করেন। অপর-পক্ষে রাজা হইলেন সম্পূর্ণরূপে দল-নিরপেক্ষ। তিনি স্থায়ী শাসক। সুতরাং, শাসনব্যাপারে তাঁহার অধিকতর অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির দ্বারা মন্ত্রিবর্গকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারেন। বর্তমানে রাজার কোন স্বকীয় ক্ষমতা না থাকিলেও তাঁহার যথেষ্ট পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। এই প্রভাব-প্রতিপত্তি, দল-নিরপেক্ষতা ও অগাধ অভিজ্ঞতার জন্য রাজা জাতীয় স্বার্থের প্রধান রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যখন গুরুতর মতভেদ দেখা যায়, তখন রাজাই নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন মতের সমন্বয়সাধন করিয়া জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। সুতরাং পরামর্শদাতা হিসাবে জাতীয় জীবনে রাজার অবদান উপেক্ষণীয় নহে।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার সুযোগ আছে। সাধারণতঃ কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজা

মন্ত্রিপরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। যদি কোন মন্ত্রিপরিষদ কমন্স সভায় পরাজিত হইয়া পদত্যাগ করেন তাহা হইলে রাজা বিরোধী দলের নেতাকে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের জন্য অনুরোধ করেন। উভয় ক্ষেত্রেই রাজার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলবৎ করিবার কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু কমন্স সভায় যদি কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে অথবা প্রধানমন্ত্রী অবসর গ্রহণ করিলে এবং যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কোন নেতা নির্বাচন করে নাই—এই অবস্থা ঘটিলে রাজাকে অতি সতর্কতার সহিত শাসনতন্ত্র অনুমোদিত পদ্ধতিতে নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিতে হয়। ১৯২৩ ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রাজা পঞ্চম জর্জ উপরি-উক্ত অবস্থার সম্মুখীন হইয়া নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুসারে যথাক্রমে স্ট্যানলি বলড্বুইন ও র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাজা বহুজাতি-সমন্বিত বিশাল আয়তনের (বৃটিশ) কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ঐক্যের একমাত্র যোগসূত্র। ডোমিনিয়নগুলি বর্তমানে কার্যতঃ স্বাধীন। ডোমিনিয়নগুলি সম্পর্কে রাজা বর্তমানে যে সামান্য কার্য করেন তাহা ডোমিনিয়ন মন্ত্রিসংসদের পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হয়। ইহা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে, এই বিরাট সাধারাণতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে রাজার বিশেষ গুরুত্ব আছে। রাজার অবর্তমানে কমনওয়েলথের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হইবে। ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হইলেও কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে ইংলণ্ডের রাজাকে কমনওয়েলথের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই আলোচনা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, রাজা শুধু নামসর্বস্ব নিষ্ক্রিয় শাসকপ্রধান নহেন, বাস্তবক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁহার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। জাতীয় আয়ের যে অংশ রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য ব্যয় করা হয়, বৃটিশ জাতি সে ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়া মনে করে না।

প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ : কেবিনেট - Cabinet—The Real Executive

প্রিভি কাউন্সিল (The Privy Council)—গ্রেট বৃটেনে শাসনকার্য প্রকৃতপক্ষে কেবিনেট সভা কর্তৃক পরিচালিত হইলেও এই সভাকে

আইনসম্মত শাসনকর্তৃপক্ষ বলা যায় না। কেবিনেট সভার ক্ষমতার উৎস হইল প্রিভি কাউন্সিল। ব্যক্তিগতভাবে রাজা যখন স্বকীয় শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিতেন তখন রাজার যে মন্ত্রণাসভা ছিল তাহাকে প্রিভি কাউন্সিল বলা হইত। স্টুয়ার্ট রাজাদের শাসনকালে প্রিভি কাউন্সিল সর্ববিষয়ে অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠে ও সর্ববিষয়ে রাজার পরামর্শদাতা হিসাবে কার্য করিতে থাকে। কালক্রমে প্রিভিকাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, জরুরী অবস্থায় রাজাকে পরামর্শ দিবার জন্য ইহার কার্যকারিতা বহুপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। সেইজন্য প্রিভি কাউন্সিলের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সদস্য লইয়া ক্ষুদ্র একটি মন্ত্রণাসভা গঠিত হয় এবং এই সভা কালক্রমে কেবিনেট সভায় পরিণত হয়। কেবিনেট সভা গঠিত হইবার পর মূল সভা প্রিভি কাউন্সিলের কার্যকারিতা বহুপরিমাণে হ্রাস পায়। বর্তমানে মূল সভার আইনসিদ্ধ অস্তিত্ব থাকিলেও মন্ত্রণাসভা হিসাবে ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। ইহা এখন নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে এই সভার সদস্যসংখ্যা প্রায় তিনশত তিরিশ। এই সভার সদস্যগণ রাজা কর্তৃক আজীবন সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়া থাকেন। কেবিনেট সভার প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যসমূহ এই সভার সদস্য মনোনীত হন। এতদ্ব্যতীত, রাজ-পরিবারের সদস্য, ক্যান্টারবেরী ও ইয়র্কের আর্চবিশপদ্বয়, ডোমিনিয়নগুলির প্রধানমন্ত্রিগণ এবং যুক্তরাজ্যের যে সমস্ত ব্যক্তি কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও এই সম্মানসূচক পদে নিযুক্ত করা হয়।

রাজার অভিষেক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা অন্য কোন বিশেষ আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে এই সভার সদস্যগণ মিলিত হইয়া থাকেন। বর্তমানে এই সভার কার্য কয়েকটি বিশেষ সংস্থার দ্বারা সম্পাদিত হ. এই সংস্থাগুলির মধ্যে শিক্ষাসংস্থা, কৃষিসংস্থা ও বিচারকার্য-পরিচালনার সংস্থা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল সপরিষদ রাজাদেশ (Orders-in-Council) প্রবর্তন করা। কিন্তু সপরিষদ রাজাদেশ জারী করিতেও ৪।৫ জনের অধিক সদস্য উপস্থিত থাকেন না। মাত্র তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই আইনানুমোদিতভাবে কার্য

পরিচালিত হয়। প্রিভি কাউন্সিলের সমুদয় কার্য-পরিচালনারও দায়িত্ব লর্ড সভার প্রেসিডেন্টের হস্তে ন্যস্ত। তিনি আবার কেবিনেটের সদস্য।

কেবিনেট সভা—The Cabinet

কেবিনেটের উৎপত্তি—Growth of the Cabinet

রাজার মন্ত্রণাসভা বলিয়া গণ্য হইলেও বহুদিন পর্যন্ত কেবিনেট সভা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে কেবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তৃতীয় উইলিয়ম ও রাণী অ্যানের রাজত্বকালে কেবিনেট সভা আইনতঃ না হইলেও কার্যতঃ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর প্রথম জর্জের রাজত্বকালে কেবিনেট সভার সভাপতি হিসাবে রাজা অপসারিত হইবার ফলে প্রধানমন্ত্রিপদের সৃষ্টি হইল। ওয়াল্‌পোল প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেট সভার সভাপতি হইয়া এই সভাকে অনেক পরিমাণে ইহার বর্তমান পদমর্যাদায় উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কমন্স সভায় পরাজিত হইয়া ওয়াল্‌পোল প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া কেবিনেট প্রথায় একটি নূতন নীতি প্রবর্তন করেন। কেবিনেট যতদিন পর্যন্ত আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের আস্থাভাজন থাকিবে ততদিন পর্যন্ত ইহার সভ্যবৃন্দ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন। আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিসংসদের সভ্যগণের পদত্যাগ বাধ্যতামূলক হইবে। এইরূপে পার্লামেন্ট সভার নিকট মন্ত্রিদায়িত্বের প্রবর্তন হইল।

বিংশ শতাব্দীতে কেবিনেট সভার সংগঠনে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধকার্য যাহাতে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল হইতে প্রতিনিধি লইয়া সর্বদলীয় কেবিনেট (Coalition Cabinet) সভা গঠিত হয়। পূর্বে কেবিনেট সভার কার্যসূচীর কোন লিখিত বিবরণ রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই উদ্দেশ্যে কেবিনেটের একটি দপ্তরখানা (Secretariat) সৃষ্টি হয়। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এক নূতন ধরণের জাতীয় সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই ব্যবস্থা শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রবর্তন করেন। এই জাতীয়

সরকারের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, মন্ত্রিসংসদ সর্বদলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলেও বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি মন্ত্রিগণ তাঁহাদের বক্তৃতা ও ভোটদান দ্বারা অপর দলের মন্ত্রিগণের বিরোধিতা করিতে পারিতেন। এই প্রথা অবশ্য জাতীয় প্রয়োজনে সাময়িকভাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে কেবিনেট সভার আরও কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে; সর্বদলের নেতাকে সরকার গঠনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া ছাড়াও আর একটি অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীই পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে কার্য করেন। দক্ষতার সহিত যুদ্ধকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত এই সময় প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁহার দলীয় নেতৃত্বের ভার অপর একজন কেবিনেট সদস্যের উপর ন্যস্ত করিয়া যুদ্ধকার্য পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। গ্রেট বৃটেনের কেবিনেট প্রথার এই শতাব্দীর আর একটি উদ্ভাবন হইল কেবিনেটের স্থায়ী সংস্থা সৃষ্টি (Standing Cabinet Committees)। কেবিনেটের ক্রমবর্ধমান কার্যভার লাঘব করিবার ও মতবিরোধের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় সাহায্যে মতভেদ দূর করিয়া কেবিনেট বৈঠকের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। এইরূপে জাতীয় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কেবিনেট সভা ইহার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

কেবিনেট সভার গঠনপদ্ধতি—Composition of the Cabinet

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পর রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে কেবিনেট সভা গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকেই সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়। এই প্রধানমন্ত্রী তাঁহার অন্যান্য সহকর্মী সদস্যদের নামের তালিকা রাজার নিকট পেশ করেন। রাজা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। অন্যান্য মন্ত্রিনির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার খুশীমত কার্য করিতে পারেন না। মন্ত্রিসভার সদস্যনির্বাচনে বিভিন্ন ব্যক্তির রাজনৈতিক মতামত, দলের সংহতি রক্ষার কার্যে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির গুরুত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয়। দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণ যাহাতে কেবিনেট সভায় স্থান

পান সেদিকেও তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সহায়ক বিষয়গুলির প্রতিনিধিত্বের দাবীও তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হয়।

সাধারণতঃ কুড়ি হইতে পঁচিশ জন সদস্য লইয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বিশেষ আইনবলে এই সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ তিনজনকে লর্ড সভার সদস্য হইতে হইবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নৌ, স্থল ও বিমান-বাহিনী, এই তিনটি বিভাগ তিনজন পৃথক মন্ত্রীর পরিবর্তে একজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে আনীত হইয়াছে। কেবিনেটের সদস্যসংখ্যা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

বৃটিশ কেবিনেট প্রথার বৈশিষ্ট্য—Features of the British Cabinet

(১) রাজনৈতিক ঐকমত্য—Political Homogeneity

একই নীতির সমর্থক একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয় (Political Homogeneity)। মতানৈক্য ঘটিলেও কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন না। আপৎকালে একাধিক দলের প্রতিনিধি লইয়া সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তখনও জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁহাদের সম-মতাবলম্বী হইতে হয়।

(২) শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—Close correspondence between the Executive and the Legislature

কেবিনেট সভার সহিত আইনসভার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান (Close correspondence between the Executive and the Legislature)। কেবিনেট সভার সদস্যগণকে অবশ্যই পার্লামেণ্ট সভার সদস্য হইতে হইবে। পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের প্রধানগণকে লইয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয়। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কার্যকরী হয় নাই।

(৩) মন্ত্রিগণের যৌথ দায়িত্ব—Collective responsibility of the Ministry

আইনসভার নিকট মন্ত্রিমণ্ডলীর যৌথ দায়িত্ব এই শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য (Collective responsibility of the Ministry)। মন্ত্রি-সংসদের সভ্যগণ যতদিন পর্যন্ত কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের আস্থাভাজন থাকেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিদায়িত্বের বিশেষত্ব হইল যে, মন্ত্রীরা যৌথভাবে তাঁহাদের কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব পাস হইলে সমস্ত মন্ত্রীকে একসঙ্গে পদত্যাগ করিতে হয়।

(৪) কেবিনেটের ঐক্য ও সংহতি—Unity and Solidarity of the Cabinet

বৃটিশ কেবিনেট প্রথার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার ঐক্যবদ্ধ ভাব (Unity and Solidarity of the Cabinet)। এই ঐক্য ও সংহতির উপর কেবিনেট শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সদস্যবৃন্দ শুধু যে এক রাজনৈতিক মতাবলম্বী হইবেন তাহা নহে, পার্লামেণ্ট সভা সম্পর্কে সর্ববিষয়ে তাঁহাদের একমত হইতে হইবে। কেবিনেট সভার অধিবেশনকালে তাঁহাদের মতবিরোধ ঘটিতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাদের মতভেদের পরিচয় তাঁহারা দিতে পারিবেন না।

(৫) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব—Leadership of the Prime Minister

কেবিনেটের এই ঐক্য ও সংহতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কার্যকরী হয় (Leadership of the Prime Minister)। অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাঁহাদের দলের নেতার পরামর্শ ও নির্দেশ মানিয়া চলেন। কেবিনেটের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন ও মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে প্রধান-মন্ত্রীই আলাপ-আলোচনার দ্বারা মতানৈক্যের নিরসন করিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপর কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের ভার থাকে না। তিনি সমগ্র শাসনব্যবস্থার তদারক করেন। যদি কোন মন্ত্রী কোন

বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত হইতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যতামূলকভাবে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে পদত্যাগ করিয়া সমগ্র কেবিনেট সভার পতন ঘটাইতে পারেন। সুতরাং কোন মন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত হওয়া অথবা পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

(৬) সভার গোপনীয়তা---Secrecy of the Cabinet meetings

কেবিনেট সভার কার্যসূচীর গোপনীয়তা রক্ষা করা বৃটিশ কেবিনেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য (Secrecy of the Cabinet meetings)। কেবিনেট সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু এই মতভেদের কথা বা তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিষয় যদি প্রকাশ পায় তাহা হইলে শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা সূচিত হয়। এইজন্য গোপনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কেবিনেটের কার্যকলাপ-সম্পর্কে কোন কিছু প্রকাশ পাইলে তৎসংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পদত্যাগ করিবার বহু নজীর আছে।

(৭) রাজার অনুপস্থিতি—Exclusion of the King

কেবিনেট সভায় রাজার অনুপস্থিতি (Exclusion of the King) একটি লক্ষণীয় বিষয়। কেবিনেট রাজার পরামর্শ সভা হইলেও রাজা নিজে এই সভার কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। শাসনকার্য-পরিচালনা করিবার কার্যকরী নীতি রাজার অনুপস্থিতিতে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

কেবিনেট ও মন্ত্রিসংসদ---The Cabinet and the Ministry

বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় কেবিনেট ও মন্ত্রিপরিষদ অনেক সময় একার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। কেবিনেট হইল অল্প সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত নীতি-নির্ধারক (Policy-forming) মন্ত্রণাসভা, আর মন্ত্রিপরিষদ হইল কেবিনেট সদস্য ব্যতীত আরও অধিক সংখ্যক শাসন-বিভাগীয় কর্মচারী লইয়া গঠিত। মন্ত্রিপরিষদের সমুদয় সদস্য লইয়াই রাজার শাসন বিভাগ গঠিত।

এই উভয়ের পার্থক্য বুঝিবার জন্য বৃটিশ শাসনব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর আলোচনা প্রয়োজন। যখন কোন ব্যক্তি নূতন প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন তখন তাঁহাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য শাসন বিভাগে ছোট-বড় বহু নূতন নিয়োগ করিতে হয়। প্রথমেই তাঁহাকে কেবিনেট মন্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হয়। এই মন্ত্রিগণের প্রত্যেকেই এক একটি বিভাগ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত থাকেন। কেবিনেট মন্ত্রিগণের মধ্যে আবার দুই-একজন দপ্তর-বিহীন মন্ত্রী (Minister without Portfolio) থাকেন। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অথচ যাঁহারা বিভাগীয় কার্য পরিচালনা ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর নহেন, এইরূপ ব্যক্তিগণকেই প্রধানতঃ পরামর্শ-দাতা হিসাবে দপ্তর-বিহীন মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করা হয়। লর্ড প্রিভিসিল হইলেন এইরূপ একজন দপ্তর-বিহীন মন্ত্রী।

দ্বিতীয়তঃ, কেবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন আর এক শ্রেণীর মন্ত্রী থাকিতে পারেন। ইঁহারা বিভাগীয় প্রধান হইলেও এবং কেবিনেট মন্ত্রীর সম-বেতন পাইলেও প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা মূল কেবিনেটের সদস্য বলিয়া পরিগণিত হন না। এই শ্রেণীর মন্ত্রিগণ সাধারণতঃ কেবিনেট সভায় যোগ দিতে পারেন না। প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আমন্ত্রিত হইলে ইঁহারা কেবিনেট সভায় উপস্থিত থাকেন। এই শ্রেণীর মন্ত্রিগণের নিয়োগ ও সংখ্যা প্রধানমন্ত্রীই স্থির করেন।

তৃতীয়তঃ, আর এক শ্রেণীর মন্ত্রী আছেন যাঁহাদিগকে রাষ্ট্রমন্ত্রী (State Ministers) বলা হয়। যখন কোন বিভাগের কার্যভার বৃদ্ধি পায় তখন কেবিনেট মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য এইরূপ রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী (Deputy Minister) নিয়োগ করা বর্তমান কেবিনেটের একটি বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রমন্ত্রীর পার্লামেন্টের নিকট কোন দায়িত্ব নাই। তিনি যে বিভাগীয় কেবিনেট মন্ত্রীর সহকারী হিসাবে কাজ করেন, সেই বিভাগীয় প্রধানই দায়ী।

চতুর্থতঃ, উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্রী ব্যতীতও প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক বা একাধিক পার্লামেন্ট-বিষয়ক কর্মসচিব (Parliamentary Secretary) থাকেন। এই কর্মসচিবগণকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ

করিয়া প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ইঁহারা কমন্স সভা অথবা লর্ড সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য এবং ইঁহাদের স্থায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের স্থায়িত্বের অথবা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই কর্মসচিবগণের কার্য হইল পার্লামেন্ট সভার তর্ক-বিতর্কে ও দপ্তরের কাজে বিভাগীয় মন্ত্রীকে সাহায্য করা।

পঞ্চমতঃ, রাজপরিবারভুক্ত আরও পাঁচজন ব্যক্তি এই মন্ত্রিপরিষদের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে কোষাধ্যক্ষ (Treasurer), উপ-গৃহাধ্যক্ষ (Vice-Chamberlain) ও হিসাব-পরীক্ষক (Comptroller) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উক্ত পাঁচ শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ (Ministry) গঠিত। ইঁহারা সকলেই পার্লামেন্টের সদস্য হইলেও একমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রিগণ ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর মন্ত্রী কেবিনেট সদস্য নহেন।

সুতরাং মন্ত্রিসংসদ কেবিনেট সভা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত। সাধারণতঃ কেবিনেট সভার সদস্যসংখ্যা কুড়ি হইতে পঁচিশ-এ সীমাবদ্ধ থাকে, আর মন্ত্রিসংসদে সাধারণতঃ শতাধিক সদস্য থাকেন। কেবিনেট সভার সমুদয় সদস্য মন্ত্রিসংসদের সদস্য থাকেন, কিন্তু মন্ত্রিসংসদের সমুদয় সদস্য কেবিনেটের সদস্য নহেন। কেবিনেট সভার প্রধান কার্য হইল শাসন-সম্পর্কিত বিষয়সমূহের নীতি নির্ধারণ করা, কিন্তু মন্ত্রিসংসদের নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নাই। কেবিনেট সভার নিয়মিত অধিবেশনের মত মন্ত্রিসংসদের কোন অধিবেশন হয় না। কেবিনেট সভার অনুরূপ ইঁহাদের কোন যৌথ দায়িত্বও নাই। কেবিনেট সভা পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসংসদের সদস্যবৃন্দেরও পদত্যাগ করিতে হয়। তবে মন্ত্রিসংসদ আইনসম্মত সংস্থা আর কেবিনেট একটা প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা।

কেবিনেটের কার্যাবলী—Functions of the Cabinet

বৃটিশ শাসনব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল কেবিনেট এবং এই প্রাণকেন্দ্রের স্পন্দন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে কেবিনেট হইল বৃটিশ আইনসভার একটি বিশেষ সংস্থা, অপর দিক দিয়া ইহা আবার প্রিভি কাউন্সিলের একটি সংস্থা। এই সংস্থা সমগ্র শাসন-

ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়ন বিভাগের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। কেবিনেটের কার্যাবলী একটি বিশেষ কমিটি কর্তৃক নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হইয়াছে।

১। পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করিবার জন্য শাসননীতির চূড়ান্ত নির্ধারণ (The final determination of policy to be submitted to Parliament)।

২। পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী জাতীয় শাসন বিভাগের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ (The supreme control of the national executive in accordance with the policy prescribed by Parliament) এবং

৩। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে অবিরাম সমন্বয় সাধন ও সীমা নির্দেশকরণ (and The Continuous co-ordination and delimitation of the activities of the several Departments of the State)

প্রথমতঃ, কেবিনেট হইল মূলতঃ একটি নীতিনির্ধারক সংস্থা এবং এই কারণে এই সংস্থা অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্ত সমস্যা কেবিনেট আলোচনা করে এবং একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রচেষ্টা চলে। সভায় আলোচনাকালে সদস্যগণের মধ্যে কোন সমস্যা সম্পর্কে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, সিদ্ধান্তটি সর্ববাদিসম্মত হওয়া চাই। সভায় উপনীত সিদ্ধান্তটি কোন মন্ত্রী বিশেষের সিদ্ধান্ত নহে—ইহা সমগ্র সভার সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। মতভেদের বিষয় কোন সদস্যই প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন না। যদি কোন সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিত একমত হইতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে পদত্যাগ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কেবিনেট কর্তৃক নীতি নির্ধারিত হইলে সংশ্লিষ্ট শাসন-বিভাগ সেই নীতিকে কার্যে রূপায়িত করে। চলতি আইনানুসারে যদি নীতিটিকে কার্যকর করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে কেবিনেট প্রয়োজনমত নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া পার্লামেন্টের সম্মতি গ্রহণ করে। পার্লামেন্টে কেবিনেটের সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কেবিনেটের পক্ষে নূতন আইন-

প্রণয়ন সাহায্যে নির্ধারিত নীতি কার্যকর করা আদৌ কঠিন হয় না। এই-রূপে নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও কেবিনেটের নেতৃত্ব ও অগ্রাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে কেবিনেটের এই নেতৃত্বের কারণ হইল যে, কেবিনেটই আইনসভার আইন-প্রণয়ন কার্যক্রম স্থির করে এবং সমগ্র সাধারণ সম্পর্কিত বিল (Public Bills) কোন-না-কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত হয় এবং সেই মন্ত্রীই বিলটিকে পার্লামেন্টে আইন পাসের প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্য দিয়া পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং বলা যায় যে, কেবিনেট শুধু নীতি নির্ধারণ করে না, শাসননীতি নির্ধারণপূর্বক পার্লামেন্টের সম্মতিতে প্রয়োজনীয় আইন-প্রণয়ন সাহায্যে নির্ধারিত নীতিকে কার্যে রূপায়িত করে। এক কথায়, কেবিনেটের কাজ শুধু নীতিনির্ধারণে সীমাবদ্ধ নহে, কেবিনেট আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও নেতৃত্ব করে।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রেট বৃটেনের সর্বময় শাসনকর্তৃত্ব বর্তমানে রাজতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু রাজতন্ত্র একটি ধারণা মাত্র। ইহার বাস্তব কোন কার্যকারিতা নাই। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। প্রত্যেক শাসনবিভাগের একজন করিয়া ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন। তিনিই সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু শাসন-পরিচালনা ব্যাপারে কোন মন্ত্রীই নিজ ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে পারেন না। পার্লামেণ্ট অনুমোদিত কেবিনেট নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। কেবিনেট নির্ধারিত নীতি-বিরোধী কাজ করিলে সে মন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত হয়ত পদত্যাগ করিতে হয়, তা তিনি কেবিনেট মন্ত্রী পদমর্যাদাসম্পন্ন হউন বা অন্য শ্রেণীর মন্ত্রী হউন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের বিভাগীয় নীতি নির্ধারণ করেন এবং এই নীতিগুলি কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য অধস্তন কর্মিবৃন্দকে নির্দেশ দান করেন। পার্লামেন্টে ইঁহাদের বিভাগ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির মৌখিক অথবা লিখিত জবাব দিতে হয়। এক কথায় তাঁহারা তাঁহাদের সকল প্রকার কার্যের জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী এবং এই কারণে বিশেষ সতর্কতা ও দক্ষতার সহিত তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত নির্ধারিত নীতিগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য বর্তমানে কেবিনেট আর দুইটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। স-পরিষদ রাজ-আজ্ঞা (Orders

in-Council) ও অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন-প্রণয়ন (Delegated Legislation) সাহায্যে কেবিনেট স্বয়ং প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারে অথবা অধস্তন বিভাগগুলিকে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে। এই দ্বিবিধ উপায়ে গ্রেট বৃটেনে বহু আইন প্রণয়ন করা হয়।

তৃতীয়তঃ, সত্য বটে সরকারের কাজ বিভিন্ন ধরণের এবং এই বিভিন্ন ধরণের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য আভ্যন্তরীণ, পররাষ্ট্র, শিক্ষা, কৃষি, অর্থ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ আছে। গ্রেট বৃটেনে এইরূপ প্রায় ২০ হইতে ২৫টি দপ্তর আছে। দপ্তরগুলি পৃথক হইলেও দপ্তরগুলির কাজ সব সময়ে পৃথক নহে—বরঞ্চ বহুক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অর্থ দপ্তরের উপর সকল দপ্তরই নির্ভরশীল। শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য পররাষ্ট্রনীতির উপর নির্ভরশীল। শাসন বিভাগীয় কার্য এরূপভাবে পরিচালিত হইবে যে, অন্তর্বিভাগীয় বিরোধ না ঘটে। শাসনকার্যের উৎকর্ষের জন্য শুধু অন্তর্বিভাগীয় বিরোধের নিরসন যথেষ্ট নহে, পরন্তু বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। কেবিনেটের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল আন্তর্বিভাগীয় বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। সাধারণতঃ অন্তর্বিভাগীয় ক্ষুদ্র বিরোধগুলি বিভাগীয় প্রধানগণ মিলিতভাবে সমাধান করেন। অমীমাংসিত বিরোধগুলি সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে নিষ্পত্তি হয়। শেষ পর্যায়ে কেবিনেটই বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে।

এতদ্ব্যতীত, কেবিনেট সরকারের সমগ্র আয় ও ব্যয়ের জন্য দায়ী। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কেবিনেটে উপস্থাপিত করা হয় না, তথাপি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করিবার পূর্বে অর্থমন্ত্রী কেবিনেট সভায় এই হিসাব পেশ করিয়া মৌখিক বিবৃতি দান করেন। ব্যয়ের ক্ষেত্রে কেবিনেটের অসীম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। নূতন কর স্থাপন ক্ষেত্রেও কেবিনেটের সম্মতি প্রয়োজন—কারণ উভয় ক্ষেত্রই সরকারী নীতি সম্পর্কিত।

সুতরাং দেখা যায় যে, কেবিনেট ইহার অপরিসীম ক্ষমতাবলে পার্লামেন্টের অনুমোদনে সমগ্র শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও ইহার কোন আইন-সম্মত অস্তিত্ব নাই।

কেবিনেট কমিটি—Committees of the Cabinet

গ্রেট বৃটেনের কেবিনেট সভাকে একদিক দিয়া প্রিভি কাউন্সিলের একটি বিশেষ সংস্থা বলা চলে, অপর দিক দিয়া কেবিনেট হইল আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের একটি বিশেষ সংস্থা। কিন্তু এই বিশেষ সংস্থাটি দ্রুত ও দক্ষতার সহিত ইহার গুরু কার্যভার নিষ্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় ছোট ছোট কমিটি গঠন করিয়া এই কমিটির সাহায্যে কাজ করে। যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই সমস্ত কাজের জন্য কেবিনেট কমিটি গঠন করিয়া কমিটির হস্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অর্পণ করে। এই কমিটিগুলি সাধারণতঃ কতিপয় কেবিনেট সদস্য ও বে-সরকারী কেবিনেট-বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ সদস্য লইয়া গঠিত হয়। বর্তমানে এইরূপ কতকগুলি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটিগুলির নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পেশ করা হয়। দেশরক্ষা কমিটি, উৎপাদন কমিটি, আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কমিটি প্রভৃতি হইল স্থায়ী কমিটির পর্যায়ভুক্ত। স্থায়ী কমিটিগুলি ব্যতীত সাময়িক সমস্যা সমাধানকল্পে অনেক সময় অস্থায়ী কমিটিও গঠিত হয়। অস্থায়ী কমিটিগুলি নির্ধারিত বিষয়ে অভিমত প্রদান করিলে তাহাদের কার্যকাল শেষ হয়। তবে স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটিগুলি যে অভিমত প্রদান করে, কেবিনেটের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে। সুতরাং কেবিনেটের এই বিশেষ সংস্থাগুলিকে নিছক পরামর্শদাতা সংস্থা বলা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থার গুণ হইল যে, বিশেষ বিষয়ে কেবিনেট সভা বিশেষজ্ঞের অভিমত পাইতে পারে এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বে-সরকারী সদস্যগণও শাসন-নীতি নির্ধারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের সহিত শাসকশ্রেণীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

কেবিনেটের সহিত রাজার সম্পর্ক—The Cabinet in relation to the Crown

রাজার মন্ত্রণাসভা হিসাবেই কেবিনেটের জন্ম ও রাজাকে পরামর্শ দান করাই হইল কেবিনেটের প্রধান কর্তব্য। রাজা প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য সদস্যদেরও তিনি নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিমণ্ডলী একযোগে রাজাকে পরামর্শ দান করেন ও যৌথভাবে তাঁহার

নিকট আইনতঃ দায়ী। বর্তমানে রাজার সহিত কেবিনেটের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্কে পর্যবসিত হইয়াছে। পূর্বে রাজা কেবিনেটের পরামর্শমত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। বর্তমানে শাসনকার্য পরিচালনা করে কেবিনেট সভা এবং রাজা ইচ্ছা করিলে শাসনকার্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে কেবিনেটকে পরামর্শ দান করিতে পারেন। কেবিনেটের পক্ষে সে পরামর্শ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে। সুতরাং রাজার নিকট কার্যতঃ কেবিনেটের কোন দায়িত্ব নাই।

কেবিনেটের সহিত আইনসভার সম্পর্ক—The Cabinet in relation to the Legislature

গ্রেট বৃটেনে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা হয় নাই। কেবিনেট সভার সদস্যগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিপত্তিশালী সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হয়। সুতরাং কেবিনেটের সমুদয় সদস্যকেই আইনসভার সদস্য হইতে হয়। এ-দিক দিয়া দেখিতে গেলে কেবিনেটকে আইনসভার একটি বিশেষ সংস্থা বলা হয়। কেবিনেট পার্লামেন্টের বিশেষ করিয়া কমন্স সভার নিকট তাহার কার্য ও নীতির জন্য দায়ী। কমন্স সভার আস্থাহীন হইলে কেবিনেট সদস্যদের পদত্যাগ করিতে হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের পর রাজনৈতিক ক্ষমতাসমূহ রাজার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া পার্লামেন্টের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। এই ক্ষমতার বলে পার্লামেন্ট সভা আইন-প্রণয়ন, আয়-ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ এবং কেবিনেট সভার কার্যনিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত ব্যাপারে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিল। কেবিনেটের গঠন ও কেবিনেটের পতন পার্লামেন্ট সভার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কেবিনেট আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিত বটে, কিন্তু কেবিনেটের প্রত্যেকটি কার্য পার্লামেন্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল এবং পার্লামেন্ট সভার অনাস্থা প্রস্তাবে বহু প্রতিপত্তিশালী কেবিনেটের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে পার্লামেন্টের আর সে ক্ষমতা নাই। বর্তমানে পার্লামেন্ট কেবিনেটের কার্যকলাপে সম্মতি দান করিবার একটা যন্ত্রবিশেষে পরিণত হইয়াছে। নীতিগতভাবে পার্লামেন্টের এখনও মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যের উপর পূর্ণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পার্লামেন্ট আর সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। ধীরে ধীরে পার্লা-

মেন্টের সমুদয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ; পার্লামেন্ট শুধু নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কার্যতঃ কেবিনেটই সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। পূর্বে কেবিনেট সভা পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিত ও পার্লামেন্টের ইচ্ছার উপর কেবিনেটের স্থায়িত্ব নির্ভর করিত। অধুনা আইনসভা হইতে উদ্ভূত কেবিনেট আইনসভাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। আইনসভার আজ্ঞাবহ কেবিনেট আজ আইনসভার প্রভুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

কয়েকটি কারণে আজ কেবিনেটের এই প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ও সেই অনুপাতে পার্লামেন্ট সভার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। কেবিনেট সভার সহিত মতবিরোধ ঘটিলে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিবার ক্ষমতাই হইল কেবিনেটের হস্তে কমন্স সভাকে স্বমতে আনিবার একটি প্রধান অস্ত্র। নূতন নির্বাচনের ফলাফল অনিশ্চিত। ইহা ছাড়া, কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিলে সদস্যগণ যে বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইংলণ্ডে সার্বজনীন ভোটাধিকার-প্রথা বর্তমান থাকার ফলে কোন নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে কোন একটি রাজনৈতিক দলের সাহায্য ব্যতীত নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডে খুব কঠোরভাবে দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা হয়। দলের সমর্থকগণ দলের নেতার নির্দেশ অমান্য করিলে তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবনের অবসান অবশ্যম্ভাবী। ইহা ছাড়া, এরূপ অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দলের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন যে, তাঁহাদের নির্দেশ অমান্য করিবার মত ব্যক্তিত্ব দলের সমর্থকগণের মধ্যে বিরল। তাই পার্লামেন্ট সভায় দলের নেতা প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে যখন কোন আইন প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন বা আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে বা বৈদেশিক নীতিতে কোন পরিবর্তন আনয়ন করিতে সংকল্প করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী-নির্ধারিত নীতি দলের সমর্থকগণের বিবেকবুদ্ধিসম্মত না হইলেও দলীয় সংহতি বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা ইহা সমর্থন করিয়া থাকেন। কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, কি রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্ববিষয়ে কেবিনেট সভার প্রাধান্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। পার্লামেন্টের সদস্যগণ প্রশ্ন করিতে পারেন, সমালোচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সমালোচনা বিশেষ কার্যকরী হয় না। পার্লামেন্ট-সভার কার্যসূচী কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হয় ;

সুতরাং বে-সরকারী সদস্যগণের বক্তৃতা দিবার সময় সীমাবদ্ধ। আবার বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করিবারও নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এইরূপে নানাপ্রকারে বর্তমান পার্লামেন্ট সভা শুধু মূক দর্শকের অভিনয় করিতেছে। যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া রাজার নিকট হইতে পার্লামেন্টের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

পার্লামেন্ট সভার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার একটা প্রধান কারণ হইল ইংলণ্ডে শিক্ষিত ও সচেতন জনমতের অভ্যুদয়। জনমত বর্তমানে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের কর্তব্য শেষ করে না—জনমত প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কেবিনেট সভা এই জনমতের প্রাধান্যের সুবিধা লইয়া প্রত্যক্ষভাবে জনমতের নিকট ইহার কার্যের জবাবদিহি করে। কেবিনেট সভা যদি জনমতকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে তাহা হইলে পার্লামেন্ট সভার সমর্থনের উপর তাহাকে একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিপত্তি ও সংহতি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্ট সভার সদস্যগণের স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। দলের নেতার নির্দেশ সকল সময়েই অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই পার্লামেন্টের আজ আর কোন কার্যের অনুপ্রেরণা নাই, ইহা শুধু যন্ত্রচালিতের ন্যায় সম্মতি দান করে।

বৃটিশ কেবিনেটের একনায়কত্ব—Dictatorship of the Cabinet

বৃটিশ কেবিনেট সভার ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে দেখা যে, কি শাসন ব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সর্ববিষয়েই কেবিনেটই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয়। যত সময় পর্যন্ত কেবিনেট পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট থাকে, তত সময় কেবিনেটই হইল সর্বেসর্বা। দলীয় শাসনের বিধিনিষেধগুলি দলের সদস্যগণের উপর এরূপ কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় যে, সদস্যগণ তাঁহাদের বিবেক, বিচারবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া অন্ধভাবেই দলীয় অনুশাসন মান্য করিতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক দলের সদস্যগণের এই অন্ধ ও অবিমিশ্র আনুগত্যের ফলে বর্তমানে পার্লামেন্টের

সদস্যগণের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়া কেবিনেটের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া কেবিনেট আজ একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আইন-প্রণয়ন, আয়-ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, শাসন-নীতি নির্ধারণ ও ইহার প্রয়োগ সব কিছু ক্ষমতাই আজ কেবিনেটের হস্তে কেন্দ্রীভূত। সত্য বটে, কেবিনেট সব কিছু কাজই পার্লামেন্টের সহিত পরামর্শ করিয়া করে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পার্লামেন্ট কেবিনেট-প্রস্তাবিত ও কেবিনেট-অনুসৃত নীতি ও কার্য সমর্থন না করিয়া পারে না। কারণ কেবিনেট ইচ্ছা করিলে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারে। কমন্স সভা ভাঙ্গিবার ফলে সদস্যগণের শুধু পদচ্যুতি ঘটে না, তাঁহারা তাঁহাদের বেতন ও ভাতা হইতে বঞ্চিত হন এবং নূতন নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হয়। দলীয় সমর্থন ব্যতীত ইংলণ্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। এই কারণে সদস্যগণ তাঁহাদের দলপতিগণ (কেবিনেট সদস্য) কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ের বিরোধিতা করিতে সাহসী হন না। ইহা ছাড়া, কেবিনেটের সমর্থন ও সাহায্য না পাইলে কোন বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল পাস হইতে পারে না। পার্লামেন্টের প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনের প্রথমে কেবিনেট রাজা কর্তৃক প্রদত্ত বাণী (Speech from the Throne) প্রস্তুত করে এবং কেবিনেট অনুসৃত নীতি-সম্বলিত এই বাণী পার্লামেন্ট সভা পরোক্ষ-ভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কেবিনেট আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেন্টে পেশ করে এবং দলীয় সমর্থন সাহায্যে পাস করাইয়া লয়। পার্লামেন্টের কার্যসূচীও কেবিনেট প্রস্তুত করে এবং বিরোধী দলের দীর্ঘ সমালোচনা ও বাদানুবাদ রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নানাপন্থা অবলম্বন করে। বর্তমানে পার্লামেন্টের একমাত্র কাজ হইল কেবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা। কোন বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কোন কিছুর প্রস্তাব করার ক্ষমতা পার্লামেন্ট কেবিনেটের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। সত্য বটে, পার্লামেন্টের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা এখনও পর্যন্ত আছে কিন্তু এই ক্ষমতা বর্তমানে একপ্রকার নিষ্ফল। পূর্বে কেবিনেট পার্লামেন্টের আজ্ঞাবহ ছিল কিন্তু বর্তমানে পার্লামেন্ট কেবিনেটের আজ্ঞাবহ হইয়াছে।

সুতরাং কেবিনেটই হইল সমগ্র শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। এখন প্রশ্ন হইল যে, কেবিনেটের এই সর্বময় কর্তৃত্বের উৎস কোথায়? কেন সমগ্র জাতি

কেবিনেটের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে? কেবিনেটের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা কি বৃটিশ গণতান্ত্রিক আদর্শকে সংকুচিত করে নাই?

এ প্রশ্নের উত্তর হইল যে, বৃটিশ কেবিনেটের সর্বময় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও গ্রেট বৃটেনে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্থাৎ জনমতের প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষমতার আধার কেবিনেটও জনমতের উপর নির্ভরশীল। কোন প্রধানমন্ত্রীই ক্রমাগত জনমত উপেক্ষা করিতে পারেন না। পার্লামেন্টের সহিত মতবিরোধ ঘটিলে তাঁহাকে ভোটদাতাগণের বিচারালয়ে আবেদন করিতে হয় এবং এই গণ আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধবিজয়ী প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতি স্বীকার করিয়া প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে ইজিপ্ট আক্রমণ করিবার অপরাধে জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী এণ্টনী ইডেনকেও পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং ইংলণ্ডে কেবিনেটের একনায়কত্ব গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া, বিরোধীদলের সমালোচনাও কেবিনেটের একনায়কত্বের অন্যতম অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়।

মন্ত্রিগণের দায়িত্ব—Ministerial Responsibility

মন্ত্রিগণের দায়িত্ব ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, মন্ত্রিগণ রাজার নিকট দায়ী। কিন্তু এই দায়িত্ব শুধু নাম মাত্র—প্রকৃত নহে, কারণ মন্ত্রিগণ যতদিন পর্যন্ত আইনসভা পার্লামেন্টের আস্থাভাজন থাকেন ততদিন পর্যন্ত রাজা তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিগণের একটি পারস্পরিক দায়িত্ব আছে। বিভাগীয় নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত করিতে হইলে প্রত্যেক মন্ত্রীরই তাঁহার সহকর্মী অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া কাজ করিতে হয়। কারণ একজন মন্ত্রীকে যদি আইনসভায় পর্যুদস্ত হইয়া পরাজয় বরণ করিতে হয়, তাহা হইলে এই একজনের পরাজয় সমগ্র মন্ত্রিসভার পরাজয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিগণ কমন্স সভার নিকট দায়ী এবং মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বলিলে কমন্স সভার নিকট তাঁহাদের দায়িত্বের কথাই বুঝায়।

মন্ত্রিগণের দায়িত্বের অর্থ হইল যে, মন্ত্রিগণ তাঁহাদের অনুসৃত নীতি ও

কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল যে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে অকুণ্ঠভাবে সমগ্র পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত-ভাবে হয়ত একজন সদস্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু পার্লামেন্টের সহিত বা জনমতের সহিত সম্পর্কে বিরুদ্ধমতাবলম্বী মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা কখনই সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। গুরুতর মত-বিরোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রমিক-নেতা র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কেবিনেটের এই চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম ঘটে। এই সময়ে সাময়িক কালের জন্য মন্ত্রিগণের যৌথ দায়িত্ব বলবৎ হয় না। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া এই সময়কার মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং এই বিভিন্ন দলের মন্ত্রিগণের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে তাঁহাদের বক্তৃতা ও ভোট দ্বারা অপর দলের মন্ত্রিগণের বিরোধিতা করিতে পারিতেন। কিন্তু সাময়িক কালের জন্য মন্ত্রিগণের যৌথ দায়িত্বের এই ব্যতিক্রম দ্বারা ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণের সুপ্রতিষ্ঠিত যৌথ দায়িত্বের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় নাই। আইনসভার সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ একটি একক ও অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কার্য পরিচালনা করে। আইনসভা যদি কোন একজন মন্ত্রীর কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে অথবা কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত হয় ও মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে পদত্যাগ করে। গ্রেট বৃটেনে মন্ত্রিগণের পার্লামেন্ট সভার নিকট এই দায়িত্ব প্রথাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, অসদাচরণ বা কুশাসনের ফলে দোষী হন তাহা হইলে এই মন্ত্রীবিশেষের ত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভা দায়ী হইতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই এককভাবে পদত্যাগ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মিঃ মন্টেগুর, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে স্যার স্যামুয়েল হোরের ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডল্‌টনের পদত্যাগ উপরি-উক্ত নীতির পরিচায়ক।

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও ক্ষমতা—Position and Powers of the Prime Minister

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর সমকক্ষ আর দ্বিতীয় কোন রাষ্ট্রনায়ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধানমন্ত্রী কার্যতঃ স্ব-নির্বাচিত নেতা। তাঁহাকে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হইতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবেই তিনি রাজা কর্তৃক আহূত হইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হইলে গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য সম্পাদন করা অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রীকে রাজা, কেবিনেট সভা, তাঁহার নিজ দল—আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, বিরোধী দল ও দেশের জনমত—এতগুলি পক্ষের সহিত যোগসূত্র রাখিয়া রাষ্ট্রনায়কের কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রিপদের গুরুত্ব অপরিসীম।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী এই প্রধানমন্ত্রীর পদ আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে। রাজস্ববিভাগের প্রথম লর্ড হিসাবে তিনি বেতন পাইয়া থাকেন ও এই বেতনের পরিমাণ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের রাজমন্ত্রী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী তাহার মূল উৎস হইল তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রীর স্বীয় দল সম্পর্কে কতকগুলি কর্তব্য আছে। দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিয়া তাঁহাকে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে দলের নীতি ও কার্যক্রম এইরূপভাবে স্থির করিতে হইবে যে, দলীয় নীতি জনপ্রিয় হইয়া জনসমর্থন লাভ করিতে পারে। এজন্য শুধু জনমতের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা করিলে তাঁহার কর্তব্য শেষ হয় না, অনেক সময় জনমতকে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন হয়। নির্বাচনের পর দলীয় কার্যক্রম ও নীতির দ্বারা জনমতকে সন্তুষ্ট রাখাও প্রধানমন্ত্রীর গুরু-দায়িত্ব। পার্লামেন্টের অনুমোদন অপেক্ষাও জনমতের অনুমোদনের উপর কেবিনেটের স্থায়িত্ব অধিকতরভাবে নির্ভর করে।

কমন্স সভায় প্রধানমন্ত্রী হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁহার নির্দেশেই পার্লামেন্টের সমুদয় কার্য পরিচালিত হয়। অন্যান্য বিভাগীয়

প্রধানগণ তাঁহাদের বিভাগসম্পর্কিত আলাপ-আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সমগ্রভাবে কেবিনেট সভা-অনুসৃত কার্যক্রমের অধিকর্তা হিসাবে পার্লামেণ্টে দলীয় নীতি সমর্থন করেন। সমুদয় বিভাগীয় কার্যসম্পর্কে তিনি দলীয় নীতি পার্লামেণ্ট সভায় বিশ্লেষণ করেন। কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। পার্লামেণ্ট সভার সভাপতি নির্বাচন ব্যাপারে ও বিভিন্ন কমিটির সদস্য-নির্বাচন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্ট সভার কর্মসূচীও তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিরোধী দলের নেতার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা প্রধানমন্ত্রীর গুরু-দায়িত্ব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলগুলির সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহাদের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে বিরোধী দলগুলির সহিত সম্মিলিতভাবে কেবিনেট গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা তাঁহার কর্তব্য।

সাধারণ নির্বাচনের পর দলের নেতা হিসাবে তাঁহাকেই কেবিনেট সভার অন্যান্য সদস্যদের মনোনয়ন করিতে হয়। তিনিই কেবিনেট সভার সভাপতি হিসাবে সমুদয় বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। কেবিনেটের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার সমপদস্থ সহকর্মী হইলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া কেবিনেট সভা গঠিত হয় ও তিনি পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন হয়। অন্যান্য মন্ত্রীদের পৃথকভাবে পদত্যাগের প্রয়োজন হয় না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অপর মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই কেবিনেট সভার ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নহেন, সেজন্য তাঁহার পক্ষে বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাহাদের তদারক করা সহজসাধ্য হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সহিত রাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনিই রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। প্রধানমন্ত্রীই রাজার সহিত কেবিনেটের প্রধান যোগসূত্র ও তাঁহার মাধ্যমেই পারস্পরিক মতামত বিনিময় হয়। শাসনকার্য পরিচালনা-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় প্রধানমন্ত্রী রাজাকে জ্ঞাত করান। লর্ড

সভা ও প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা, সম্মানসূচক পদবী বিতরণ করা, কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীই রাজাকে পরামর্শ দান করিয়া থাকেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আলোচনা করিয়া ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারী ব্যক্তির অসীম যোগ্যতা ও কর্মকুশলতা থাকা চাই। প্রধানমন্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, কর্তব্যবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সর্বোপরি সহনশীলতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতার উপর শাসনকার্যের সাফল্য নির্ভর করে। বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রী পদের অধিকারীর যোগ্যতার উপরেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পরিমাণ নির্ভর করে। গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতার উপর যে শুধু দেশের শাসনকার্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহা নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ দেশ খুব কমই আছে যাহার সহিত বৃটেনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও গ্রেট বৃটেন যে মর্যাদার অধিকারী তাহাও বহুলাংশে তাহার প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

এই বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেও প্রধানমন্ত্রীকে স্বৈরাচারী শাসকের সহিত তুলনা করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁহার নির্ধারিত কার্যকাল পাঁচ বৎসর। তারপর তাঁহাকে পুনরায় জনমতের সমর্থন লাভ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার প্রাধান্যের অবসান ঘটিবে। পার্লামেণ্টে যতদিন তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন ততদিনই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্ররূপ তরণীর কর্ণধার থাকিতে পারেন।

কেবিনেট সভা ভাঙ্গিয়া দিবার পদ্ধতি—**How a Ministry is ousted**

পূর্বে নানাকারণে কেবিনেটের পতন ঘটিত। বর্তমানে অবশ্য ইহার কোনটিই কার্যকরী নয়। প্রথমতঃ, আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিতর্কের সময় যদি কমন্স সভায় কোন মন্ত্রীর বেতন নামমাত্র হ্রাসের প্রস্তাব পাস হয়, তাহা

হইলে একযোগে কেবিনেটের সমুদয় সদস্তকে পদত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেবিনেটের সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত কোন প্রস্তাব যদি কমন্স সভা কর্তৃক পাস না হয় তাহা হইলে কমন্স সভার এই অসম্মতি অনাস্থাপ্রস্তাবের পরিচায়ক মনে করিয়া কেবিনেটের পতন হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও যদি কোন বে-সরকারী সদস্য-উত্থাপিত আইনের খসড়া পাস হয়, তাহা হইলেও মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিতে পারে। চতুর্থতঃ, যদি কোন মন্ত্রীবিশেষের বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব পাস হয়, সেক্ষেত্রেও কেবিনেটের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, কেবিনেট-অনুসৃত নীতির উপর যদি সমগ্রভাবে অনাস্থাপ্রস্তাব পাস হয়, তাহা হইলেও কেবিনেটের পতন হইতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, রাজা স্বয়ং মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বর্তমানে এ ক্ষমতার উল্লেখ না করিলেও চলে। অধুনা কেবিনেট যদি পার্লামেণ্ট সভায় তাহাদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত না হয়, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন।

শাসনবিভাগসমূহ—The Administrative Departments

কেবিনেট সভা সমগ্রভাবে শাসন-নীতি নির্ধারণ করে এবং কেবিনেটের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংশ্লিষ্ট নীতি কার্যে রূপদান করে। প্রত্যেক বিভাগেরই একজন বিভাগীয় প্রধান থাকেন। এই বিভাগীয় প্রধান সাধারণতঃ কেবিনেট সভার একজন সদস্য থাকেন এবং তাঁহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য তিনি পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী থাকেন। বিভাগীয় প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন কর্মসচিব থাকেন —একজন অস্থায়ী (Parliamentary Under-secretary), আর একজন স্থায়ী (Permanent Under-secretary)। স্থায়ী কর্মসচিব হইলেন ইংলণ্ডের শাসনবিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারী। মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিলেও স্থায়ী কর্মসচিবের পদত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু অস্থায়ী কর্মসচিব হইলেন মন্ত্রী-সংসদের (Ministry) সদস্য—কেবিনেটের পরিবর্তন ঘটিলে তাঁহাকেও পদত্যাগ করিতে হয়। বৃটিশ শাসনব্যবস্থার চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কোন বিভাগীয় প্রধান যদি কমন্স সভার সদস্য হন তাহা হইলে তাঁহার

অস্থায়ী কর্মসচিবকে লর্ড সভার সদস্য হইতে হইবে, অপর পক্ষে বিভাগীয় প্রধান লর্ড সভার সদস্য হইলে তাঁহার অস্থায়ী কর্মসচিবকে কমন্স সভার সদস্য হইতে হইবে। এই নিয়মের তাৎপর্য হইল যে, উভয় পরিষদে যাহাতে কেবিনেটের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া সদস্যবর্গের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।

শাসন-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিভাগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। আভ্যন্তরীণ শাসনবিভাগ—Home Office

এই বিভাগের অধিকর্তা হইলেন আভ্যন্তরীণ শাসনবিভাগীয় সচিব (Secretary of State for Home affairs)। এই বিভাগের প্রধান কার্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ, জেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। বিদেশীর উপর বৃটিশ নাগরিকত্ব অর্পণ করা ও বিদেশী পলাতক অপরাধীকে যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করাও (Extradition) এই বিভাগের কাজ।

২। পররাষ্ট্র বিভাগ—Foreign Office

এই বিভাগটি বর্তমানে সর্বদেশেই শাসনবিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বলিয়া পরিগণিত হয়। পররাষ্ট্র সচিব এই বিভাগের অধিকর্তা। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হইল এই বিভাগের প্রধান কার্য। এই বিভাগ কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে।

৩। ঔপনিবেশিক বিভাগ—Colonial Office

গ্রেট বৃটেনের উপনিবেশগুলি সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করা ও উপনিবেশগুলিতে গভর্ণর নিয়োগ করা হইল এই বিভাগের কাজ।

৪। সাধারণতন্ত্র-সম্পর্কিত বিভাগ—Commonwealth Relation Office

এই বিভাগ ডোমিনিয়নগুলি সম্পর্কিত কাজ করে।

৫। প্রতিরক্ষা বিভাগ—**Defence Office**

এই বিভাগের কাজ পূর্বে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী এই তিনটি পৃথক বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হইত। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই তিনটি বিভাগ একত্রিত করিয়া একজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

৬। স্কটল্যাণ্ড-সম্পর্কিত বিভাগ—**Scotland Office**

স্কটল্যাণ্ড শাসন-সম্পর্কিত ব্যাপারের জন্য একজন মন্ত্রী আছেন।

৭। আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিভাগ—**Treasury Department**

অর্থসচিব (Chancellor of the Exchequer) এই বিভাগের প্রধান। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা এই বিভাগের প্রধান কার্য।

৮। ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিভাগ—**Board of Trade**

এই দপ্তরের মন্ত্রী প্রেসিডেন্ট নামে অভিহিত হন। ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা ও এ সম্পর্কে পরিসংখ্যান (Statistics) সংগ্রহ করা হইল এই বিভাগের কাজ।

৯। শিক্ষা বিভাগ—**Ministry of Education**

দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কর্তৃত্বে এই বিভাগ পরিচালিত হয়।

১০। কৃষি ও মৎস্য বিভাগ—**Ministry of Agriculture and Fisheries**

কৃষিকার্য ও মৎস্যের চাষ সম্পর্কিত ব্যাপারের জন্য এই দপ্তরটি একজন মন্ত্রীর অধীনে কাজ করে।

১১। স্বাস্থ্য বিভাগ—**Ministry of Health**

স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়াও গৃহনির্মাণ ও শহর পরিকল্পনার কাজ এই দপ্তরটির উপর ন্যস্ত থাকে।

১২। পরিবহণ বিভাগ—Ministry of Transport

এই বিভাগটি রেল, ট্রাম প্রভৃতি পরিবহণ-ব্যবস্থা এবং রাস্তা, পথ-ঘাট, সেতু, খাল প্রভৃতি যোগাযোগের উপায়গুলির তত্ত্বাবধান করে।

১৩। শ্রমবিভাগ—Ministry of Labour

শ্রমিকসংঘগুলির ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার জন্য এই বিভাগটি বর্তমানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কার্য হইল আপস-আইন ও বেকার বীমা আইন কার্যকরী করা।

১৪। গৃহ নির্মাণ, স্থানীয় শাসন ও ওয়েলস্ সম্পর্কিত বিভাগ —Ministry of Housing, Local Government and Minister for Welsh affairs

এই বিভাগটি উপরি-উক্ত বিষয়গুলির কার্য পরিচালনা করে।

১৫। বে-সামরিক বিমান বিভাগ—Ministry of Aviation

এই বিভাগটি বে-সামরিক বিমান ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

১৬। সরকারী অর্থপ্রদানকারী বিভাগ—Paymaster General

এই বিভাগটির কার্য হইল সরকার কর্তৃক অর্থপ্রদান কার্যের তদারক করা।

ইহা ছাড়া আরও তিনজন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী আছেন। ইঁহারা হইলেন, (১) লর্ড চ্যান্সেলর, (২) লর্ড প্রিভিসিল ও (৩) ল্যাংকাষ্টারের ডিউকের সম্পত্তির চ্যান্সেলর। কেবিনেটের সদস্য নহেন এরূপ আরও ১৯ জন রাষ্ট্র-মন্ত্রী আছেন।

উপদেষ্টা সমিতি—Advisory Committees

শাসনব্যবস্থার প্রধান প্রধান বিভাগগুলির সহিত একটি করিয়া উপদেষ্টা সমিতি যুক্ত থাকে। সাধারণতঃ বে-সরকারী সদস্যগণ লইয়া উপদেষ্টা সমিতিগুলি গঠিত হয়। সদস্যগণ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং এই বিশেষ বিষয়সমূহ সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাগকে পরামর্শ

দান করেন। কিন্তু এই উপদেষ্টা সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট শাসন-বিভাগের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে এবং উপদেষ্টা সমিতিও তাঁহাদের কোন পরামর্শের ফলাফলের জন্য দায়ী নহে। তবে এই ব্যবস্থার গুণ হইল যে, বে-সরকারী বিশেষজ্ঞ-সমন্বিত সমিতি সরকারী বিভাগের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া শাসনব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পায়।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ—The Parmanent Executive—The Civil Service

শাসনবিভাগীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করিবার নিমিত্ত দুই শ্রেণীর কর্মচারী থাকে। শাসন-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির নীতি নির্ধারণ করা এবং ঐ বিষয়সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা হইল প্রথম শ্রেণীর প্রধান কার্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারিগণ প্রথম শ্রেণী কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও আইনগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বলবৎ করে। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় নীতি-নির্ধারক শাসনকর্তৃপক্ষ হইলেন মন্ত্রিমণ্ডলী, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ স্থায়ী কর্মচারী নহেন। তাঁহারা একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাদের উপর যে সমস্ত দপ্তর পরিচালনা করিবার ভার থাকে, সেগুলি সম্পর্কে তাঁহাদের খুব কম অভিজ্ঞতা থাকে। এমন হয়ত হইতে পারে যে, আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রাজস্ব-মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে রাজস্ববিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইলেন মন্ত্রী। অনভিজ্ঞ মন্ত্রী মহাশয়কে শাসনকার্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বিভাগে একদল স্থায়ী কর্মকুশল কর্মচারী থাকেন, যাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার দ্বারা শাসনপরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রীকে কার্যকরিভাবে সহায়তা করেন। মন্ত্রিগণ শুধু নীতি নির্ধারণ করেন ও বিভাগীয় শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন। মন্ত্রিপ্রদত্ত নির্দেশ-গুলিকে কার্যে রূপদান করা হইল এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের প্রধান কার্য।

গ্রেট বৃটেনে প্রায় তিন লক্ষ স্থায়ী সরকারী কর্মচারী আছেন। ইঁহাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ হইলেন নারী কর্মচারী। স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগে বিভাগীয় কর্মসচিক

থাকেন। ইঁহারাই বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ইঁহাদের সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতানুসারে নিয়োগ করা হয়। ইহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য অধস্তন আরও তিন-চারি শ্রেণীর কর্মচারী থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা কর্মঠ ও দক্ষ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। শাসনব্যাপারের সহিত দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থাকেন বলিয়া শাসনকার্যের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁহাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মে, শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মন্ত্রিগণের সে অভিজ্ঞতা বা কর্মকুশলতা থাকে না। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কার্য ও নীতির জন্য দায়ী থাকেন। কিন্তু এই নীতিনির্ধারণ ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে মন্ত্রিগণকে সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইঁহাদের সাহায্য ব্যতীত মন্ত্রিগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের উপর মন্ত্রিগণের এই একান্ত নির্ভরশীলতার জন্য এই কর্মচারিগণের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মন্ত্রিগণ-প্রবর্তিত প্রত্যেকটি নীতি ও আইনের উপর এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়।

গ্রেট বৃটেনের উর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ হইলেন অস্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী। মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন হইলে এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া থাকেন। শাসনকার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাঁহারা যদি দলীয় মনোভাবাপন্ন হন তাহা হইলে বিরোধী দলের শাসনকালে তাঁহারা শাসনকার্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারেন। এইজন্য ভোটদান অধিকার থাকিলেও ইঁহারা সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করিতে পারেন না। যে-কোন রাজনৈতিক দল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হউক না কেন, স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের কর্তব্য হইল যে, দলের নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচী সমান আন্তরিকতার সহিত কার্যকরী করা। স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের এই দলনিরপেক্ষতা আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মত স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের এই স্বাধীন ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষ মনোভাব জনমতের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট সভা —Parliament

গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্ট বা আইনসভা রাজা-সহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা লইয়া গঠিত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অব্যাহত ক্ষমতার অধিকারী। কি সাধারণ আইন, কি শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত আইন—সর্বপ্রকার আইন এই সভা প্রণয়ন করিতে পারে, সংশোধন করিতে পারে অথবা বাতিল করিতে পারে। বৃটেনে এমন কোন বিচারালয় নাই যাহা এই সভার আইনসম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন করিতে পারে। পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা স্বৈর ও আদিম। কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে। এইজন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভাকে অন্যান্য দেশের আইনসভাগুলির সহিত তুলনা করিয়া **সার্বভৌম আইনসভা (Sovereign Law-making body)** বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে পার্লামেণ্টের এই সার্বভৌম ক্ষমতা কেবিনেটের অস্বাভাবিক ক্ষমতাবৃদ্ধি, অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন-প্রণয়ন প্রভৃতির জন্য অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

লর্ড সভা—গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতা—House of Lords—Composition and Functions

লর্ড সভা একটি অতি প্রাচীন আইনসভা বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমানে নিম্নলিখিত ছয়টি বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৯১০ জন সদস্য লইয়া এই সভা গঠিত। ১। রাজবংশের নির্ধারিত কতিপয় ব্যক্তি। ইঁহারা সাধারণতঃ লর্ড সভায় উপস্থিত থাকেন না। ২। জন্মগত উত্তরাধিকারসূত্রে ইংলণ্ড ও যুক্তরাজ্যের লর্ডগণ। ৩। স্কটল্যাণ্ডের লর্ডগণ কর্তৃক নির্বাচিত ষোল জন প্রতিনিধি; ইঁহারা একটি পার্লামেণ্টের কার্যকালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ৪। আটাশ জন আয়ারল্যাণ্ডের আজীবন লর্ড সদস্য। এই আসনগুলি আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতে শূন্য আছে। ৫। ক্যান্টারবেরি ও ইয়র্কের আর্চবিশপ ও ছাব্বিশ জন বিশপ লইয়া মোট আটাশ জন ধর্মযাজক লর্ড সভার সদস্য আছেন। ৬। লর্ড সভার আপীল মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নয় জন আইনবিশারদকে লর্ড সভার আজীবন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা বেতন ভোগ করিয়া থাকেন। লর্ড সভার সভাপতি হইলেন লর্ড চ্যান্সেলর। তিনজন সদস্য

উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য চলিতে পারে, কিন্তু কোন আইন পাস করিতে হইলে কমপক্ষে ত্রিশজন সদস্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

পূর্বে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত লর্ড উপাধি পরিত্যাগ করা যাইত না। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের নূতন আইনানুসারে উত্তরাধিকারবলে লর্ড উপাধি গ্রহণে অস্বীকার অথবা লর্ড থাকাকালে লর্ড উপাধি পরিত্যাগ করা যায় এবং কমন্স শ্রেণীভুক্ত হইয়া কমন্স সভার ভোটদাতা ও সদস্য পদে প্রার্থী হইতে পারা যায়।

লর্ড সভার কার্য সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা। আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট আইন পাস হইবার পূর্বে লর্ড সভা কমন্স সভার সমক্ষমতা-বিশিষ্ট ছিল। বর্তমানে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই আইনের প্রধান ধারাগুলি হইল : ১। যদি কোন সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত আইনের খসড়া পর পর তিনটি অধিবেশনে কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ও যদি প্রথম অধিবেশনে কমন্স সভায় বিলের দ্বিতীয় পাঠ ও তৃতীয় অধিবেশনে বিলের তৃতীয় পাঠের মধ্যে দুই বৎসর অতিবাহিত হয় তাহা হইলে ঐ আইনের খসড়াটি লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই রাজার সম্মতির জন্য প্রেরিত হইতে পারে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের এই আইন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত হইয়াছে। এই সংশোধন আইনের দ্বারা লর্ড সভার অনুমোদনের জন্য দুই বৎসরের স্থলে এক বৎসর সময় নির্ধারিত হইয়াছে। ২। অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে নিয়ম হইল যে, যদি কোন বিল কমন্স সভা পাস করে এবং লর্ড সভায় ঐ বিল প্রেরিত হওয়ার এক মাসের মধ্যে যদি লর্ড সভা ঐ বিল পাস না করে, তাহা হইলে লর্ড সভার অনুমোদন ব্যতীত ঐ বিল রাজার সম্মতিসহ আইনে পরিণত হইবে। ৩। কোন একটি বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা কমন্স সভার সভাপতির উপর প্রদত্ত হইয়াছে। এবিষয়ে তাঁহার নির্দেশই চূড়ান্ত নির্দেশরূপে পরিগণিত হয়। ৪। কমন্স সভার কার্যকাল সাত বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর করা হয়।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ও পরবর্তী ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন পাস

হইবার ফলে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা কার্যতঃ লোপ পাইয়াছে। পূর্বে লর্ড সভা বিরোধিতা করিলে কমন্স সভাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের মাধ্যমে জনসমর্থনের শক্তিতে আইন পাস করিতে হইত। বর্তমানে আর কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এই আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে লর্ড সভা কমন্স সভা-প্রস্তাবিত আইনকে মাত্র এক বৎসরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিবার ক্ষমতা ইহার নাই। কমন্স সভা কর্তৃক প্রেরিত অর্থ-সংক্রান্ত বিল লর্ড সভাকে এক মাসের মধ্যেই তাহার পর্যালোচনা শেষ করিতে হইবে। সুতরাং আইন-প্রণয়ন বিষয়ে লর্ড সভার বিশেষ কোন কার্যকারিতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন লর্ড সভার বিচারবিভাগীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে নাই। লর্ড সভাই গ্রেট বৃটেনের সর্বোচ্চ আপীল বিচারালয়। যুক্তরাজ্য ও উত্তর-আয়ারল্যাণ্ডের সমুদয় আপীল মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা এই আদালতের আছে। লর্ড চ্যান্সেলর, নয় জন আপীল লর্ড, ভূতপূর্ব লর্ড চ্যান্সেলরগণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন বা বর্তমানে আছেন এরূপ লর্ডগণ লইয়া এই আদালত গঠিত। আপীল মামলার বিচার করা ছাড়াও এই বিচারালয় আদিম বিচারকার্যও পরিচালনা করে। লর্ড সভার কোন সদস্য রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত হইলে তাঁহার বিচারকার্য এই আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়াও কমন্স সভা কর্তৃক আনীত গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীর বিচারকার্যও (Impeachment) এই আদালত নিষ্পন্ন করে। কিন্তু মন্ত্রিগণের দায়িত্ব নীতি কার্যকর হওয়ার ফলে আর মহা অভিযোগের প্রয়োজন হয় না।

লর্ড সভার অধিকার ও অক্ষমতা—Privileges and Disabilities of the House of Lords

আইনসভার সদস্যগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন সেজন্য সকল দেশেই তাঁহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার থাকে। লর্ড সভার সদস্যগণ সাধারণ অধিকার ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ

অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশেষ অধিকারগুলি হইল—
১। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।
২। তাঁহারা পৃথকভাবে সভার অধিবেশনের আহ্বান পাইয়া থাকেন।
৩। তাঁহারা আপীল মামলার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কার্য করিতে পারেন ও কমন্স সভা কর্তৃক আনীত গুরুতর অভিযোগেরও বিচার করিতে পারেন।
৪। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন লর্ড নিজে সভায় অনুপস্থিত থাকিয়াও অন্যের মারফত ভোট দিতে পারিতেন। ৫। লর্ড সভা যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারে। ৬। ইহা ছাড়া সভাগৃহে সাধারণভাবে তাঁহাদের বাক্-স্বাধীনতা আছে এবং সভার অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্বে এবং পরে কোন লর্ডকে দেওয়ানী অপরাধের জন্য আটক করা যায় না। ৭। পূর্বে এই সভার কোন সদস্য নরহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে স্বশ্রেণীর একজন লর্ডের বিচারাধীন হইবেন এই দাবি করিতে পারিতেন। কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিশেষ অধিকার তুলিয়া লওয়া হয়। ৮। এই সভার সদস্যগণের আর একটি বিশেষ অধিকার হইল যে, ইঁহারা সভার দিনপঞ্জীতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ রাখিতে পারেন।

লর্ড সভার সদস্যগণের কতিপয় বিশেষ অক্ষমতাও আছে। প্রথমতঃ, পূর্বে তাঁহারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত লর্ড উপাধি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না বা লর্ড থাকা কালে উপাধি পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা কমন্স সভার সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারিতেন না বা সদস্য পদ-প্রার্থী হইতে পারিতেন না। কিন্তু ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের আইনের ভিত্তিতে লর্ড সভার সদস্যগণের একযোগে এই উভয় অক্ষমতাই দূর হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সদস্যগণ পার্লামেন্ট-বিষয়ক কার্যের জন্য কোন বেতন পান না। তবে লর্ড সভার সমগ্র অধিবেশনের ⅓ অধিবেশনে যদি কেহ যোগদান করেন তাহা হইলে তাঁহার বাসগৃহ হইতে সভাকক্ষ পর্যন্ত যাতায়াত ব্যয় পাইতে পারেন।

গ্রেট বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের ফলে লর্ড সভার বিশেষ অধিকারগুলিও ইহার ক্ষমতার সহিত অন্তর্ধান করিয়াছে।

লর্ড সভার বিরুদ্ধে অভিযোগ—Criticism against the House of Lords

গ্রেট বৃটেনের লর্ড সভা সম্পর্কে এ যাবৎ বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। সমালোচনার কয়েকটি সঙ্গত কারণ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া ইহার প্রথম ও প্রধান সমালোচনা করা হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এরূপ গণতন্ত্র-বিরোধী পদ্ধতিতে নিযুক্ত সদস্য-সমন্বিত উচ্চ পরিষদ এক ক্যানাডা ব্যতীত অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। জনগণ দ্বারা নির্বাচন-পদ্ধতিতে গঠিত আইনসভা ব্যতীত ভিন্ন পদ্ধতিতে গঠিত আইনসভা জনমত প্রতিফলিত করিতে পারে না। লর্ড সভা জনমতের প্রতিনিধি নয়, সুতরাং এই সভা গণতন্ত্র-বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ, লর্ড সভার অধিকাংশ সদস্যই ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। গ্রেট বৃটেনের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণী এই সভার সদস্য। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি ও বিশেষ করিয়া মদ্য ব্যবসায়ের প্রতিনিধি লইয়া এই সভা প্রধানতঃ গঠিত। সুতরাং এইরূপ আইনসভার অস্তিত্ব স্বাধীন দেশের মূর্ত প্রতীক ইংলণ্ডে সমর্থনযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ, লর্ড সভার কার্যাবলীর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই সভা পূর্বাপর কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কাজ করিয়াছে এবং প্রগতিমূলক ও উদারনৈতিক কার্যক্রমে বাধা দিয়াছে।

চতুর্থতঃ, লর্ড সভার সদস্যগণের উপস্থিতির সংখ্যা হইতে আইনসভা হিসাবে ইহার অসারতা ও প্রয়োজনীয়তার অভাব বুঝিতে পারা যায়। অধিকাংশ সদস্যই অনুপস্থিত থাকেন। প্রায় সাড়ে নয়শত সদস্যের মধ্যে তিনজন উপস্থিত থাকিলেই সভার কাজ চলিতে পারে এবং কোন আইন পাস করিতে হইলে ৩০ জন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই আইন পাস করা যায়। উপরি-উক্ত নিয়মটি হইতে লর্ড সভার অসারতা প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ের মতানুযায়ী লর্ড সভা একদিকে যেরূপ ক্ষতিকর (mischievous) অপরদিকে তদ্রূপ বাহুল্যমাত্র (superfluous)। যখন উদারনৈতিক দল বা শ্রমিক দল সরকার গঠন করে তখন লর্ড সভা এই দল কর্তৃক আনীত আইনের অন্ধভাবে বিরোধিতা করে।

সুতরাং এই সভার কার্য একদেশদর্শী এবং জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার যখন রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসীন থাকে তখন এই সভা রক্ষণশীল দল কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন গুণাগুণ বিচার না করিয়া সমর্থন করে। সুতরাং এই সভার নিজস্ব কোন স্বাধীন অভিমত নাই। ইহা রক্ষণশীল মতবাদ সমর্থন করে, সুতরাং বাহুল্য মাত্র।

লর্ড সভার কার্যকারিতা—Utility of the House of Lords

১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইলেও ইহার উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না। ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও লর্ড সভার অস্তিত্ব যে একেবারেই বিলুপ্ত হয় নাই ইহা দ্বারা ইহার উপযোগিতা প্রমাণিত হয়। লর্ড সভার সম্পূর্ণ বিলোপ অথবা সংস্কারসাধনের নিমিত্ত পূর্বে বহুবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হয় নাই। গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে লর্ড সভা গণতন্ত্র-বিরোধী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লর্ড সভা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। লর্ড সভার সদস্যতালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি জাতীয় জীবনের নানাদিকে তাঁহাদের চিন্তাধারা ও কার্যের দ্বারা উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে লর্ড পদবীতে অলংকৃত করা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই লর্ড সভার সদস্য মনোনীত হইয়া থাকেন। সুতরাং লর্ড সভার গঠন-পদ্ধতিকে নিতান্ত গণতন্ত্র-বিরোধী বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও লর্ড সভা আইনসভার উচ্চ কক্ষের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। কমন্স সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করিয়া তাহা সংশোধন করা হইল উচ্চ কক্ষের প্রধান কার্য। লর্ড সভা বিতর্কবিহীন আইনের প্রস্তাব করিতে পারে ও কমন্স সভার দ্রুত আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতায় এক বৎসরকাল পর্যন্ত বাধা প্রদান করিয়া আইন-প্রণয়ন বিষয়ে জনমতকে সজাগ রাখিতে পারে। ইহা ছাড়া, অনেক সময় লর্ড সভা হইতে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে কেবিনেটের সদস্য নিযুক্ত করা হয়।

লর্ড সভার সংস্কার—Reform of the House of Lords

লর্ড সভার উত্তরাধিকারসূত্রে গঠন ও রক্ষণশীল প্রকৃতি ইহার জনপ্রিয়তার অন্তরায় এবং এই কারণে মধ্যে মধ্যে এই সভার সংস্কারের জন্য গণদাবী উত্থিত হয়। যতদিন পর্যন্ত রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত লর্ড ও কমন্স সভার মধ্যে কোন গুরুতর মতবিরোধ ঘটে নাই। কিন্তু উদারনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন হইবার পরবর্তী কাল হইতে উভয় সভার মধ্যে মতভেদ গুরুতর আকার ধারণ করে এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড সভা অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তখনই উদার-নৈতিক দল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া লর্ড সভার ক্ষমতা বিশেষভাবে সংকুচিত করে। এই সময় হইতে লর্ড সভার সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে একটি প্রকৃত উচ্চ পরিষদের মর্যাদা দান করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা হয়।

১। ল্যান্সডাউন প্রস্তাব—এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, লর্ড সভা মোট ৩৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই সদস্যগণের মধ্যে কিয়দংশ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইবেন, কিছু সংখ্যক সদস্য বিশপগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং অবশিষ্টাংশ কমন্স সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা হয় নাই।

২। ব্রাইস্ প্রস্তাব—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ব্রাইসের সভাপতিত্বে লর্ড সভার সংস্কারের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করে। (ক) উচ্চ পরিষদের সদস্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া ৩২৭-এ সীমাবদ্ধ করা, (খ) পরিষদের কার্যকাল ১২ বৎসর হইবে এবং ⅓ সদস্য প্রতি চারবৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবে, (গ) উচ্চ পরিষদের ¾ সদস্য কমন্স সভা কর্তৃক আনুপাতিক নির্বাচনপদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবে ও অবশিষ্ট ¼ সদস্য লর্ডগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে, (ঘ) উভয় পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে প্রত্যেক পরিষদের ৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি যুক্ত কমিটি দ্বারা এই মত-বিরোধ বিবেচিত হইবে। কিন্তু বিরোধের ক্ষেত্রে যুক্ত কমিটির দ্বারা বিরোধের মীমাংসা প্রস্তাবে উদারনৈতিক দল সম্মত না হওয়ার ফলে এই প্রস্তাবও সফল হয় নাই।

৩। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাব—১৯২২ খৃষ্টাব্দে লয়েড্ জর্জের মন্ত্রিসভা লর্ড সভার সংস্কার উদ্দেশ্যে কয়েকজন কেবিনেট সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি এই সম্পর্কে ব্রাইস্ প্রস্তাবের অনুরূপ পাঁচটি প্রস্তাব লর্ড সভার বিবেচনার জন্য পাঠায়, কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি লর্ড সভা বা জনসাধারণ গ্রহণ করে না বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

৪। কেভ্ প্রস্তাব—১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি কেবিনেট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রস্তাব করে যে, লর্ড সভা রাজপরিবারের সদস্য ও আপীল-বিচারক সদস্য বাদ দিয়া মোট ৩৫০ জন্য সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। অল্প-সংখ্যক সদস্য রাজা কর্তৃক ১২ বৎসরের জন্য মনোনীত হইবে এবং লর্ডগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে ১২ বৎসরের জন্য কিছুসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত করিবেন। এই প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কিনা তাহা কমন্স সভার স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত না হইয়া উভয় পরিষদের একটি যুক্ত কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড সভা সংস্কারের উদ্দেশ্যে লর্ড ক্লারেণ্ডেন আর একটি প্রস্তাব করেন।

৬। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড সল্স্‌বেরী আর একটি প্রস্তাব করেন এবং বিলের আকারে এই প্রস্তাবটি পার্লামেন্টে পেশ করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে লর্ড সভার সদস্যসংখ্যা ৩২০ জন করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৫০ জন লর্ডগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে, আর ১৫০ জন জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ রাজা কর্তৃক মনোনীত হইবে। কমন্স সভার স্পীকারের সভাপতিত্বে উভয় পরিষদের একটি যুক্ত অধিবেশন কর্তৃক অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রকৃতি নির্ধারিত হইবে। কিন্তু এ প্রস্তাবও কার্যকরী হয় নাই। শ্রমিকদলের নীতি ছিল যে, লর্ড সভা যদি ইহার শাসনকার্যে বাধা দেয় তাহা হইলে লর্ড সভার বিলোপ সাধন করা।

কিন্তু লর্ড সভার সংস্কারের উদ্দেশ্যে এতগুলি প্রস্তাব সত্ত্বেও লর্ড সভা এখনও পর্যন্ত নিজ বৈশিষ্ট্যসহ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল পূর্ণ গণতান্ত্রিক যুগে এই গণতন্ত্র-বিরোধী আইনসভা বজায় থাকিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, লর্ড সভার দুর্বলতাই ইহার অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বর্তমানে এই সভা আইন-প্রণয়নে কিছু বিলম্ব ঘটাইতে পারে,

কিন্তু কমন্স সভার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে না। ইহা ছাড়া, বর্তমানে লর্ডগণ একটি স্বতন্ত্রশ্রেণী নহেন। জনসাধারণের মধ্য হইতেও লর্ড সৃষ্টি হয় এবং লর্ডবংশ হইতেও সাধারণ শ্রেণীর জন্ম হয়। সুতরাং লর্ড সভার গঠন ও ক্ষমতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সভা কোনদিক দিয়াই গ্রেট বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শের অন্তরায় হয় নাই। তাই গ্রেট বৃটেনের জনমত এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী, বিভিন্ন দেশের মাতৃস্থানীয় আইনসভার কোন সংস্কার করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই।

কমন্স সভা—The House of Commons

বর্তমানে কমন্স সভা ছয়শত তিরিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত। সত্তর হাজার সংখ্যক লোকপ্রতি একজন প্রতিনিধির ভিত্তিতে ইংলণ্ড হইতে চারিশত নিরানব্বুই জন প্রতিনিধি, স্কটল্যাণ্ড হইতে চুয়াত্তর, ওয়েলশ্ হইতে ছত্রিশ ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড হইতে তের জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের গণপ্রতিনিধিত্ব আইন ও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সমান প্রতিনিধিত্বের আইন পাস হইবার ফলে গ্রেট বৃটেনে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হইয়াছে বলা চলে। কমন্স সভার সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাজা তৎপূর্বেই কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। রাজা কমন্স সভা আহ্বান করেন ও ইহার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন।

কমন্স সভার ক্ষমতা—Powers of the House of Commons

১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট আইন বলবৎ হইবার পর লর্ড সভার ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া কমন্স সভার আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কমন্স সভাকে কেন্দ্র করিয়াই বৃটিশ শাসনব্যবস্থার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য প্রকটিত হইয়াছে। বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় কমন্স সভা যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূল কারণ হইল শাসনব্যবস্থার উপর এই সভার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা। শাসন-সংক্রান্ত-ব্যাপারে, আইন-প্রণয়ন-কার্যে, আয়-ব্যয়-নিয়ন্ত্রণে, কেবিনেট সভার নীতি ও কর্মসূচীর নিয়ন্ত্রণে কমন্স সভা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী।

কমন্স সভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। এই সভা কর্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত না হইয়া কোন আইনের প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে না, বা কোন আইনেরই পরিবর্তন বা পরিবর্জন সম্ভব নয়। অর্থ-সংক্রান্ত সমুদয় প্রস্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হয় ও এই সভার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রস্তাবই বলবৎ করা যায় না। সরকারের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত নীতির সমালোচনা করিবার পূর্ণ অধিকারী হইল কমন্স সভা। সর্বোপরি কমন্স সভা শাসনব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ামক কেবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেবিনেটের হস্তেই প্রকৃত শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এবং এই কেবিনেট সভা ইহার শাসননীতি ও কার্যক্রমের জন্য কমন্স সভার নিকট দায়ী। কেবিনেটের প্রত্যেকটি কার্যসম্পর্কে কমন্স সভা প্রশ্ন তুলিতে পারে। উহা কেবিনেটের কার্য অনুমোদন করিতে পারে অথবা অসম্মতিসূচক মত প্রকাশ করিতে পারে। কমন্স সভা কর্তৃক কেবিনেটের কার্য অননুমোদিত হইলে, কেবিনেট সভাকে হয় পদত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা জনমতের নিকট আবেদন জানাইতে হইবে অর্থাৎ কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কমন্স সভার সদস্যগণ শাসন-সংক্রান্ত কোন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য কেবিনেট সদস্যগণকে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়াই কেবিনেট সভার কার্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কমন্স সভাকে বৃটেনের প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ কেবিনেট সদস্যগণের রাজনৈতিক শিক্ষাক্ষেত্র বলা যাইতে পারে—এইখানেই তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক কর্মকুশলতার পরীক্ষা চলে।

কিন্তু কেবিনেটের সহিত কমন্স সভার সম্পর্ক আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, বর্তমানে কমন্স সভা আর তাহার পূর্বগৌরবের অধিকারী নাই। শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা দূরে থাকুক, বর্তমানে আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে ও আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও কার্যতঃ ইহার ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। সিড্‌নি লো যথার্থই বলিয়াছেন যে, বর্তমানে কমন্স সভা ক্ষমতার বাহ্যিক আড়ম্বরের অধিকারী—কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা অন্য প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হইয়াছে। কমন্স সভার আজ্ঞাবহ কেবিনেটই বর্তমানে ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইয়া কমন্স সভাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পর্যবসিত করিয়াছে।

কমন্স সভার অধিকার—Privileges of the House of Commons

লর্ড সভার সদস্যদের অনুরূপ কমন্স সভার সদস্যগণও কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, কমন্স সভার কোন সদস্যকে অধিবেশনকালে ও অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্ব ও পর পর্যন্ত কোন দেওয়ানী মামলার জন্য আটক করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সদস্যগণ বাক্‌-স্বাধীনতার অধিকারী। এই অধিকার ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকারপত্র দ্বারা প্রদত্ত হয়। এই অধিকারের বলে সদস্যগণ সভার আলোচনা ও বিতর্ককালে তাঁহাদের বক্তৃতা বা বক্তৃতার কোন অংশে উচ্চারিত কোন শব্দ বা বাক্যের জন্য দায়ী নন। এজন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন বিচারালয়ে অভিযোগ চলিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, কমন্স সভার সভাপতির মধ্যবর্তিতায় তাঁহারা সমবেতভাবে রাজার নিকট আবেদন পেশ করিতে পারেন। চতুর্থতঃ, লর্ড সভার অনুরূপ কমন্স সভা যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে। পঞ্চমতঃ, কমন্স সভার আর একটি বিশেষ অধিকার হইল যে, এই সভাতেই অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি প্রথম উত্থাপিত হয়। নির্বাচন-সংক্রান্ত-ব্যাপারে কোন সন্দেহ হইলে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার বিশেষ অধিকার এই সভার আছে। ইহা ছাড়া, নির্বাচন-প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতাও কমন্স সভার হস্তে ন্যস্ত।

কমন্স সভার সভাপতি—The Speaker of the House of Commons

কমন্স সভার সভাপতি 'স্পীকার' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাচীন-কালে যখন কমন্স সভা ইহার বর্তমান ক্ষমতা বা পদমর্যাদায় উন্নীত হয় নাই, যখন এই সভার প্রধান কার্য ছিল রাজার নিকট নানা অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আবেদন পেশ করা, তখন এই সভার একজন প্রতিনিধি কমন্স সভার মুখপাত্র হিসাবে এই আবেদনগুলি রাজার নিকট পেশ করিতেন। কালক্রমে এই মুখপাত্রের উপরই কমন্স সভার কার্য পরিচালনার ভার অর্পিত হইল এবং তিনি স্পীকার নামে পরিচিত হইলেন।

নূতন নির্বাচনের পর কমন্স সভার প্রথম অধিবেশনের প্রধান কার্য হইল সভার সভাপতি নির্বাচন করা। এই সভাপতি হইলেন স্পীকার। স্পীকার নির্বাচন ব্যাপারে সাধারণতঃ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। কমন্স সভার চিরাচরিত প্রথা হইল যে, বিদায়ী স্পীকার সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকেই পুনরায় নির্বাচন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য দলের নেতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া একজন সদস্যকে স্পীকারপদে মনোনয়ন করেন। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা বলিয়া তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি যে কমন্স সভা কর্তৃক ভোটাধিক্যে স্পীকার-পদে নির্বাচিত হইবেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদিও কার্যতঃ স্পীকার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, তথাপি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর এই মনোনয়ন কমন্স সভার নির্বাচনের মধ্য দিয়া সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। এই নিয়োগে রাজার আনুষ্ঠানিক সম্মতিরও প্রয়োজন। স্পীকার বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড বেতন ও লণ্ডন শহরে বিনা ভাড়ায় একটি সুসজ্জিত আবাসগৃহ পাইয়া থাকেন। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি পেন্‌সন্ পাইয়া থাকেন ও সাধারণতঃ তাঁহাকে লর্ড উপাধি দেওয়া যায়।

স্পীকারের প্রধান কার্য হইল কমন্স সভার অধিবেশন পরিচালনা করা। বৃটিশ কমন্স সভা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর আইন-পরিষদ, সেখানে বহু কৃতবিদ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক ও সুদক্ষ বাগ্মী থাকেন। সুতরাং এই সভার পরিচালক হিসাবে স্পীকারের কি পরিমাণ কর্মদক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও সর্বোপরি শিষ্টাচারী হওয়া প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। স্পীকার সভার কার্য পরিচালনা করেন, সুতরাং তাঁহাকেই সভার কার্য পরিচালনা করিবার নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হয় ও এই নিয়মাবলী কার্য-পরিচালনায় বলবৎ করিতে হয়। বিতর্ককালে তিনি সভার শান্তি-শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষা করেন এবং কোন ব্যাপারে মতভেদ হইলে তাঁহাকে মীমাংসা করিতে হয় এবং বিতর্কমূলক ব্যাপারে স্পীকারের নির্দেশ চূড়ান্ত বলিয়া সকল সদস্যেরই গ্রহণ করিতে হয়। কোন সদস্য যদি বক্তৃতা-কালে অভদ্রোচিত বা সম্মানহানিকর বা বিদ্রোহাত্মক কোন ভাষা প্রয়োগ করেন তাহা হইলে স্পীকার তাঁহাকে তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিতে

পারেন অথবা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন—এমন কি প্রয়োজনক্ষেত্রে সভার নিয়মাবলী গুরুতররূপে অবহেলিত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কার করিতে পারেন।

তিনি মুলতুবী-প্রস্তাব আনয়নের অনুমতি দিতে পারেন অথবা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন যে, কমন্স সভায় উত্থাপিত কোন আইনের প্রস্তাবের উপর সংশোধন প্রস্তাবগুলি বিস্তারিত আলোচনার যথেষ্ট সময় নাই, তাহা হইলে তিনি মাত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রস্তাবগুলি আলোচনা ও ভোটগ্রহণে অনুমতি দান করিতে পারেন। কোন বিল অর্থ-বিষয়ক বিল কিনা এবিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত প্রদান করিবার ক্ষমতা ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা স্পীকারের উপর অর্পিত হইয়াছে। সভার অবমাননার অভিযোগে স্পীকার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

কমন্স সভার আলাপ-আলোচনায় স্পীকার অংশ গ্রহণ করেন না এবং সাধারণতঃ তিনি ভোট প্রদান করেন না। কিন্তু যখন কোন প্রস্তাবের সপক্ষে ও বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হয়, তখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁহাকে ভোট দিতে হয়। স্পীকারের এই ভোটদান তাঁহার নিজ ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় না। প্রথাগত নিয়মানুসারে তিনি এরূপভাবে ভোট দেন যাহাতে প্রচলিত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে এবং সভা ঐ বিষয়ে পুনরায় ভোট গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। সভার সমুদয় সদস্যকেই স্পীকারকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে হয়। তিনি কমন্স সভার বক্তা নামে অভিহিত হইলেও বর্তমানে তাঁহাকে আর বক্তৃতা করিতে হয় না। তিনি বক্তা হইতে নির্বাক শ্রোতায় পর্যবসিত হইয়াছেন।

কমন্স সভার সদস্য হিসাবে স্পীকারকে রাজনৈতিক দলের সমর্থকরূপেই নির্বাচিত হইতে হয়। স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দল-নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। কমন্স সভার ভিতরে ও বাহিরে কোন রাজনৈতিক দলের সভাসমিতিতে তিনি যোগদান করিতে পারিবেন না। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলসম্পর্কিত কোন সংবাদপত্র বা সংস্থা বা কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। সভার অধিবেশন পরিচালনাকালেও দল-নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখা তাঁহার প্রধান কর্তব্য।

স্পীকারের এই দল-নিরপেক্ষতার উপরই তাঁহার নিজের পদমর্যাদা ও জাতীয় সম্মান নির্ভর করে।

কমিটি ব্যবস্থা—Committee System

বর্তমান যুগে আইনসভার কার্য এরূপ ব্যাপক ও জটিলতাপূর্ণ হইয়াছে যে, বহু সদস্য-সমন্বিত আইনসভার পক্ষে বিশেষ বিবেচনাপূর্বক সূক্ষ্মভাবে কোন বিষয়ের মীমাংসা করা সম্ভব নয়। এইজন্য প্রত্যেক দেশের আইনসভা বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে কতকগুলি কমিটি গঠন করে। কমিটি-গুলির প্রধান কার্য হইল, খসড়া আইনগুলি যখন ইহাদের নিকট বিবেচনার্থ প্রেরিত হয় তখন সেগুলিকে সবিস্তারে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজন ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন অন্তে কমিটির সুপারিশসহ আইনসভায় প্রেরণ করা। এই ব্যবস্থা দ্বারা শুধু যে আইনের প্রস্তাবগুলির সম্যক পর্যালোচনা হয় তাহা নয়, আইনসভাও অনেক পরিমাণে ভারমুক্ত হইয়া অন্য অসংখ্য কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারে। গ্রেট বৃটেনে কমন্স সভার কার্যপরিচালনা-বিষয়ে কমিটিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতি অধিবেশনের প্রারম্ভে ছয় প্রকারের বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। এই বিভিন্ন কমিটিগুলি সদস্য-নির্বাচনের জন্য বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে সরকারী দলের ও বে-সরকারী বিপক্ষদলের নেতৃগণ একটি যুক্ত সম্মেলনে মিলিত হইয়া একটি ১। নির্বাচনী কমিটি গঠন করেন। উপরি-উক্ত বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণ এই নির্বাচনী কমিটি (Committee of Selection) দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সাধারণ-সম্পর্কিত বিলগুলি বিবেচনার জন্য ২। স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Public Bills) তিরিশ হইতে পঞ্চাশ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইঁহারা প্রয়োজন বোধ করিলে অতিরিক্ত পনের হইতে বিশজন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞ লইয়া এইরূপ পাঁচটি স্থায়ী কমিটি কমন্স সভায় আছে। ৩। সাময়িক কমিটি (Select Committees) বিশেষ কোন প্রস্তাব বিবেচনার্থ সাময়িকভাবে গঠিত হয় ও নির্দিষ্ট কার্য শেষ হইলে এই কমিটিগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। ৪। একটি অধিবেশনের জন্য গঠিত কমিটি (Sessional Committees)—আবেদনপত্র পরীক্ষা করা প্রভৃতি নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই কমিটি-

গুলি গঠিত হয়। ৫। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত প্রস্তাব বিবেচনাকারী কমিটি (Private Bills Committees)—এই কমিটিগুলি মাত্র চারজন সদস্য লইয়া গঠিত। ইঁহাদের প্রধান কার্য হইল, যে সমস্ত বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের বিরোধিতা হয় সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা ও এই বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া কমন্স সভায় তাহাদের সিদ্ধান্তসহ বিবরণী পেশ করা। ৬। সমগ্র কমন্স সভার কমিটিরূপে অধিবেশন (Committee of the Whole House)। সমগ্র সভা দুইটি উদ্দেশ্যে কমিটিরূপে মিলিত হইতে পারে: (ক) প্রথমতঃ, কি উপায়ে ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থ আহরণ করিতে হইবে অর্থাৎ কর ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে যখন মিলিত হয় তখন এই কমিটিকে Committee of Ways and Means বলা হয়। (খ) দ্বিতীয়তঃ, যখন এই কমিটি ব্যয়ের তালিকাগুলি বিবেচনা করিয়া অনুমোদন করিবার উদ্দেশ্যে মিলিত হয় তখন ইহাকে Committee on Supply বলা হয়। কমন্স সভার সাধারণ অধিবেশনের সহিত কমন্স সভার এই কমিটির অধিবেশনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সভার যখন কমিটি হিসাবে অধিবেশন চলিতে থাকে তখন এই অধিবেশনে স্পীকার সভাপতিত্ব করিতে পারেন না। এই কমিটির জন্য পৃথক সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকে। স্পীকারের দণ্ডও টেবিলের নীচে রাখা হয়। কমন্স সভার কার্যপরিচালনা-ব্যাপারে যতটা নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বিত হয়, কমিটির কার্যপরিচালনায় ততটা নিয়মানুবর্তিতা প্রদর্শিত হয় না। যে-কোন সদস্য একাধিকবার বক্তৃতা করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব (Budget) পরীক্ষা করিবার জন্য ৭। Standing Committee on Public Accounts আছে। ৮। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimates Committee) বলিয়া আর একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে।

খসড়া আইনের শ্রেণীবিভাগ—**Classification of Bills**

আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে আইনের খসড়াগুলির শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন—কারণ আইনের খসড়ার বৈচিত্র্যের জন্য আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির কিছু পরিমাণ পার্থক্য হয়। আইনের খসড়াগুলিকে সাধারণতঃ

সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়া (Public Bill) ও বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়া (Private Bill) বলা হয়। সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়াগুলি কোন ব্যক্তি বা সংসদ অথবা কোন স্থান বিশেষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। এই খসড়াগুলির বিষয়বস্তু জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়। যেমন, দেশে বাল্যবিবাহ নিষেধ বা প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার আইন। এই খসড়াগুলি সাধারণতঃ সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক (মন্ত্রিমণ্ডলী) বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া আইনসভায় পেশ করা হয়। তবে বে-সরকারী সদস্যগণ এই জাতীয় খসড়া আইন উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু উত্থাপনের পূর্বে সরকারী সদস্যগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাদের সম্মতিক্রমেই বে-সরকারী সদস্যগণ এই সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিল উত্থাপন করিতে পারেন। সরকারী সম্মতি ও সরকারী সাহায্য না পাইলে এরূপ বিল অনুমোদিত হইতে পারে না। বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক আনীত সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিলকে (Private member's bill) বলা হয়।

ইহা ছাড়া, বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত খসড়া আইন (Private Bill) আছে। এই বিলগুলি সাধারণতঃ বে-সরকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত হয়। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত ব্যাপার হইল এই বিলগুলির বিষয়বস্তু। কোন শহরে নূতন মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্টি করা বা কোন নদীর উপর পুল তৈয়ারী করা ইত্যাদি বিশেষ স্বার্থের জন্য এই আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়।

পার্লামেণ্টে সাধারণ আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি—**Process of Law-making in Parliament**

আইনের প্রস্তাব অর্থসম্পর্কিত হইতে পারে অথবা অর্থসম্পর্কিত নাও হইতে পারে। যে সমস্ত প্রস্তাব অর্থসম্পর্কিত নহে, সে সমুদয় প্রস্তাব পার্লামেণ্ট সভার লর্ড বা কমন্স যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোন আইনের প্রস্তাবকে আইনে পর্যবসিত করিতে হইলে নির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতির মধ্য দিয়া যাইতে হয়, যথা—প্রস্তাবের খসড়া-প্রণয়ন (Drafting), আইনসভায় খসড়াটিকে পেশ করা (Introduction), প্রথম পাঠ (First Reading), দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading), কমিটিতে প্রেরণ

(Committee Stage), কমিটি কর্তৃক বিবরণ প্রদান (Report Stage) ও তৃতীয় পাঠ (Third Reading)। রাজার সম্মতি (Kings Assent)।

যে সদস্য প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক, প্রথমে তাঁহাকে নিজে অথবা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে প্রস্তাবের একটি খসড়া প্রণয়ন করিতে হয় ; খসড়াটি প্রস্তুত হইলে প্রস্তাবককে আইনসভায় ঐ প্রস্তাবটিকে উত্থাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয় অথবা প্রস্তাবের উত্থাপককে লিখিত নোটিশ দিয়া সভার টেবিলে প্রস্তাবটিকে স্থাপন করিতে হয়। সভার কর্মসচিব (Clerk of the House) প্রস্তাবের শিরোনামা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন। ইহার পর স্পীকারের অনুরোধক্রমে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাবের দ্বিতীয় পাঠের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ করেন। এই প্রক্রিয়াকে প্রথম পাঠ বলা হয়। কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ব্যতীত সাধারণতঃ প্রথম পাঠের সময় প্রস্তাবটি সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা হয় না।

অতঃপর নির্ধারিত দিনে প্রস্তাবটির দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় পাঠের সময় প্রস্তাবটির মূল নীতি সম্পর্কে প্রস্তাবটির সমর্থক ও বিরুদ্ধ দলের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। এই পর্যায়ে প্রস্তাবটির ধারা-উপধারা লইয়া কোন বিস্তারিত আলোচনা হয় না। আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক প্রস্তাবের মূল নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময়ে বিরোধী দল প্রস্তাবটির সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে পারেন অথবা 'ছয়মাস পরে বিলটির দ্বিতীয় পাঠ করা হউক' এই মর্মে প্রস্তাব আনিতে পারেন। দ্বিতীয় পাঠে প্রস্তাবটি যদি ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় পাঠ পর্যায় শেষ হয়।

প্রস্তাবটির মূলনীতি দ্বিতীয় পাঠ দ্বারা স্থিরীকৃত হইবার পর প্রস্তাবটিকে স্পীকারের নির্দেশ অনুসারে সভার একটি কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সাধারণতঃ প্রস্তাবগুলিকে সভার কোন স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে প্রস্তাবটি একটি বিশেষ সাময়িক কমিটিতেও প্রেরিত হইতে পারে। এই কমিটি প্রস্তাবের বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে প্রস্তাবের সংশোধন করিতে পারে।

কমিটির বিবেচনার পর সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটিকে উত্থাপক সভায় প্রেরণ করা হয়। যদি কমিটি প্রস্তাবের কোন সংশোধন না করেন তাহা হইলে কমিটির এই বিবরণ-পেশ পর্যায়ের আর কোন প্রয়োজন হয় না।

প্রস্তাবটিকে অপরিবর্তিত আকারেই সভায় প্রেরণ করা হয়। উত্থাপক সভা এই সময়ে প্রস্তাবটির ধারা-উপধারা অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা করে ও প্রয়োজন বোধ করিলে প্রস্তাবটির সংশোধনও করিতে পারে।

তাহার পর প্রস্তাবটির উত্থাপক প্রস্তাবটির তৃতীয় পাঠের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তৃতীয় পাঠের সময় প্রস্তাবটির মূলনীতি ও আদর্শ লইয়া পুনরায় আলাপ-আলোচনা চলে, কিন্তু কোনরূপ বিস্তারিত আলোচনা হয় না। এই সময়ে প্রস্তাবের আনুষ্ঠানিক সংশোধন ছাড়া অন্য কোনরূপ সংশোধন করা চলে না। প্রস্তাবটিকে হয় সমগ্রভাবে অনুমোদন করিতে হইবে, নতুবা সমগ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে; কিন্তু কোনরূপ পরিবর্তন করা চলে না।

একটি পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে উহা দ্বিতীয় পরিষদের নিকটে প্রেরিত হয় অর্থাৎ প্রস্তাবটি যদি কমন্স সভা কর্তৃক উত্থাপিত হইয়া এই সভা দ্বারা তিনটি পাঠের পর অনুমোদিত হয় তাহা হইলে প্রস্তাবটিকে লর্ড সভায় প্রেরণ করা হয়। লর্ড সভায়ও প্রস্তাবটি একই পদ্ধতির মধ্য দিয়া চালিত হয়। বর্তমানে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন পাসের ফলে লর্ড সভা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিলেও এক বৎসর পরে লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই বিলটি রাজার সম্মতি পাইয়া আইনে পরিণত হয়। সুতরাং সাধারণ আইন-প্রণয়নে কমন্স সভাই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যদি লর্ড সভায় উত্থাপিত কোন আইনের প্রস্তাব কমন্স সভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে সে প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে না।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব—Money Bills in Parliament

সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতিতে আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করা হয়। যে সমস্ত প্রস্তাবের দ্বারা রাজস্ব আদায়, ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন, ঋণগ্রহণ ও ঋণপরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হয় সেই সমস্ত প্রস্তাবকে সাধারণতঃ অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব বলা হয়।

গ্রেট বৃটেনে অর্থ-বিষয়ক প্রস্তাবগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা,—(১) রাজস্ব বিল (Finance Bill), (২) ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর বিল

(Appropriation Bill), ও (৩) একত্রিত তহবিল বিল (Consolidated Fund Bill)। বৃটেনের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের সহিত পরিচিত হইতে গেলে একটি বিষয়সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বৃটেনে সরকারী সমগ্র আয় জাতীয় ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংক অব ইংলণ্ডে জমা হয় এবং সরকারী এই জমাকে সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) বলা হয়। এই সঞ্চিত তহবিল হইতেই পার্লামেন্ট সভা সমগ্র ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করে। ব্যয়-বরাদ্দ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সরকারী ব্যয়ের একটি বড় অংশ পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক স্থায়ী আইন দ্বারা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যয়, জাতীয় ঋণপরিশোধ, বিচারপতিগণের ও হিসাবপরীক্ষক প্রধানের বেতন, ইত্যাদি পার্লামেন্ট-নির্ধারিত এই স্থায়ী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যয়বরাদ্দগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেন্ট সভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। এই ব্যয়বরাদ্দগুলিকে সঞ্চিত তহবিল ব্যয় (Consolidated Fund Services) বলা হয়। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ব্যয় আছে, যেগুলি প্রতি বৎসর পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এই অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়গুলি (Supply Services) কতকগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়; এই বিভিন্ন ভাগগুলিকে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর বিল—Appropriation Bill

প্রতি বৎসর অক্টোবর মাস হইতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে তাহাদের আগামী বৎসরের আনুমানিক ব্যয়ের একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়া ট্রেজারি বিভাগের নিকট পেশ করিতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের এই হিসাব বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত থাকে। এই ভাগগুলি সাধারণতঃ 'ভোট' নামে অভিহিত হয়। ব্যয়ের এই আনুমানিক হিসাবগুলিকে জানুয়ারী মাসের শেষে অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথমে কমন্স সভায় পেশ করা হয়। প্রথাগত বিধানানুযায়ী সমগ্র কমন্স সভা ব্যয়বরাদ্দের এই হিসাবগুলি বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটি কমিটিতে রূপান্তরিত হয়। সমগ্র সদস্য সমন্বিত এই কমিটি সরবরাহ কমিটি (Committee on Supply) নামে পরিচিত হয়। কমন্স সভা কমিটি হিসাবে একে একে বিভিন্ন

ব্যয়বরাদ্দের 'ভোট'গুলি অনুমোদন করে এবং এই অনুমোদন-কার্যের জন্য ছাব্বিশ দিন সময় নির্ধারিত থাকে। ব্যয়বরাদ্দের অনুমোদন কার্য শেষ হইলেই কমন্স সভার কর্তব্য সমাপ্ত হয় না। সরকারী কর্মচারিগণ ব্যয়-নির্বাহের জন্য যাহাতে ব্যাংক অব ইংলণ্ড হইতে টাকা উঠাইতে পারেন, সেজন্য কমন্স সভার পৃথক অনুমোদনের আবশ্যক হয়। অন্য একটি কমিটির রূপ পরিগ্রহ করিয়া কমন্স সভা ব্যাংক হইতে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রস্তাব পাস করে। এই কমিটি পন্থা ও উপায় নির্ধারণ কমিটি (Committee of Ways and Means) নামে পরিচিত। অতঃপর উল্লিখিত দুইটি কমিটির প্রস্তাবগুলিকে একটি সরবরাহের বিলের আকারে একত্রিত করা হয়। Appropriation Bill-ও কমন্স সভার নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়।

(খ) রাজস্ব বিল—**Finance Bill**

ব্যয়নির্বাহের জন্য আয়ের পন্থা নিরূপণ করা নিতান্ত অপরিহার্য। মার্চ মাসের শেষ দিনে অর্থমন্ত্রী (Chancellor of the Exchequer) কমন্স সভায় তাঁহার বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-সমন্বিত বাজেট উপস্থাপিত করেন। গত বৎসরের আয়-ব্যয়ের বিবৃতির সহিত নূতন বৎসরের আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ এবং ঐ ব্যয়নির্বাহের জন্য আনুমানিক রাজস্বের একটা পরিমাণের উল্লেখ থাকে। রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিবার জন্য কমন্স সভা পন্থা ও উপায় নির্ধারণ কমিটিতে পর্যবসিত হয়। সরকারী ব্যয়ের একটি অংশ যেরূপ স্থায়ী আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে, তদ্রূপ সরকারী রাজস্ব যে সমুদয় কর হইতে আদায় করা হয়, আয়কর, চা-শুল্ক প্রভৃতি ব্যতীত অন্য অধিকাংশ করই স্থায়ী আইন দ্বারা নির্ধারিত করা থাকে। এই করগুলির জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। করধার্যের এই বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি একত্রিত করিয়া পন্থা-ও উপায় নির্ধারণ কমিটি উহা রাজস্ব বিলরূপে কমন্স সভার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে।

কমন্স সভা তৃতীয় পাঠ দ্বারা উল্লিখিত সরবরাহ বিল ও রাজস্ব বিল অনুমোদন করিলে কমন্স সভার স্পীকার বিল দুইটিকে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব

বলিয়া ঘোষণা করেন। স্পীকার কর্তৃক অর্থ-সংক্রান্ত বিল বলিয়া সমর্থিত হইলে বিল দুইটিকে লর্ড সভায় প্রেরণ করা হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন অনুসারে একমাস সময় পরে রাজার সম্মতিসহ বিল দুইটি আইনে পরিণত হইয়া কার্যকরী হয়।

ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হইতে অনেক সময় আগস্ট মাস শেষ হইয়া যায়। কিন্তু এপ্রিল মাস হইতে সরকারী বৎসর আরম্ভ হয়। ব্যয়বরাদ্দ পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক আইনতঃ অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কোন দপ্তর অর্থব্যয় করিতে পারে না। অথচ এপ্রিল মাস হইতেই নূতন ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এই ব্যয় সংকুলানের জন্য কমন্স সভা নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বেই সরবরাহ কমিটিরূপে প্রত্যেক সরকারী বিভাগকে প্রত্যেক ব্যয়বরাদ্দের বাবদ কিছু পরিমাণ অর্থ খরচ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রস্তাব পাস করে। যতদিন পর্যন্ত ব্যয়বরাদ্দ চূড়ান্তভাবে মঞ্জুর না হয় ততদিন পর্যন্ত কমন্স সভার এই সাময়িকভাবে অনুমোদিত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন বিভাগগুলির ব্যয়নির্বাহ হইয়া থাকে।

আয়ব্যয়ের উপর পার্লামেণ্ট সভার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা—Parliamentary Control over Finance

সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইলেও এই সভার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। অর্থসচিব—চ্যান্সেলর অব্ দি একস্চেকার হইলেন এ বিষয়ে অধিকর্তা। কেবিনেট সভার অনুমোদনক্রমে অর্থসচিবের নির্দেশে ট্রেজারি বিভাগ এই সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কোন নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব বা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব রাজার অনুমোদনক্রমে একমাত্র কোন মন্ত্রীর মারফত উত্থাপিত হইতে পারে। কোন বে-সরকারী সদস্য ব্যক্তিগতভাবে এরূপ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন না। এ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার সদস্যগণ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে আয় ও ব্যয়বরাদ্দের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। কমন্স সভার সদস্যগণ নির্ধারিত কোন ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন না বা একটি বিভাগের ব্যয়বরাদ্দের নির্ধারিত পরিমাণ অন্য আর একটি বিভাগের ব্যয়ের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন না।

রাজার ব্যক্তিগত পারিবারিক ব্যয়, বিচারপতিগণের বেতন, জাতীয় ঋণ-সম্পর্কিত ব্যয় প্রভৃতি বিষয়গুলি যেগুলির ব্যয়বরাদ্দ স্থায়ী আইন দ্বারা নির্ধারিত, সেগুলি সম্পর্কেও কমন্স সভার কোন অধিকার নাই। পার্লামেন্ট সভার একমাত্র ক্ষমতা হইল এই আয়ব্যয়-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলির সমালোচনা করা এবং সমালোচনা দ্বারা কেবিনেটের অর্থ-সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রমসম্বন্ধে জনমতকে অবহিত রাখা। বর্তমানে পার্লামেন্ট সভার এই সমালোচনা করিবার অধিকারও বহুপরিমাণে নানাপ্রকারে সংকুচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, পার্লামেন্ট সভার কার্যসূচী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেবিনেট সভা কর্তৃক স্থিরকৃত হয়। বে-সরকারী সদস্যগণ সমালোচনা করিবার সুযোগ খুব কমই পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, সমালোচনামূলক বিতর্কের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করিবার জন্য মাত্র ছাব্বিশ দিন সময় নির্ধারিত থাকে। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়সম্পর্কে আলোচনা হওয়া অসম্ভব। ফলে, ব্যয়বরাদ্দের অনেক অংশ বিনা বির্তকেই অনুমোদিত হয়। তৃতীয়তঃ, আয়-ব্যয়ের হিসাব বর্তমানে এরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ ব্যতীত কমন্স সভার সাধারণ সদস্যের পক্ষে এই জটিলতার আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিবার সময় থাকে না এবং একজন সাধারণ সদস্য এরূপ যোগ্যতার অধিকারী নহেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চতুর্থতঃ, এ কথা সত্য যে, কমন্স সভা কোন ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করিতে পারে কিংবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। কিন্তু কেবিনেট সভার অনুমোদনক্রমে উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করার অর্থ হইল কেবিনেটের উপর অনাস্থা প্রকাশ করা। এরূপ ক্ষেত্রে বর্তমান কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ ওয়া হয়। সুতরাং কমন্স সভার পক্ষে কেবিনেট কর্তৃক উত্থাপিত কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করা কার্যতঃ সম্ভব নয়। সুতরাং কি করধার্য ব্যাপারে কি ব্যয়বরাদ্দ-মঞ্জুর ব্যাপারে পার্লামেন্ট সভার পক্ষে কেবিনেট কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের সমালোচনা করা ছাড়া কার্যকরভাবে ঐ প্রস্তাবগুলিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

একমাত্র 'স্থায়ী হিসাবপরীক্ষক কমিটির (**Standing Committee** on Public Accounts) মাধ্যমে পার্লামেন্ট সভা সরকারী

আয়-ব্যয়-বরাদ্দের উপর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। সরকারী আয়-ব্যয়ের সমুদয় হিসাবই রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন হিসাব-পরীক্ষক-প্রধান (Comptroller and Auditor-General) দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। হিসাবপরীক্ষক-প্রধান তাঁহার পরীক্ষাকার্য সমাপ্ত করিয়া এ সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যসহ একটি বিবরণী কমন্স সভায় পেশ করেন। কমন্স সভা এই বিবরণী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হিসাবপরীক্ষক কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে। কমন্স সভার বিভিন্ন দলের পনের জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। বিরোধী দলের একজন সদস্য সাধারণতঃ এই কমিটির সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। হিসাব-পরীক্ষক-প্রধানের বিবরণীসহ প্রত্যেক বিভাগের ব্যয়ের হিসাব এই কমিটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকে। কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া কমিটি কমন্স সভায় বিবরণী প্রেরণ করে ও ভবিষ্যতে যাহাতে ব্যয়বরাদ্দ-সম্পর্কে কোনরূপ অনিয়ম বা অপচয় না ঘটে সে সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করে। হিসাব-পরীক্ষক কমিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার জন্য সরকারী বিভাগগুলি ব্যয়সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকে।

আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি—The Estimates Committee

স্থায়ী হিসাবপরীক্ষক কমিটি সরকারী ব্যয় শেষে ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে। সুতরাং এই ব্যবস্থার দ্বারা ব্যয় সংকোচ সম্ভব নয়। ব্যয় করিবার পূর্বে বিভাগীয় ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করিয়া যদি ব্যয় সংকোচের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলেই প্রকৃত ব্যয়-সংকোচ সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯[illegible] খৃষ্টাব্দে আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি গঠিত হয়। পার্লামেন্টে পেশ করিবার পূর্বে ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি এই কমিটি পরীক্ষা করে ও প্রয়োজনমত রদ-বদল করে। কমিটি বিভিন্ন বিভাগগুলিকে ব্যয় সংকোচ সম্পর্কে পরামর্শ দান করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই কমিটি ব্যয়-সংক্রান্ত কোন সরকারী নীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কিন্তু অসুবিধা হইল যে, সরকারী নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যয় সংক্ষেপ সকল ক্ষেত্রে সহজসাধ্য নহে।

বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল—Private Bills

সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিল হইতে ভিন্ন পদ্ধতিতে বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল পাস করা হয়। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল বলিতে বুঝায় সেই সমস্ত আইনের প্রস্তাব, যেগুলির সহিত অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লোকের স্বার্থ জড়িত থাকে বা যে সমস্ত প্রস্তাব কোন বিশেষ স্থান বা শিল্প-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। কোন শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রস্তাব বা কোন বিশেষ শিল্প ব্যবসায়ে শ্রমিক আইন প্রবর্তন করিবার প্রস্তাবগুলিকে বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিল বলা যাইতে পারে।

এই জাতীয় বিল উত্থাপনের পূর্বে বিলের উত্থাপককে গেজেটে ও স্থানীয় সংবাদপত্রে বিলসম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হয়। যে পরিষদে বিলটি উত্থাপিত হইবে, বিলের প্রস্তাবককে সেই পরিষদের বে-সরকারী বিল-অফিসে উক্ত বিলসহ একটি আবেদন-পত্র জমা দিতে হয় ও একই সময়ে বিলের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরগুলিতে পাঠাইতে হয়। পার্লামেন্টের উভয় পরিষদেই বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলগুলি আইনসম্মতরূপে সংকলিত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন-পত্র পরীক্ষকগণ (Examiners of Petitions for Private Bill) নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা বিলটি বিধি-সম্মতরূপে সংকলিত হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করিলে বিলটির প্রথম পাঠ হয়। প্রথম পাঠ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। ইহার পর দ্বিতীয় পাঠ আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটির সাধারণ নীতি ও আদর্শের উপর আলাপ-আলোচনা চলে। দ্বিতীয় পাঠের সময় ভোটাধিক্যে বিলটি যদি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে বিলটি একটি সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলটিকে পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে তাহাদের বিবরণীসহ সমগ্র সভায় প্রেরণ করে। কিন্তু বিলটি সম্পর্কে যদি কোন পক্ষ আপত্তি জানায়, তাহা হইলে উহাকে একটি সাধারণ প্রাইভেট বিল কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এই কমিটি বিলটি বিবেচনা করিবার জন্য বিচারালয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে। বিলের সমর্থকগণ ও বিরুদ্ধবাদীরা আইন-জীবী নিযুক্ত করিয়া সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করেন। কমিটি বিশেষ নিপুণভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিলটিকে পরীক্ষা করেন। প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারিগণেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা

হয়। অতঃপর সমগ্র সভার নিকট কমিটি বিলটি সম্পর্কে তাহাদের মন্তব্য পেশ করে। ইহার পর বিলটির তৃতীয় পাঠ হয় ও সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের অনুরূপ পদ্ধতিতেই উহা আইনে পরিণত হয়।

বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিল প্রণয়ন-পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, এই পদ্ধতিতে পার্লামেণ্ট সভার মূল্যবান্ সময়ের অপচয় ঘটে না। ইহা ব্যতীতও বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলগুলির যথাযথ ও নিরপেক্ষ সমালোচনা হইতে পারে। কিন্তু এই সুবিধাগুলি সত্ত্বেও এই কথা বলিতে হইবে যে, এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের প্রণয়ন-পদ্ধতির অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে গ্রেট বৃটেনে নূতন পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। এই পদ্ধতিকে অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ বলা হয়।

অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ—Provisional Orders

যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের নিকট আবেদন-পত্র পেশ করিতে হয়। সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর উক্ত বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া প্রার্থিত বিষয়ের যুক্তিযুক্ততা-সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ দান করিতে পারেন। এই আদেশগুলিকে অনুমোদনসাপেক্ষ বলা হয় তাহার কারণ পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদন ব্যতীত শাসনবিভাগের কোন আদেশ কার্যকরী হয় না। সাধারণতঃ এইরূপ কতকগুলি অনুমোদনসাপেক্ষ আদেশ একত্রিত করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্ট সভায় পেশ করেন। কোন মন্ত্রী কর্তৃক একত্রিতভাবে উত্থাপিত এই বিলগুলিকে Confirmation Bill বলা হয়। অতঃপর ইহা বিশেষ স্বার্থসম্পর্কিত বিলের অনুরূপ পদ্ধতিতে আইনে পরিণত হয়। যেহেতু এই বিলগুলি সরকারী দপ্তর কর্তৃক অনুসন্ধানের পর পার্লামেণ্ট সভায় উত্থাপিত হয়, সেই হেতু সাধারণতঃ এ সম্পর্কে বিশেষ কোন আপত্তি হয় না।

পার্লামেণ্টের সার্বভৌমিকতা—Sovereignty of Parliament

বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভা হইল সার্বভৌম আইনসভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং পার্লামেণ্টের এই সার্বভৌমিকতা হইল বৃটিশ শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান

বৈশিষ্ট্য। পার্লামেন্ট সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা এতই দুর্ভেদ্য যে, এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, পার্লামেন্ট সভা একমাত্র পুরুষকে নারীতে রূপান্তরিত করা ও নারীকে পুরুষে রূপান্তরিত করা ব্যতীত অন্য সবই করিতে পারে। পার্লামেন্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা স্বৈর—ইহা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নহে। পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের বৈধতাসম্পর্কে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডের কোন কর্তৃপক্ষেরই, এমন কি, বিচারালয়গুলিরও নাই। পার্লামেন্ট সভা সর্বপ্রকার আইনই—কি সাধারণ কি শাসনতান্ত্রিক—প্রণয়ন, সংশোধন ও বাতিল করিতে পারে। পার্লামেন্ট প্রণীত আইন সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রযোজ্য। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে, পার্লামেন্ট সভার তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসকে অ-সার্বভৌম আইনসভা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু নীতিগতভাবে পার্লামেন্ট সভার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইলেও কার্যতঃ বর্তমানে পার্লামেন্ট সভাকে আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা সমীচীন নহে। পার্লামেন্ট বলিতে রাজাসহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা বুঝায়। বর্তমানে রাজা ও লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। পার্লামেন্টের প্রাধান্য বর্তমানে কমন্স সভার প্রাধান্য সূচিত করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কমন্স সভা হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে পার্লামেন্টের প্রাধান্য বলিতে কেবিনেটের প্রাধান্য বুঝায়। ইহা ব্যতীত, অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসন-বিভাগ কর্তৃক আইন-প্রণয়ন ও বিচারবিভাগ কর্তৃক আইন ব্যাখ্যাকালীন পরোক্ষ আইন-প্রণয়ন দ্বারাও পার্লামেন্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইন-গুলির বিরোধী কোনও আইন পার্লামেন্ট সভা প্রণয়ন করিতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইনই ডোমিনিয়নগুলির বিনা সম্মতিতে ডোমিনিয়নগুলিতে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং দেখা যায় যে, পার্লামেন্টের প্রাধান্য বর্তমানে একটি নিছক কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতার সীমা (Limitations on Parliamentary Sovereignty)

বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা স্বৈর ও অন্য-নিরপেক্ষ। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, পার্লামেন্ট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতার

কতিপয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বাধা আছে। আভ্যন্তরীণ বাধা সম্পর্কে ডাইসি বলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পার্লামেন্টের স্বৈর ক্ষমতা প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কোন পার্লামেন্ট সভাই আর উপনিবেশগুলির জনগণের উপর কর ধার্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইবে না। বাহ্যিক বাধা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, যে আইন জনসাধারণ কর্তৃক আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সেরূপ আইন প্রণয়নেও পার্লামেন্ট সভা দ্বিধাবোধ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন পার্লামেন্টই শ্রমিকসংঘগুলির বিলোপ সাধন করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে সাহসী হইবে না- যদিও আইনতঃ পার্লামেন্টের এইরূপ আইন-প্রণয়নে কোন বাধা নাই।

তৃতীয়তঃ, পার্লামেন্ট সভা আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না--কারণ বৃটিশ সরকার একাধিক ক্ষেত্রে জাতীয় আইনের তুলনায় আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে যদি জাতীয় আইনের সহিত আন্তর্জাতিক আইনের সংঘাত ঘটে তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিচারালয়গুলি আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কারণে পার্লামেন্ট সভা আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে দ্বিধা করে।

চতুর্থতঃ, ভোটদাতাগণের নিকট হইল বর্তমানে পার্লামেন্টের প্রধান দায়িত্ব। এই কারণে পার্লামেন্ট জনমত-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিতে সাহসী হয় না।

পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ডের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থাও পার্লামেন্টের স্বৈর ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিচারালয়গুলি আইনের ব্যাখ্যা-কর্তা হিসাবে অনেক সময় ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষা-কবচ হিসাবে কাজ করে।

পরিশেষে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ওয়েষ্টমিনস্টার আইনের বলে পার্লামেন্ট-প্রণীত কোন আইনই আর ডোমিনিয়নগুলির বিনা সম্মতিতে ডোমিনিয়ন-গুলিতে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

লর্ড সভা ও কমন্স সভার সম্পর্ক (Relationship between the two Houses)

গ্রেট বৃটেনের পার্লামেন্ট রাজাসহ লর্ড সভা ও কমন্স সভা লইয়া গঠিত। লর্ড সভা হইল উচ্চ কক্ষ, আর কমন্স সভা হইল নিম্ন কক্ষ। প্রাচীনত্বে ও আভিজাত্যে লর্ড সভা কমন্স সভা হইতে শ্রেষ্ঠতর হইলেও বর্তমানে লর্ড সভার ঐতিহ্য থাকিলেও এ সভা আর পূর্বের গৌরব ও ক্ষমতার অধিকারী নহে। পার্লামেন্ট বলিতে কার্যতঃ শুধু কমন্স সভাকে বুঝায়।

সদস্য সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, লর্ড সভা কমন্স সভা অপেক্ষা বৃহত্তর। কমন্স সভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা হইল ৬৩০। আর লর্ড সভার সদস্য সংখ্যা হইল প্রায় ৯১০। কমন্স সভার সদস্যগণ গণতান্ত্রিক আদর্শে ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, আর লর্ড সভার সদস্যগণ বংশানুক্রমিক সূত্রে বা মনোনয়ন নীতি অনুসারে নির্বাচিত হন। এই নীতি গণতন্ত্রবিরোধী।

পার্লামেন্টের প্রধান কার্য হইল তিনটি; যথা, (১) আইন প্রণয়ন করা (২) রাজস্ব বা অর্থ মঞ্জুর করা ও (৩) শাসন বিভাগের নীতি ও কার্যসূচীর উপর সমালোচনামূলক আলোচনা-বিস্তার করা। এ দিক দিয়া লর্ড সভা ও কমন্স সভার ক্ষমতার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমানে লর্ড সভা অপেক্ষা কমন্স সভা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। আইন প্রণয়ন বিষয়ে লর্ড সভা পূর্বে কমন্স সভার সমক্ষমতার অধিকারী থাকিলেও ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ঐ আইনের সংশোধন হইবার ফলে লর্ড সভার আইন প্রণয়ন-ক্ষমতাকে বহুলাংশে পঙ্গু করা হইয়াছে। কমন্স সভা এখন ইচ্ছা করিলে লর্ড সভার বিনা সম্মতিতে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ছাড়া অন্য সাধারণ সরকারি আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের দিন হইতে এক বৎসর পর রাজার সম্মতিতে পাস করাইতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি অবশ্যই কমন্স সভায় প্রথম উত্থাপিত হয় এবং কমন্স সভা কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাব লর্ড সভায় প্রেরণের একমাস পরে লর্ড সভার সম্মতি অথবা বিনা সম্মতিতে পাস হইতে পারে। সুতরাং কি সাধারণ আইন, কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে কমন্স সভাকেই অধিকতর-ক্ষমতার অধিকারী বলা যাইতে পারে। লর্ড সভা প্রস্তাবিত আইনের আলাপ-আলোচনা,

সমালোচনা বা সংশোধন প্রস্তাব করিতে পারে। কিন্তু কোন ক্রমেই কমন্স সভার আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারে না। তবে পার্লামেণ্ট সভার স্বাভাবিক কার্যকাল বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবে উভয় কক্ষের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীকে কমন্স সভার সদস্য হইতেই হইবে। তিনি লর্ড সভার সদস্য হইতে পারেন না। ইহা ছাড়া কয়েকটি নির্ধারিত পদ ব্যতীত কেবিনেটের অধিকাংশ পদই কমন্স সভার সদস্যগণ কর্তৃক পূরণ করা হয়। বৃটেনে মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বলিতে কমন্স সভার নিকট মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বুঝায়। এ বিষয়ে লর্ড সভার কোন ক্ষমতা নাই। একমাত্র বিচারবিষয়ক ক্ষমতায় লর্ড সভা কমন্স সভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

রাজার অনুগত বিরোধীদল (His Majesty's Loyal Opposition)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল নীতি হইল আলাপ-আলোচনার দ্বারা পারস্পরিক মতভেদ দূর করিয়া যথাসম্ভব সার্বজনীন ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করা। কিন্তু মানুষ মাত্রই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও কার্য করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহশীল। স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যেই একমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাঁহাদের মতানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকেন। যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁহারা ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাঁহাদের মত শাসনব্যাপারে কার্যকরী করিতে সচেষ্ট থাকেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে শুধু শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহা নয়, শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিরোধীদলের সমালোচনার ভয়ে জনস্বার্থবিরোধী কোন কার্য করিতে সাহসী হয় না। যে-কোন উপায়েই হউক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করাই বিরোধী দলের একমাত্র কর্তব্য নহে। গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সর্বদা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কার্যকলাপে প্ররোচিত করা বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই জন্য প্রয়োজন হইলে বিরোধী দলকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। দলগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল দলীয় নীতি ও কার্যসূচীর দ্বারা

জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করা। সুতরাং মতানৈক্য সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থের উন্নতিকল্পে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। গ্রেট বৃটেনে বিরোধী দলকে রাজার অনুগত বিরোধী দল বলা হয়। বিরোধী দলের এই নামকরণের মধ্য দিয়াই বিরোধীদলের কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা করা যাইতে পারে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ গ্রেট বৃটেনে যেরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। দায়িত্বশীল সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলগুলির অবদান উপেক্ষণীয় নহে। গ্রেট বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস আলোচনা করিলে শাসনব্যাপারে দলীয় রাজনীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীত যুগে গ্রেট বৃটেনে যে দলগুলির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে আধুনিক অর্থে অবশ্য রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া চলে না। এই দলগুলি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল এবং যখনই কোন একটি দল শাসনক্ষমতার অধিকারী হইত তখনই সেই দল অন্য দলগুলিকে সর্বপ্রকারে পর্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গ্রেট বৃটেনের বিভিন্ন দলগুলি তাহাদের দলগত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া নীতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি বুঝিতে পারিল যে, শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে একটি বিরোধীদলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। এই বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই বিরোধীদলের সৃষ্টি হয়। সুতরাং গ্রেট বৃটেনে বিরোধী দল শাসনপরিচালনার কার্যের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সেইজন্য বিরোধী দল ও সরকারী দলের সম্পর্কে কোনরূপ তিক্ততা দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্রেট বৃটেনের বিরোধী দল সরকারী দলকে অপদস্থ করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে না। সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ উভয়েই জানে যে, একটির অধিক রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। একটি দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, অপর দল যুক্তি দ্বারা ক্ষমতায় আসীন দলের অনুসৃত নীতি ও কার্যসূচীর সমালোচনা করিবে। একমাত্র বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারাই সরকার তাহার শাসনকার্য-সম্পর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত

সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য সম্পাদন করা হয় না, যেখানে বিরোধী দলের নেতার পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি, প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রায় সমতুল্য এবং সর্বোপরি যেখানে বিরোধী দলের নেতা বেতনভুক্ সরকারী কর্মচারীর পদে পর্যবসিত হইয়াছেন সেখানে এই বিরোধী দলের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেটের অনেক প্রতিপত্তিশালী সদস্য এবং বিরোধী দলের নেতৃগণ স্কুল-কলেজের সহপাঠী বন্ধু—আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা বৈবাহিক বন্ধন দ্বারা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। অনেক সময় তাঁহারা একই শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক হইতে পারেন। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের নিকট হইতে সরকারী কার্যকলাপের নিরপেক্ষ সমালোচনার আশা করা দুরাশামাত্র। বিরোধী দলের নেতৃগণ সমপদস্থ ও সমস্বার্থ-সম্পন্ন হইলে প্রকৃত সমালোচনার কার্য ব্যাহত হওয়া অবধারিত।

এই বিরুদ্ধ সমালোচনার বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, গ্রেট বৃটেনে রাজনৈতিক দলের নেতৃগণ খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব লইয়া রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহারা জাতীয় স্বার্থকে সর্বসময়েই দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া থাকেন। তাই জাতীয় স্বার্থের জন্য তাঁহারা ব্যক্তিগত বা দলগত মত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

আমলাতন্ত্র ও অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থা
(Bureaucracy and Delegated Legislation)

গ্রেট বৃটেনে পার্লামেণ্ট সভা হইল আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। কিন্তু বর্তমানে নানাকারণে আইন প্রণয়ন করিবার এই সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পার্লামেণ্ট কর্তৃক হস্তান্তরিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া যে সমস্ত আইন-কানুন প্রবর্তিত করেন, সেইগুলিকে সাধারণতঃ অর্পিত ক্ষমতাবলে আমলাতন্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত আইন বলা হয়।

বর্তমান সময়ে পার্লামেণ্ট সভার কার্যভার এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট-সভার সর্ববিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার পর্যাপ্ত সময় নাই। ইহা ব্যতীত পার্লামেণ্ট সভা যে আইনগুলি প্রণয়ন করে, সেগুলি শুধু কতকগুলি

সাধারণ নীতি স্থির করিয়া দেয়। আইনের বিস্তারিত বিবরণগুলি উহ্য থাকে। কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কালে আইনগুলির বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন হয়। এই বিস্তারিত বিবরণ-সম্পর্কিত নিয়ম-কানুনগুলি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সাধারণতঃ মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন অনুসারে পার্লামেণ্ট কর্তৃক রচিত আইনের সহিত নূতন নিয়ম-কানুন সন্নিবেশিত করিয়া আইনটিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উপযোগী করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গ্রেট বৃটেনে শাসনকর্তৃপক্ষ অর্পিত ক্ষমতার বলে দুই প্রকারে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। প্রথমতঃ, শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করিবার জন্য ইঁহারা অনেক নূতন নিয়মাবলী প্রবর্তিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট যে-সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দেয় সেই আইনগুলিকে শাসনকর্তৃপক্ষ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নিয়ম-কানুন দ্বারা প্রয়োগোপযোগী করিয়া তুলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রেট বৃটেনে শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারী হইলেন মন্ত্রিপরিষদ। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ স্বল্পকালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। দলীয় কর্তৃত্বের অবসানের সঙ্গে তাঁহাদেরও কার্যকালের সমাপ্তি হয়। মন্ত্রিগণ শাসন-সংক্রান্ত-নীতি ও কার্যক্রম স্থির করেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতিকে কার্যকরী করিবার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা তাঁহাদের থাকে না। এজন্য মন্ত্রিগণকে স্থায়ী আমলাতন্ত্রের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। আমলাতন্ত্রের এই স্থায়ী কর্মচারিগণ শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রিগণ অপেক্ষা অনেক বেশী অভিজ্ঞ ও কর্মকুশল। সুতরাং কি নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে শাসনকর্তৃপক্ষ এই স্থায়ী কর্মচারিগণের সহায়তা ব্যতীত তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না। সুতরাং অর্পিত ক্ষমতার বলে মন্ত্রিগণ যে আইন প্রণয়ন করেন, কার্যতঃ সে আইনগুলি আমলাতন্ত্রের দ্বারাই রচিত হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ-প্রবর্তিত প্রত্যেকটি আইন ও প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমলাতন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। অথচ এজন্য আমলাতন্ত্র দায়ী নয়। শাসনকর্তৃপক্ষকেই এই সমস্ত আইন ও নির্দেশের সমস্ত দায়িত্ব বহন করিতে হয়। সুতরাং অর্পিত ক্ষমতার বলে মন্ত্রিগণের উপর আইন-প্রণয়নের যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরোক্ষভাবে এই আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। আমলাতন্ত্রের

ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। এইজন্য গ্রেট বৃটেনের জনমত অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসনকর্তৃপক্ষের এই আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

উপরি উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা-প্রয়োগের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, একাধিক কারণে শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে এই ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিবার মত পর্যাপ্ত সময় পার্লামেণ্ট সভার নাই। ইহা ছাড়া, সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্পর্কেও পার্লামেণ্টের আদৌ কোন অভিজ্ঞতা নাই। জরুরী অবস্থায় বিশেষ করিয়া যুদ্ধকালে শাসনকার্যে যাহাতে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, সেজন্য শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অর্পিত ক্ষমতার বলে শাসনকর্তৃপক্ষ যে সমস্ত নির্দেশনামা বলবৎ করেন, সেইগুলি পার্লামেণ্ট সভা ইচ্ছা করিলে রদ করিতে পারে। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইল পার্লামেণ্ট সভা।

মন্ত্রিগণের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা পর্যালোচনা করিবার জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। কমিটি মন্ত্রিগণের এই আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া বলেন যে, মন্ত্রিগণ-প্রদত্ত নির্দেশগুলি কার্যকরী করিবার পূর্বে কমন্স সভা কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে। এই নির্দেশগুলির মধ্যে যদি আপত্তিকর কোন অংশ থাকে তাহা হইলে তাহা কমন্স সভার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এক নূতন আইন দ্বারা শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত নির্দেশগুলি পার্লামেণ্টের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের জন্য চল্লিশ দিন সময় নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন প্রণয়ন-ক্ষমতাকে গণতন্ত্র-বিরোধী আখ্যা দিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বিচারবিভাগ (The Judiciary)

গ্রেট বৃটেনে বিচারালয়গুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়: ফৌজদারী আদালত, দেওয়ানী আদালত ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশগুলি

হইতে আনীত আপীল মামলা বিচার করিবার আদালত। ফৌজদারী মামলার বিচার করিবার জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল একতরফা আদালত (Court of Summary Jurisdiction)। ইহার উপরে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। এই বিচারালয়গুলি ছোট ছোট অপরাধের বিচার করে। ইহার পরবর্তী উচ্চ বিচারালয় হইল ত্রৈমাসিক আদালত (Quarter Sessions)। এই আদালত জুরীর সাহায্যে অপেক্ষাকৃত গুরুতর মামলার বিচার করে ও নিম্ন আদালত হইতে আনীত আপীলের বিচার করে। গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত (Assizes) বসে। প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এই আদালতের কার্য পরিচালনা করেন। এখানেও জুরীর সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। ফৌজদারী মামলার আপীলের জন্য সর্বোচ্চ বিচারালয় হইল ফৌজদারী আপীল আদালত (Court of Criminal Appeal)। ইংলণ্ডের লর্ড চীফ্ জাষ্টিস্ ও উচ্চ বিচারালয়ের রাজার বিচারবিভাগের (King's Bench Division) একাধিক বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হয়। লর্ড সভায় সাধারণতঃ কোন আপীল করা যায় না। তবে কোন জটিল আইন-সম্পর্কিত প্রশ্ন উঠিলে এ্যাটর্নি জেনারেলের সম্মতি লইয়া লর্ড সভায় আপীল করা যাইতে পারে।

দেওয়ানী মামলার বিচার করিবার সর্বনিম্ন আদালত হইল একতরফা বিচারালয় (Court of Summary Jurisdiction)। ইহার পরবর্তী উচ্চ বিচারালয় (The High Court of Justice)। এই বিচারালয় বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচার করে ও নিম্ন আদালত কর্তৃক আনীত আপীলের বিচার করে। এই আদালতের তিনটি বিভাগ আছে, যথা—রাজার বিচার বিভাগ (King's Bench Division), চান্সারী বিভাগ (Chancery Division) এবং উইল, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং নৌবিভাগ-সংক্রান্ত বিচার বিভাগ (Will Divorce and Admiralty Division)। উচ্চ বিচারালয় হইতে আপীল আদালতে (Court of Appeal) আপীল করা যায়। ফৌজদারী মামলার মত দেওয়ানী মামলারও জটিল আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নে লর্ড সভার নিকট আপীল করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, লর্ড সভায়

সমুদয় সদস্যই বিচারকের কার্য করেন না। নয় জন আইনবিশারদ্ লর্ড দ্বারা বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের বিচারবিভাগের আর একটি প্রতিষ্ঠান হইল প্রিভি কাউন্সিলের বিচার কমিটি। এখানে ভারত ও স্বাধীন আয়ার প্রভৃতি দেশ ব্যতীত কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশ হইতে আনীত আপীলের শুনানী হইত।

ইংলণ্ডের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Peculiarities of the English Judicial System)

ইংলণ্ডের বিচারবিভাগের পর্যালোচনা করিলে প্রথমতঃ ইহার স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঊর্ধ্বতন বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। বিচারপতিগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের রাজসকাশে যুক্ত আবেদন ব্যতীত তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। সুতরাং তাঁহারা যতদিন পর্যন্ত সদাচারী থাকেন ততদিন পর্যন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কর্তৃত্বমুক্ত থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। তাঁহাদের নির্ধারিত বেতন পার্লামেণ্ট সভার বার্ষিক অনুমোদন-সাপেক্ষ নয় বা পার্লামেণ্ট সভা তাঁহাদের বিচারকার্যের কোনরূপ সমালোচনাও করিতে পারে না।

ইংলণ্ডের বিচারকগণের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক সমালোচক বলেন যে, প্রতিষ্ঠিত বিচারব্যবস্থার মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি না থাকিলেও ইংলণ্ডের বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফলে বিচারবিভাগ অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের বিচারকমণ্ডলী সাধারণতঃ অভিজাত শ্রেণী হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই অভিজাত শ্রেণী প্রায়শঃ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়া শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল সূত্রগুলি তাঁহাদের কর্মজীবনে এরূপ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে যে, তাঁহাদের পক্ষে এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। তাই বিচারকগণের পক্ষে সার্বজনীন ভিত্তিতে

আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের বিচারালয়গুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়গুলির মত পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারে না। ইংলণ্ডে শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, পার্লামেণ্ট সভার সার্বভৌমত্ব। বিচারালয়গুলি আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু কোনক্রমে আইনগুলির বৈধতাসম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বিচারালয়গুলি পার্লামেণ্ট সভার অধীন।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের বিচারবিভাগে ফরাসী দেশের অনুরূপ কোন স্থায়ী শাসনবিভাগীয় বিচারালয় (Administrative Court) নাই। আইনের অনুশাসন শাসনতন্ত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনের প্রাধান্যের জন্য আইনের চক্ষে সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী সমপর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থতঃ, গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি ও বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়।

বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি—
(Principle of Mutual Check and Balance in the British Constitution)

বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-বিভাজন নীতির সূক্ষ্ম প্রয়োগ দেখা যায় না। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতার একত্রীকরণ দৃষ্ট হয়, যেমন, লর্ড চ্যান্সেলর একাধারে আইনসভার (লর্ড সভার) সদস্য, কেবিনেটের (শাসনবিভাগ) সদস্য ও ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ বিচারালয় লর্ড সভার সদস্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ দৃষ্ট না হইলেও বৃটিশ শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির প্রয়োগ দেখা যায় এবং এই পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে অন্তর্বিভাগীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে সরকারী প্রত্যেকটি বিভাগের সহিত অপর বিভাগের নির্ভরশীলতাসূচক সহযোগিতা রহিয়াছে, যথা, (১) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ আইন প্রণয়ন করে; কিন্তু রাজার সম্মতি ব্যতীত এই আইন বলবৎ করা যায় না। (২) মন্ত্রিসভা ইহার কার্যের জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী।

পার্লামেন্ট সভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া অথবা অন্য নানাভাবে মন্ত্রিসভাকে বিতাড়িত করিতে পারে। (৩) পার্লামেন্ট সভা মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে সত্য, কিন্তু মন্ত্রিসভাও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজার সম্মতি লইয়া পার্লামেন্ট সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। (৪) মন্ত্রিগণ স্থায়ী কর্মচারিগণকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু মন্ত্রিগণকেও বিশেষ কাজের জন্য এই কর্মচারিগণের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয়। (৫) বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহারা শাসনকর্তৃপক্ষের অবৈধ কাজের সমালোচনা ও বাধা সৃষ্টি করিতে পারেন। একবার বিচারপতি নিযুক্ত হইলে তাঁহারা যতদিন সদাচারী থাকেন, ততদিন শাসনকর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারেন না।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা (Local Government)

স্থানীয় স্বার্থসম্পর্কিত ব্যাপারগুলি স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা যখন পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ইংলণ্ডে স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান আছে। পার্লামেন্ট সভা নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে এই শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকটা স্বাধীনভাবে তাহাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে।

স্থানীয় শাসন পরিচালনা করিবার নিমিত্ত সমগ্র ইংলণ্ড ও ওয়েলস্‌কে তিরাশীটি কাউন্টি বরো (County Borough) এবং বাষট্টিটি শাসন কাউন্টিতে (Administrative County) বিভক্ত করা হইয়াছে। কাউন্টিগুলি আবার বহুসংখ্যক জিলা (Districts) লইয়া গঠিত হয়। জিলাগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) শহরাঞ্চল জিলা (Urban Districts) ও (২) গ্রামাঞ্চল জিলা (Rural Districts)। অনেকগুলি গ্রাম (Parish) লইয়া এই জিলাগুলি গঠিত হয়।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠিত একটি সভা (Council) আছে। একুশ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক স্থানীয় অধিবাসীর ভোটদান-ক্ষমতা আছে। কাউন্টি ও বরোগুলিতে নির্বাচিত সদস্যগণ অল্ডারম্যান নিযুক্ত করিয়া থাকেন। সভার সাধারণ সদস্য ও অল্ডারম্যান যুক্তভাবে একজন মেয়র নির্বাচিত করেন। মেয়র বেতন পাইয়া

থাকেন, কিন্তু তিনি বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী নহেন। স্থানীয় সভাগুলি কতকগুলি কমিটি গঠন করিয়া কমিটির মাধ্যমে বহু কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কার্য হইল স্থানীয় অধিবাসীদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ, জল ও আলোক সরবরাহ, অগ্নিনির্বাণ, গ্রাম ও শহর পরিকল্পনা করা প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর কার্য ইহাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ ও বে-সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করিবার ভার এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা, পুস্তকালয়, যাদুঘর, শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রসূতি আগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করে।

স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির যে ব্যয় হয় তাহা স্থানীয় কর, ব্যবসায় হইতে আয়, ঋণগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা সংকুলান করা হয়।

লণ্ডন শহরের জন্য বিশেষ শাসনব্যবস্থা আছে। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে লণ্ডনকে তিনটি অংশে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, (১) লণ্ডন শহর (City of London), (২) কাউন্টি লণ্ডন (County of London) এবং (৩) বৃহত্তর লণ্ডন (Metropolitan London)। লণ্ডন শহরের আয়তন মাত্র এক বর্গমাইল। এখানে একটি কর্পোরেশন আছে। কর্পোরেশনের কাজ একজন লর্ড মেয়র ও তিনটি কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়।

কাউন্টি লণ্ডনের কাজ ১২৪ জন নির্বাচিত কাউন্সিলর ও ২০ জন অল্ডারম্যান লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের দ্বারা পরিচালিত হয়। কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণ মিলিয়া এক বৎসরের জন্য একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন। কাউন্টি লণ্ডন আবার ২৮টি পল্লীতে (Borough) বিভক্ত এবং প্রত্যেক পল্লীর কাজের জন্য একজন নির্বাচিত মেয়র এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যান আছেন।

বৃহত্তর লণ্ডন হইল পুলিশ শাসনের একটি বিভাগ। কাউন্টি লণ্ডন ছাড়াও অন্যান্য কাউন্টির অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। আয়তনে ইহা প্রায় সাত শত বর্গমাইল। রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন পুলিশ কমিশনার তিনজন সহকারী কমিশনারের সাহায্যে কার্য পরিচালনা করেন।

রাজনৈতিক দল (Political Parties)

এক গ্রেট বৃটেন ব্যতীত অন্য কোন দেশে রাজনৈতিক দলের প্রভাব গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য এতটা সহায়ক হয় নাই। বহু পূর্ব হইতেই দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ছিল।

ইংলণ্ডে বহুদিন পূর্ব হইতেই দুইটি দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। অবশ্য পূর্বের এই দলগুলিকে রাজনৈতিক দল আখ্যা না দিয়া বিবদমান স্বার্থান্বেষী কুচক্রী দল বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। Lancastrians ও Yorkists, White Roses ও Red Roses, Cavaliers ও Roundheads এই জাতীয় দল ছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'গৌরবময় বিপ্লবের' পরবর্তী কালে ইংলণ্ডে Whigs এবং Tories নামক দুইটি সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান ঘটে। কালক্রমে এই দুইটি দল নাম পরিবর্তন করিয়া রক্ষণশীল (Conservatives) ও উদারনৈতিক (Liberals) দলে পরিণত হয়। রক্ষণশীল দলটি উহার পূর্ববর্তী Tory দলের স্থান গ্রহণ করিয়া চলতি অবস্থা সংরক্ষণের পক্ষপাতী হইল। উদারনৈতিক দলটি Whig মতবাদ গ্রহণ করিয়া প্রগতিমূলক সংস্কার দাবী করিল। উনিশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা দাবী করিয়া একটি আইরিশ জাতীয় দল গঠিত হয়, কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অর্জনের পরে এই দল বিলুপ্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের অভ্যুত্থানে ইংলণ্ডের অতি প্রাচীন দ্বি-দলীয় ঐতিহ্যে ছেদ পড়ে। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রমিকদল উহার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয় এবং নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করে। ইংলণ্ডে বর্তমানে তিনটি—রক্ষণশীল, উদারনৈতিক ও শ্রমিক দল থাকিলেও কার্যতঃ দুইটি দল (রক্ষণশীল ও শ্রমিক) প্রবল। উদারনৈতিক দলটি বর্তমানে বিশেষ দুর্বল হইয়াছে বলিয়া জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের উপর এই দলের আর বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই। পার্লামেন্ট সভায় এই দল সাধারণতঃ রক্ষণশীল দলকে সমর্থন করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির বৈশিষ্ট্য (Features of English Political Parties)

ইংলণ্ডে দলীয় ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক—যে-কোন কারণে হউক না কেন, এই দলগুলির মধ্যে যে মতানৈক্য থাকে তাহা শুধু শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। জাতীয় জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রে এই মতানৈক্যের ফলে দলগুলির মধ্যে বিরোধ হয় না। এই কারণেই কোন জরুরী অবস্থায় দলগুলি তাহাদের মতানৈক্য বিসর্জন দিয়া সর্বদলীয় সরকার গঠন সাহায্যে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, এই দলগুলি সরকার হইতে অবিচ্ছেদ্য। সরকার হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিমাত্র এবং এই প্রতিনিধির মাধ্যমেই দলের নীতি রূপায়িত হয়।

চতুর্থতঃ, ইংলণ্ডের দলীয় সংগঠনগুলির কার্যক্রম নির্দিষ্ট আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই কারণে দলগুলি সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। নির্ধারিত দলীয় নীতির প্রতি আনুগত্য প্রত্যেক সদস্যই পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে ক্ষমতায় আসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সহযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন দেশে তাহা নাই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে বিরোধী দলের নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পার্লামেন্টের কার্যসূচীও বিরোধী দলের নেতার সম্মতিতে প্রস্তুত হয়। বিরোধী দলের নেতা শাসন পরিচালনা কার্যের এরূপ অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হন যে, বর্তমানে তিনি সরকারের বেতনভুক্ পদস্থ কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হন।

পঞ্চমতঃ, গ্রেট বৃটেনে দলীয় সংগঠনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Two or Bi-Party System)। নির্বাচন প্রতিযোগিতা সাধারণতঃ দুইটি প্রধান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমানে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দলের মধ্যে ঘটে এবং তৃতীয় দল (উদারনৈতিক দল) ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে নামমাত্র নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় এবং এই দলের যে স্বল্প সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হন, তাঁহারা রক্ষণশীল দলকেই সাধারণতঃ সমর্থন করেন।

ষষ্ঠতঃ, বৃটেনে দুইটি মাত্র দল থাকিবার ফলে দলীয় শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা এরূপ কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় যে ব্যক্তিগতভাবে দলের কোন সদস্যই দলীয় নেতৃত্বের বিরোধিতা করিতে পারে না। কারণ দলীয় নির্দেশ ও দলীয়

শৃংখলা না মানিলে দল হইতে বহিষ্কার অবশ্যম্ভাবী। ইহার ফলে একদিকে যেরূপ দলের ব্যক্তিগত সদস্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অপরদিকে তদ্রূপ দলীয় নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দলীয় সংগঠন—Party Organisation

রাজনৈতিক দলগুলি সুসংবদ্ধ না হইলে জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। এইজন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দল আইনসভার অভ্যন্তরে ও বাহিরে দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট হয়। ইংলণ্ডে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের যে-সমস্ত সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন তাঁহারা তাঁহাদের নির্বাচিত নেতার নির্দেশে পরিচালিত হন। আইনসভায় প্রত্যেক দলের নির্বাচিত হুইপ থাকেন। তাঁহারা দলীয় কার্যনির্বাহ ব্যাপারে দলের নেতাকে সাহায্য করেন।

পার্লামেন্ট সভার বাহিরেও প্রত্যেক দলের নিজস্ব স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠন আছে। প্রত্যেক দলের একটি করিয়া কেন্দ্রীয় দপ্তরখানা আছে। এই দপ্তরখানাই দলের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় উদারনৈতিক যুক্ত সংগঠন (The National Liberal Federation) উদারনৈতিক দলের নেতাকে কেন্দ্র করিয়া দলীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রমিক দলের সর্বোচ্চ সংগঠন হইল জাতীয় কার্যকরী সংস্থা (The National Executive Committee)। শ্রমিক দলের প্রতি বৎসরই প্রতিনিধিমূলক একটি বার্ষিক সম্মেলন হয় এবং এই সম্মেলনে দলের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রক্ষণশীল দলের কেন্দ্রীয় সংস্থা হইল রক্ষণশীল দলের জাতীয় যুক্তসংঘ ও ইউনিয়নিষ্ট সংঘ (The National Union of Conservatives and Unionist Association)। প্রার্থী-মনোনয়ন, প্রচারকার্য ও নির্বাচন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা হইল এই সংগঠনগুলির প্রধান কর্তব্য। প্রত্যেক দলের একজন নেতা নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং নির্বাচিত নেতাকে কেন্দ্র করিয়া দলীয় কর্মসূচী নির্ধারিত হয়।

রক্ষণশীল দল—Conservative Party

রক্ষণশীল দল বৃটেনের প্রাচীন টোরিদলের উত্তরাধিকারী। ইহারা প্রাচীন ঐতিহ্য ও নজিরে আস্থাবান হইলেও সর্বক্ষেত্রে প্রগতির পক্ষপাতী।

এই দল রাজতন্ত্র, জাতীয় সংহতি, শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠী, রাষ্ট্র প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট। বৃটিশ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের বলে অনগ্রসর জাতিগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার স্বাভাবিক অধিকার বৃটিশ জাতির আছে বলিয়া ইহাদের ধারণা। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এই দল বৃটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের প্রাধান্য বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দল ধনতান্ত্রিকতা সমর্থন করে এবং এই কারণে এই দল ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট। বর্তমানে রক্ষণশীল দলের মধ্যে কিছু সংখ্যক বয়ঃকনিষ্ঠ সদস্য প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন হইয়া শ্রমিক দলের ন্যায় সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে পক্ষপাতী হইয়াছেন। এই উপদল পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, পূর্ণ কর্ম-সংস্থান ও অন্যান্য সমাজ সেবামূলক কার্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

বড় বড় জমিদার, মহাজন, ধর্মযাজক প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া রক্ষণশীল দল গঠিত। বর্তমানে কিছু সংখ্যক শ্রমিকও এই দলে যোগদান করিয়াছে। রক্ষণশীল দলের প্রাণকেন্দ্র হইল এই দলের নেতা। তিনি অন্যান্য দলের নেতা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী। একবার নেতা নির্বাচিত হইলে তিনি আ-মৃত্যু বা অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

শ্রমিক দল—Labour Party

বৃটেনে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শ্রমিক দলই হইল সর্বকনিষ্ঠ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই দল গঠিত হয় এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল বৃটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বলিয়া পরিচিত হয়। এই দল প্রধানতঃ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের ধারক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের যে ব্যবধান তাহা দূর করিবার দাবি করে। এই দল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রবর্তনের সহিত অর্থনৈতিক গণতন্ত্র যুক্ত করিবার প্রয়াসী। ইহাদের মতে সমস্ত নৈসর্গিক সম্পদ ও মূল শিল্পগুলি রাষ্ট্র পরিচালনাধীন হইবে ও অবশিষ্ট উৎপাদনের উপায়গুলিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হইবে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে এই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। শ্রমিকদল ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করিবার পক্ষপাতী।

শ্রমিক দল যদিও সাম্যনীতির সক্রিয় সমর্থক তথাপি এইদল মার্কসীয় সাম্যবাদ নীতি অনুসরণকারী নহে। এই দল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নীতিতে আস্থাহীন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যথাশীঘ্র সম্ভব স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হইল এই দলের নীতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে শক্তিশালী করিয়া এই সংগঠনের মাধ্যমে সমবেতভাবে নিরাপত্তা রক্ষা করা হইল এই দলের আন্তর্জাতিক নীতি।

প্রধানতঃ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক লইয়া এই দল গঠিত। এই কারণে সমবায় সমিতিগুলি ও শহরাঞ্চলের শ্রমিক সংঘগুলির প্রাধান্য এই দলে পরিলক্ষিত হয় এবং এই দলের অধিকাংশ অর্থ শ্রমিক সংঘগুলি হইতে সংগৃহীত হয়।

উদারনৈতিক দল—Liberal Party

অতীতে উদারনৈতিক দল জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্তমানে আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলে এই দলটি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ও জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের উপর এই দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। পার্লামেন্ট সভায় এই দল সাধারণতঃ রক্ষণশীল দলকে সমর্থন করিয়া থাকে। জাতীয়করণ নীতির পরিবর্তে এই দল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সমর্থন করে।

সাম্যবাদী দল—Communist Party

গ্রেট বৃটেনের রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে বর্তমানে সাম্যবাদী দলের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে সাম্যবাদী দলের কোন সদস্যই পার্লামেন্ট সভায় নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই দল শ্রমিক দলের সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে শ্রমিক দল সাম্যবাদী দলের সহিত একযোগে কার্য করিতে অসম্মত হওয়ার ফলে ইহাদের প্রভাব হ্রাস পায়।

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি—Nature of the British Constitution

অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্র হইতে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল, এই শাসনতন্ত্রের অখণ্ড ধারাবাহিকতা ও ইহার সহজ পরিবর্তনশীলতা। জাতীয় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই শাসনতন্ত্র পুষ্টিলাভ করিলেও অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসূত্র বৃটিশ জাতি কোনদিনই একেবারে ছিন্ন হইতে দেয় নাই। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই বর্তমানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অতীত যুগের প্রতিষ্ঠান ও শাসনতান্ত্রিক রীতি-নীতিগুলির পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই শাসনতন্ত্রকে পৃথিবীর প্রাচীনতম শাসনতন্ত্র বলা যাইতে পারে। এই শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত হইলেও সুপ্রতিষ্ঠিত আইনের অনুশাসন (Rule of Law) নীতির সাহায্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বাধিক পরিমাণে রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা থাকার ফলে এই শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্যপ রিচালনায় কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে না। সর্বোপরি এই শাসনতন্ত্রে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র—অতীত, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। বৃটেনের শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় হইলেন রাজা। রাজার যথেষ্ট ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা থাকিলেও তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে কোন ক্ষমতাই পরিচালনা করিতে পারেন না। রাজা বর্তমানে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। সুতরাং বৃটেনে রাজতন্ত্রের অবস্থিতি গণতন্ত্র প্রসারের পরিপন্থী না হইয়া বরং ইহার সহায়ক হইয়াছে। ক্ষমতাবিহীন হইলেও রাজা জাতীয় জীবনের সকল উচ্চ আদর্শের প্রতীক এবং বৃটেন ও অন্যান্য সাধারণতন্ত্র রাজ্যসমূহের ঐক্যের প্রতীক বলিয়া বিবেচিত হন। বৃটেনের লর্ড সভা হইল অভিজাততন্ত্রের নিদর্শন। অন্যান্য দেশের অভিজাততন্ত্রের সহিত বৃটেনের অভিজাততন্ত্রের প্রধান পার্থক্য হইল যে, এই অভিজাততন্ত্র শুধুমাত্র বংশানুক্রমিক স্থায়ী অভিজাততন্ত্র নহে—পরন্তু অভিজাততন্ত্র ও জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রহিয়াছে। কোন লর্ডের একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই লর্ড হইয়া থাকেন, অন্যান্য সন্তানগণ সাধারণ শ্রেণীভুক্ত থাকেন. আবার প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে রাজা জনসাধারণের মধ্য হইতে গুণানুসারে লর্ড

সৃষ্টি করেন। সুতরাং বৃটেনের অভিজাত শ্রেণী একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নহে। ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ১৯১১ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন ও ইহার সংশোধন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা বহুল পরিমাণে সংকুচিত হইয়াছে। সুতরাং অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বৃটেনে গণতন্ত্রের প্রসার বাধা পায় নাই। জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমন্স সভাই হইল বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতীক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান উৎস। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলিলে বর্তমানে কমন্স সভার প্রাধান্য সূচিত হয় এবং কমন্স সভার মধ্য দিয়াই গণতান্ত্রিক আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রের কাঠামো রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক—এই তিনটি আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও গণতান্ত্রিক আদর্শই প্রকৃত কার্যকরী শক্তি হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে।

বর্তমানে অবশ্য কেবিনেট সভার ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে কমন্স সভার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। গণতান্ত্রিক শক্তি ধীরে ধীরে মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ত হইয়া গণতন্ত্র অভিজাততন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু বৃটেনের জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা এতই প্রবল যে, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না। অন্যায়ভাবে ইজিপ্ট আক্রমণ করিবার ফলে জনমতের চাপে এমন কি জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনী ইডেনকেও পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের উৎস—শাসনতন্ত্রের উৎস হইল—(১) শাসনতান্ত্রিক আইন ও (২) প্রথাগত বিধান, (৩) কতকগুলি ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র, (৪) পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন, (৫) বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত এবং (৬) প্রথাগত আইন। এই আইনগুলি আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায়। প্রথাগত বিধানগুলি পার্লামেন্ট-নিরপেক্ষভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিধানগুলি রাজা, মন্ত্রিসভা ও সমুদয়

রাজকর্মচারীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু এই বিধানগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় না। তিন শ্রেণীর প্রথাগত বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) রাজা ও মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত, (২) পার্লামেন্ট সভার কার্যপদ্ধতি-সম্পর্কিত এবং (৩) গ্রেট বৃটেনের সহিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলি-সম্পর্কিত।

প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিবার প্রধান কারণ হইল জনমতের প্রভাব, আইন ভঙ্গ করিবার ভয় নহে।

আইন ও প্রথাগত বিধান—(১) আইনসভা কর্তৃক আইন রচিত হয়, প্রথাগত বিধান আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে ধীরে ধীরে গঠিত হয়। (২) বিচারালয় আইন বলবৎ করিতে পারে, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না।

প্রথাগত আইন ও প্রথাগত বিধান উভয়েই আইনসভা-নিরপেক্ষভাবে বর্ধিত হইলেও প্রথাগত আইন বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করা যায়, কিন্তু প্রথাগত বিধানগুলি বলবৎ করা যায় না।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—১। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। ক্ষমতার কোনরূপ ভাগ হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস। ২। অ-লিখিত ও সহজে পরিবর্তনশীল। মহাসনদ প্রভৃতি কিছু লিখিত অংশ থাকিলেও এই শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত এবং পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতেই ইহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। ৩। পার্লামেন্ট সভার প্রাধান্য। এই প্রাধান্যের বলে পার্লামেন্ট সভা সর্বপ্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে ও বাতিল করিতে পারে। কোন বিচারালয়ই পার্লামেন্টের আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারে না। ৪। ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি এই শাসনতন্ত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। ৫। আইনের অনুশাসন এই শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান ও বিনা বিচারে কাহাকেও বন্দী রাখা যায় না। ৬। আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয় বলিয়া এই ব্যবস্থাকে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা বলা হয়। ৭। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ৮। শাসনতন্ত্রের অবাস্তবতা অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক

নীতি ও কার্যক্ষেত্রে এই নীতিগুলি প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ৯। অখণ্ড ধারাবাহিকতা অর্থাৎ অতীত শাসনব্যবস্থার সহিত বর্তমান শাসনব্যবস্থার যোগসূত্র কার্যতঃ কোন দিনই ছিন্ন হয় নাই। ১০। দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা।

রাজা ও রাজতন্ত্র—বৃটিশ শাসনতন্ত্রে রাজা ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য হইল একটি লক্ষণীয় বিষয়। রাজা হইলেন ব্যক্তিবিশেষ, আর রাজতন্ত্র হইল প্রতিষ্ঠানবিশেষ। রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতা কালক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া রাজতন্ত্রে আরোপিত হইয়াছে। বর্তমানে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট সভার সদস্যগণের সম্মতিক্রমে কেবিনেট সদস্যগণ এই প্রতিষ্ঠানগত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ রাজার মৃত্যু হইলেও প্রতিষ্ঠানগত রাজার মৃত্যু নাই। রাজার ক্ষমতা জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা অব্যাহতভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজা স্ব-ইচ্ছায় কোন কার্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার নামে মন্ত্রিগণ যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন তজ্জন্য রাজাকে কোন মতে দায়ী করা যায় না। রাজা নিজে কোন অন্যায় কার্য করিতে পারেন না বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায় কার্যে প্ররোচিত করিতে পারেন না। কারণ, কোন ব্যক্তি অন্যায় কার্য করিয়া রাজার নির্দেশ বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

রাজার ক্ষমতা—রাজার শাসন-সংক্রান্ত, আইন প্রণয়ন বিষয়ক, বিচারবিভাগীয় এবং অন্য বহুবিধ ক্ষমতা আছে। তিনি সরকারী উচ্চপদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগ করেন, আইন-প্রণয়নে তাঁহার সম্মতি অপরিহার্য। তিনিই সমাজের কর্ণধার। কিন্তু বর্তমানে কার্যতঃ তিনি কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে পারেন না। মন্ত্রিগণ কর্তৃক রাজার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার কারণ—১। গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের রক্ষণশীল প্রকৃতি। ২। রাজার পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ফরাসী দেশের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ নির্বাচিত কোন রাষ্ট্রপতি গ্রেট বৃটেনের গণতান্ত্রিক আদর্শ অব্যাহত রাখিতে অসমর্থ। ৩। রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তি শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে। ৪। রাজা মন্ত্রিপরিষদকে কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন, নিষেধ করিতে

পারেন ও পরামর্শ দান করিতে পারেন। ৫। রাজা হইলেন সমগ্র কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের প্রতীক। রাজার অভাবে এই ঐক্য বিনষ্ট হইতে পারে।

শাসনকর্তৃপক্ষ—কেবিনেট ঃ পূর্বে রাজার মন্ত্রণাসভা প্রিভি কাউন্সিল বৃহদায়তনবিশিষ্ট হইয়া উঠিলে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সদস্যের সহিত পরামর্শ করিতেন। কালক্রমে এই ক্ষুদ্র মন্ত্রণাসভা কেবিনেটে পরিণত হইল। প্রথম জর্জের রাজত্বকালে রাজা এই মন্ত্রণাসভায় যোগদানে বিরত হইলেন। কাজেই সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সভার কার্য পরিচালনা করিতেন। কেবিনেটের এই সভাপতিই প্রধানমন্ত্রী নামে পরিচিত হইলেন। এই সময়ে কেবিনেটের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার নিজ দল হইতেই কেবিনেট সভার সদস্য মনোনীত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁহারা পার্লামেন্ট সভার আস্থাভাজন থাকিতেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা মন্ত্রিত্ব করিতেন।

কেবিনেটের সংগঠন, বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ—নূতন নির্বাচনের পর রাজা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে কেবিনেট গঠন করিতে আহ্বান করেন। নেতা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন ও তাঁহার মনোনীত সদস্যগণ রাজা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে কেবিনেট সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ১। কেবিনেট সভার সদস্যগণ একমতাবলম্বী একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ২। সদস্যগণের পক্ষে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক ও তাঁহারা যৌথভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। ৩। সদস্যগণের মধ্যে ঐকমত্য ও সংহতি একান্ত আবশ্যক। ৪। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই ঐকমত্য ও সংহতি বজায় থাকে। ৫। কেবিনেট সভার কার্যসূচীর গোপনীয়তা রক্ষা করা ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য। ৬। রাজার অনুপস্থিতি কেবিনেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য। কেবিনেট সভার প্রধান কার্য—(১) শাসননীতি নির্ধারণ করা। (২) পার্লামেন্ট-সমর্থিত নীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। (৩) বিভিন্ন বিভাগগুলির কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করা। (৪) আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা ও পার্লামেন্টের সমর্থনে প্রস্তাবগুলিকে আইনে পরিণত করা। (৫) আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা।

কেবিনেটের সহিত (১) রাজা ও (২) পার্লামেন্ট সভার সম্পর্ক—নীতিগতভাবে রাজার মন্ত্রণাসভা ও রাজাকে মন্ত্রণা দান করাই কেবিনেটের প্রধান কর্তব্য এবং এজন্য কেবিনেট সমবেতভাবে রাজার নিকট ইহাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী। বর্তমানে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে রাজার নিকট কেবিনেটের এই দায়িত্ব নামমাত্র দায়িত্বে পরিণত হইয়াছে। মন্ত্রিগণই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের মুখপাত্র হিসাবে রাজাকে শাসনপরিচালনা সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ জ্ঞাত করান, কিন্তু রাজার পরামর্শ কেবিনেট গ্রহণ না করিতেও পারে।

কেবিনেটে কার্যতঃ পার্লামেন্ট সভার নিকট ইহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী। পূর্বে পার্লামেন্ট সভার অনাস্থা প্রস্তাবে বহু কেবিনেট ক্ষমতা-চ্যুত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে কেবিনেট সভাই অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। পার্লামেন্টের সহিত মতভেদ হইলে কেবিনেট কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। সুতরাং কেবিনেট এখন প্রত্যক্ষ-ভাবে ভোটদাতৃগণের নিকট দায়ী। কেবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে পার্লামেন্ট সভার ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। পার্লামেন্ট সভা বর্তমানে শুধু কেবিনেট-নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমে সমর্থন জ্ঞাপন করে। কেবিনেটের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ হইল: (১) কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা, (২) সার্বজনীন ভোটাধিকার-প্রবর্তনের ফলে ইংলণ্ডের ভোটদাতার সংখ্যার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। সুতরাং দলের সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য ব্যতীত কোন প্রার্থীর পক্ষে স্বাধীনভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব। (৩) সদস্যগণ বেতন পাইয়া থাকেন সুতরাং কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিলে তাঁহারা এই বেতন হইতে বঞ্চিত হইবেন। (৪) প্রতিপত্তিশালী দলীয় নেতাকর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন সদস্য বিরোধিতা করিতে ইচ্ছুক নন। উল্লিখিত কারণগুলির সমবায়ে বর্তমানে পার্লামেন্ট সভার ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভার নির্বাচিত সদস্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁহার নেতৃত্বে কেবিনেট গঠিত হয়। তিনি কেবিনেট সভার সভাপতি ও অন্যান্য কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার সমপর্যায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া

লইয়া থাকেন। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে নিজে পদত্যাগ করিয়া সমগ্র কেবিনেটের পতন ঘটাইতে পারেন ও তৎপরে রাজার অনুরোধক্রমে তাঁহার ইচ্ছামত কেবিনেট সভার সদস্যদের রদবদল করিতে পারেন। সমগ্র কেবিনেট সভার প্রতিনিধিরূপে তিনি শাসনকার্যে রাজাকে পরামর্শ দান করেন। পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারূপে তিনি কেবিনেট-অনুসৃত নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ রচিত হয়, আয়-ব্যয়-বরাদ্দগুলি নির্ধারিত হয় এবং পার্লামেণ্ট সভার যাবতীয় কার্য পরিচালিত হয়। বাহিরের জনমতের উপর তাঁহাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। জনমতকে স্বীয় দলীয় মতের অনুবর্তী করিতে না পারিলে তাঁহার নেতৃত্বের অবসান অনিবার্য। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতার উপরেই রাষ্ট্র-পরিচালনা-কার্যের সাফল্য নির্ভর করে।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ—শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত বৃটেনে দুই শ্রেণীর শাসক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—অস্থায়ী ও স্থায়ী শাসক। মন্ত্রি-পরিষদ মাত্র একটি নির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারের মূলনীতিগুলি তাঁহারা নির্ধারিত করেন। এজন্য তাঁহারা পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী থাকেন। শাসন-সংক্রান্ত-নীতিগুলিকে বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কার্যকরী করিতে গেলে যে অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার প্রয়োজন হয়, মন্ত্রিগণ তাহার অধিকারী নহেন। এইজন্য মন্ত্রিগণকে সাহায্য করিবার জন্য এক শ্রেণীর স্থায়ী কর্মচারী থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা গুণানুসারে তাঁহাদের নিয়োগ করা হয়। এই স্থায়ী কর্মচারিগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। দলীয় শাসনের পরিবর্তনে ইঁহাদের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইঁহারা দলনিরপেক্ষভাবে দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখেন।

পার্লামেণ্ট সভা—পার্লামেণ্ট সভা হইল গ্রেট বৃটেনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন আইনসভা। রাজাসহ লর্ড সভা ও কমন্স সভাকে যুক্তভাবে পার্লামেণ্ট বলা হয়। এ সভা আদিম ও স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন সম্পর্কে বৃটেনের কোন বিচারালয়ই বৈধতার প্রশ্ন তুলিতে পারে না।

লর্ড সভা—প্রায় ৯১০ জন বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য লইয়া লর্ড সভা গঠিত। ১৯১১ ও ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন পাস হইবার পর এই সভার

আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে সংকুচিত হইয়াছে। বর্তমানে এই সভা একবৎসর কাল পর্যন্ত সাধারণ আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারে, কিন্তু আয়-ব্যয়-সম্পর্কিত প্রস্তাব এই সভায় পেশ হইবার একমাস কাল পরে ইহার অনুমোদন ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইতে পারে। তবে এই সভা আজও পর্যন্ত বৃটেনে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। নয়জন মনোনীত আজীবন সদস্য এই বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এই সভার সদস্যগণ কমন্স সভার সদস্যগণের প্রাপ্য অধিকারগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করেন, যথা,—ব্যক্তিগতভাবে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা, পৃথক্ ভাবে সভার অধিবেশনের আহ্বান পাইবার অধিকার, ইত্যাদি। লর্ড সভা জনগণ-নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত না হইলেও দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন স্বার্থ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে, একথা বলা যাইতে পারে। কার্যকারিতার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও বলা যায় যে, জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে উচ্চ পরিষদের যাহা করণীয়, লর্ড সভা সে সমুদয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে।

লর্ড সভার বিরুদ্ধে অভিযোগ—১। এই সভার গঠনতন্ত্র গণতন্ত্র-বিরোধী।

২। এই সভা ধনিক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

৩। পূর্বাপর এই সভা প্রগতিমূলক কার্যে বাধা দিয়াছে। ৪। এই সভা আইনের প্রস্তাবের গুণাগুণ বিচার না করিয়া একমাত্র রক্ষণশীল দল কর্তৃক আনীত প্রস্তাব সমর্থন করে। সুতরাং এই সভা একদিকে বাহুল্য মাত্র, অন্যদিকে ক্ষতিকর।

কমন্স সভা—সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ছয়শত তিরিশ জন সদস্য লইয়া কমন্স সভা গঠিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট আইন বলবৎ হইবার পর পার্লামেণ্ট বলিতে কার্যতঃ কমন্স সভাকেই বুঝায়। আইন-প্রণয়ন, আয়-ব্যয়-বরাদ্দ-নিয়ন্ত্রণ, কেবিনেট সভার সদস্য-নির্বাচন ও কেবিনেটের নীতি ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমন্স সভার হস্তে ন্যস্ত; কিন্তু বর্তমানে এই সমুদয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া কেবিনেট সভায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কেবিনেটের সহিত মতবিরোধ ঘটিলে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। কমন্স

সভার সদস্যগণও বাক্-স্বাধীনতা, সভার অধিবেশনের চল্লিশ দিন পূর্বে ও পরে বন্দী না হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন।

সভাপতি বা স্পীকার—কমন্স সভার কার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত সমগ্র সভা একজন সভাপতি নির্বাচন করেন। এই নির্বাচন অবশ্য রাজা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। নির্বাচিত সভাপতিকে সম্পূর্ণ দল-নিরপেক্ষ থাকিয়া সভার নিয়ম-কানুন অনুসারে সভার সমুদয় কার্য পরিচালিত করিতে হয়। সভার কার্য পরিচালনা সম্পর্কে তাঁহার নির্দেশ চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

কমিটি ব্যবস্থা ও আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি—আইনসভার কার্য সাধারণতঃ কতকগুলি কমিটির দ্বারা বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয়। সভার অধিবেশনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রিসহ সর্বদলের সম্মেলনের একটি নির্বাচন কমিটি নিযুক্ত হয়। এই নির্বাচনী কমিটি অন্যান্য কমিটিগুলির সদস্য নির্বাচন করে। পার্লামেণ্ট সভায় নানাবিধ কমিটি গঠিত হয়; যথা, স্থায়ী কমিটি, অস্থায়ী কমিটি, একটি অধিবেশনের জন্য গঠিত কমিটি, বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল পরীক্ষা করিবার কমিটি ইত্যাদি।

আয়-ব্যয়-বরাদ্দ বিল ব্যতীত সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। বিলটি প্রস্তুত হইলে সভাপতির অনুমোদন লইয়া বিলটি আইনসভায় পেশ করিতে হয়। পেশ হইবার পর প্রথম পাঠ হয়। ইহা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। তাহার পর নির্ধারিত দিনে দ্বিতীয় পাঠ হয় ও এই সময়ে সবিস্তারে আলোচনা না হইয়া বিলটির শুধু মূলনীতি ও আদর্শের উপর আলোচনা চলে। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটি অনুমোদিত হইলে ইহা একটি কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। কমিটি বিচার-বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে কিছু পরিবর্তন করিয়া তাহাদের বিবরণীসহ পার্লামেণ্ট সভায় বিলটি প্রেরণ করে। তখন তৃতীয় পাঠ হয়। তৃতীয় পাঠে বিলটি সমগ্রভাবে গৃহীত হইলে অপর পরিষদে প্রেরিত হয় ও সেখানে অনুরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া পরিষদের সম্মতি লাভ করিলে উহা রাজার নিকট প্রেরিত হয় এবং রাজার স্বাক্ষরযুক্ত হইলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

অর্থ-সংক্রান্ত বিলের প্রস্তাব একমাত্র কমন্স সভায় উত্থাপিত হয়। অর্থ-

সংক্রান্ত বিল ও বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতিতে আইনে পরিণত হয়। বিশেষ-স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলের প্রণয়ন-পদ্ধতি জটিল বলিয়া অনেক সময় বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাকে বিলের খসড়া সহ বিল অনুমোদনের জন্য আবেদন পত্র পেশ করিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাগ প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানকার্য সম্পন্ন করিয়া বিলটি অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্ট সভায় পেশ করে। শাসনবিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলকে অনুমোদন-সাপেক্ষ বিল বলা হয়।

রাজার অনুগত বিরোধী দল—বৃটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরোধী দলের অস্তিত্ব বহু পূর্ব হইতেই দেখা যায়। পূর্বকালে বিরোধীদল-গুলি বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত চরম বিরোধিতা করিত। বৃটেনে গণ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় উন্নতির উদ্দেশ্যে তাহাদের কার্যসূচী নির্ধারিত করিতে লাগিল এবং জাতীয় উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করিল। বর্তমানে বিরোধীদল জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সহযোগিতার মনোভাব লইয়া সরকারী দলের সহিত প্রতিযোগিতা করে। প্রধানমন্ত্রী সর্ববিষয়ে বিরোধী দলের নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাসনব্যাপারে বিরোধী দলের কার্যকারিতার গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বিরোধী দলের নেতা তাঁহার এই সহযোগিতামূলক বিরোধিতার জন্য বাৎসরিক একটা বেতন পাইয়া থাকেন। অবশ্য বেতনভুক্ত বিরোধী নেতা বেতনদাতা সরকারের কতদূর নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে সক্ষম তাহা বিচার্য বিষয়।

আমলাতন্ত্র ও অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন-প্রণয়ন-ব্যবস্থা—পার্লামেন্ট সভার কার্যের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ইহার পক্ষে সবিস্তারে কোন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, সর্ববিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার মত পর্যাপ্ত সময়ও ইহার নাই। এইজন্য অনেক সময় পার্লামেন্ট-প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাসনবিভাগগুলি শাসন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করিবার জন্য নূতন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে এবং পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনগুলিকে সবিস্তারে বিধিবদ্ধ করে। শাসনবিভাগ কর্তৃক এই আইন-প্রণয়ন-কার্যকে অর্পিত ক্ষমতার বলে আইন-প্রণয়ন বলা হয়। এই ক্ষমতার বলে একদিকে যেমন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে

অপর দিকে সেইরূপ পার্লামেন্টের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-প্রণয়ন কার্য অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে রচিত আইনগুলি পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক অনুমোদন-সাপেক্ষ, সুতরাং এই পদ্ধতি দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা নাই।

বিচার বিভাগ—ইংলণ্ডে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিবার জন্য দুই শ্রেণীর বিচারালয় আছে। লর্ড সভা হইল সর্বোচ্চ-আদালত। ইংলণ্ডে বিচারপতিগণ যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-কার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গুরুতর মামলাগুলি বিশেষ করিয়া ফৌজদারী মামলা জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়। এখানকার বিচারালয়গুলি কোন আইনের বৈধতার প্রশ্ন করিতে পারে না। ফরাসী দেশের মত এখানে স্বতন্ত্র কোন শাসনবিভাগীয় আদালত নাই।

স্থানীয় শাসন—শহরাঞ্চল বা পল্লী অঞ্চলের জন্য দুই শ্রেণীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সমগ্র দেশটিকে লণ্ডন শহরের সহিত বাষট্টিটি কাউন্টিতে ভাগ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, তিরাশীটি কাউন্টি বরো আছে। কাউন্টিগুলিকে আবার শহরাঞ্চল জিলা ও গ্রামাঞ্চল জিলায় ভাগ করা হইয়াছে। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া এই জিলা গঠিত হয়। প্রত্যেক স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নির্বাচিত সভা আছে। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে এই সভা স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করে।

দল ব্যবস্থা—রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বৃটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি দলের পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে দলীয় সংগঠন আছে। বর্তমানে রক্ষণশীলদল সংখ্যা গরিষ্ঠদল হিসাবে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। শ্রমিক দলও বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে। উদারনৈতিক দল পূর্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে সাম্যবাদীদলের বিশেষ কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই বলিলেও চলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.)

শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম আধুনিক প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ও কালক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে অন্যান্য দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপ হইতে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতি তাহাদের জাতিগত বিভেদ ভুলিয়া কিভাবে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাস আরম্ভ হয় তিন শ্রেণীর তেরটি স্বাধীন উপনিবেশ লইয়া। এই উপনিবেশগুলি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তাহাদের উপর করধার্য করিবার ক্ষমতা প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি সন্ধি সমবায়ের (Confederation) অধীনে একতাবদ্ধ হয়। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যখন এই উপনিবেশগুলি গ্রেট ব্রিটেনের সহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করিল তখন তাহারা এই সত্য বুঝিতে পারিল যে, একতাই তাহাদের প্রধান বল। স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য এই বিচ্ছিন্ন তেরটি উপনিবেশ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় মিলিত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কার্যকরী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি—Nature of the U. S. A. Constitution

শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ একাধারে জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। উপনিবেশগুলির অধিবাসিগণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনব্যবস্থাকে দক্ষ ও শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা

একজন আইনসভা-নিরপেক্ষ ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী শাসনকর্তার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কার্যে অন্তর্বিভাগীয় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অবলম্বন করেন। তৃতীয়তঃ, গণশক্তির প্রাধান্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নির্বাচন দ্বারা আইনসভার, শাসনবিভাগের ও বিচারবিভাগের সদস্যগণের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি মার্কিন শাসনব্যবস্থায় দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, আইন-প্রণয়ন ও শাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বন্টনব্যবস্থা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতাগুলি উভয় সরকারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় অনুল্লিখিত ক্ষমতার (Residuary Powers) অধিকারী হইল আঞ্চলিক সরকারগুলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল শাসন ক্ষমতার বিভাজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন ক্ষমতা দুই ভাগে ভাগ করিয়া সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলি রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং আঞ্চলিক স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলি রাজ্যশাসন কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঙ্গিক রাজ্যগুলি যাহাতে সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলির শাসন ব্যাপারে সমভাবেই অংশ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য জাতীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষে তাহাদের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এই নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের প্রত্যেকটি ইহার আয়তন, জনসংখ্যা ও সম্পদ নির্বিচারে সিনেট সভায় দুইজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে। এইরূপে সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (Provincial autonomy)। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় হইল প্রাদেশিক শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাদেশিক অথবা

রাজ্য সরকারগুলির জাতীয় সরকার নিরপেক্ষতা অর্থাৎ রাজ্যশাসন ব্যাপারে জাতীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির কার্যে সাধারণভাবে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। রাজ্য সরকারগুলির এই জাতীয় সরকার-নিরপেক্ষতা শাসন ব্যাপারে, আইন-প্রণয়ন বিষয়ে এবং রাজস্ব ব্যাপারে বলবৎ থাকা চাই। অর্থাৎ রাজ্য সরকারগুলি তাহাদের কার্য যাহাতে জাতীয় সরকার-নিরপেক্ষ-ভাবে সম্পাদন করিতে পারে, সেজন্য তাহাদের পৃথক আয়ের উৎস থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা ও আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা উভয় সরকারের মধ্যে যেভাবে ভাগ করা হইয়াছে আয়ের উৎসগুলিও উভয় সরকারের মধ্যে অনুরূপভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ও রাজ্য বিচারালয়-গুলি নিজ নিজ এলাকাভুক্ত বিষয়গুলির বিচারের জন্য পাশাপাশি থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি অনুসারে একটি সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় নিম্ন আদালত আছে। এই আদালতগুলি শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত বিষয়সমূহের বিচার করে এবং রাজ্য আদালতগুলি অন্যান্য বিষয়গুলির মীমাংসা করে। পদমর্যাদায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার সমকক্ষ। কারণ, এই তিনটি বিভাগের সকলেরই ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল মার্কিন শাসনতন্ত্র।

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি লক্ষণ হইল যে, রাজ্যগুলির গঠন-তন্ত্র মূল শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। মার্কিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে যে, রাজ্যগুলির প্রত্যেকটিতে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত থাকিবে এবং রাজ্যগুলি এই গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

সপ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির পারস্পরিক সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে উভয় সরকার যাহাতে অন্যের অসম্মতিতে এককভাবে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে না পারে, তজ্জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে সাধারণতঃ অনমনীয় করা হয়। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে বিশেষভাবে অনমনীয় করা হইয়াছে। একটি জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে উভয় আইনসভার সম্মতি ব্যতীত শাসনতন্ত্রের সংশোধন সম্ভব নহে।

অষ্টমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে, বহু রাজ্যের সমবায়ে গঠিত হইলেও যুক্তরাষ্ট্র হইল অবিভক্ত সার্বভৌম শক্তিবিশিষ্ট একটি মাত্র রাষ্ট্র। সুতরাং আঙ্গিক রাজ্যগুলির ব্যবচ্ছেদের কোন অধিকার বা প্রশ্ন নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সম্পূর্ণভাবে এই নীতি গৃহীত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া শাসনতন্ত্র কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার ক্ষমতা নাই। কোন রাজ্যের পক্ষে এরূপ প্রচেষ্টা বিপ্লবাত্মক কার্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং জাতীয় সরকার কর্তৃক এরূপ প্রচেষ্টা বলপ্রয়োগে প্রতিরোধ করা হয়।

মার্কিন শাসনতন্ত্র ও ইহার ক্রমবিকাশের উপাদানসমূহ—The American Constitution and the factors influencing its Development

১। মূলসংবিধান—Original Constitution

সাধারণ প্রচলিত ধারণা হইল যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্র অ-লিখিত এবং নানা উৎস হইতে এই শাসনতন্ত্রের উপাদান আহরণ করিতে হয়। সুতরাং বৃটিশ শাসনতন্ত্র হইল একটি ক্রমবর্ধমান গতিশীল শক্তি। অপরপক্ষে মার্কিন শাসনতন্ত্র হইল লিখিত এবং ইহার একমাত্র উৎস হইল ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় গণসভা কর্তৃক রচিত মূল সংবিধান। ফিলাডেলফিয়ায় রচিত সংবিধান একটি অতি সংক্ষিপ্ত দলিল। এই সংক্ষিপ্ত সংবিধান একটি প্রস্তাবনাসহ (Preamble) সাতটি মাত্র অনুচ্ছেদের সমষ্টি। আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাই তাঁহারা শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের কাঠামো (Superstructure) স্থির করিয়া দেশের ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক আদর্শের অগ্রগতির পথ মুক্ত রাখিয়াছিলেন। সংবিধান রচয়িতাগণ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি সংবিধানকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হয় তাহা হইলে সংবিধানের প্রয়োজনমত সম্প্রসারণ, গতিশীলতা এবং পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার ক্ষমতা রুদ্ধ করা কাম্য নহে। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা সংবিধানে শাসনব্যবস্থার সবিশেষ বর্ণনা না করিয়া ভবিষ্যতে সংবিধানের সময়োপযোগী পরিবর্তন ও সম্প্রসারণের পথ

উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। সুতরাং মার্কিন শাসনতন্ত্র বলিতে শুধুমাত্র মূল শাসনতন্ত্র বুঝায় না—এই শাসনতন্ত্র আরও নানা উপাদানে গঠিত।

২। সংশোধন আইনসমূহ—Constitutional Amendments

কোন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বলিতে শুধুমাত্র সেই রাষ্ট্রের গঠনকালীন মূল শাসনতন্ত্র বুঝায় না। পরবর্তী কালের সংশোধনগুলিও মূল শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কঠোর অনমনীয়তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত পঁচিশটি সংশোধন আইন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাস হইয়াছে। এই সংশোধন আইনগুলি পাস হইবার ফলে আদি শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই সংশোধন আইনগুলির মধ্যে দাসত্ব প্রথার বিলোপসাধন, শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলির সন্নিবেশ, স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার প্রাপ্তি, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা সিনেট সভার সদস্যগণের নির্বাচন প্রভৃতি হইল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং পরবর্তী কালের শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইনসমূহও মার্কিন শাসনতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া গণ্য হয়।

৩। আইনসভা প্রণীত আইন—Statutes

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আদি শাসনতন্ত্রের প্রণেতাগণ মূল সংবিধানে শাসনব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সংবিধানে মাত্র উল্লিখিত আছে যে, একটি মহা-ধর্মাধিকরণ (Supreme Court) এবং অন্যান্য নিম্ন আদালত থাকিবে যেগুলি প্রয়োজনমত কংগ্রেস সভা কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। শাসনতন্ত্রের এই বিধানের বলে কংগ্রেস সভা নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপে আইনসভা প্রণীত আইন দ্বারা শুধুমাত্র বিচারব্যবস্থার সংগঠন ও পরিচালনা সম্ভব হইয়াছে তাহা নয়, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাও কংগ্রেস প্রণীত আইনের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে কংগ্রেস সভা ইহার অধিকার ক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

শাসনতন্ত্র সম্প্রসারণে আইনসভা প্রণীত আইন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

৪। শাসন কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ—Executive Order and Decrees

মার্কিন শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণে প্রতিপত্তিশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি-গণের নির্দেশ ও অনুসৃত কার্যাবলীও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শাসনতন্ত্রে কেবিনেটের উল্লেখ না থাকিলেও প্রথম রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সৃষ্ট কেবিনেট আজ মার্কিন শাসনব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সিনেট সভার অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন না, কিন্তু রাষ্ট্রপতি পররাষ্ট্রে সৈন্য প্রেরণ করিয়া এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারেন যে, যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। উইলসন্, ডি. রুজভেল্ট, নিকসন্ প্রভৃতি রাষ্ট্রপতিগণ এইরূপে নূতন নজির সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস সভাও বিভিন্ন শাসন বিভাগকে নির্দেশদান ও প্রবিধান সৃষ্টি সাহায্যে কংগ্রেস প্রণীত আইনগুলিকে কার্যকর করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। শাসন কর্তৃপক্ষের এইসকল কার্যের ফলেও শাসনতন্ত্র সম্প্রসারিত হইতেছে।

৫। বিচার বিভাগীয় বিশদ ব্যাখ্যা—Judicial Interpretation

বৃটিশ শাসনতন্ত্র সচরাচর বিচারপতিগণ কর্তৃক সৃষ্ট শাসনতন্ত্র (Judge-made Constitution) বলিয়া অভিহিত হয়। এই উক্তি মার্কিন শাসনতন্ত্র সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। মূল মার্কিন শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেও অতি-সংক্ষিপ্ত এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণবিহীন। এই সংক্ষিপ্ততার জন্য শাসনতন্ত্রের বহু বিধানের একাধিক অর্থ হইতে পারে। শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলির এই সংক্ষিপ্ততাজনিত অস্পষ্টতার কারণ বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত আবশ্যক হয়। এইরূপে শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলি বিচারালয় কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া নূতন নূতন শাসনতান্ত্রিক বিধি সৃষ্টি করে। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট ইহার অনুমিত ক্ষমতা নীতি (Doctrine of Imp-

lied Powers) প্রয়োগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা এতই অধিক যে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে গৃহীত এই সংক্ষিপ্ত শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলিকে পরবর্তী কালে যে কোন সময় নূতন ব্যাখ্যা দান করিয়া দেশের ও জাতির নূতন চাহিদা পূরণ করিতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান দ্বারা বহু বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হইয়াছে। সুতরাং বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা মার্কিন শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান উপাদান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

৬। প্রথা—Usages

কোন প্রগতিশীল দেশের শাসনতন্ত্র চিরাচরিত প্রথাগুলির প্রভাবমুক্ত নয়। কারণ এই প্রথাগুলি জাতীয় জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বৃটেনের প্রথাগত আইনগুলির অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রও কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠিত অভ্যাস ও রীতি-নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহার ব্যক্তিত্বের বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে কেবিনেট প্রথার সূচনা করিয়াছিলেন, সেই কেবিনেট প্রথা আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পরম্পরাক্রমে অব্যাহত থাকিয়া শাসনতন্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় শাসন এইরূপ আর একটি শাসনতন্ত্র বহির্ভূত প্রথাগত সংস্থা। শাসনতন্ত্রে ইহার উল্লেখ না থাকিলেও দেশের সমগ্র শাসনব্যবস্থা এই দলীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। দলীয় শাসনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থাকে সচল ও সক্রিয় রাখিয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মার্কিন শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও একটিমাত্র দলিলে সীমাবদ্ধ নয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ন্যায় এই শাসনতন্ত্র একদিনে পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী সৃষ্টি হয় নাই। জাতীয় জীবনের প্রয়োজন অনুসারে এই শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে মূল শাসনতান্ত্রিক বিধি ও ইহার সংশোধনসমূহ, কংগ্রেসপ্রণীত আইন, শাসন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, বিচার বিভাগীয় অসংখ্য ব্যাখ্যা ও শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও অভ্যাস লইয়া গঠিত। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ন্যায় এই শাসনতন্ত্রেরও একাধিক উৎস দেখা যায়। এই শাসনতন্ত্রও একটি গতিশীল শক্তি।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—Characteristics of the U. S. A. Constitution

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—Federal Government

শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আলাস্কা এবং আগষ্ট মাসে 'হাওয়াই' যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উনপঞ্চাশৎ ও পঞ্চাশৎ রাজ্যে উন্নীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে শুধুমাত্র অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলি উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত উভয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা সূচিত হয়।

২। লিখিত ও অনমনীয়—Written and Rigid

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয় (Written and rigid)। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি একটি নির্দিষ্ট দলিলে লিখিতভাবে সন্নিবদ্ধ আছে। কিন্তু কোন শাসনতন্ত্রের বিধানসমূহ সম্পূর্ণভাবে লিখিত থাকিতে পারে না। মার্কিন শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও নানাপ্রকারের প্রথাগত বিধান ও রীতি-নীতি এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যন্ত অ-লিখিত প্রথা ও রীতি-নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে মার্কিন শাসনতন্ত্র অনমনীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে আইনসভা ইহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা বিশেষ ভিন্ন প্রকৃতির পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

৩। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য—Supremacy of the Constitution

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) মার্কিন শাসনব্যবস্থার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রেট বৃটেনের অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হইল শাসনতন্ত্র। শাসনতন্ত্র একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও

আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে এবং অপরদিকে আইনসভা, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন দ্বারা প্রত্যেকের ক্ষমতা-প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করিয়া পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়াছে।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের প্রাধান্য—Supremacy of the Supreme Court

শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Supremacy of the Federal Judiciary) কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করে ও শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ বে-আইনী ঘোষণা করিয়া শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করে। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়-দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা, আঞ্চলিক কর্তৃত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

৫। ক্ষমতাস্বাতন্ত্র্যীকরণ—Separation of Powers

এই শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যীকরণ (Separation of Powers) নীতির পূর্ণপ্রয়োগ। শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শে এতটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই মতবাদের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আইন-প্রণয়ন, প্রশাসনিক কার্য ও বিচারকার্য যাহাতে পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শাসনকর্তৃপক্ষ আইন পরিষদ্-নিরপেক্ষভাবে যাহাতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য আইনসভা বহির্ভূত নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয় ও রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী হইতে হয় না। অনুরূপভাবে আইনসভাও শাসনকর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ করিয়া গঠিত হয়। বিচারবিভাগও অন্য দুইটি বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকে।

৬। পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য—Mutual Check and Balance

মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে

কার্যকরী হইলে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। এইজন্য শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির কঠোরতা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের (Mutual check and balance) ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমস্ত নিয়োগ ও পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি কার্য আইনসভার উচ্চ কক্ষের অনুমোদন-সাপেক্ষ। অপরপক্ষে আইনসভা কর্তৃক রাষ্ট্রপতির বিনা সম্মতিতে আইন-প্রণয়ন করা একরূপ অসম্ভব। বিচারপতিগণ আইনসভার উচ্চ কক্ষের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

৭। রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা—Presidential Form of Government

শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, রাষ্ট্রপতি-প্রধান প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা (Presidential Republic)। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র থাকে না। পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত থাকিয়া উভয় বিভাগ স্ব স্ব কার্য পরিচালনা করে। এই শাসনতন্ত্রে রাজার কোন স্থান নাই। জনগণ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

উপরি-উক্ত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীতও মার্কিন শাসনতন্ত্রের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়।

মার্কিন শাসনতন্ত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ এই শাসনতন্ত্রে শুধু শাসনব্যবস্থার কাঠামো মাত্র উল্লেখ করিয়া বিস্তারিত বিবরণ স্থির করিবার ভার কংগ্রেস সভার উপর অর্পিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের সংক্ষিপ্ততার আর একটি কারণ হইল যে, এই শাসনতন্ত্রে সদস্য রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার জন্য কোন নিয়মাবলী নাই। রাজ্য সরকারগুলিই ইহাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র রচনা করিবার ভার পাইয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কারণ জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরিশেষে এই শাসনতন্ত্র কর্তৃক জনগণের কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকারের সনদ—Bill of Rights in the U. S. A.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক সংরক্ষিত নাগরিকগণের পৌর অধিকারের তালিকা সম্পূর্ণভাবে প্রণয়ন করা দুঃসাধ্য। অবশ্য মার্কিন শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকারের এক সুদীর্ঘ তালিকা আছে এবং এই তালিকা-ভুক্ত কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ বা সংকোচ অথবা অস্বীকার করা না গেলেও এই তালিকা স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কারণ শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্রভুক্ত হয় নাই বলিয়া অন্যান্য অধিকারগুলিকে সংকোচ বা অস্বীকার করা চলিবে না। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য বিচারালয়গুলি আইনের নূতন নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন অধিকার সৃষ্টি করিয়াছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থিত অধিকার সংকোচন করিয়াছে। অধিকারগুলির এইরূপ নিয়ত সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য ইহাদের কোন নিখুঁত তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব নহে। আবার এমন কতকগুলি অধিকার আছে যাহা নাগরিকগণ অধিকার বলিয়া দাবী করে অথচ সেগুলি শাসতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক নাগরিকগণের উপর ভোটদান ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই। শাসনতন্ত্রে শুধু পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জাতি-বর্ণ বা স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যের জন্য কাহাকেও ভোটদান ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

মার্কিন নাগরিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই অধিকারগুলির এক অংশ কংগ্রেস সভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার ফলে জন্মলাভ করিয়াছে, অপর অংশ শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। এই উভয় উৎস হইতে সৃষ্ট অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে অধিকারের সনদ বলিয়া পরিচিত।

প্রধান প্রধান অধিকারগুলি হইল :—

১। হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইনের সুযোগ পাইবার অধিকার যদি না এই সুযোগের অধিকার দ্বারা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

২। বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করিবার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সরকারের নিকট অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা করিবার অধিকার। উপরি-উক্ত অধিকারগুলি কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সংকোচ করিয়া পরোক্ষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অধিকার—আইনের অনুমোদন ব্যতীত কাহাকেও আটক করা বা কাহারও গৃহ তল্লাসী করা চলিবে না।

৪। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে জুরীর সাহায্যে প্রত্যক্ষ বিচার ও গুরুতর দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে জুরীর সাহায্যে বিচার পাইবার অধিকার এই সম্পর্কে আরও দুইটি অধিকারের উল্লেখ করা যায়, যথা, একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি না পাইবার ও আইনজীবীর সাহায্য পাইবার অধিকার।

৫। আইনসম্মতভাবে বঞ্চিত না হইলে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার।

৬। রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে ভ্রমণের অবাধ স্বাধীনতা ও যে-কোন রাজ্যে বসবাস করিবার অধিকার।

৭। ক্ষতিপূরণ সহ সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হইবার অধিকার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারের সনদ বিশ্লেষণ করিলে ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, এই অধিকারগুলির এক অংশ আদি শাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শাসনতান্ত্রিক সংশোধনগুলি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অপর অংশ কংগ্রেস সভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার ফলে জন্মলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই অধিকারগুলি স্থিতিশীল নহে। শাসনতান্ত্রিক সংশোধন ও বিচারালয় কর্তৃক ব্যাখ্যার সাহায্যে এই অধিকারগুলি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ, যদিও এই অধিকারগুলিকে কোন কর্তব্য সম্পাদনের শাসনতান্ত্রিক বিধির উপর নির্ভরশীল করা হয় নাই তথাপি পরোক্ষভাবে অধিকারগুলি কর্তব্য সম্পাদনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং কোন অধিকারই অবাধ বা শর্তশূন্য নহে। চতুর্থতঃ, অধিকারগুলি জাতীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ও সংরক্ষিত হইলেও রাজ্যসরকারগুলিও অধিকারগুলিকে রক্ষা করে। পরিশেষে বলা যায় যে, সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে যেরূপ কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকার স্থান পাইয়াছে মার্কিন শাসনতন্ত্রে সেরূপ কোন বিশেষ অর্থনৈতিক অধিকারের উল্লেখ নাই। মার্কিন শাসনতন্ত্র রচনাকালে বোধহয় এরূপ অর্থনৈতিক অধিকারের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক বিচার—Comparative study of the British and the U.S.A. Constitutions

যে তেরটি উপনিবেশ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম গঠিত হয়, তাহাদের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল ইংলণ্ড হইতে আগত উদ্বাস্তু। দেশত্যাগ করিলেও তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও জাতীয় ঐতিহ্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই কারণে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিজয়লাভ করিয়া তাহারা যখন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিল তখনও তাহার মাতৃভূমির রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারে নাই। আপাতদৃষ্টিতে গ্রেট বৃটেনের শাসনতন্ত্রের সহিত মার্কিন শাসনতন্ত্রের বহু পার্থক্য থাকিলেও এই পার্থক্যগুলির অন্তরালে উভয় শাসনতন্ত্রের কতিপয় মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সাদৃশ্য—Similarity

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, বৃটিশ ও মার্কিন উভয় শাসনতন্ত্রই ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। উভয় শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা। ইংলণ্ডে আইনের অনুশাসন (Rule of Law) সাহায্যে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত শাসনতন্ত্র, সুপ্রীম কোর্ট ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। পদ্ধতি ভিন্ন হইলেও শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল অভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত—রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু তিনি শাসন করেন না। তাঁহার যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রতিপত্তি থাকিলেও প্রকৃত ক্ষমতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বংশানুক্রমিক কোন রাজা না থাকিলেও নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাজার স্থান পূরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তিনি রাষ্ট্রের প্রধান এবং স্বদেশে ও বিদেশে তিনি রাজার ন্যায় সম্মানের অধিকারী।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের রাজা পার্লামেন্ট সভার বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে দেশের নানা সমস্যা ও সমস্যা সমাধান সম্পর্কে বক্তৃতা (Speech

from the Throne) করেন, মার্কিন শাসনতন্ত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতিও কংগ্রেস সভার বাৎসরিক অধিবেশনের প্রারম্ভে কংগ্রেস সভায় তাঁহার লিখিত বাণী (Message) প্রেরণ করিয়া জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও নির্দেশ দান করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও এই শাসনতন্ত্রে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে বহু প্রথাগত বিধান (Conventions) স্থান পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কয়েকটি প্রধান অংশ এই প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উভয় দেশের কেবিনেটই এই প্রথাগত বিধানের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। আবার কালক্রমে উভয় দেশেই এই প্রথাগত বিধানের কতকগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে আইনে পরিণত করা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, শুধু প্রথাগত বিধান নয়, উভয় দেশের শাসনতন্ত্রই প্রভূত পরিমাণে বিচারালয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই উভয় দেশের শাসনতন্ত্রকেই বিচারালয় সাহায্যে গঠিত (Judge-made) শাসনতন্ত্র বলা হয়।

ষষ্ঠতঃ, বৃটেনের ন্যায় মার্কিন শাসনতন্ত্রও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করে। বৃটেনের তৎকালীন উচ্চ কক্ষ লর্ড সভা যে ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও মর্যাদার অধিকারী ছিল, মার্কিন দেশের উচ্চ কক্ষ সিনেট সভাকেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী করিয়া গঠন করা হইয়াছিল। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা যে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার প্রভাব মুক্ত হইয়া গঠিত হইয়াছিল তাহা নহে।

বৈসাদৃশ্য—**Dissimilarity**

বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক বিচার করিতে গেলে প্রথমেই এই উভয় শাসনতন্ত্রের যে পার্থক্যের উপর দৃষ্টি পড়ে তাহা হইল, বৃটিশ শাসনতন্ত্র বৃটেনে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। আর মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয়। বৃটেনে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার আধার আর মার্কিন দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত এবং অনমনীয়। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে কি সাধারণ কি শাসনতান্ত্রিক উভয়বিধ আইনই সংশোধন করিতে পারে। অপরপক্ষে মার্কিন শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। কংগ্রেস সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে না। সুতরাং বৃটেনে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক আইন সাধারণ আইন হইতে শুধু পৃথক নয়, ইহা বিশেষ মর্যাদারও অধিকারী।

তৃতীয়তঃ, বৃটেনে মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বর্তমান। এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা ইহার নীতি ও কার্যক্রমের জন্য পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার বর্তমান। এই ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ কোন কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নহে, এবং আইনসভাও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত।

চতুর্থতঃ, বৃটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের প্রধান হইলেন একজন বংশানুক্রমিক রাজা—যিনি রাজত্ব করেন অথচ শাসন করেন না। অপর পক্ষে মার্কিন দেশের শাসনব্যবস্থা হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র (Federal Republic)। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান ও কর্ণধার। তিনি শাসন করেন কিন্তু রাজত্ব করেন না।

পঞ্চমতঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে রাজাসহ পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, মার্কিন দেশে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। শাসনতন্ত্রই হইল সকল ক্ষমতার উৎস।

ষষ্ঠতঃ, বৃটেনে আইনের অনুশাসনের সাহায্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত, মার্কিন দেশে এইরূপ আইনের অনুশাসন না থাকিলেও শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ আছে।

সপ্তমতঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হয় নাই এজন্য বৃটেনের বিচারবিভাগ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহে। মার্কিন শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার সূক্ষ্ম পৃথকীকরণ করা হইয়াছে এবং এই কারণে সে দেশের বিচারবিভাগ যথেষ্টরূপে স্বাধীনতা ভোগ করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, বৃটিশ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের মধ্যে কতিপয় মূলগত সাদৃশ্য থাকিলেও গঠন প্রকৃতিতে এক শাসনতন্ত্র অপর শাসনতন্ত্র হইতে শুধু পৃথক নয়, বিপরীতও বটে।

মার্কিন শাসনতন্ত্রের আধুনিক পরিবর্তন (Recent Changes)

সময়ের পরিবর্তনে শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত উপায়ে মার্কিন শাসনতন্ত্রের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হইল শাসনতন্ত্র রচনা-কালীন পরিবেশ ও বর্তমান পরিবেশের পার্থক্য। শাসনতন্ত্র রচনাকালে দেশের আয়তন ও জনসংখ্যা যাহা ছিল, তদপেক্ষা বর্তমানে উভয়েই বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ চিন্তাধারা ও কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, আদি শাসনতন্ত্রের বিধিগুলি অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অবস্থার সমস্যাগুলির সমাধানে অপ্রযোজ্য। তাই আদি শাসনতন্ত্রকে বর্তমান যুগোপযোগী করিবার জন্য নিয়মতন্ত্র-বহির্ভূত উপায়ে শুধু যে ইহার কাঠামোর পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যেরও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কেবিনেটের উৎপত্তি ও ইহার প্রতিপত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা করিলেও বর্তমানে এই নির্বাচন কার্যতঃ প্রত্যক্ষ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানের ফলে আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ কর্তৃক পরিকল্পিত শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের পারস্পরিক নিরপেক্ষতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বর্তমানে দলব্যবস্থা শাসনকর্তৃপক্ষ (রাষ্ট্রপতি) ও আইন সভার মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে; সুতরাং মার্কিন শাসনতন্ত্রের কাঠামো ও বিষয়বস্তুর বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ
(The Federal Executive)
রাষ্ট্রপতি (The President)

যোগ্যতা, নির্বাচন-পদ্ধতি ও কার্যকাল (Qualification, Mode of Election & Term of office)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে অন্ততঃপক্ষে চৌদ্দ বৎসরকাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুক্তরাষ্ট্রের স্বভাবজাত নাগরিক হইতে হইবে। তিনি চারি বৎসর কার্যকালের জন্য ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্র একটি নির্বাচন-এলাকায় পরিণত হয়। প্রত্যেকটি নির্বাচন এলাকা সেই মূলরাষ্ট্র হইতে কংগ্রেস সভায় যত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করে, ঠিক তত সংখ্যক প্রতিনিধিই ভোটদাতৃগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সেই কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত করে। এইরূপে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিয়া থাকেন। যাহাতে যোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন ও নির্বাচনকার্য যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ পরোক্ষ নির্বাচনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। কিন্তু বর্তমানে শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হস্তগত হইয়াছে। প্রাথমিক ভোট-দাতৃগণ দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে ভোটদান করিয়া দলের সমর্থকগণকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রতিনিধি স্থির করেন। এই প্রতিনিধিগণ দলীয় নির্দেশ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকেন। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পর্যায়ের ভোট গণনা হইলে কোন্ দল হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন তাহা অনুমান করা যায়। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বর্তমানে দৃশ্যতঃ পরোক্ষ হইলেও কার্যতঃ প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন ব্যাপারে প্রথম হইতেই একটি বিশেষ প্রথাগত বিধান গঠিত হইয়াছিল। বিধানটি হইল যে, একই ব্যক্তি পর পর দুই বারের বেশী রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট [illegible] বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ফলে এই বিধানটি লঙ্ঘিত হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে একটি শাসনতান্ত্রিক আইন পাস করিয়া বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিই উপর্যুপরি দুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। সুতরাং প্রথাগত বিধানটি বর্তমানে আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

বেতন, নিষ্কৃতি ও পদচ্যুতি (Salary, Immunities and Removal)

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের আইনানুসারে রাষ্ট্রপতির বর্ধিত বেতন বাৎসরিক ২০০,০০০ ডলার ধার্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ভ্রমণ, আবাসগৃহ-সংরক্ষণ ও সরকারী ভোজ এবং আমোদ-প্রমোদের জন্য বাজেটে পৃথক ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিদায়ী রাষ্ট্রপতিগণও ২৫০০০ ডলার বাৎসরিক বৃত্তি ও অন্য খরচা পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতিকে কোন কারণে গ্রেপ্তার করা যায় না বা তাঁহাকে কোন আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সমনজারী করা যায় না। একমাত্র বিশ্বাস-ঘাতকতা, উৎকোচ গ্রহণ ও অন্য অসদাচরণের অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে মহা-অভিযোগ আনা যায়। প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) সংখ্যাধিক্য ভোটে মহাঅভিযোগ (Impeachm nt) আনয়ন করিতে পারে। এইরূপ মহাঅভিযোগের বিচার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সিনেট সভা কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্য ভোটে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায়। আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রপতিই মহাঅভিযোগের পদ্ধতিতে পদচ্যুত হন নাই।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যকলাপ (Powers and Functions of the President)

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার চারিটি উৎস আছে। প্রথম ও প্রধান উৎস হইল

শাসনতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের অনেক বিধির অস্পষ্টতার জন্য বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও নির্দেশের প্রয়োজন হইয়াছে। বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা বহু নূতন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আইনসভা নূতন আইনের দ্বারা অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নূতন ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে। চতুর্থতঃ, প্রথাগত বিধান, রীতিনীতি ও পদ্ধতির প্রভাবেও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(১) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Executive Powers

সমগ্র শাসনব্যবস্থার প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইনগুলিকে বলবৎ করিতে হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, কেবিনেটের সদস্য, কূটনৈতিক দূত প্রভৃতি তিনিই নিয়োগ করিয়া থাকেন; অবশ্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই সমস্ত নিয়োগই সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ; নিয়োগব্যাপার সিনেটের পরামর্শ ও অনুমোদনসাপেক্ষ হইলেও, রাষ্ট্রপতি সিনেটের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই এই সমস্ত কর্মচারীকে বরখাস্ত করিতে পারেন। বৈদেশিক নীতিনির্ধারণ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি যথেষ্ট ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিতে তিনি দূত, কন্সাল প্রভৃতি কূটনৈতিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন ও বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত দূত তাঁহার নিকটেই প্রেরিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক-নির্ধারণও তাঁহার একটি কর্তব্য। তিনিই দেশের সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক এবং আপৎকালে এই সশস্ত্রবাহিনী পরিচালনা করিবার ক্ষমতা তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। তবে কংগ্রেস সভার উভয় পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার নিজস্ব অধিকার না থাকিলেও রাষ্ট্রপতি পররাষ্ট্রনীতি এরূপভাবে পরিচালিত করিতে পারেন যাহাতে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। পররাষ্ট্রনীতি-পরিচালনক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্তু পররাষ্ট্রের সহিত কোন গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করিতে হইলে, সে চুক্তি সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের বিনা অনুমোদনে কোন চুক্তি কার্যকরী হয় না।

(২) আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক ক্ষমতা—Legislative Powers

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অবলম্বিত হওয়ার ফলে আইন-প্রণয়নক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নানাপ্রকারে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজার মত কংগ্রেস সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে বা অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন না বা কংগ্রেস সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন না। কিন্তু প্রয়োজনক্ষেত্রে কংগ্রেস সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার সদস্য হইতে পারেন না ও কংগ্রেস সভায় উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহার নাই। তবে কংগ্রেস সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে তিনি তাঁহার লিখিত বাণী (Message) কংগ্রেস সভায় প্রেরণ করিতে পারেন। এই বাণীর মধ্যে দেশের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব ও আইনের খসড়া গ্রথিত থাকিতে পারে। কংগ্রেস সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি প্রেরিত বাণী দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়। কোন বিল কংগ্রেস সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলেও রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়া আইনে পরিণত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে তাঁহার স্বাক্ষর প্রদান না করিয়া অন্ততঃ সাময়িকভাবে আইন-প্রণয়ন কার্য স্থগিত রাখিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কোন বিল অনুমোদন না করিলে দশ দিনের মধ্যে উক্ত বিলটিকে কংগ্রেস সভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত বিল যদি কংগ্রেস সভা দ্বিতীয় বার দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা অনুমোদন করে, তাহা হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীতও আইনে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রপতির বিল অনুমোদন না করিবার এই ক্ষমতা চূড়ান্ত না হইলেও সাময়িকভাবে আইন পাস করার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে ও বিলটি পুনর্বিচারের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভায় প্রেরিত হইতে পারে। অনেক সময় কংগ্রেস সভা কোন কোন আইনকে বিস্তারিতভাবে সন্নিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ করিয়া থাকে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া অনেক নূতন নিয়ম-কানুন প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাই হইল রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারীর ক্ষমতা।

দলীয় রাজনীতির প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতির আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক ক্ষমতা আর একটি উপায়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কংগ্রেস সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়াই তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি নিজে একটি আইন পরিকল্পনা ও সংকলন করিয়া তাঁহার স্বদলীয় কোন কংগ্রেস সদস্যকে সেই বিলটি কংগ্রেস সভায় পেশ করিতে অনুরোধ করিতে পারেন বা দলের নেতা হিসাবে কোন সদস্যকে সেই বিল পেশ করিতে বাধ্য করিতেও পারেন। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি সাংবাদিক বৈঠকের (Press Conference) মধ্য দিয়াও আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে কংগ্রেস সভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সপ্তাহে দুইবার সাংবাদিকগণের বৈঠক আহ্বান করেন ও এই সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক মতামত ব্যক্ত করিয়া দেশের জনমতকে আইন-প্রণয়ন বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলেন। জনমতের দাবীতে কংগ্রেস সভা রাষ্ট্রপতি-নির্ধারিত বিষয়সমূহে আইন প্রণয়ন করিতে অনেক সময় বাধ্য হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মত আইন-প্রণয়ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও আইন-প্রণয়ন কার্যে তাঁহার পরোক্ষ প্রভাব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব অপেক্ষা কোন অংশে কম বলা চলে না। রাষ্ট্রপতিকে শুধু শাসনবিভাগের প্রধান বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারেও তাঁহার যথেষ্ট কার্যকরী ক্ষমতা আছে। এইজন্য মুনরো রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি শুধু রাষ্ট্রপতি নহেন, প্রধানমন্ত্রীও বটে (President and Prime Minister combined)।

(৩) বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা—Judicial Powers

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি মার্জনা করিতে পারেন, শাস্তির পরিমাণ হ্রাস করিতে পারেন বা শাস্তিপ্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার আদেশ দান করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে দণ্ডিত ব্যক্তিসম্পর্কে রাষ্ট্রপতি এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন না।

(৪) অর্থবিষয়ক ক্ষমতা—Financial Powers

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আয় ব্যয় বিবরণী ও হিসাব-সংক্রান্ত আইন (The Budget and Accounting Act, 1921) পাস হইবার পূর্বে আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের নূতন আইন আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতিই সমস্ত সরকারী বিভাগ ও সংস্থা হইতে আয়-ব্যয়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে নির্ধারিত আর্থিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে রদ-বদল করিতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাবের প্রয়োজনমত পরিবর্তনের পর একত্রিত করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ আয়-ব্যয়ের বিবরণী অনুমোদনের জন্য কংগ্রেস সভায় তিনিই পেশ করেন। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবার জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী দপ্তর (Budget Bureau) সৃষ্টি হইয়াছে। এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (Director) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(৫) আইন না-মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা—Veto Power

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আইন-প্রণয়ন বিষয়েও রাষ্ট্রপতির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এক শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইন পাস করিবার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সমুদয় আইন-প্রণয়ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি অপরিহার্য। কংগ্রেস সভা প্রণীত কোন প্রস্তাবে তিনি সম্মতিদান করিয়া প্রস্তাবটিকে আইনে পরিণত করিতে পারেন অথবা সম্মতিদানে বিরত থাকিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কোন প্রস্তাবে সম্মতি দান না করিলে তাঁহার অসম্মতির কারণসহ উক্ত প্রস্তাবটিকে কংগ্রেস সভার যে কক্ষে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই কক্ষে রবিবার বাদ দিয়া দশদিনের মধ্যে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। এইরূপে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাব যদি কংগ্রেস সভার প্রত্যেক কক্ষ ⅔ সংখ্যাধিক্য ভোটে পুনরায় পাস করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির বিনা সম্মতিতে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিয়া সাময়িক কালের জন্য কোন আইন নাকচ (Limited or Partial Veto) করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব প্রেরণের দশদিনের মধ্যে যদি কংগ্রেস সভা মুলতুবী হয় এবং ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি যদি প্রস্তাব সম্পর্কে কোন

সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন তাহা হইলে প্রস্তাবটি আগে হইতেই শেষ হইয়া যায়। ইহাকে রাষ্ট্রপতির পকেট ভেটো (Pocket Veto) বলা হয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উৎস (Sources of the Powers of the American President)

উপরি উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রধানতঃ চারিটি উৎস হইতে তাঁহার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

১। শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতা—Powers conferred by the Constitution

প্রথমতঃ, আদি শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার একটি প্রধান উৎস। কিন্তু শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত ক্ষমতাগুলির কয়েকটি স্পষ্ট হইলেও অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট।

২। কংগ্রেস সভা-প্রদত্ত ক্ষমতা—Powers entrusted by the Congress

শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত ক্ষমতাসমূহের সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতার জন্য কংগ্রেস সভা সময়ে সময়ে আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রপতির হস্তে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ, আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কার্য কবিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

৩। সুপ্রীম কোর্ট-নির্ধারিত ক্ষমতা—Powers defined by the Supreme Court.

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট ও ইহার অনুমিত ক্ষমতানীতি বলে রাষ্ট্রপতির উপর ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। যে সমস্ত বিষয় শাসনতন্ত্রে অনুল্লিখিত বা অস্পষ্ট, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের নূতন ব্যাখ্যার সাহায্যে নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিচার বিভাগীয় এই সিদ্ধান্তগুলিও রাষ্ট্রপতির হস্তে নূতন নূতন ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে। এইরূপে ব্যাখ্যাদান মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে শাস্তি পাইবার পূর্বেই কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

৪। প্রথাগত ক্ষমতা—Powers derived from Usage

রাষ্ট্রপতির বর্তমান ক্ষমতার কিয়দংশ পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতিগণ অনুসৃত কার্যের

ফলে প্রচলিত প্রথায় পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে এই প্রথা-ভিত্তিক ক্ষমতা-সমূহও রাষ্ট্রপতির আইন-সম্মত ক্ষমতা বলিয়া পরিগণিত হয়। সিনেটের শিষ্টাচার প্রথা (Senatorial Courtsey) প্রবর্তিত হইবার ফলে বর্তমানে রাষ্ট্রপতিই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণপদে নিয়োগ করিবার একমাত্র অধিকারী হইয়াছেন।

৫। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব—Personality of the President.

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উৎস যাহাই হউক-না-কেন, রাষ্ট্রপতি যদি ব্যক্তিসম্পন্ন হন তাহা হইলে তিনি কংগ্রেস সভা, জনমত প্রভৃতির উপর তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহার ক্ষমতার পরিধি বিস্তার করিতে পারেন। মার্কিন রাজনৈতিক ইতিহাসে এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একাধিক রাষ্ট্রপতির অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। মার্কিন শাসনতন্ত্রের সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতার জন্য একাধিক রাষ্ট্রপতি নিজ নিজ অনুপ্রেরণায় বহু নূতন নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন, লিংকন, উইলসন্, রুজভেল্ট প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে নূতন নজির সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতির সহিত কেবিনেটের সম্পর্ক—President in relation to the Cabinet

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সভা প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার শাসনতান্ত্রিক আইনসম্মত কোন অস্তিত্ব নাই। শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত এই মন্ত্রণাসভা দশজন বিভাগীয় কর্মসচিব লইয়া গঠিত। এই কর্মসচিবগণ একান্তভাবেই রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সহকারী। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং তিনিই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। সচিবগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয় না। আইনসভার সহিত তাঁহাদের একমাত্র সম্পর্ক হইল যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁহাদের নিয়োগ সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। বর্তমানে সিনেটের এই অনুমোদনও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন্ কর্তৃক চার জন কর্মসচিব নিযুক্ত হন। তখনও পর্যন্ত এই মন্ত্রণাসভা কেবিনেট নামে আখ্যাত হয় নাই। কর্মসচিবগণ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিতেন এবং

রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঁহাদের সহিত মত বিনিময় করিতেন। এইরূপে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই মন্ত্রণাসভা কেবিনেট নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণাসভাকে কেবিনেট বলিয়া অযথা নামকরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কেবিনেট শাসনপদ্ধতি বলিলে সাধারণতঃ কেবিনেট সদস্যগণকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী শাসকগোষ্ঠী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মার্কিন কেবিনেট ব্যবস্থায় কেবিনেট সদস্যগণ আদৌ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন। মার্কিন কেবিনেট সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন। কেবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির সহকর্মী নহেন, তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নির্দেশ-চালিত অধস্তন কর্মচারী মাত্র। কেবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতিকে যে পরামর্শ দান করেন, রাষ্ট্রপতি তাহা গ্রহণ না করিতেও পারেন। যদিও রাষ্ট্রপতি নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একবার বা দুইবার তাঁহার মন্ত্রণাসভা আহ্বান করেন, তথাপি এই মন্ত্রণাসভার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। কারণ কোন বিষয়ে দশজন মন্ত্রী যদি সম্মতি দান করেন এবং রাষ্ট্রপতি যদি অসম্মতি প্রকাশ করেন তাহা হইলে দশজনের সম্মতি উপেক্ষিত হইয়া এক রাষ্ট্রপতির অসম্মতি বলবৎ হইবে ('Ten yeas and one no, the no shall prevail')। মন্ত্রিগণের কোন যৌথ দায়িত্ব নাই, সুতরাং রাষ্ট্রপতি বিভাগীয় কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ করেন। সমগ্র কেবিনেট সভার একযোগে ভোটদান করিবার কারণও সচরাচর ঘটে না। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগ, পদচ্যুতি, বেতন ও কার্য-পরিচালনায় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার মন্ত্রণা-সভার উপর আদৌ নির্ভর করিতে হয় না।

রাষ্ট্রপতির সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক (**President in relation to the Congress**)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি অত্যধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতির (শাসনকর্তৃপক্ষ) কংগ্রেসের (আইনসভা) সহিত কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়

না। রাষ্ট্রপতি আইনসভা নিরপেক্ষভাবে ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার মন্ত্রণাসভার (Cabinet) সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইন প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবেও তাঁহার বা তাঁহার কর্মসচিবগণকে পদত্যাগ করিতে হয় না। এইরূপে রাষ্ট্রপতি আইনসভার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

অনুরূপভাবে কংগ্রেস সভাও রাষ্ট্রপতির প্রভাবমুক্ত। রাষ্ট্রপতি আইনসভা আহ্বান করিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন না বা নির্ধারিত কার্যকালের পূর্বে কংগ্রেস সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন না।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতই মনে হয় যে, রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ বিশেষ করিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি গৃহীত হইলেও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (Mutual checks and balances) নীতি দ্বারা শাসনব্যবস্থা সক্রিয় ও সাবলীল রাখা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত না রাখিতে পারিলেও কংগ্রেস সভার বা যে কোন কক্ষের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং উভয়-কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে তাঁহার স্বীয় বিবেচনা অনুসারে কংগ্রেস সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস সভার প্রত্যেক অধিবেশনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী বহু তথ্য-সম্বলিত তাঁহার বাণী (Message) কংগ্রেস সভায় প্রেরণ করেন। এই বাণীর মধ্যে দেশের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব ও আইনের খসড়া গ্রথিত থাকে। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে কংগ্রেস সভা রাষ্ট্রপতি-প্রেরিত বাণী দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়।

তৃতীয়তঃ, কোন আইনের প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হইলেও রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ব্যতীত তাহা আইনে পরিণত হইতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি প্রস্তাবটিতে তাঁহার সম্মতি প্রদান না করিয়া অন্ততঃ সাময়িকভাবে আইন-প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কোন বিল অনুমোদন না করিলে দশ দিনের মধ্যে উক্ত বিলটিকে কংগ্রেস সভায় ফেরত পাঠাইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত বিল যদি কংগ্রেস সভা দ্বিতীয়বার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট দ্বারা অনুমোদন করে, তাহা হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত আইনে পরিণত হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া দুষ্কর হয়।

চতুর্থতঃ, দলীয় সংগঠনের সাহায্যে রাষ্ট্রপতি আইন-প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি স্বয়ং কোন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া স্বদলীয় কোন সদস্যের সাহায্যে আইনসভায় পেশ করিয়া দলীয় সংখ্যাধিক্যের বলে তাঁহার বাঞ্ছিত প্রস্তাবকে আইনের মর্যাদা দিতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতি তাঁহার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকের মারফতও আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি তাঁহার অপরিসীম প্রভাব সহজেই কংগ্রেস সভার নেতৃবর্গের উপর বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারেন। সুতরাং আইনসভার সদস্য হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ না করিলেও রাষ্ট্রপতি যে নানাভাবে আইনসভার উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন—ইহা অনস্বীকার্য।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতির শাসনক্ষমতাও কংগ্রেস সভা কর্তৃক বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমুদয় নিয়োগই সিনেট সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে সিনেট সভার সম্মতি অপরিহার্য। যুদ্ধ ঘোষণা করা বা শান্তি স্থাপন করিতে হইলে রাষ্ট্রপতির কংগ্রেস সভার উভয় পরিষদের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি (Position and influence of the President)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতই তাঁহাকে একজন অসীম প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্রনায়ক বলিয়া মনে হয়। এক গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাঁহার ক্ষমতা ও পদমর্যাদার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অন্ততঃ দুটি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অধিকতর স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী। সত্য বটে গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী সমগ্র দেশের অবিসংবাদী নেতা ও জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে কমন্স সভা তথা ভোটদাতৃগণের নিকট তাঁহার কার্যের জন্য দায়ী। যতদিন পর্যন্ত তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনলাভে সমর্থ থাকেন ততদিন পর্যন্তই তিনি জাতীয় নেতা হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে না পারিলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাঁহার কার্যকাল শেষ হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট চারি বৎসর কার্যকালের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি-অনুসৃত শাসননীতি ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে ও শাসনকার্য-পরিচালনায় দক্ষতার অভাব হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে অপসারিত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কেবিনেট সভা, আইনসভা ও ভোটদাতৃমণ্ডলী নিরপেক্ষভাবে তাঁহার শাসনক্ষমতা অধিকতর স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে পারেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সভাপতি ও নেতা হইলেও অন্যান্য কেবিনেট সদস্যের সমপর্যায়ভুক্ত। কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার সহকর্মী, অধস্তন কর্মচারী নহেন। তিনি তাঁহাদের পরামর্শ একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অনেক বিষয়ে অন্যান্য সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার অধস্তন কর্মচারী, সহকর্মী নহেন। তিনিই তাঁহাদের নিয়োগ করেন, আবার তিনিই তাঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে বরখাস্ত করিতে পারেন। কেবিনেট সদস্যগণ শুধু বিভাগীয় কর্মসচিব মাত্র, রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে কোন

মতেই বাধ্য নহেন। আইনসভার সহিত সম্পর্কেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা বহুপরিমাণে আইনসভা-নিরপেক্ষ হইয়া শাসনকার্য পরিচালিত করিতে পারেন। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। অধিকন্তু রাষ্ট্রপতি বাণী প্রেরণ করিয়া ও তাঁহার ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইনসভার কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। ভোটদাতৃমণ্ডলীরও রাষ্ট্রপতির উপর কোন ক্ষমতা নাই। ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইলেও তাঁহার কার্যের জন্য ভোটদাতৃগণের নিকট তাঁহার নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে তাঁহাকে দায়ী হইতে হয় না। ভোটদাতৃগণ তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারে না। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বা উৎকোচ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করা যায়, কিন্তু তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে নিয়পরিষদ্ কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইবে এবং অভিযোগ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র তাঁহাকে একাধারে ইংলণ্ডের রাজার পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাজা নাই, কিন্তু রাষ্ট্রপতিই রাজার স্থান পূরণ করিয়াছেন।

জননেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতি (The President as a leader of the People)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি বলবৎ থাকার ফলে শাসনকর্তৃপক্ষ (রাষ্ট্রপতি) ও আইনসভার (কংগ্রেস) মধ্যে কোন যোগসূত্রের প্রয়োজন ছিল না। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার কিছুকাল পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান ঘটে এবং ইহার ফলে শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম কতিপয় রাষ্ট্রপতি নির্দলীয় ছিলেন এবং দল-নিরপেক্ষ থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানের পরবর্তীকাল হইতে রাষ্ট্রপতিগণ দলীয় ভিত্তিতে দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে দলীয় প্রচেষ্টার সাহায্যে নির্বাচিত হইতে থাকেন। সর্বত্র যেরূপ হইয়া থাকে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তদ্রূপ দলপতি বা নেতাই রাষ্ট্রপতি মনোনীত ও নির্বাচিত হন। বর্তমান রাষ্ট্রপতিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি-পদ লাভ করেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি-পদ লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে জননেতা হইতেই হইবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া তাঁহাকে দলীয় নীতির ভিত্তিতে সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হয় এবং এই কারণে তিনি স্ব-দলীয় ব্যক্তিগণের সহিত মত বিনিময় করিয়া সকল প্রকার নিয়োগ, আইন-প্রণয়ন, বিচার ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া দলীয় নীতি ও কার্যসূচীর রূপায়ণ তাঁহার কর্তব্য হইলেও রাষ্ট্রপতি হইলেন সমগ্র জাতির অভিভাবক ও মুখপাত্র এবং জাতীয় স্বার্থের রক্ষক। কি আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে, কি যুদ্ধ পরিচালনায়—কোন ক্ষেত্রেই তিনি কোন দলের নেতারূপে পরিগণিত হন না—তিনি দল-নির্বিশেষে সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে কাজ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বেতার বা টেলিভিশন সাহায্যে জাতির উদ্দেশ্যেই ভাষণ দান করেন। তাঁহার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকেও জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তর চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় কোন বংশানুক্রমিক রাজা না থাকিলেও রাষ্ট্রপতি সেই স্থান, সেই আদর্শ পূরণ করিয়াছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন এবং মতপার্থক্য সত্ত্বেও সমগ্র জাতি তাঁহাকে তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের সর্বোচ্চ প্রতীক বলিয়া মনে করে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি—Increase of Powers of the President

শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রাপ্ত ক্ষমতা ব্যতীতও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ক্ষমতা বৃদ্ধির নানাকারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, মার্কিন দেশে দলীয় শাসন শক্তিশালী হইবার ফলে রাষ্ট্রপতি এখন দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি এখন কংগ্রেস সভার সক্রিয় সমর্থন পাইয়া থাকেন। শাসন কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রাষ্ট্রপতির

ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত প্রার্থী বলিয়া রাষ্ট্রপতি তাঁহার শাসননীতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে অনায়াসে রূপায়িত করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথাগত বিধানের ফলে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বর্তমানে কার্যতঃ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই কারণে বর্তমানে তিনি বেতার, সাংবাদিক বৈঠক ও টেলিভিশন সাহায্যে জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপন করিয়া জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। এজন্য তাঁহাকে আইনসভার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয় না। জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপনের সুবিধার জন্যও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সুপ্রীম কোর্ট ইহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার দ্বারাও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ক্ষমতা প্রদানের ফলে রাষ্ট্রপতি এখন সরকারী কর্মচারিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন, কাগজীনোট প্রচলন করিতে পারেন এবং বেতার ও এরোপ্লেন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে জরুরী অবস্থার সমাধান উদ্দেশ্যেও রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার উপর নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু প্রতিভাশালী রাষ্ট্রপতির অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে যাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্বদেশে ও বিদেশে বহু খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। জ্যাক্‌সন, লিংকন, রুজ্‌ভেল্ট, উইলসন্‌, কেনেডি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রপতি পদের প্রভাব ও মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক সর্বাত্মক রাষ্ট্রের কর্ম পরিধি সম্প্রসারণের ফলে প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান রাষ্ট্র। সুতরাং এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, এইরূপ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রপতির পদ ক্রমশই একনায়কত্বে পর্যবসিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ আশংকা করা

অমূলক। রাষ্ট্রপতির পদ একনায়কত্বে পর্যবসিত হইবার দুইটি অন্তরায় দেখা যায়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ ও পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন কার্য উভয়ই সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যের উপর সিনেট সভা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন্ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভার্সাই শান্তি চুক্তির অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করিয়া সিনেট সভা রাষ্ট্রপতির কার্যের উপর ইহার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। দ্বিতীয়তঃ, সুপ্রীম কোর্ট ইহার ব্যাখ্যা দান করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অসিদ্ধ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি রুজ্‌ভেল্ট-প্রদত্ত কয়েকটি নির্দেশ এইরূপে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়।

গ্রেট ব্রিটেনের রাজা ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি The British King and the President of the U. S. A.

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির স্থান কয়েকটি বিষয়ে তুলনীয় হইলেও অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি উভয়েই রাষ্ট্রের প্রধান এবং দেশে বিদেশে বহু-সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় উৎসব ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইঁহারা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাষ্ট্রের যে অবাস্তব অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়, সেই অবাস্তব অস্তিত্বের বাস্তব প্রতীক হইলেন ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন রাজা নাই, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁহার নিজের দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে রাজার সম্মান পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা জনসাধারণের নিকট যেরূপ প্রিয়, মার্কিন রাষ্ট্রপতিও তদ্রূপ মার্কিন জনসাধারণের নিকট প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। এইজন্য বলা হয় যে, "The President is the nearest and dearest substitute for a royal ideal the American possesses." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিই রাজার স্থান পূরণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি—উভয়েই রাষ্ট্রের প্রধান হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। রাজা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব করেন, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্য ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা রাষ্ট্র-প্রধান হইলেও

শাসন বিভাগের প্রধান নহেন। কেবিনেট সদস্যগণই রাজার নামে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এজন্য রাজার কোন দায়িত্ব নাই, মন্ত্রিগণই দায়ী। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন প্রকৃত শাসনকর্তা, শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু এই মন্ত্রিগণ সব বিষয়েই রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন বিষয়ে আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। তিনি অপরাধীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনও করিতে পারেন। তিনি যে চার বৎসর কাল রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহার মধ্যে তিনি কাহারও নিকট দায়ী নহেন বা কাহারও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য নহেন। তিনি হইলেন প্রকৃত শাসক, আর রাজা হইলেন নামমাত্র শাসক। এইজন্য বলা হয়: ইংলণ্ডের রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসন করেন কিন্তু রাজত্ব করেন না। ("The English King reigns but does not govern, but the American President governs but does not reign.")

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী—The American President and the British Prime Minister

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদ-মর্যাদার তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়েই দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্ণধার ও এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়েই অসীম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়:

১। প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভোটদাতৃগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দুইটি নির্বাচনের ফলের উপর নির্ভর করে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভার সদস্য হিসাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হইলে রাজা কর্তৃক তিনি প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হন। সুতরাং কার্যতঃ উভয়েই পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন ও উভয়ের নিয়োগ দুইটি নির্বাচনের উপর নির্ভর করে, যদিও নির্বাচনপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে পরিচালিত হয়।

২। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজার মত কোন নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান না থাকায় রাষ্ট্রপতি আইনতঃ ও কার্যতঃ শাসনক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। শুধু প্রকৃত শাসনক্ষমতা পরিচালনা করা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারসমূহের তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগকারী হইলেও আইনতঃ রাজাই হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান কর্মসচিব। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান-সমূহে রাজাই প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

৩। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি পদ শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। শাসন-তন্ত্র প্রদত্ত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি অন্যনিরপেক্ষভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন। অপরপক্ষে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা প্রধানতঃ প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়াই শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

৪। চতুর্থতঃ, আইনসভার সহিত সম্পর্কের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও উভয় পদের পার্থক্য অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। রাষ্ট্রপতি অনেক পরিমাণে আইনসভার প্রভাবমুক্ত এবং আইনসভাও অনুরূপভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না ও আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁহার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। কি সাধারণ আইন-প্রণয়নে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভাকে তাঁহার স্বমতে আনিতে বাধ্য করিতে পারেন না। অপরপক্ষে কংগ্রেস সভা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ, চুক্তি-সম্পাদন প্রভৃতি কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেও রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে না। গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং দলের নেতা হিসাবে তিনি পার্লামেন্ট সভাকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। সাধারণ আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রি পরিষদ সহ প্রধানমন্ত্রী যে-নীতি অবলম্বন করেন, সাধারণতঃ কমন্স সভা তাহা অনুমোদন করে। কমন্স সভা মন্ত্রিপরিষদ্ কর্তৃক অনুসৃত নীতি সমর্থন না করিলে প্রধানমন্ত্রী কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া কমন্স সভাকে স্বমতে আনিতে পারেন।

৫। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত ও এই কার্যকালের মধ্যে মহা-অভিযোগ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহাকে কোনপ্রকারেই পদচ্যুত করা যায় না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বৎসরের জন্য কমন্স সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু পার্লামেন্ট সভার সহিত মতবিরোধ ঘটিলে তাঁহার পদত্যাগ করিবার কারণ ঘটিতে পারে। সেইজন্য প্রধান-মন্ত্রীকে সর্বদা একদিকে যেরূপ পার্লামেন্ট সভার সহিত যথাসম্ভব মতৈক্য বজায় রাখিতে হয়, অন্যদিকে তদ্রূপ জনমতের পরিবর্তনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন। তাঁহাকে আইনসভা বা জনমতের উপর এতটা নির্ভর করিয়া চলিতে হয় না।

৬। ষষ্ঠতঃ, কেবিনেটের সহিত সম্পর্কেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি তাঁহার দশজন কর্মসচিবকে সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে নিয়োগ করেন এবং প্রথাগত বিধানানুযায়ী ইঁহাদিগকে লইয়া কেবিনেট গঠিত হয়। কেবিনেট সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী হিসাবে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহাদের কার্যের জন্য তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে বরখাস্ত করিতে পারেন। গ্রেট বৃটেনের কেবিনেট সভা প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। কেবিনেট সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী, অধস্তন কর্মচারীমাত্র নহেন। প্রধানমন্ত্রী ইঁহাদিগকে মনোনয়ন করেন ও রাজা নিয়োগ করেন। বৃটিশ কেবিনেট যৌথভাবে পার্লামেন্ট সভার নিকট দায়ী।

উপ-রাষ্ট্রপতি—The Vice-President

মার্কিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্ট হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে হইলে যে যে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, উপ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্যও অনুরূপ যোগ্যতা অপরিহার্য। আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে যে-প্রার্থী রাষ্ট্রপতির নিম্নে দ্বিতীয় অধিক সংখ্যক ভোট পাইতেন

তিনিই উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে শাসনতন্ত্রের দ্বাদশ সংশোধনের দ্বারা উপ-রাষ্ট্রপতির স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুইটি বিশেষ নিয়ম আছে। প্রথমটি হইল যে, রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি একই ভৌগোলিক অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি একই রাজনৈতিক দলের সম-মতাবলম্বী না হইয়া নরম ও চরমপন্থী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শেষোক্ত এই নীতিটি কার্যক্ষেত্রে সর্বদা প্রযুক্ত হয় না।

রাষ্ট্রপতির সাময়িক অনুপস্থিতিকালে অথবা তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতি, অপসারণ অথবা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করাই হইল উপ-রাষ্ট্রপতির প্রধান কার্য। সম্ভবতঃ ইহা বিবেচনা করিয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ সিনেট সভার সভাপতিত্ব করিবার ভার উপ-রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করেন। সিনেট সভার পরিচালনা কার্যে উপ-রাষ্ট্রপতির স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র নাই বলিলেও চলে। ১৯৬৭ সালের পঞ্চবিংশতি শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতাহেতু উপ-রাষ্ট্রপতিকে সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করিতে পারেন। এই আইনের বলে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস সভার অনুমোদনক্রমে একজন উপ-রাষ্ট্রপতিও মনোনীত করিতে পারেন। বর্তমান যুগে উপ-রাষ্ট্রপতি-পদের গুরুত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ, কোন কোন রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতিকে আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে ও বৈদেশিক ব্যাপারের সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজ্‌ভেল্ট উপ-রাষ্ট্রপতি ওয়ালেশের উপর অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি আইজেন্‌হাওয়ার উপ-রাষ্ট্রপতি নিক্‌সনকে মধ্য-প্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করিবার নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উপ-রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, প্রয়োজনক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইলে যাহাতে তিনি রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।

মার্কিন কেবিনেট—The U.S.A. Cabinet

শাসনপরিচালনা-কার্যে সাহায্য করিবার জন্য দশজন কর্মসচিব নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। এই দশজন বিভাগীয় কর্মসচিবকে লইয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণাসভা বা কেবিনেট গঠিত। উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই কেবিনেট সভা স্বীকৃত হয় নাই। বৃটিশ কেবিনেটের মতই যুক্তরাষ্ট্রীয় কেবিনেটও শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত একটা প্রথাগত সংস্থা। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি চারি বৎসর কালের জন্য ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং তিনি ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু বৃটিশ কেবিনেট সাধারণতঃ একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সম-মতাবলম্বী সদস্যদিগকে লইয়া গঠিত হয়। গ্রেট বৃটেনে কেবিনেট সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন ও এজন্য কিছু পরিমাণে তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিয়া লইলেও প্রধানমন্ত্রীর অধস্তন কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হন না। তাঁহারা সকলেই আইনসভার সদস্য ও আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা অনেক কম বলিয়া মনে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ বিভাগীয় কার্যনির্বাহক দপ্তরগুলির কর্মসচিবমাত্র, বৃটিশ কেবিনেটের সদস্যগণের মত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নহেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারেই তাঁহাদিগকে বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করিতে হয়। বৃটিশ কেবিনেটের সদস্যগণের মত বিভাগীয় কার্য-পরিচালনায় তাঁহাদের নিজস্ব কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই। তাঁহারা রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী মাত্র ও রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নহেন ও আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং আইনসভার নিকট তাঁহাদের ব্যক্তিগত বা যৌথ কোন দায়িত্ব নাই। তাঁহারা একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী এবং এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। সুতরাং কেবিনেট শাসনব্যবস্থা বলিতে সাধারণতঃ যে জাতীয় শাসনব্যবস্থা বুঝায়, যুক্তরাষ্ট্রের

কেবিনেট সভা তাহার পরিচায়ক নহে। কার্যতঃ এই সভা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অধস্তন কার্যনির্বাহক সংস্থামাত্র।

বৃটিশ কেবিনেট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট—British and the U.S.A. Cabinet Systems

বৃটিশ কেবিনেট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেটের মধ্যে কতকগুলি বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে অধিকতর মূলগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

সাদৃশ্য—Similarity

১। উভয় দেশের কেবিনেট সভাই প্রথাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—শাসনতান্ত্রিক আইনের দ্বারা ইহারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

২। বৃটেনের কেবিনেট সাধারণতঃ একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের—সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের—সদস্য লইয়া গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেটও রাষ্ট্রপতির সমর্থক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয়।

৩। বৃটেনে সরকারের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির মন্ত্রিগণকে লইয়া কেবিনেট গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দপ্তরগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব-গণকে লইয়া কেবিনেট গঠিত হয়।

৪। শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বৃটেনের রাজা প্রধানমন্ত্রিসহ অন্যান্য মন্ত্রিবর্গকে কেবিনেট সদস্য নিযুক্ত করেন; মার্কিন দেশেও রাষ্ট্রপতি তাঁহার কর্মসচিবগণকে নিয়োগ করেন।

৫। বৃটিশ কেবিনেট ব্যবস্থায় কেবিনেট সদস্যগণ সমপর্যায়ভুক্ত হইলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

উপরি-উক্ত সাদৃশ্যগুলি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সভাকে প্রকৃত কেবিনেট শাসনব্যবস্থা বলা যায় না। তাহার কারণ হইল যে, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় কেবিনেট শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব।

বৈসাদৃশ্য—Dissimilarity

১। বৃটিশ কেবিনেটের সদস্যগণকে পার্লামেণ্ট সভার সদস্য হইতেই

হইবে। তাঁহারা পার্লামেন্টের একটি কক্ষের সদস্য হিসাবে আইন-প্রণয়ন-কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির পূর্ণপ্রয়োগের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ কংগ্রেস সভার সদস্য নহেন এবং আইন-প্রণয়ন কার্যে তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।

২। বৃটেনে কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার বিশেষ করিয়া কমন্স সভার নিকট দায়ী এবং কমন্স সভার অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। আইনসভার সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই এবং আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাদের অপসারিত করিতে পারেন না।

৩। বৃটিশ কেবিনেট ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ঐক্যবদ্ধভাব এবং এই ঐক্য ও সংহতির উপর কেবিনেট ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সদস্যবৃন্দ যে শুধু এক রাজনৈতিক মতাবলম্বী হইবেন তাহা নহে, পার্লামেন্ট সভা সম্পর্কে সর্ববিষয়ে তাঁহাদের একমত হইতে হইবে। আইনসভা কর্তৃক একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগ করিতে হয়। বৃটেনে মন্ত্রিগণের যৌথ দায়িত্ব বর্তমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিগণের এরূপ কোন যৌথ দায়িত্ব নাই। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। রাষ্ট্রপতি যে-কোন সদস্যকে এককভাবে পদচ্যুত করিতে পারেন।

৪। বৃটিশ কেবিনেটের সিদ্ধান্তগুলি সাধারণতঃ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করিলেও তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

৫। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হইলেন সমপদস্থ সহকর্মিবর্গের নেতা এবং তাঁহার এই নেতৃত্বের জন্য সহকর্মিগণ তাঁহার আনুগত্য ও অগ্রাধিকার স্বীকার করেন।

অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন কেবিনেট সভার সর্বাধিনায়ক। কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহার অধস্তন কর্মচারী মাত্র, সহকর্মী নহেন।

৬। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ কেবিনেট সভা দেশের প্রকৃত-শাসনক্ষমতার অধিকারী একটি সংস্থা, অপর পক্ষে মার্কিন কেবিনেট হইল রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণাসভা মাত্র। রাষ্ট্রপতিই হইলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

মার্কিন কেবিনেটের বিভিন্ন বিভাগ—Cabinet Departments in the U. S. A.

মার্কিন কেবিনেট বিগত ১৭৪ বৎসর ধরিয়া গঠিত হইয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর দপ্তর ও অর্থমন্ত্রীর দপ্তর লইয়া রাষ্ট্রপতির কেবিনেটের সূত্রপাত হয়। তারপর দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমে ক্রমে আরও আটটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়া বর্তমানে কেবিনেটের দপ্তর সংখ্যা দশ হইয়াছে। বিভাগগুলি হইল :

১। রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী—The Secretary of State

রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী হইলেন পররাষ্ট্র বিভাগের মুখ্যসচিব ও রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। অনেক রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীকে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করিয়া থাকেন। এই কারণে মার্কিন কেবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে রাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত সন্ধি বা চুক্তিপত্র এই দপ্তরেই রক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সীল-মোহরও তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকে। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে অন্যান্য সদস্যগণ অপেক্ষা তিনিই অগ্রাধিকার পাইয়া থাকেন এবং কেবিনেট সভায় রাষ্ট্রপতির দক্ষিণে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট থাকে। এই সকল কারণে অন্যান্য কেবিনেট সদস্যগণের সম-পর্যায়ভুক্ত হইলেও রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীর মর্যাদা ও প্রাধান্য বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রত্যেক সদস্যই বাৎসরিক ১৫,০০০ ডলার বেতন পাইয়া থাকেন।

২। অর্থমন্ত্রী—The Secretary of the Treasury

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থবিভাগের কর্তা হইলেন অর্থমন্ত্রী এবং ইঁহার কাজ অনেকটা বৃটিশ চ্যান্সেলর অব দি এক্স-চেকারের অনুরূপ। অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের কাজ

হইল—যুক্তরাষ্ট্রীয় কর আদায়, জাতীয় কোষাগার হইতে প্রয়োজনীয় অর্থদান, মুদ্রা প্রস্তুত-করণ, কর ফাঁকি ও জালমুদ্রা সম্বন্ধে তদন্ত করা ইত্যাদি।

৩। আইনমন্ত্রী—The Attorney-General

ইনি বিচার-বিভাগের কর্তা এবং রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস ও অন্যান্য সরকারী বিভাগগুলির আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের পরামর্শদাতা। অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া অপরাধীর বিচারকার্য ও শাস্তির ব্যবস্থা করা এই বিভাগের কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

৪। ডাক ও তার বিভাগীয় মন্ত্রী—Minister of the Post Office Department

এই বিভাগ কর্তৃক ডাক, তার ও বেতার পরিচালিত হয়। কার্যতঃ এই বিভাগটি হইল সরকারী একটি বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—ইহার বাৎসরিক আর্থিক আদান-প্রদানের পরিমাণ হইল ৭১০ মিলিয়ন ডলার এবং প্রায় ৩ লক্ষ কর্মী এই বিভাগের কার্যে নিযুক্ত আছে।

৫। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী—Minister of the Department of the Interior

এই বিভাগ আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের ভারপ্রাপ্ত। সরকারী জমি ক্রয়-বিক্রয়, জরীপ, রেড ইণ্ডিয়ানদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, খনিজীবীদের নিরাপত্তা, এলাস্কার অধিবাসীদের শিক্ষা এবং ভার্জিন দ্বীপ প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকৃত স্থানগুলির শাসনব্যবস্থা এই বিভাগ পরিচালনা করে।

৬। কৃষি মন্ত্রী—Minister of Agriculture

কৃষির উন্নতির জন্য কৃষিসহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন, বন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং খাদ্য ও ঔষধ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ করা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কার্য।

৭। বাণিজ্য মন্ত্রী—Minister of Commerce

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ব্যতীতও এই বিভাগ লোকগণনা, আলোক-স্তম্ভ, রাসায়নিক গবেষণাগার, ওজন, পেটেন্ট প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।

৮। শ্রমমন্ত্রী—Minister of Labour

যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্রমজীবীদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করাই হইল এই বিভাগের কার্য। এই উদ্দেশ্যে শ্রমজীবী সম্পর্কে বিবিধ তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশেষ করিয়া নারী শ্রমজীবিগণের বিশেষ উন্নতিসাধান করা এই বিভাগের কর্তব্য।

৯। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—The Minister of Defence

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এই বিভাগের কার্য।

১০। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ মন্ত্রী—Minister of Health, Education and Welfare

জাতির স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামগ্রিক কল্যাণসাধন এই বিভাগের কর্তব্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—Federal Legislature

কংগ্রেস—The Congress

দুইটি পরিষদ লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা বা কংগ্রেস গঠিত। উচ্চ পরিষদ সিনেট (Senate) নামে অভিহিত হয় ও নিম্ন পরিষদকে প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) বলা হয়। মূল রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি লইয়া সিনেট সভা গঠিত হয়, আর সমগ্র জাতির প্রতিনিধি লইয়া প্রতিনিধি পরিষদ্ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হইল, জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন-পরিষদের দুইটি কক্ষের সংগঠন পদ্ধতির মধ্য দিয়া এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী নীতির সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

কংগ্রেস সদস্যগণের বেতন, অধিকার ও নিষ্কৃতি—Salary, Privileges and Immunities of Congressmen

সিনেট ও প্রতিনিধিপরিষদ—উভয় কক্ষের সদস্যগণই আইন দ্বারা নির্ধারিত বাৎসরিক ২২,০০০ ডলার বেতন পাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া, তাঁহারা সরকারী কার্যের জন্য ভ্রমণ, চিকিৎসা ব্যয় প্রভৃতি বাবদ অর্থ পাইয়া থাকেন। অবসর গ্রহণের পরও বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। উভয় কক্ষের সদস্যগণই

বাক্-স্বাধীনতার অধিকারী। সভাকক্ষে কোন সদস্য কর্তৃক-প্রদত্ত বক্তৃতার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা যায় না। সভার অধিবেশনে গমন এবং সভা হইতে প্রত্যাগমনকালে কোন দেওয়ানী আইন বলে তাঁহাদের উপর কোন নির্দেশ বলবৎ করা যায় না।

কংগ্রেস সভার ক্ষমতা—Powers of the Congress

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভা বৃটিশ পার্লামেন্টের ন্যায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলেও ইহা অন্য নানাবিধ ক্ষমতার অধিকারী। এই সভার ক্ষমতা প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা (১) আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ও (২) আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত বহির্ভূত ক্ষমতা।

এই সভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সম্পর্কে বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে এই সভা সর্ববিধ আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এ সম্পর্কে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আইন-প্রণয়ন বহির্ভূত ব্যাপারেও এই সভা বহু ক্ষমতার অধিকারী, যথা,

১। শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা—Executive Functions

(ক) শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি যে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করেন, তাহা কংগ্রেস বিশেষ করিয়া সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। কার্যতঃ এই সকল পদের প্রার্থিগণকে রাজ্য ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির দলের কংগ্রেস সদস্যগণ মনোনয়ন করেন এবং রাষ্ট্রপতি এইরূপ মনোনীত প্রার্থিগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করেন। (খ) রাষ্ট্রপতির অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বে পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি-চুক্তিগুলি সম্পাদিত হয় কিন্তু এই চুক্তিগুলি কার্যকর হইতে হইলে সিনেট সভার অনুমোদন অপরিহার্য। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইল্সন কর্তৃক সম্পাদিত ভার্সাই শান্তি-চুক্তি সিনেট সভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরবর্তীকাল হইতে বিচক্ষণ রাষ্ট্রপতিগণ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই সিনেটের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করিয়া চুক্তি সম্পাদন করেন। (গ) রাষ্ট্রপতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁহার কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু এই কর্তব্য পালনের ব্যয়ভার সমগ্রভাবে কংগ্রেস সভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। (ঘ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রচারিত যুদ্ধ ঘোষণাও কংগ্রেস সভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

২। নির্বাচন-সংক্রান্ত ক্ষমতা---Electoral Functions

প্রতি চতুর্থ বৎসরে কংগ্রেসের উভয় কক্ষ সম্মিলিত অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গণনা করে। কোন প্রার্থী রাষ্ট্রপতি বা উপ রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পাইয়া নির্বাচিত না হইলে কংগ্রেসের উভয় কক্ষ বিশেষ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে।

৩। বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা---Judicial Functions

রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে এই সভা মহা-অভিযোগ (Impeachment) আনয়ন করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধি-পরিষদ অভিযোগ আনয়ন করে এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সিনেট বিচার-কার্য পরিচালনা করে। শাস্তি-প্রদানের ক্ষেত্রে ⅔ সংখ্যক সদস্য কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত হওয়া চাই।

৪। তদন্ত করিবার ক্ষমতা---Investigative Functions

জনপ্রতিনিধি হিসাবে আইনসভার অন্যতম প্রধান কার্য হইল শাসনকার্য পরিচালনার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা যাহাতে শাসন কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে বিরত থাকে। সরকারী কার্য পরিচালনায় কোন দুর্নীতি বা অপবাদের ক্ষেত্রে সিনেট সভা বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ ও দলিলপত্রাদি তলব করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি নিকসনের শাসনপরিচালনা-কার্যে দুর্নীতির অভিযোগের এইরূপ তদন্ত চলিতেছে।

৫। সভার কার্য পরিচালনা-সংক্রান্ত ক্ষমতা---Supervisory Function

উভয় কক্ষ ইহার অধিবেশনের নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। অধিবেশনের সময় সভা ইহার সদস্যগণকে নিয়মানুবর্তী হইতে ও শিষ্টাচরণে বাধ্য করিতে পারে। যদি কোন সাধারণ নাগরিক ইহার কার্যক্রম বা পদ্ধতিতে বাধা সৃষ্টি করে, সেরূপ ক্ষেত্রে সভা সাধারণ নাগরিককেও সভার নিয়মানুযায়ী শাস্তি প্রদান করিতে পারে।

৬। সংবিধান-গত ক্ষমতা—Constituent Power

কংগ্রেসের উভয় কক্ষ সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। উত্থাপিত প্রস্তাব কি পদ্ধতিতে অনুমোদিত হইবে এবং অনুমোদনের সময়-সীমা নির্ধারণ ব্যাপারে একমাত্র কংগ্রেস সভাই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

এত ক্ষমতা সত্ত্বেও কংগ্রেস সভা এক অ সার্বভৌম আইনসভা (Non-sovereign Law-making body) বলিয়া পরিচিত। বৃটিশ পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা স্বৈর, কোন উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্তৃপক্ষ হইতে উহা উদ্ভূত নহে। বৃটিশ পার্লামেন্ট সভা সর্ববিধ আইন প্রণয়ন করিতে পারে, এবং সর্ববিধ আইনের সংশোধন ও পরিবর্জন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল পার্লামেন্ট সভা। পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক রচিত কোন আইনই কোন বিচারালয় বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে না। এক কথায় পার্লামেন্ট সভা আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত। কংগ্রেস সভার আইন প্রণয়ন ব্যাপারে কোন স্বৈর ক্ষমতা নাই। ইহার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত ও এই শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ইহার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস সভা-প্রণীত প্রত্যেকটি আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন-সাপেক্ষ : রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিতে না পারিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অননুমোদিত আইন পুনরায় কংগ্রেস সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমোদনে আইনের মর্যাদা লাভ করিতে পারে। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করা সহজসাধ্য নয়। তৃতীয়তঃ, বৃটিশ পার্লামেন্টের মত কংগ্রেস সভা শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার অধিকারী নহে। শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। চতুর্থতঃ, কংগ্রেস সভা যদি শাসনতন্ত্রে বহির্ভূত কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রীম কোর্ট উক্ত আইনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

শাসনতন্ত্র হইল সর্বক্ষমতার আধার, আর সুপ্রীম কোর্ট হইল এই ক্ষমতার রক্ষক। সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখিতে সহায়তা করে। ফলে আইনসভার ক্ষমতা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

সিনেট সভার সংগঠন ও কার্যকলাপ—Composition and Functions of the Senate

প্রত্যেকটি মূল রাষ্ট্র হইতে সমান প্রতিনিধিত্ব নীতির ভিত্তিতে দুইজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া বর্তমানে মোট একশত সদস্য দ্বারা সিনেট সভা গঠিত। বর্তমানে সিনেট সভার সদস্যগণ মূল রাষ্ট্রগুলির জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সিনেটের সদস্যগণের অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততপক্ষে নয় বৎসর কাল স্থায়িভাবে বসবাসকারী হওয়া চাই। সদস্যগণ ছয় বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন ও এই সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে যিনি উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন, তিনিই সিনেট সভার সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। প্রত্যেক নূতন অধিবেশন বসিবার পূর্বে সিনেট সভা ইহার সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া কতকগুলি বিশেষ কার্যকরী সংস্থা (Committee) নিয়োগ করে ; যথা, অর্থবিষয়ক সংস্থা, পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত সংস্থা ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমেই প্রধানতঃ সিনেট সভা ইহার কার্য পরিচালনা করে।

(ক) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা—Legislative Powers

অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন-ব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সিনেট সভার আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা প্রতিনিধি-পরিষদের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অনেক সময় সিনেট সভা কর্তৃক আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রতিনিধি-পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত বিল সিনেটের অনুমোদন ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইতে পারে না। সিনেট সভার কার্যকাল দীর্ঘতর বলিয়া অনেকক্ষেত্রে প্রতিনিধি-পরিষদ আইন-প্রণয়নের দায়িত্ব সিনেট সভার হস্তে ন্যস্ত করে। সিনেট অর্থ-সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব উত্থাপন

করিতে পারে না। আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রতিনিধি-পরিষদেই প্রথম উত্থাপিত হয়। কিন্তু যখন এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সিনেট সভায় প্রেরিত হয়, তখন সিনেট সভা ব্যাপকভাবে এই প্রস্তাবগুলির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। বস্তুতঃ, সিনেট সভা এই আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব-গুলি সংশোধন করিবার এইরূপ সুদূরপ্রসারী ক্ষমতার অধিকারী যে, এই প্রস্তাবগুলির নাম ব্যতীত ধারা ও উপধারাগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করিতে পারে। সিনেট কর্তৃক সংশোধিত প্রস্তাবগুলি যখন ইহাদের প্রস্তাবকগণের নিকট প্রেরিত হয় তখন এই বিলের প্রস্তাবকগণের পক্ষে বিলটিকে তাঁহাদের উত্থাপিত বিল বলিয়া স্থির করা দুষ্কর হয়।

(খ) শাসন-সংক্রান্ত-ক্ষমতা—Executive Powers

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যাহাতে যথেচ্ছভাবে শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে না পারেন, সেজন্য সিনেট সভাকে রাষ্ট্রপতির কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার কয়েকটি ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ, কেবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইন অনুসারে প্রত্যেকটি নিয়োগের জন্য সিনেট সভার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ইহার অনুমোদন লাভ করিতে হয়। সিনেটের অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রীয় কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সাময়িকভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু এই নিয়োগগুলি সিনেটের পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়া চাই। নতুবা পরবর্তী অধিবেশন সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়।

বর্তমানে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত নিয়োগ করেন, সেই নিয়োগগুলির জন্য কার্যতঃ সিনেট সভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। এই নিয়োগ সম্পর্কে একটি নূতন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যে মূলরাষ্ট্রে নবনিযুক্ত কর্মচারীকে বহাল করেন, সেই মূলরাষ্ট্রের নির্বাচিত সিনেট সদস্যগণ যদি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নূতন নিয়োগ অনুমোদন করেন তাহা হইলে সাধারণতঃ সিনেট সভা ঐ নিয়োগ অনুমোদন করিয়া থাকে। এই প্রথাকেই সিনেট সভার শিষ্টাচার (Senatorial courtesy) বলা হয়।

আর একটি ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সংযত রাখিবার উদ্দেশ্যে সিনেট

সভার উপর শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি অপর রাষ্ট্রের সহিত চুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারেন, কিন্তু সিনেট সভার পরামর্শ ও অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকরী হয় না। রাষ্ট্রপতি দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি শুধুমাত্র সিনেট সভার সাধারণ সংখ্যাধিক্যের অনুমোদনে গৃহীত হইতে পারে না; এজন্য সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন অপরিহার্য। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন্ সিনেট সভার সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সিনেট সভা এই চুক্তি অনুমোদন না করার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে এ চুক্তি কার্যকরী হয় নাই ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল না। রাষ্ট্রপতি দ্বারা স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধি-চুক্তি অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিয়া সিনেট সভা যে রাষ্ট্রপতি দ্বারা সর্বক্ষেত্রে প্রভাবিত হয় না তাহা প্রমাণ করিল। ইহাতে পরবর্তী কালের রাষ্ট্রপতিগণ সিনেট সভার পরামর্শ গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন।

(গ) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—Judicial Powers

সিনেটের উপর কিছু বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতাও অর্পিত হইয়াছে। রাষ্ট্রদ্রোহ, উৎকোচ-গ্রহণ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দের বিচারকার্য (Impeachment) সিনেট কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রতিনিধি-পরিষদ্ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবে এবং এই অভিযোগের বিচার করিতে পারে একমাত্র সিনেট সভা। সিনেট সভা যখন এইরূপ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বিচারকার্য পরিচালনা করে, তখন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে হইলে সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন অপরিহার্য।

(ঘ) অন্যান্য ক্ষমতা—Miscellaneous Functions

এতদ্ব্যতীত সিনেট সভা আরও কতিপয় প্রথাভিত্তিক কার্য সম্পাদন করে। সরকারী কার্য পরিচালনায় কোন দুর্নীতি বা অপবাদের ক্ষেত্রে

সিনেট সভা বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারে। এইজন্য তদন্ত কমিটির সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ ও দলিলপত্রাদি তলব করিবার ক্ষমতা আছে। সিনেট সভা প্রতিনিধি-পরিষদের সহিত শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে এবং নবগঠিত কোন রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাজ্যভুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারে; উপ-রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থীই নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য ভোটপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সিনেট সভা সর্বাধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত দুইজন প্রার্থীর মধ্য হইতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিয়া থাকে।

সিনেট সভার গুরুত্বের কারণ—Causes of the Importance of the Senate

লর্ড ব্রাইসের মতে অন্যান্য দেশের উচ্চ পরিষদের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। ফরাসী দেশের নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ইহার উচ্চ পরিষদের (Senate) আইন-প্রণয়ন বিষয়ে বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে। সেখানে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে হইলে উচ্চ পরিষদের সম্মতির প্রয়োজন হয় কিন্তু কি সাধারণ আইন, কি অর্থ সংক্রান্ত আইন ইহার সম্মতি ব্যতিরেকেই পাস করা যায়। ফরাসী দেশের বর্তমান উচ্চ পরিষদ পূর্বতন উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ সিনেট সভার ক্ষমতা বা পদমর্যাদার অধিকারী হইতে পারে নাই। নিম্ন পরিষদই কার্যতঃ সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী। বৃটেনে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্ট আইন দ্বারা ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ঐ আইন সংশোধিত হইয়া লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে। এই পার্লামেন্ট আইন পাস হইবার ফলে লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই আইন পাস করা সম্ভব হইয়াছে। অর্থ-সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে লর্ড সভার প্রস্তাব উত্থাপন করিবার বা সংশোধন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। এক বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ছাড়া লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত বা শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতার অবসান ঘটিয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী।

সুইজারল্যাণ্ডে উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ নিম্নপরিষদই প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা সম্পর্কে বলা যায় যে, এই সভা নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ দেখা যায় যে, সিনেট সভা অধিকতর সক্রিয়ভাবে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। নিম্ন পরিষদের কার্যকাল মাত্র দুই বৎসরে সীমাবদ্ধ; অপরপক্ষে, সিনেটের কার্যকাল ছয় বৎসর। স্বল্পকালস্থায়ী প্রতিনিধি-পরিষদ এইজন্য কোন দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব সাধারণতঃ গ্রহণ করে না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি সিনেটের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, অর্থ-সংক্রান্ত কোন বিল সিনেট সভায় উত্থাপিত না হইতে পারিলেও সিনেট সভা ব্যাপকভাবে এই বিলগুলির সংশোধন করিতে পারে। সিনেট সভা তাহার এই সংশোধন-ক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করে যে, অর্থ-সংক্রান্ত বিলের এক নাম ছাড়া ইহার বিস্তারিত ধারা-উপধারাগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর অন্য কোন দেশের উচ্চ পরিষদের এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ, সিনেট সভা রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যেকটি নিয়োগ সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত প্রত্যেকটি চুক্তির বৈধতা সিনেট সভার পরামর্শ ও অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য পদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে একমাত্র সিনেট সভাই এই অভিযোগের বিচার করিবার অধিকারী।

সিনেট সভার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার অনুমোদন ব্যতীত নিম্ন পরিষদ কোন বিল আইনে পরিণত করিতে পারে না। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন না করিতে পারিলেও ইহার অপরিসীম সংশোধন ক্ষমতা আছে। একদিকে রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া সিনেট সভা স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবে বাধা দেয়, অপরদিকে নিম্ন পরিষদের অত্যধিক গণতান্ত্রিক হঠকারিতার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে।

সিনেট সভার এই অধিকতর ক্ষমতার প্রথম কারণ হইল যে, সিনেট সভা অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক—মাত্র একশত জন—সদস্য লইয়া গঠিত, সুতরাং স্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করিবার পক্ষে আদর্শ আইন-পরিষদ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার কার্যকালও দীর্ঘতর। ছয় বৎসরকাল স্থায়ী বলিয়া সিনেট সভা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করিতে পারে ও নিম্ন পরিষদ স্বল্পস্থায়ী বলিয়া সিনেটের হস্তেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন কার্যের ভার অর্পণ করে। তৃতীয়তঃ, সিনেট সভার সদস্যগণ অধিক বয়স্ক ও অপেক্ষাকৃত অধিকতর অভিজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের সদস্যগণ সাধারণতঃ নিম্ন পরিষদে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং এই সমস্ত কারণে দেশে ও বিদেশে সিনেটের সদস্যগণকে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী বলিয়া মনে করা হয়। চতুর্থতঃ, সিনেট সভার সদস্যগণ বর্তমানে আর মূলরাষ্ট্রগুলির আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র নহেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে মূলরাষ্ট্রের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা অধিকতর নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। সিনেট সভার অধিকতর গুরুত্বের আর একটি কারণ হইল যে, সিনেট সভার সদস্যগণ দল-নিরপেক্ষভাবে পরিষদের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা অবহিত থাকেন। পরিষদের ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষা করিবার একান্ত প্রচেষ্টা তাঁহাদিগকে দলীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একতাবদ্ধ করিয়াছে। যখনই কোন রাষ্ট্রপতি সিনেট সভার গৌরবময় ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করিবার ক্ষীণতম প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তখনই সিনেট সভা একযোগে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। সিনেটের এই ঐক্য ও সংহতি ইহার শক্তির একটি প্রধান উৎস। সিনেট সভার উপর শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে বলা যায় যে, সিনেট সভা সে গুরুদায়িত্ব এযাবৎকাল দক্ষতার সহিত পালন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ও ইংলণ্ডের লর্ড সভা—The American Senate and the British House of Lords

গ্রেট বৃটেনের লর্ড সভা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আইনসভা অপেক্ষা

অধিকতর প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে এবং এই প্রাচীনত্বের জন্য এই সভার যে একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য আছে তাহা অন্য কোন আইনসভার নাই। বৃটিশ পার্লামেন্ট লর্ড সভা ও কমন্স সভা লইয়া গঠিত এবং লর্ড সভা হইল উচ্চ কক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেস সিনেট ও প্রতিনিধি-পরিষদ এই দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। লর্ড সভার মতই সিনেট হইল মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষ।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ও বৃটেনের লর্ড সভা—উচ্চ কক্ষ হিসাবে এই উভয়ের তুলনামূলক বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। গঠনপ্রকৃতি, কর্মপদ্ধতি এবং ক্ষমতার পরিধি—যে-কোন দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, এই উভয় কক্ষের পার্থক্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়া দেখা যায় যে, লর্ড সভা কাহারও প্রতিনিধি নহে। এই সভার ৯২৬ জন সদস্যের মধ্যে কতিপয় ধর্মযাজক লর্ড ও আইনজ্ঞ লর্ড ব্যতীত অধিকাংশ সদস্যই উত্তরাধিকারসূত্রে এই সভায় স্থান গ্রহণ করেন। ইঁহারা কাহারও নিকট দায়ী নহেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এরূপ স্ব-নির্বাচিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত সদস্য-সমন্বিত আইনসভা অচিন্তনীয় ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সভার কর্ম-পরিচালনার একটি নিয়ম হইল যে, ৯২৬ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র তিনজন উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য চলিতে পারে এবং কোন বিল অনুমোদন করিতে হইলে ৩০ জন সদস্যের উপস্থিতি যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। এই নিয়মটি হইতে উচ্চ কক্ষ হিসাবে লর্ড সভার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সহজে অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত সদস্যগণ আজীবন সদস্য হিসাবে এই সভায় স্থান গ্রহণ করেন। সুতরাং জনমতের প্রভাব ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভাকে লর্ড সভার ঠিক বিপরীত বলা যাইতে পারে। আয়তন ও লোকসংখ্যা-নির্বিচারে প্রতি রাজ্য হইতে দুইজন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য লইয়া সিনেট সভা গঠিত। বর্তমানে সদস্যসংখ্যা হইল ১০০। সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং বলা যায় যে, লর্ড সভার গঠন-

প্রকৃতি গণতান্ত্রিক নীতি-বিরোধী, আর সিনেট সভার গঠনপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র-সম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কর্মপদ্ধতির দিক দিয়া বিচার করিলেও সিনেটের যে সজীবতা ও কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়, লর্ড সভায় তাহা কখনও দৃষ্ট হয় না। কি সাধারণ আইন কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন—উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে সিনেট সভা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে যাহা লর্ড সভায় আদৌ দেখা যায় না।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই উভয় কক্ষের পার্থক্য আরও স্পষ্টতর হয়। লর্ড সভাকে সাধারণতঃ সংশোধনী সভা (Revising body) বলা হয়। আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা থাকিলেও আইন-প্রণয়নে বর্তমানে ইহার আর কোন অনুপ্রেরণা নাই। এক বৎসরের অধিক কাল এই সভা নিম্ন কক্ষের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতায় বাধা দিতে পারে না। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহার কোন ক্ষমতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—মাত্র তিনমাস কাল অর্থ-সংক্রান্ত আইন পাস করিতে বাধা দিতে পারে। সুতরাং হয় নিম্ন কক্ষের প্রস্তাবে সম্মতিদান করা নতুবা সাময়িক কালের জন্য বাধা দেওয়াই হইল বর্তমানে লর্ড সভার আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক প্রধান কার্য। সুতরাং আইন-সভার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড সভার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত শাসনকর্তৃপক্ষ (কেবিনেট) ইহার নিকট দায়ী নহে। বর্তমানে লর্ড সভার কোন সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হইতে পারেন না। তবে ২।৪ জন মন্ত্রী লর্ড সভা হইতে নিযুক্ত হন। ইহার মধ্যে লর্ড সভার সভাপতি লর্ড চ্যান্সেলর বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ক্ষমতা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, উচ্চ কক্ষ হিসাবে এই সভা সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ব্যাপক পরিবর্তন সাধনে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সিনেট সভা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উচ্চ কক্ষ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন্ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধি-চুক্তিতে সম্মতিদান না করিয়া সিনেট ইহার স্বাধীন সত্তার পরিচয় দিয়াছে। সিনেট সম্পর্কে বলা যায় যে, এই সভা একদিকে রাষ্ট্রপতির শাসন-সংক্রান্ত কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবে বাধা দেয়, অপর-

দিকে নিম্ন পরিষদের অত্যধিক গণতান্ত্রিক হঠকারিতার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে।

বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার দিক দিয়াও উভয় উচ্চ কক্ষের তুলনা করা যাইতে পারে। গোষ্ঠিভুক্ত লর্ডগণের বিচার (যদিও বর্তমানে পরিত্যক্ত). পদস্থ রাজপুরুষগণের বিচার করা ব্যতীতও লর্ড সভা বৃটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালতের কার্য সম্পাদন করে। তবে আইনের বাধা না থাকিলেও মাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই এই সর্বোচ্চ আপীল আদালত গঠন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। তবে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনেটের অনুমোদন অপরিহার্য। ইহা ব্যতীত নিম্নকক্ষের অভিযোগে সিনেট সভা বৃটেনের লর্ড সভার অনুরূপ-ভাবে পদস্থ কর্মচারিগণের বিচার করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করেন।

লর্ড সভা ও সিনেট সভার মধ্যে বর্তমানে এই ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে, মার্কিন শাসনতন্ত্রের আদি রচয়িতাগণ লর্ড সভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সিনেট সভাকে রূপায়িত করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট আইন পাস হওয়ার পূর্ববর্তী কালে উচ্চ কক্ষ হিসাবে লর্ড সভা শুধু প্রাচীনতম ছিল না, ক্ষমতায় ও ঐতিহ্যে লর্ড সভা ছিল পৃথিবীর আদর্শ স্থানীয় উচ্চ কক্ষ। লর্ড সভা সাধারণ আইন-প্রণয়নে অগ্রণী ছিল, অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পরিবর্তন করিতে পারিত এবং লর্ড সভা হইতেই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইতেন। সুতরাং সেই সময় লর্ড সভাই ছিল বৃটিশ শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। তাই লর্ড সভার আদর্শে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভাকে শক্তিশালী করিয়া গঠন করা হইয়াছিল। সময়ের পরিবর্তনে লর্ড সভা আজ ক্ষমতাচ্যুত, আর সিনেট সভা স্বমহিমায় ক্ষমতাসীন।

প্রতিনিধি-পরিষদের সংগঠন—Composition of the House of Representatives

চারশত সাঁইত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত প্রতিনিধি-পরিষদ হইল যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষ। প্রতিনিধিগণ অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হইবেন ও তাঁহাদের অন্ততঃপক্ষে সাত বৎসরকাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী হইতে হইবে

এবং যে জিলা হইতে তাঁহারা নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন, সেই জিলার অধিবাসী হইতে হইবে। মূলরাষ্ট্রগুলির এলাকা-নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দুই বৎসরের জন্য প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বর্তমানে প্রত্যেক ৩,৪৫০০০ জনসংখ্যা প্রতি একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। শাসনতান্ত্রিক বিধানানুসারে প্রত্যেক রাজ্য হইতে অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতেই হইবে। প্রতিনিধি-পরিষদের একজন সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তিনি সভার কার্য পরিচালনা করেন। বৃটেনের কমন্স সভার স্পীকারের মত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার দল-নিরপেক্ষ নহেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে স্পীকার নিযুক্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং কমন্স সভার স্পীকার তাঁহার পক্ষপাতশূন্য দল-নিরপেক্ষতার জন্য যে মর্যাদার অধিকারী, তিনি সে মর্যাদার অধিকারী হইতে পারেন না।

প্রতিনিধি-পরিষদে বর্তমানে কুড়িটি বিশেষ কার্যকরী সংস্থা আছে। কোন বিল আইনসভায় পেশ হইলে প্রথম পাঠের পরই উহা এইরূপ একটি বিশেষ সংস্থার নিকট প্রেরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা—Powers of the House of Representatives

প্রত্যেকটি আইনের খসড়া প্রতিনিধি-পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে আইনে পরিণত হইতে পারে না। প্রতিনিধি-পরিষদ সকল প্রকার আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে এবং অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার একমাত্র অধিকারী হইল প্রতিনিধি-পরিষদ। প্রতিনিধি-পরিষদের যে-কোন সদস্যই আইনের প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন। এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণ কমন্স সভার সদস্যগণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। গ্রেট বৃটেনে বে-সরকারী সদস্যগণের আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। সেখানে আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা সাধারণতঃ কেবিনেট সদস্যগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে, সুতরাং বে-সরকারী সদস্যগণের পক্ষে কেবিনেটের সমর্থন ব্যতিরেকে কোন প্রস্তাব

আইনে পরিণত করা কার্যতঃ একরূপ অসম্ভব। আইন-প্রণয়ন বিষয়ে মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের সভ্যগণের অব্যাহত ক্ষমতা থাকিলেও অন্য একটি বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা কমন্স সভার সদস্যগণের ক্ষমতা অপেক্ষা কম। কমন্স সভা কেবিনেট সভার নীতি ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদের হস্তে শাসনকর্তৃপক্ষের কার্যের উপর আদৌ কোন ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল সিনেট সভা। অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি-পরিষদ শাসনকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধি-পরিষদকে আহ্বান করিতে পারেন না, ইহার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন না বা প্রতিনিধি-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু গ্রেট বৃটেনে রাজা কমন্স সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। সিনেট সভার সহিত একযোগে প্রতিনিধি-পরিষদ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। ইহা যে-কোন বিষয়ে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যদি কোন প্রার্থী সংখ্যাধিক্য ভোট না পায় তাহা হইলে প্রতিনিধি-পরিষদ একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে।

ইংলণ্ডের কমন্স সভা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদ —British House of Commons and American House of Representatives

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শাসনব্যবস্থার উপর জনগণের প্রভাব সাধারণতঃ আইনসভার নিম্নকক্ষের গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং আইনসভার নিম্নকক্ষের গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদ বৃটিশ কমন্স সভার আদর্শে গঠিত

হইলেও পরিবেশের পার্থক্যের জন্য এই উভয় কক্ষের গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। সদস্যসংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ৪৩৭ জন সদস্য-সমন্বিত মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা বৃটিশ কমন্স সভা বৃহত্তর, কারণ ইহার সদস্যসংখ্যা হইল ৬৩৫। মার্কিন প্রতিনিধিগণ অন্ততঃ সাত বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ২৫ বৎসর বয়স্ক নাগরিক হইবেন এবং যে রাজ্য এলাকা হইতে নির্বাচিত হইবেন, সেই এলাকার অধিবাসীও হইতে হইবে। বর্তমানে প্রথাগত বিধান অনুযায়ী তাঁহাকে তাঁহার নির্বাচন এলাকারও অধিবাসী হইতে হইবে। অপরপক্ষে ইংলণ্ডে কমন্স সভার সদস্যগণের অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই এবং নির্বাচন এলাকায় অন্ততঃ তিনমাস বসবাস করা চাই। উভয় দেশেই নির্বাচন ব্যাপারে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উভয় দেশে সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হইলেও ইংলণ্ডের কমন্স সভা মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর প্রতিনিধিমূলক আইনসভা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে প্রতি ৭০,০০০ লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৩১৮,০০০ জন লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সুতরাং মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা কমন্স সভা চারগুণ অধিক প্রতিনিধিমূলক।

উভয় দেশের নিম্ন কক্ষের কার্যকালের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কমন্স সভার কার্যকাল হইল পাঁচ বৎসর, যদিও তৎপূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের কার্যকাল মাত্র দুই বৎসর এবং স্বল্প স্থায়িত্বের জন্য ইহার ক্ষমতা ও মর্যাদা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইংলণ্ডে রাজা কমন্স সভা আহ্বান করেন, প্রতিনিধি-পরিষদ শাসনতন্ত্র নির্ধারিত সময়ে সমবেত হয়।

গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতার দিক দিয়া উভয় কক্ষের পার্থক্য আরও স্পষ্টতর। উভয় কক্ষই সভার কার্যপরিচালনা করিবার জন্য সভাপতি (স্পীকার) নির্বাচিত করে। নির্বাচনের পর কমন্স সভার স্পীকার দল-নিরপেক্ষভাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করেন। অপরপক্ষে প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার দলবিশেষে প্রতিনিধি হিসাবে সক্রিয়ভাবে বিতর্কে যোগদান করেন।

উভয় কক্ষের স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থায়ও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলির সংখ্যা কমন্স সভার কমিটিগুলির সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইলেও এক অর্থ কমিটি ব্যতীত অন্যান্য কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদের কমিটিগুলির চেয়ারম্যান সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। কমন্স সভায় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন ব্যাপারে বয়স অপেক্ষা যোগ্যতার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত কমন্স সভায় সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিল (Public Bill) ও বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলের (Private Bill) মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা হয়, প্রতিনিধি-পরিষদে আনীত বিলগুলির মধ্যে সেরূপ কোন পার্থক্য আদৌ করা হয় না। ইংলণ্ডে কমন্স সভা কর্তৃক আনীত বিলগুলির নীতি দ্বিতীয় পাঠ দ্বারা সুনির্ধারিত হইলে তারপর কমিটিতে পাঠান হয়, কিন্তু প্রতিনিধি-পরিষদে উত্থাপিত বিলগুলি প্রথম পাঠের পরই কমিটিতে প্রেরিত হয়। সুতরাং ইংলণ্ডে বিলগুলির নীতি-নির্ধারণে কমন্স সভা যে সুযোগ পায়, মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ সে সুযোগ পায় না। এই ব্যবস্থার দ্বারা কমিটিগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর একটি বিষয়েও উভয় পরিষদের সংগঠনের পার্থক্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ সর্বদাই কর্মব্যস্ত। সদস্যগণ প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। অপর পক্ষে কমন্স সভায় এরূপ কোন কর্মব্যস্ততা বা সজীব বিতর্ক প্রায়শঃই বিরল। সদস্যগণের উপস্থিতির সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। ইংলণ্ডে কমন্স সভার এই ক্রিয়াশীলতার অভাবের কারণ হইল ইহার পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় দলের নেতাগণ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন এবং তাঁহারা সর্ববিষয়ে নেতৃত্ব করেন। দলের সাধারণ সদস্যগণ শুধুমাত্র নেতাগণের নির্ধারিত-নীতি সমর্থন করেন।

ক্ষমতার দিক দিয়া আলোচনা করিলে উভয় কক্ষের পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়। নীতিগতভাবে কমন্স সভা এখনও পর্যন্ত বিচার-বিবেচনা ক্ষমতার, আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার ও অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত কমন্স সভা শাসন বিভাগকে (কেবিনেট) নিয়ন্ত্রণ করিতে

পারে। কিন্তু মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ শাসন বিভাগকে আদৌ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতির নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ও চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা উচ্চ কক্ষ সিনেট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও সিনেট সভা প্রায় ইহার সম-ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং প্রতিনিধিমূলক আইনসভা হইলেও মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদকে নিম্নকক্ষ হিসাবে কোন অগ্রাধিকার বা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করা হয় নাই।

উভয় দেশের নিম্ন কক্ষের আপেক্ষিক দোষগুণ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মার্কিন প্রতিনিধি-পরিষদ মার্কিন দেশে উপযোগী, আর কমন্স সভা ইংলণ্ডে উপযোগী। বৃটিশ ও মার্কিন এই জাতিদ্বয়ের রাজনৈতিক দৃষ্টির পার্থক্যের ভিত্তিতে উভয় দেশের নিম্ন কক্ষ গঠিত হইয়াছে।

প্রতিনিধি-পরিষদের আপেক্ষিক দুর্বলতার কারণ—Causes of the relative weakness of the House of Representatives

সকল দেশেরই নিম্নপরিষদ উচ্চ পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। গ্রেট বৃটেন, ডোমিনিয়নগুলি, ভারত, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আইনসভার নিম্ন পরিষদ আইন-প্রণয়ন-ব্যাপার, আয়-ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি পরিষদের মধ্যে নিম্ন পরিষদই হইল কম ক্ষমতার অধিকারী। প্রতিনিধি-পরিষদের এই আপেক্ষিক দুর্বলতার একাধিক কারণ আছে।

প্রথমতঃ, প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণ শাসনতন্ত্রের নির্দেশানুসারে যে রাজ্য হইতে সদস্য নির্বাচিত হইবেন, তাঁহাদিগকে সেই রাজ্যের অধিবাসী হইতেই হইবে। বর্তমানে একটি প্রথা জন্মিয়াছে যে, সদস্যগণের শুধুমাত্র সেই রাজ্যের অধিবাসী হইলে চলিবে না, তাঁহারা যে জিলা-নির্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন, তাঁহাদিগকে সেই জিলার বাসিন্দা হইতে হইবে। উপরি-উক্ত কঠোর নিয়মের দ্বারা ভোটদাতার যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচন

করিবার স্বাধীনতা এরূপভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে যে, প্রতিনিধি-পরিষদে নির্বাচন করিবার মত যোগ্যপ্রার্থী হয়ত সে নির্বাচনকেন্দ্রে দুর্লভ হইতে পারে। অপরপক্ষে যোগ্যপ্রার্থী থাকিলেও হয়ত বিরোধিতার ফলে তাহার নির্বাচন-সম্ভাবনা নাও থাকিতে পারে। সুতরাং প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য-পদ সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রার্থী দ্বারা পূর্ণ হয়। এই কারণে প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে একটির অধিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না—সুতরাং ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি প্রতিনিধি-পরিষদ অপেক্ষা সিনেট সভার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে, কারণ বৃহদায়তন রাজ্যগুলির সমসংখ্যক (দুইটি) প্রতিনিধি তাহারা সিনেট সভায় প্রেরণ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, প্রতিনিধি পরিষদের স্থায়িত্ব মাত্র দুই বৎসরকাল, অপরপক্ষে সিনেটের সদস্যগণ দীর্ঘ ছয় বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে কোন কার্যে মনঃসংযোগ করা সম্ভব নয়। নির্বাচনের পরই তাঁহাদের পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। এইজন্য তাঁহারা আইন-প্রণয়ন ও অন্যান্য কার্যে সিনেটের নির্দেশে পরিচালিত হইয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি দেশে অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে নিম্ন পরিষদের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিম্ন পরিষদই হইল চরম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেট সভাকে অর্থ-সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করিবার ফলে প্রতিনিধি-পরিষদের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত বৈদেশিক চুক্তি ও নিয়োগ-গুলি সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ—এ বিষয়ে প্রতিনিধি-পরিষদের আদৌ কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাই। নিম্ন পরিষদের ক্ষমতার প্রধান কারণ হইল শাসনকর্তৃপক্ষের উপর ইহার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদ এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া একটি অধস্তন আইনসভায় পর্যবসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৃটেনের কমন্স সভার নেতার ন্যায় প্রতিনিধি পরিষদে এমন কোন নেতা নাই, যিনি জাতীয় নীতি-নির্ধারণে ও আইন-প্রণয়ন কার্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিতে পারেন।

প্রতিনিধি-পরিষদের সভাপতি বা স্পীকার—The Speaker of the House of Representatives

প্রতিনিধি-পরিষদ ইহার নিজস্ব সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি স্পীকার নামে পরিচিত। ইনি দলীয় ভিত্তিতে দলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। নির্বাচনের পরও তিনি নিজের দলের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করেন এবং সভার কার্য পরিচালনায় উগ্রভাবে দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন করেন। প্রতিনিধি-পরিষদে তিনিই হইলেন প্রথম ও প্রধান কর্মচারী এবং সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিনিধি-পরিষদে স্পীকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সমুদয় কমিটিগুলির সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন করিতেন। তিনি সভার কার্য পরিচালনা করিবার নিয়ম প্রস্তুত করিবার কমিটিরও সদস্য থাকিতেন। স্পীকার তাঁহার অনুগামী দলসহ একটি ক্ষুদ্র শাসন পরিষদ গঠন করিয়া সরকারী কার্যের নীতি-নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করিতেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, স্পীকারের ক্ষমতা এই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পদমর্যাদায় তিনি কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির নিম্নস্থানে ছিলেন।

কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে স্পীকারের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতার অবসান ঘটিতে থাকে। কমিটিগুলির সদস্য নির্বাচনের ক্ষমতা তাঁহার নিকট হইতে অপসারণ করা হয় এবং তিনি নিয়ম কমিটির সদস্যপদচ্যুত হন। বর্তমানে তিনি আর অসাধারণ ক্ষমতাশালী না হইলেও কমন্স সভার স্পীকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী।

প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকারের কর্তব্য অনেক পরিমাণে কমন্স সভার স্পীকারের অনুরূপ। তিনি প্রতিনিধি-পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভার শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। সভার তর্ক-বিতর্ক পরিচালনা করেন। তিনি সভার কার্যের তালিকা এবং ভোট গ্রহণের ফলাফল ঘোষণা করেন। তিনিই সভার কার্য পরিচালনার নিয়ম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু প্রতিনিধি-পরিষদ সংখ্যাধিক্য ভোটে তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ নাও করিতে পারে। সভার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সমস্ত আইন, প্রস্তাব ও আদেশ-নিদেশ স্বাক্ষর করেন। তিনি সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন এবং কোন্ বিল কোন্ কমিটিতে প্রেরিত হইবে ইহা লইয়া মতভেদ ঘটিলে স্পীকারের সিদ্ধান্ত

চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। দলের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল তাঁহার দল কর্তৃক উত্থাপিত বিল যাহাতে পাস হয় এবং এবিষয়ে দলকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা।

ইংলণ্ডের কমন্স সভার স্পীকারের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই উভয় স্পীকারের নির্বাচন-পদ্ধতি যে বিভিন্ন শুধু তাহাই নহে, আইন-সভার সহিত সম্পর্কে এবং ক্ষমতা পরিচালনা ক্ষেত্রেও উভয় স্পীকারের পার্থক্য অধিকতর সুস্পষ্ট। কমন্স সভার স্পীকার কোন দলের সদস্য হইলেও দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন না এবং নির্বাচনের পর দল-নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না এবং তিনি যতদিন খুসী স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। তিনি বক্তা (Speaker)-রূপে পরিচিত হইলেও তাঁহার বক্তৃতা করিবার কোন সুযোগ হয় না। বর্তমানে তিনি মূক, নিষ্ক্রিয় ও দল-নিরপেক্ষ শ্রোতায় পর্যবসিত হইয়াছেন। তাঁহার ভোট-দান ক্ষমতাও প্রথাগত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তবে যে-কোন বিষয়ে হউক না কেন কমন্স সভার স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। তিনিই অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রকৃতি নির্ধারণ করেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, কমন্স সভার স্পীকার হইলেন নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ। পক্ষান্তরে প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার হইলেন উগ্রভাবে সক্রিয়, দলীয় স্বার্থের প্রতিনিধি ও কিয়ৎ পরিমাণে স্বৈরাচারী। এই পার্থক্যের কারণ হইল যে, ইংলণ্ডে ক্ষমতাসীন দলের নেতাগণ কেবিনেট সদস্য হিসাবে কমন্স সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের কার্যসূচী রূপায়িত করিবার সুযোগ পান। সুতরাং স্পীকারের নেতৃত্বের কোন প্রয়োজন হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়া ক্ষমতাসীন দলের নেতাগণ—রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার কেবিনেট মন্ত্রিগণ আইন-সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের দলীয় নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে পারেন না। সেইজন্য প্রতিনিধি-পরিষদের স্পীকার পরিষদে দলের নেতৃত্ব করিয়া দলীয় নীতি সমর্থন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি—Process of Law-making in the U. S. A.

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সাধারণতঃ সকল দেশেই একরূপ পদ্ধতি

অবলম্বিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-কোন কক্ষে আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে এবং উভয় কক্ষের সম্মতিতে প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়, তবে অর্থ-সংক্রান্ত বিলগুলি একমাত্র প্রতিনিধি-পরিষদেই উত্থাপিত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি বলবৎ থাকার দরুণ রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার কেবিনেট সদস্যগণ কংগ্রেস সভার সদস্য নহেন এবং সেজন্য কোন আইনের প্রস্তাব সরাসরি তাঁহারা উত্থাপন করিতে পারেন না। সাধারণ সদস্যগণই আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের উত্থাপক বিলটি পেশ করিলে বিলের শিরোনামা পরিষদের পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ও ইহার দ্বারা প্রথম পাঠ শেষ হয়। সুতরাং বিলের প্রথম পাঠটি একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এই সময় বিলটির সম্পর্কে কোন-প্রকার বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। অতঃপর বিলটি একটি বিশেষ সংস্থার (Committee) নিকট প্রেরিত হয়। এই সংস্থা বা কমিটি বিলটির বিশদ আলোচনা করে এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে ইহার পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাদের বিবরণীসহ পরিষদে প্রেরণ করে। তাহার পর বিলটির দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বিরোধী-দল ভোট-গণনার দাবী করিতে পারেন ও সংখ্যাধিক্যের অনুমোদন লাভ করিতে পারিলে বিলটির তৃতীয় পাঠ আরম্ভ হয়। তৃতীয় পাঠও অনেকাংশে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। তৃতীয় পাঠ শেষ হইলে বিলটি অপর কক্ষে প্রেরিত হয় ও সেখানেও অনুরূপভাবে বিলের তিনটি পাঠ হয়। অপর কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তাঁহার নিকট উপস্থাপিত হইবার দশদিনের মধ্যে যদি তিনি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। যদি তিনি দশদিনের মধ্যে অনুমোদন না করেন বা পুনর্বিবেচনার জন্য কংগ্রেস সভার নিকট বিলটি ফেরত না পাঠান, তাহা হইলে তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকেই দশদিন অতিবাহিত হইবার পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত কোন বিল যদি কংগ্রেস সভা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা অনুমোদন করে, তাহা হইলেও বিলটি আইনে পরিণত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন—American Financial Legislation

১৯২১ খৃষ্টাব্দের একটি বিশেষ আইন (The Budget and Accounting Act of 1921) দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি পাস করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ হইতে ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিয়া বাজেটের ডাইরেক্টর বাৎসরিক একটি আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করেন। এই ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন এবং একমাত্র রাষ্ট্রপতিই এই হিসাব কংগ্রেস সভায় উপস্থাপিত করান। সুতরাং ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় দেশেই ব্যয়-বরাদ্দের নীতি-নির্ধারণে শাসনকর্তৃপক্ষই আইনসভাকে প্রাথমিক নির্দেশ দান করে। ব্যয়-বরাদ্দের হিসাব প্রথম প্রতিনিধি-পরিষদে উত্থাপিত হয় এবং এই পরিষদ ব্যয়ের হিসাবটিকে বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করে। কমিটি ব্যয়-বরাদ্দগুলি হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারে। কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইবার পর ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি পুনরায় প্রতিনিধি-পরিষদে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে প্রতিনিধি-পরিষদ ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির ব্যাপক পরিবর্তন করিতে পারে। ইংলণ্ডের কমন্স সভার এইরূপ পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। প্রতিনিধি-পরিষদ প্রস্তাবগুলি পাস করিলে উহা সিনেট সভার বিবেচনার্থ পাঠান হয়। সিনেট সভাও এই ব্যয়-বরাদ্দগুলির ব্যাপক পরিবর্তন করিবার অধিকারী। এইরূপে উভয় পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হইয়া ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি যখন একটা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে তখন উভয় পরিষদ কর্তৃক ব্যাপকভাবে পরিবর্তনের ফলে ইহাদের মৌলিক রূপ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ অথবা আইনসভা—কে দায়ী তাহা বলা সু-কঠিন।

রাষ্ট্রপতির নামে ট্রেজারির সেক্রেটারী আয়ের প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন। যদিও প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে আয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার কোন বাধা নাই।

শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আনীত হউক আর আইনসভা কর্তৃক উত্থাপিত হউক আয়-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি একটি পৃথক কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হয়। ইংলণ্ডের এই আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি দুইটি পৃথক কমিটি কর্তৃক বিবেচিত

হইলেও কমিটি দুইটি একই সদস্য-সংখ্যা লইয়া গঠিত হয় বলিয়া আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংলণ্ডের ন্যায় কমিটি দুইটি যে শুধু পৃথক নামে অভিহিত হয় তাহা নহে, কমিটি দুইটির সদস্যগণও পৃথক পৃথক ব্যক্তি লইয়া গঠিত হয় এবং এই কারণে আয় ও ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে সংগতির অভাব দেখা যায়। ইহা ছাড়া, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করার দায়িত্বও ভাগ হইয়া যায়। এ কথা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্যগণ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভার সদস্যগণ অপেক্ষা আয়-ব্যয়ের প্রস্তাবগুলির উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, মার্কিন দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুরপদ্ধতি দোষবিমুক্ত নহে। কারণ যে শাসনকর্তৃপক্ষ আয়-ব্যয়ের প্রাথমিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া আইনসভায় পেশ করেন, সে শাসন-কর্তৃপক্ষ আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের অর্থ-সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। অবশ্য রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ-ভাবে বাণী প্রেরণ করিয়া অথবা অন্য পরোক্ষ উপায়ে আইনসভার উপর এসম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। ইংলণ্ডের আয়-ব্যয়-নির্ধারণ ক্ষমতা শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তে কেন্দ্রীভূত, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে বিভক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি ব্যবস্থা—Committee System in the U. S. A.

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বিশেষ বিচার-বিবেচনা ও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। বহু জনপ্রতিনিধি লইয়া গঠিত আইনসভার বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিবার মত পর্যাপ্ত সময়ও নাই এবং বিশেষ জ্ঞানও নাই। এই কারণে পৃথিবীর প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা প্রয়োজনমত স্বল্পসংখ্যক উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্য লইয়া বিভিন্ন কমিটি গঠন করে এবং এই কমিটিগুলির হস্তে প্রস্তাবিত আইনের গুণাগুণ বিচার করিয়া ইহার চূড়ান্ত রূপ নির্ধারণ করিবার ভার অর্পণ করে। অবশ্য দেশভেদে আইনসভা-সৃষ্ট এই কমিটিগুলির ক্ষমতা ও দায়িত্বের তারতম্য দেখা যায়।

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার কমিটিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং কমিটিগুলির সভাপতিগণই (Chairmen) প্রস্তাবিত আইনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিলের প্রথম পাঠ (First Reading) আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সমাপ্ত হইলেই বিলটি কমিটিতে প্রেরিত হয় এবং কার্যতঃ কমিটিই আইনসভার কাজ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভায় বিভিন্ন ধরণের কমিটি গঠিত হয়, যথা-

১। স্থায়ী কমিটি—Standing Committee

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী কমিটিগুলি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। সিনেটে এইরূপ ষোলটি এবং প্রতিনিধি-পরিষদে কুড়িটি স্থায়ী কমিটি আছে। সিনেটের স্থায়ী কমিটিগুলি সাধারণতঃ ১৩ হইতে ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত এবং প্রতিনিধি-পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলির সদস্য-সংখ্যা ৯ হইতে ৫০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণতঃ একজন সিনেট সদস্য দুইটি স্থায়ী কমিটির সদস্য হইতে পারেন, অপরপক্ষে প্রতিনিধি-পরিষদের একজন সদস্য একটি স্থায়ী কমিটির সদস্য হইতে পারেন। এই কমিটিগুলি আইনসভার সকল দলেরই সদস্য লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আইনসভায় দলীয় সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতেই কমিটিগুলির দলীয় সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই কমিটিগুলিতে অধিক সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিবার সুযোগ পায়। নীতিগতভাবে স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ সমগ্র কক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কিন্তু কার্যতঃ, প্রত্যেক দলের নির্বাচনী কমিটি কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণই বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিতে তাঁহাদের গুণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

স্থায়ী কমিটিগুলির প্রত্যেকটি এরূপ বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত হয় যে, প্রস্তাবিত আইনের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু অনুসারে প্রস্তাবিত আইনটিকে উপযুক্ত কমিটিতে প্রেরণ করা সম্ভব হয়। কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে সহস্র সহস্র বিল স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি বাছাই করে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া কংগ্রেসের সম্মতির জন্য প্রেরণ করে। কার্যতঃ, এই স্থায়ী কমিটিগুলি কোন বিলের চূড়ান্ত রূপ দান করে। স্থায়ী কমিটিগুলি বহু বিলের নূতন খসড়া প্রণয়ন করে। অনেক বিল স্থায়ী

কমিটি হইতে আর কংগ্রেসে পুনঃ প্রেরিত হয় না। কখনও কখনও এই স্থায়ী কমিটিগুলি আবার আরও স্বল্প-সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত নিজস্ব সাব্-কমিটি গঠন করে।

২। যুগ্ম কমিটি – Joint Committee

যুগ্ম কমিটি আইনের দ্বারা গঠিত হয় এবং এই কমিটিতে উভয় কক্ষের সম-সংখ্যক সদস্য থাকেন। যে সমস্ত কাজ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হইতে পারে না, সে সমস্ত ক্ষেত্রে যুগ্ম কমিটি কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পারমাণবিক শক্তি-সংক্রান্ত ব্যাপারে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও অন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইরূপ যুগ্ম কমিটি গঠিত হয়।

৩। সম্মেলন কমিটি—Conference Committee

এই কমিটি যুগ্ম কমিটিরই এক বিশেষ রূপ। উভয় কক্ষের মধ্যে কোন আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে মতভেদ ঘটিলে সম্মিলিত কমিটি কর্তৃক মতভেদ দূর করা হয়।

৪। বিশেষ তদন্ত কমিটি—Special Investigation Committee

আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য, সংবাদ এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়। আইন বলবৎ করিবার কালে কোন অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে কি না বা শাসনব্যবস্থায় কোন দুর্নীতি-মূলক কার্য পরিচালিত হইতেছে কি না ইহার তদন্ত করা এই কমিটির কাজ।

৫। কক্ষের সমগ্র সদস্য-সমন্বিত কমিটি—Committee of the Whole House

বর্তমানে দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সিনেট ও প্রতিনিধি-পরিষদ কক্ষের সকল সদস্য লইয়া গঠিত কমিটিরূপে একত্রিত হয়। সিনেট ও প্রতিনিধি-পরিষদ যখন কমিটিরূপে একত্রিত হয় তখন প্রত্যেক কক্ষের স্থায়ী সভাপতির পরিবর্তে একজন নব-নির্বাচিত সভাপতিকার্য পরিচালনা করেন। সভার নিয়ম-কানুনও কমিটির পরিচালনাকার্যে শিথিল করা হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য সিনেট সমগ্র কক্ষের কমিটি গঠন করে। রাজস্ব ও ব্যয়সংক্রান্ত বিলের বিবেচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি-পরিষদ কমিটিরূপে মিলিত হয়।

৬। অস্থায়ী কমিটি—Select Committee

কোন বিশেষ কাজের জন্য এইরূপ অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানে এই ধরনের কমিটির কার্যকারিতা হ্রাস পাইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি ব্যবস্থা আলোচনা সম্পর্কে এই কমিটিগুলির সভাপতিগণের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোন কমিটির সভাপতি (Chairman) সংশ্লিষ্ট কক্ষের কমিটি গঠনকারী কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হন। কিন্তু কার্যতঃ সংশ্লিষ্ট, কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রবীণতম সদস্যই সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কমিটির কাজে সভাপতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, তিনিই কমিটির কার্যপরিচালনা সূচী নির্ধারণ করেন, কমিটির কার্যের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। সাব-কমিটির সদস্য নিযুক্ত করেন এবং কমিটি হইতে বিচারবিবেচনার পর বিলটি যখন সংশ্লিষ্ট কক্ষে আসে তখন তিনিই বিলটির প্রধান সমর্থকরূপে ইহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন।

মার্কিন ও বৃটিশ কমিটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Peculiarities of the Committee Systems in the U. S. A. and Great Britain

যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলি বৃটেনের কমন্স সভার কমিটি অপেক্ষা ভিন্ন পদ্ধতিতে গঠিত হয়। গ্রেট বৃটেনের কমন্স সভার সমস্ত রাজনৈতিক দল তাহাদের সদস্যসংখ্যার আনুপাতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিটিগুলি গঠন করিবার জন্য একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করিয়া থাকে। এই নির্বাচন কমিটি অন্যান্য কমিটিগুলিকে গঠন করে। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করিয়া তাহার হস্তে বিভিন্ন কমিটি গঠনের ভার অর্পণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে কমিটিগুলির সদস্যসংখ্যা অল্প। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পাঠের পর বিলগুলি কমিটিতে প্রেরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার কমিটিগুলি অধিকতর ক্ষমতাবিশিষ্ট। এই কমিটিগুলি প্রস্তাবিত আইনের ব্যাপক পরিবর্তন করিবার অধিকারী। কিন্তু বৃটেনে দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হইয়া বিলগুলির নীতি আইনসভা কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবার পর কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটিগুলি বিলের ছোটখাট পরিবর্তন করা ছাড়া

নীতিগত কোন ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের নেতৃত্বের ভার থাকে কমিটির সভাপতির উপর। তিনিই বিলটিকে পরিচালিত করিয়া একটি নির্দিষ্ট রূপ দান করেন। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে অনেক আইন কমিটি সভাপতির নামে পরিচিত হয়, যথা, 'রোজার আইন', 'স্যারম্যান আইন' প্রভৃতি। বৃটেনে আইন-প্রণয়নের উদ্যোক্তা ও নেতা হইলেন একজন মন্ত্রী; বে-সরকারী সদস্যের আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ নাই বলিলেও চলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইংলণ্ডে সাধারণ-সম্পর্কিত বিল এবং বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলের মধ্যে একটি পার্থক্য করা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন কমিটি কর্তৃক এই দুই জাতীয় বিল বিবেচিত হয় এবং ইহাদের পাস করিবার পদ্ধতিও বিভিন্ন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ কোন পার্থক্য করা হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা—The Federal Judiciary

মার্কিন শাসনতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থার ভার একটি সুপ্রীম কোর্ট এবং কংগ্রেস সভা কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য নিম্ন বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত থাকিবে। একটি সুপ্রীম কোর্ট, এগারটি সারকিট্ কোর্ট ও নব্বুইটি জেলা কোর্ট লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে।

সুপ্রীম কোর্ট—The Supreme Court

সুপ্রীম কোর্ট হইল সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়। শাসনতন্ত্র কর্তৃক বিচারপতিগণের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া না হইলেও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে হইতে বিচারপতিগণের সংখ্যা নয়জনে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। বিচারপতিগণের সকলেই সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সাধারণতঃ দলীয় ভিত্তিতেই বিচারপতিগণের নিয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু সময় সময় নানাকারণে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর নিয়োগ সিনেট সভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। বিচারপতিগণ আজীবনকালের জন্য নিযুক্ত হন এবং একমাত্র বিশেষ বিচার পদ্ধতির (Impeachment) মাধ্যমে তাঁহাদের অপসারিত করা যায়।

কোন বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নয়জন বিচারপতিকে একসঙ্গে কাজ করিতে হয়, তবে বিচার্য বিষয়ের সিদ্ধান্তদানের সময় ছয়জন বিচারপতির উপস্থিতি অপরিহার্য। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত ওয়াশিংটন নগরে এই বিচারালয়ের অধিবেশন বসে এবং মঙ্গলবার হইতে শুক্রবার পর্যন্ত এই আদালতে মামলার শুনানী চলে। শনিবার বিচারপতিগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। সোমবার প্রকাশ্য আদালতে রায় (সিদ্ধান্ত) দান করা হয়। প্রধান বিচারপতি বাৎসরিক ২৫,৫০০ ডলার ও অন্যান্য বিচারপতিগণ বাৎসরিক ২৫,০০০ ডলার বেতন পাইয়া থাকেন।

ক্ষমতা—Powers

সুপ্রীম কোর্ট আদিম ও আপীল উভয়বিধ ক্ষমতার অধিকারী। সুপ্রীম কোর্টের আদিম বিচার ক্ষমতা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রযুক্ত হয় :

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র ও কোনও রাজ্যের মধ্যে বিবাদ, দুইটি রাজ্যের মধ্যে বিবাদ অথবা কোন রাজ্যের সহিত অপর কোন রাজ্যের নাগরিকের বিবাদ বা বিদেশীর সহিত বিবাদ ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রদূত, কন্সাল ও অন্যান্য পদস্থ সরকারী কর্মচারী-সম্পর্কিত বিরোধ। কিন্তু রাষ্ট্রদূত-সম্পর্কিত বিষয় বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা নির্ধারিত হওয়ার ফলে এই বিচারালয়ের আদিম ক্ষমতা বহুলাংশে সংকুচিত হইয়াছে।

শাসনতান্ত্রিক ব্যাপার সম্পর্কে এই বিচারালয় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ও রাজ্যবিচারালয়গুলি হইতে আনীত আপীল মামলাগুলির বিচার করে।

বিচার বিভাগীয় পুনর্বিচার—Judicial Review

মার্কিন শাসনব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট একটি অদ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের বিচারালয়গুলি সার্বভৌম পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনগুলির ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু সেগুলির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারে না। পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় শুধু আইনের ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষান্ত হয় না,

আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতাও এই বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই বিচারালয়ের মতে কংগ্রেস সভা-প্রণীত কোন আইন বা শাসনকর্তৃপক্ষ প্রদত্ত কোন নির্দেশ যদি শাসনতন্ত্র-বিরোধী হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে এই বিচারালয় যে-কোন আইন বা নির্দেশ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইলে সে আইন বা নির্দেশ আর কার্যকর হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট আইনটির সংশোধন করে না। সুপ্রীম কোর্ট শুধু শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বিচার করে যে, শাসনতন্ত্রের সহিত বিচার্য আইনটির সংগতি আছে কিনা। যদি সুপ্রীম কোর্টের মতে বিচার্য আইনটি শাসনতন্ত্র-বিরোধী হয়, তাহা হইলে আইনটি অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। এইরূপে কংগ্রেস সভা-প্রণীত বহু আইন ও শাসনকর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বহু নির্দেশ সুপ্রাম কোর্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া অসিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে। শেষ-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যে ক্ষমতার ভারসাম্য রহিয়াছে, তাহা সুপ্রীম কোর্ট অক্ষুণ্ণ রাখে এবং ক্ষমতার এই ভারসাম্য রক্ষা করিয়া এই বিচারালয় নাগরিক অধিকার, রাজ্যগুলির অধিকার ও জাতীয় সরকারের অধিকারগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে।

সুপ্রীম কোর্টের এই বিচারবিষয়ক ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার আরও একটি সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার সাহায্যে সুপ্রীম কোর্ট অনমনীয় মার্কিন শাসনতন্ত্রের বহু প্রয়োজনীয় সংশোধন দ্বারা ইহাকে নমনীয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। মার্কিন শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত আইন-সম্মত ধারাটি (Due Process of Law) প্রয়োগ করিয়া সুপ্রীম কোর্ট আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির ও আইনের বিষয়বস্তুর গুণাগুণ বিচার করিতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের মতে কংগ্রেস সভা-প্রণীত কোন আইন আইনসম্মত পদ্ধতিতে রচিত হইয়াও যদি স্বাভাবিক ন্যায়পরতা বিরোধী হয়, তাহা হইলেও সে-আইন অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের স্থান আইনসভারও ঊর্ধ্বে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ক্ষমতাশালী যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

অনুমিত ক্ষমতা-নীতি—Doctrine of Implied Powers

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রসারের অপরিহার্যতা অনুভূত হইল। এরোপ্লেন, বেতার প্রভৃতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিল। এরূপ স্থলে সুপ্রীম কোর্ট ইহার অনুমিত ক্ষমতা-নীতি (Doctrine of Implied Powers) প্রয়োগ করিয়া এই নূতন বিষয়গুলির উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। অনুমিত ক্ষমতা নীতির অর্থ হইল সুপ্রীম কোর্ট ব্যাখ্যা প্রদানকালে নির্দেশ দিতে পারে যে, যদিও নূতন বিষয়টির পরিচালনার ভার শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত হয় নাই, তথাপি শাসনতন্ত্রের অপর ধারাগুলি ব্যাখ্যা করিলে অনুমান করা যায় যে, এই নূতন বিষয়গুলির শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। এইরূপে সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা প্রদানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান দ্বারা বহু বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক-পদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনেক পরিমাণে সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া মনে হয়।

সুপ্রীম কোর্ট ও পৌর অধিকার—Supreme Court and Civil Liberties

সুপ্রীম কোর্ট নাগরিকগণের পৌর অধিকারগুলির রক্ষক হিসাবে কাজ করে। শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ অধিকারের সনদ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পৌর অধিকারগুলিকে রক্ষা করে এবং শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধন আইন রাজ্য সরকারগুলির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পৌর অধিকারগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখে। রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা পৌর অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইলেই সুপ্রীম কোর্ট হস্তক্ষেপ করিয়া অধিকারগুলিকে রক্ষা করে। সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা অনুসারে শাসনতন্ত্রের আইন

সম্মত ধারাটির অর্থ হইল যাহা ন্যায়সম্মত ও যুক্তিসম্মত (What is just and reasonable)। রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক যদি এরূপ কোন আইন গৃহীত হয় যাহা উপরি উক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে ন্যায়সম্মত বা যুক্তিসম্মত নয়, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট সেরূপ আইনকে আইনসম্মত নহে বলিয়া অসিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অসিদ্ধ ঘোষিত হইলে সে আইন কার্যকর হয় না। এইরূপে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার-প্রণীত আইন অসিদ্ধ ঘোষণা করিয়া সুপ্রীম কোর্ট পৌর অধিকার রক্ষা করে।

সুপ্রীম কোর্ট ও শাসনতন্ত্র—Supreme Court and the Constitution

একটি ক্ষুদ্র কৃষিপ্রধান দেশের উপযোগ অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদি শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে দেশের আয়তন ও জনসংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং অবস্থার পরিবর্তনের সহিত শাসনতন্ত্রের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করিতে হইয়াছে নতুবা শাসনতন্ত্র কার্যকর করা সম্ভব হইত না। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, মার্কিন শাসনতন্ত্র অত্যধিক পরিমাণে দুষ্পরিবর্তনীয়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট ইহার ব্যাখ্যা প্রদান ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক বহির্ভূত উপায়ে শাসনতন্ত্রের বহু সময়োপযোগী সংশোধন করিয়া ইহাকে সাবলীল ও সক্রিয় রাখিয়াছে। আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট ইহার ব্যাখ্যা প্রদান ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সুপ্রীম কোর্ট ইহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার বলে কংগ্রেস সভা-রচিত আইন বা রাষ্ট্রপতি-প্রদত্ত নির্দেশকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে আইনী ঘোষণা করিতে পারে। ফলে, কংগ্রেস সভার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিচারপতিগণ যদি স্বাধীন ও

নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন না হন, তাহা হইলে বিচারকার্য পক্ষপাতদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুপ্রীম কোর্টের এই ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাকে অনেকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কংগ্রেস সভা-প্রণীত আইনের বৈধতা শেষ পর্যন্ত নয়জন বিচারপতির সংখ্যাধিক্যের অর্থাৎ পাঁচজন বিচারপতির মতের উপর নির্ভর করে। পাঁচজন বিচারপতি একমত হইলে যে-কোন আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের এই অত্যধিক ক্ষমতার দ্বারা আইন-প্রণয়নে কংগ্রেস সভার সার্বভৌমত্ব ও অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এইজন্য সুপ্রীম কোর্টের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে একাধিক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া সুপ্রীম কোর্টের হস্ত হইতে আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা অপসারিত করা। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত কোন আইন যদি কংগ্রেস সভা দ্বিতীয়বার অনুমোদন করে তাহা হইলে সে আইন সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের পুনরায় অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, অনেক সমালোচক বলেন যে, যদি সুপ্রীম কোর্টের হস্তে আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত রাখিতে হয় তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া উচিত যে, নয়জন বিচারপতির মধ্যে অন্ততঃ সাতজনের এ সম্পর্কে একমত হওয়া চাই। পরলোকগত রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সংকোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সফল হইতে পারেন নাই। এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা বলিতে হইবে যে, সুপ্রীম কোর্ট ইহার ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও মূল রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির ক্ষমতা সংযত রাখিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সুপ্রীম কোর্ট এপর্যন্ত শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে নাই।

মার্কিন শাসনতন্ত্রে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য—The System of Mutual Checks and Balances in the U. S. A. Constitution

মার্কিন শাসনতন্ত্রের আদি রচয়িতাগণ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভাজন

নীতির পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অন্য-নিরপেক্ষ বিভাগরূপে গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁহারা এই ক্ষমতা-বিভাজন নীতিটিকে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। কারণ, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতা একই হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে ক্ষমতার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। তাই ক্ষমতার এই অপব্যবহার রদ করিবার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের আদি রচয়িতাগণ বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করিবার জন্য পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার মূলকথা হইল যে, ক্ষমতার অপব্যবহার রদ করিতে হইলে এক বিভাগের স্বৈর বা অবাধ ক্ষমতা অন্য বিভাগের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ—প্রত্যেককেই বিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী করা হইলেও এই ক্ষমতাসমূহ অন্য বিভাগের সহযোগিতা ও সম্মতিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি ও নিয়োগগুলি আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটের অনুমোদনসাপেক্ষ। ইহার অর্থ হইল যে, যদিও সরকারী কার্যে কর্মচারী নিয়োগ করা ও চুক্তি সম্পাদন করা শাসনবিভাগের একচেটিয়া ক্ষমতাভুক্ত তথাপি এই শাসনবিভাগীয় কার্যে আইনসভা অংশ গ্রহণ করিতে পারে ও প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিয়োগ ও চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারে শাসনবিভাগের স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বাধা দিতে পারে। অনুরূপভাবে শাসন-বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতিও আইনসভায় 'বাণী' প্রেরণ করিয়া, আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইনে সম্মতি বা অসম্মতি দান করিয়া এবং জরুরী আইন প্রণয়ন করিয়া আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আইনসভার উচ্চকক্ষ হইলেও সিনেট রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করিতে পারে। আবার রাষ্ট্রপতিও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মার্জনা করিয়া বিচার বিভাগীয় ক্ষমতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস (আইনসভা)-প্রণীত আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, আবার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের সংখ্যা ও বেতন পরিমাণ কংগ্রেস কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট দেখা যায়, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ক্ষমতা-বিভাজন নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই। কারণ আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার এই তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিই অপর বিভাগীয় কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এক বিভাগ অন্য বিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকারী হওয়ার ফলে একদিকে যেরূপ বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্র, সহযোগিতা ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে, অপরদিকে তদ্রূপ অন্তর্বিভাগীয় বিরোধ এবং বিরোধের ফলে সরকারী কার্যে অহেতুক বিলম্ব ও অনিবার্য অযোগ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের ফলে বিভাগীয় দায়িত্ববোধও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কোন নিয়োগের ক্ষেত্রে বা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে এককভাবে দায়ী করা যায় না, কারণ শাসন-বিভাগীয় এই দুইটি কাজই সিনেট সভার সম্মতিসাপেক্ষ। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে এই ভারসাম্য নীতি প্রবর্তনের ফলে বিভাগীয় স্বৈরাচার কি পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে তাহা বিচারসাপেক্ষ। অধিকন্তু এই নীতি গ্রহণের ফলে শাসন-ব্যবস্থায় দায়িত্বহীনতা ও অহেতুক বিলম্ব বৃদ্ধি পাইয়া শাসনকার্যে অনেকক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব সৃষ্টি করিয়াছে। তবে দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়া পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি প্রয়োগের ত্রুটিগুলি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন—Distribution of Powers in the U. S. A.

জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগই হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতীয় সরকারকে কতিপয় নির্ধারিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছিল এবং বণ্টনের সময় জাতীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়াও দেওয়া হইয়াছিল। রাজ্য-সরকারগুলির ক্ষমতা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইলেও অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ রাজ্যসরকারগুলির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। এই বণ্টন-ব্যবস্থার ফলে জাতীয় সরকার অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও রাজ্যসরকারগুলি অধিকতর শক্তিশালী

হয়। ১৮৬১-৬৫ খৃষ্টাব্দব্যাপী আমেরিকায় যে গৃহযুদ্ধ হয় জাতীয় সরকারের আপেক্ষিক দুর্বলতা তাহার প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

জাতীয় বা সাধারণ সরকারের উপর অর্পিত প্রধান প্রধান ক্ষমতাগুলি ও রাজ্যসরকারগুলির হস্তে ন্যস্ত মুখ্য ক্ষমতাগুলি একযোগে দেওয়া হইল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহ	রাজ্যসরকারাধীন বিষয়সমূহ
১। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর	১। রাজ্যগুলি কর্তৃক স্থাপিত কর
২। জাতীয় দায়িত্বে ঋণগ্রহণ	২। রাজ্য দায়িত্বে ঋণগ্রহণ
৩। বহির্বাণিজ্য ও আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ	৩। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ
৪। মুদ্রা-ব্যবস্থা ও নোট প্রচলন	৪। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন
৫। বৈদেশিক সম্পর্ক ও সন্ধি চুক্তি	৫। পুলিশবাহিনী
৬। স্থল ও নৌবাহিনী	৬। শিক্ষা
৭। ডাক বিভাগ	৭। স্থানীয় শাসননিয়ন্ত্রণ
৮। বিশেষাধিকার পত্র ও গ্রন্থাদির স্বত্ব	৮। দান
৯। ওজন ও মান-নির্ণয়	৯। জাতীয় সড়ক ও যানবাহন
১০। নূতন রাজ্যের অনুমোদন	১০। যৌথ কোম্পানীর সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ

শাসনতন্ত্রের দশম সংশোধনে বলা হইয়াছে যে, যে সমুদয় ক্ষমতা জাতীয় সরকারকে দেওয়া হয় নাই অথচ রাজ্যসরকারগুলির পক্ষে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তৎসমুদয়ই রাজ্যসরকারগুলির অথবা জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত করা হইল।

জাতীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা এবং অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ রাজ্য-সরকারগুলির উপর প্রদত্ত হইলেও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে: প্রথমতঃ, সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অনুমিত ক্ষমতা নীতি প্রয়োগের ফলে জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই নীতি অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা সাহায্যে জাতীয় সরকারের উপর নূতন ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্রম সম্প্রসারণের ফলেও রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না করিয়াও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ, শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইনগুলিও মধ্যে মধ্যে জাতীয় সরকারের আদি দুর্বলতাগুলি দূর করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিতে সাহায্য করিয়াছে। আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে জাতীয় সরকারের পক্ষে প্রত্যক্ষ কর স্থাপনা করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ষোড়শ সংশোধন আইন জাতীয় সরকারকে প্রত্যক্ষ কর স্থাপনের ক্ষমতা দান করে। চতুর্থতঃ, রাজ্যসরকারগুলিকে অর্থসাহায্য দান করিয়াও জাতীয় সরকার পরোক্ষভাবে রাজ্যসরকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় সংবাদপত্রগুলিও পরোক্ষভাবে জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। সংবাদপত্রগুলি ইহাদের সংবাদ পরিবেশন ও মন্তব্যের মাধ্যমে সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাবের পরিবর্তে জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

সুতরাং দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় সরকারের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা কোন মতে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। কার্যতঃ দেখা যায় যে, রাজ্যসরকারগুলি বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অধিকতরভাবে কার্যে ব্যাপৃত আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ—Federal Centralisation in the U. S. A.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাক্কালে অসম্পূর্ণ বা দুর্বল যুক্তরাষ্ট্ররূপে জন্ম লাভ করে। এই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নিতান্তরূপে সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু কালক্রমে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের—রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার—ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া রাজ্যসরকারগুলির অগ্রাধিকার ও মর্যাদা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত কারণে

কেন্দ্রীয় (জাতীয়) সরকারের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল।

প্রথমতঃ, শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী আইন অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নূতন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া ইহাকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী করিয়াছে। এইরূপে শাসনতন্ত্রের ষোড়শ সংশোধন আইন কেন্দ্রীয় সরকারকে যে-কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর কর ধার্য ও ধার্য কর আদায় করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। এইরূপে আদায়ীকৃত করের কোন অংশই রাজ্যসরকারগুলিকে দিবার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় হিসাবে এই বিচারালয় সর্বদাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য সম্পর্কে অত্যধিক অবহিত। এই বিচারালয় ইহার অনুমিত ক্ষমতা নীতি (Doctrine of Implied Powers) প্রয়োগ করিয়া আদি শাসনতন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আজ সমগ্র যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে তাহার ফলেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতির ফলে রাজ্যগুলির ভৌগোলিক সীমানার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। অন্তঃরাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিগত আদান-প্রদান এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই সমস্ত অন্তঃরাজ্য সম্পর্ক একমাত্র জাতীয় সরকার ব্যতীত কোন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্যা স্থানীয় সমস্যা হইতে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে এবং এই কারণে এই সমস্যাগুলির সমাধান একমাত্র জাতীয় সরকার জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে করিতে পারেন। ফলে জাতীয় সরকারের ক্ষমতা অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থানও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে তাহাদের নীতি নির্ধারণ করে। এই নীতি গঠনে প্রাদেশিকতার স্থান নাই। সুতরাং বিশেষ রাজনৈতিক দল পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে ইহা স্বাভাবিক।

পঞ্চমতঃ, ভারতের ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জাতীয় সরকার শিক্ষার প্রসার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচার, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে রাজ্য-সরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সাহায্যের মধ্য দিয়া রাজ্য সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রাদেশিকতার ভাব বিনষ্ট করিয়া জাতীয় ঐক্য তথা জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। কোন ঐক্যবদ্ধ জাতিই তাহার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নয়। মার্কিন দেশের জনসাধারণও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতাশালী করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। এই জাতীয়তাবোধের ফলেই মার্কিন জাতীয় সরকার ধনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শক্তিতে আজ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

শাসনব্যবস্থায় মূলরাষ্ট্রগুলির স্থান—Position of the States in the Union

বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নবগঠিত আলাস্কা ও হাওয়াই রাজ্যসহ পঞ্চাশটি মূলরাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত। প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রে একজন নির্বাচিত গভর্ণর, একটি দ্বি-পরিষদ আইনসভা, একটি রাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা বণ্টিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর সেই সমুদয় ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে—(১) যেগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয় নাই এবং (২) যেগুলি

প্রয়োগ করিতে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে নিষেধ করা হয় নাই অর্থাৎ শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত-ক্ষমতার তালিকা ও শাসনতন্ত্র কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারগুলির পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষমতার তালিকা দেখিলে আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়। সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয়।

আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকার ও কর্তব্য—Rights and Obligation of the State Government

শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে মূলরাষ্ট্রগুলির স্বাধীনভাবে তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিবার অধিকারী। স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিবার যে নির্দিষ্ট অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার কোনপ্রকারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত। তাহারা নিজ ইচ্ছামত তাহাদের শাসন-পরিষদ, আইনসভা ও বিচারবিভাগ গঠন করিতে পারে। তাহাদের পৃথক কর ধার্য করিবার ক্ষমতা আছে। প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়া তাহারা তাহাদের শাসনতন্ত্রও পরিবর্তন করিতে পারে। কোনরূপ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাইবার অধিকার দাবী করিতে পারে। তাহাদের নিজ ইচ্ছামত তাহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে রাজ্যসরকারগুলির সম্মতি ব্যতিরেকে কোন সংশোধন-প্রস্তাবই বৈধ বিবেচিত হয় না। সুতরাং শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা মূলরাষ্ট্রগুলির একটি প্রধান অধিকার বলিয়া গণ্য হয়।

প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা মূলরাষ্ট্রগুলির একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে ও যেগুলির প্রয়োগ আঞ্চলিক সরকারগুলির পক্ষে শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে, সে সমুদয় ক্ষমতা তাহারা কোনক্রমেই প্রয়োগ করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, একক বা সম্মিলিতভাবে তাহারা

কখনই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না।

শাসনতন্ত্র সংশোধন-পদ্ধতি--Procedure in regard to the Amendment of the Constitution

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় শাসনতন্ত্রের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে একটি জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন পদ্ধতিটিকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, উত্থাপিত প্রস্তাবকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করিতে হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হইয়া থাকে।

১। শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কংগ্রেস সরাসরিভাবে উত্থাপন করিতে পারে, কিন্তু এই সংশোধনের প্রস্তাব সিনেট সভা ও প্রতিনিধি-পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা পৃথক্‌ভাবে সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

২। দ্বিতীয়তঃ, মূলরাষ্ট্রগুলির আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক আইন-সভা কংগ্রেসকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সভা (Convention) আহ্বান করিবার অনুরোধ করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে আহূত বিশেষ সভা সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে।

কিন্তু যে পদ্ধতিতেই সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপিত হউক না কেন, সংশোধন প্রস্তাব বৈধ ও কার্যকর করিতে গেলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাহা সমর্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সংশোধনের প্রস্তাবগুলি দুই রকম পদ্ধতিতে অনুমোদিত হইতে পারে।

(১) প্রথমতঃ, মূলরাষ্ট্রগুলির মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের আইন-সভাগুলি অর্থাৎ পঞ্চাশটি মূলরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ আইনসভা যদি সংশোধন-প্রস্তাব অনুমোদন করে, তাহা হইলে প্রস্তাবটি বৈধ ও কার্যকরী হয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, মূলরাষ্ট্রগুলির আইনসভার পরিবর্তে প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সভা আহূত হইতে পারে এবং সমগ্র মূলরাষ্ট্রে আহূত বিশেষ সভার তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যক মূলরাষ্ট্রীয় বিশেষ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সংশোধন-প্রস্তাব কার্যকর হয়। উল্লিখিত দুইটি পদ্ধতির কোন্‌টির দ্বারা সংশোধন-প্রস্তাব সমর্থিত হইবে, কংগ্রেস সভা স্থির করে।

শাসনতন্ত্র সংশোধন-পদ্ধতির সমালোচনা—Criticism of the Process of Amendment

শাসনতন্ত্রের সংশোধনগুলি শাসনতন্ত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সকল দেশের পরিগণিত হয় এবং মূলশাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের সংশোধনসমূহ লইয়াই সমগ্র শাসনতন্ত্র গঠিত হয়। সুতরাং শাসনতন্ত্রের সংশোধনগুলি যাহাতে গণ-সার্বভৌমিকতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করিতে পারে, সেজন্য সংশোধন-পদ্ধতি সাবলীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মার্কিন শাসনতন্ত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রয়োজন হইল কংগ্রেস সভার $\frac{2}{3}$ সদস্যের ও রাজ্যগুলির $\frac{3}{4}$ অংশের সম্মতি। কিন্তু এই $\frac{2}{3}$ ও $\frac{3}{4}$-এর সম্মতি পাওয়া দুঃসাধ্য। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত শত শত শাসনতন্ত্রের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ২৫টি বিধিবদ্ধ সংশোধনে পরিণত হইতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং বিশেষ সংখ্যাধিক্যের নিয়ম পরিবর্তন করিয়া শুধু সাধারণ সংখ্যাধিক্যের সম্মতিতে সংশোধন প্রস্তাব পাশ করা যাইবে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তন করা কাম্য।

দ্বিতীয়তঃ, এই নিয়মের ফলে এক-চতুর্থাংশ ক্ষুদ্র রাজ্য ইচ্ছা করিলে সংঘবদ্ধভাবে তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের বিরুদ্ধে তাহাদের মত কার্যকর করিতে পারে। অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠের মতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বাতিল হইয়া যায়। সুতরাং মার্কিন শাসনতন্ত্র সংশোধনের এই নিয়ম অগণতান্ত্রিক ও গণ-সার্বভৌমিকতা নীতির বিরোধী। গণভোটের মাধ্যমেই এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্রের সংশোধন প্রস্তাবগুলির প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজ্যগুলি কর্তৃক সমর্থিত হইবার কোন নির্ধারিত সময়-সীমা নাই।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে কংগ্রেস সভা রাজ্যগুলি কর্তৃক সংশোধন প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিবার সময়-সীমা-নির্ধারণ করিয়া না দেওয়া হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রে বহু রাজ্য এই সম্মতি দান অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখে।

সমালোচনা—Criticism

সাধারণভাবে বলিতে গেলে মার্কিন শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয়। কিন্তু এই দুষ্পরিবর্তনীয়তা সত্ত্বেও মার্কিন শাসতন্ত্রের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাত্র পঁচিশটি সংশোধন হইয়াছে। অবশিষ্ট সংশোধন সম্ভব হইয়াছে প্রথা ও বিচারালয়ের মাধ্যমে। প্রথাগত বিধির দ্বারাই কেবিনেটের উৎপত্তি হইয়াছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা জাতীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার ক্ষমতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা ধীরে ধীরে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ তাহা কল্পনা করিতে পারিতেন না। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গঠন প্রকৃতি ও তাৎপর্য উভয়েরই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন পদ্ধতি শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একমাত্র পদ্ধতি নহে। যেখানে নিয়মতান্ত্রিক-পদ্ধতি সাহায্যে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, সেখানে অন্য উপায়ে—প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা—শাসনতন্ত্রের সংশোধন সহজসাধ্য করা হয়। শাসনতন্ত্র কোনক্রমে স্থাণুর মত থাকিতে পারে না। সুতরাং সকল শাসনতন্ত্রই পরিবর্তনীয়। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বৃটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষা কম নমনীয় নহে।

দলব্যবস্থা—Party System in the U. S. A.

দলব্যবস্থার ইতিহাস—History of the Party System

বর্তমান যুগে শাসনক্ষমতা ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া কোন শাসনকর্তৃপক্ষই তাহাদের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে না। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত জনগণের সমর্থন একান্ত অপরিহার্য। তাই প্রত্যেক দেশে ক্ষমতার প্রয়োগকারী ব্যক্তি বা সংসদ কোন নির্দিষ্ট দলের সমর্থনপুষ্ট হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

মার্কিন দেশে সর্বপ্রথম রাজার প্রতি অনুরক্ত ধনিক শ্রেণী ও স্বদেশের প্রতি অনুরক্ত দরিদ্র শ্রেণী—এই দুইটি দল ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর শাসনতন্ত্র গঠনের প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় দল (Federalists) ও গণতান্ত্রিক দলের (Democrats) অভ্যুত্থান ঘটে। প্রধানতঃ, ধনিক শ্রেণী লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় দল গঠিত ছিল। এই দলটির নীতি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা,—অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক দলের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যসরকারগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা রক্ষা করা। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রী (Republicans) ও গণতন্ত্রী (Democrats) নামক দুইটি দলের আবির্ভাব হয়। প্রজাতন্ত্রী দলের ঘাঁটি হইল উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি, আর গণতন্ত্রী দল দক্ষিণাঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় লইয়া গঠিত ছিল। গণতন্ত্রী দল দাসত্ব প্রথার সমর্থক ছিল, অপরপক্ষে প্রজাতন্ত্রী দল এই প্রথার বিরোধী ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের গৃহযুদ্ধের ফলে শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইয়া দাস-ব্যবসায় রহিত হয়। ফলে, সাধারণতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী দল দুইটির মতানৈক্যেরও প্রায় অবসান ঘটে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য—Two Party System and its Characteristics

বর্তমানে মার্কিন রাজনীতি ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত দুইটি দলের অস্তিত্ব থাকিলেও এই দুইটি দলের পার্থক্য নামমাত্র। যে সমস্ত কারণে একটি দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান ঘটে মার্কিন দেশে সেই সমস্ত কারণের নিতান্ত অভাব দেখা যায়। মার্কিন শাসনতন্ত্র এরূপ নিপুণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়াছে যে, এ সম্পর্কে বা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন-পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদের ফলে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন দেশ এসিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যক্ষ যোগসূত্রহীন যে, পররাষ্ট্র সম্পর্কিত মতভেদের ফলেও এদেশে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান সম্ভব নহে। সর্বশেষে বলা যায় যে, যে অর্থনৈতিক কারণে অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, মার্কিন দেশে সেই অর্থনৈতিক কারণও প্রায় অবর্তমান। দেশে বুভুক্ষু দরিদ্র শ্রেণী নাই বলিলেও চলে। মার্কিন দেশের

অধিবাসী অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, অধিকাংশ অধিবাসীই রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট না হইয়া অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছে। সুতরাং মার্কিন দেশে দুইটি দল থাকিলেও দলীয় পার্থক্য কম।

তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও এই দলীয় সমর্থনপুষ্ট হইয়া পরিচালিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নীতিগত প্রভেদ খুব কম। উভয় দলই অল্প-বিস্তর পরিমাণে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমর্থক। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও মূলরাষ্ট্রীয় সরকারের কতকগুলি উচ্চপদের জন্য কর্মচারী মনোনয়ন করা হইল দলগুলির প্রধান কার্য। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল দেখা যায়, যথা—প্রজাতন্ত্রী দল (Republican Party) ও গণতন্ত্রী দল (Democratic Party)। প্রত্যেকটি দলের প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে একটি প্রাথমিক সংঘ আছে। এই প্রাথমিক সংঘ হইতে সদস্য নির্বাচিত হইয়া প্রতি জিলার সভায় প্রেরিত হয়। জিলা সভার উপরে থাকে মূলরাষ্ট্রীয় সভা। রাষ্ট্রীয় সভার প্রধান কার্য হইল রাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য কর্মচারী মনোনয়ন করা এবং জাতীয় মহাসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করা। জাতীয় মহাসভা দলীয় নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া থাকে।

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দল-ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার —Comparative Study of the English and the American Party Systems

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় ব্যবস্থার মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্য আছে। উভয় দেশেই দুইটি প্রধান দল দেখা যায়। ইহা ছাড়া, উভয় দেশেই ছোট ছোট ২।১টি দল আছে। উভয় দেশেই দলের কেন্দ্রীয় উচ্চতম, জাতীয় ও স্থানীয় সমিতি আছে। নিম্নতম সমিতিগুলি উচ্চতর সমিতিগুলির কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। দলের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উভয় দেশেই স্থানীয় সংগঠন ব্যতীত আরও বহু ক্লাব ও সমিতি গঠিত হইয়াছে। উভয় দেশেই এই দলগুলির

কার্য আইনানুসারে পরিচালিত হয় এবং দলগুলি বিপ্লবাত্মক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে না।

কিন্তু উভয় দেশের এই দলীয় সংগঠনের সাদৃশ্যের অন্তরালে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল সরকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। দলীয় নীতিই হইল সরকারী নীতি এবং কেবিনেট সদস্যগণ দলের নেতা হিসাবে দল-নির্ধারিত নীতি কার্যে রূপায়িত করেন। কিন্তু মার্কিন দেশে রাজনৈতিক দল আইন-বহির্ভূত রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। সরকারের সহিত দলের কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র বা শাসনব্যবস্থায় দলের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল দলীয় নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে। নীতি-নির্ধারণই হইল দলের প্রধান কাজ, কিন্তু মার্কিন দেশে দলগুলির প্রধান কাজ হইল ভোটদাতাগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা ও দলের প্রার্থী নির্বাচন করা। দলীয় নীতি-নির্ধারণ কার্যে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে দলের সদস্যগণ রাজনীতির চর্চা করিলেও পেশাদারী রাজনীতিবিদ্ নহেন। কিন্তু মার্কিন দেশে দলের সদস্যগণের অনেকেই পেশাদারী রাজনীতিবিদের কাজ করেন। ইংলণ্ডে দলের নেতা থাকিলেও মার্কিন দেশের মত দলের কোন সর্বেসর্বা প্রভু (Boss) নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক দল—Present Political Parties in the U. S. A.

গণতন্ত্রী দল—The Democratic Party

গণতন্ত্রী দল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং দক্ষিণাঞ্চল রাজ্যগুলি হইল এ দলের প্রধান ঘাঁটি। এ দলের কংগ্রেসের উভয় পক্ষেই বহুদিন পর্যন্ত সংখ্যাধিক্য ছিল এবং এই দল একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর যাবৎ ক্ষমতায় আসীন ছিল। এই রাজনৈতিক দলটির শাসনকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এই দলের নেতা হ্যারি ট্রুম্যান রাষ্ট্রপতি থাকা কালে মার্কিন সরকার মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা অনুসারে কয়েকটি দেশকে আর্থিক সাহায্য দান করে। পররাষ্ট্র-

সম্পর্কিত ব্যাপারে এই দল সোভিয়েত-বিরোধী নীতি অনুসরণ করে এবং সোভিয়েত নীতি যাহাতে প্রসার লাভ না করিতে পারে তজ্জন্য পশ্চিমাঞ্চল রাষ্ট্রগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছে। দলের অন্যতম নেতা রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী এই দল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সমর্থন করে। এই দলের আভ্যন্তরীণ নীতি হইল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দল নিম্নহারে শুল্ক স্থাপনের পক্ষপাতী।

প্রজাতন্ত্রী বা সাধারণতন্ত্রী দল—The Republican Party

সাধারণতঃ এই দলটি উচ্চহারে শুল্ক স্থাপনের সমর্থক বলিয়া পরিচিত হইলেও বর্তমানে উভয় দলের মধ্যে এ বিষয়ে পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। শিল্প ও বাণিজ্য স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া এই দল গঠিত এবং মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে এই দলের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কি বৈদেশিক ব্যাপারে এই উভয় দলের মধ্যে বিশেষ কোন নীতিগত পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এই দল সরকার কর্তৃক বে-সরকারী শিল্প-গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। বহুদিন ডুওই আইসেন হাওয়ারের নেতৃত্বে এই দল গণতন্ত্রী দলকে নির্বাচনে পরাজিত করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করে।

এতদ্ব্যতীত শ্রমিক সংঘ লইয়া গঠিত একটি শ্রমিক দলও আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু সাম্যবাদীও ছিল। কিন্তু সরকার তাহাদিগকে সরকারী কার্য হইতে বিতাড়িত করে। বর্তমানে মার্কিন দেশে প্রত্যক্ষভাবে কোন সাম্যবাদী দল নাই।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের উপাদান

১। আদি শাসনতন্ত্র। ২। পঁচিশটি সংশোধন আইন। ৩। কংগ্রেস সভা কর্তৃক প্রণীত আইন। ৪। শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশ ও উপবিধি। ৫। বিচারবিভাগীয় নির্দেশ। ৬। প্রথাগত বিধান।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

(১) যুক্তরাষ্ট্রীয়। মূলরাষ্ট্রীয় সরকারগুলিই হইল অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী।

(২) প্রধানতঃ লিখিত হইলেও শাসনতন্ত্রে প্রথাগত বিধান ও বিচার-বিভাগীয় নির্দেশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

(৩) অনমনীয়—সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। পরিবর্তন-পদ্ধতি জটিল।

(৪) শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য—শাসনতন্ত্র হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

(৫) শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা হয়। শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ বিচারালয় কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে।

(৬) শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি প্রয়োগ—তাহা সত্ত্বেও বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে।

(৭) রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা—শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভা পরস্পর প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য পরিচালনা করে।

শাসনকর্তৃপক্ষ—রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসনবিভাগের প্রধান। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক, চৌদ্দ বৎসরকাল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী স্বভাবজাত নাগরিক রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারেন। চারি বৎসরকালের জন্য তিনি পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং একাদিক্রমে দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন না। তিনি বাৎসরিক ২০০,০০০ ডলার বেতন ও অন্যান্য রাহা খরচ পান। তাঁহার বিরুদ্ধে এক মহা-অভিযোগ ব্যতীত অন্য কোন অভিযোগ আনা যায় না।

ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতি বহু ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আইন বলবৎ করা ছাড়াও প্রধান প্রধান পদে সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে কর্মচারী নিয়োগ করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন। উভয় সভার সম্মতিক্রমে যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি-স্থাপন করিতে পারেন। সেনাবিভাগের তিনিই সর্বাধিনায়ক।

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা না থাকিলেও কংগ্রেস সভায় বাণী প্রেরণ করিয়া বা ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইন-প্রণয়নের উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। দলের সমর্থকগণের মাধ্যমেও তাঁহার আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে দণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি মার্জনা করিতে পারেন বা দণ্ড স্থগিত রাখিতে পারেন।

ভোটদাতৃগণ, আইনসভা বা কেবিনেট সভার নিকট রাষ্ট্রপতি দায়ী নহেন। তাঁহার চারিবৎসর কার্যকালের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। এ বিষয়ে তিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন।

কেবিনেট—যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেবিনেটের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে দশজন কর্মসচিব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া কেবিনেট গঠিত হয়। ইঁহারা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করিলেও রাষ্ট্রপতির সহকর্মী বলিয়া পরিগণিত নহেন। তাঁহারা সকলেই রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী ও পৃথকভাবে তাঁহার নিকট দায়ী। বৃটিশ কেবিনেটের মত ইঁহারা আইনসভার সদস্য নহেন এবং আইনসভার নিকট ইঁহাদের কোন যৌথ দায়িত্বও নাই।

আইনসভা—কংগ্রেস—সিনেট ও প্রতিনিধি-পরিষদ লইয়া কংগ্রেস সভা গঠিত। কংগ্রেস অ-সার্বভৌম আইনসভা বলিয়া পরিচিত: কারণ—১। এই সভার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২। রাষ্ট্রপতির ভিটো ক্ষমতার দ্বারা সীমায়িত। ৩। শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করিতে অক্ষম। ৪। কংগ্রেস-প্রণীত আইন সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনী ঘোষিত হইতে পারে।

সিনেট—প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র হইতে ছয় বৎসরের জন্য দুইজন সদস্য নির্বাচিত হইয়া মোট একশত জন সদস্য লইয়া সিনেট গঠিত। সিনেটের সদস্যগণ অন্ততঃ তিরিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই এবং মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুনর্নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

সিনেট সভা সমস্ত দেশের উচ্চ পরিষদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিগণিত হয়; তাহার কারণ—১। সাধারণ আইন-

প্রণয়ন ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ সিনেট সভাই আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ২। অর্থ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করিতে না পারিলেও সিনেট সভা এই বিলগুলি ব্যাপকভাবে সংশোধন করিতে পারে। ৩। রাষ্ট্রপতি শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা, নিয়োগ, চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে সিনেট সভাই বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি পাইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। সিনেটের সদস্যগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনপ্রথা, সদস্যগণের সংখ্যাল্পতা ও দীর্ঘতর কার্যকাল ইহার ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণ।

প্রতিনিধি-পরিষদ—সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে চারিশত সাঁইত্রিশ জন জাতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া প্রতিনিধি-পরিষদ গঠিত হয়। ইহার কার্যকাল মাত্র দুই বৎসর। আইন-প্রণয়ন করা ও অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা ইহার প্রধান কার্য। শাসনবিভাগের উপর ইহার কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাই। শাসনবিভাগও প্রতিনিধি-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না।

আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি ও কমিটি ব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি পার্লামেন্ট সভার আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতির অনুরূপ। তবে এখানে প্রথম পাঠের পরই বিল কমিটিতে প্রেরিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। তবে ইহাদের ক্ষমতা অধিকতর ব্যাপক। ইহারা যে-কোন বিলের ব্যাপক পরিবর্তন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে কমিটির সভাপতিগণের ক্ষমতা অনেক বেশী। তাঁহারাই বিলগুলি পরিচালনা করেন। প্রধান প্রধান কমিটিগুলি হইল স্থায়ী কমিটি, সম্মেলন কমিটি, বিশেষ তদন্ত কমিটি ইত্যাদি।

বিচারবিভাগ—একটি সুপ্রীম কোর্ট, এগারটি সার্কিট কোর্ট ও নব্বইটি জিলা কোর্ট লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগ গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগের মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট হইল সর্বোচ্চ বিচারালয়। সিনেট সভার

অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারপতিসহ আটজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। বিচারপতিগণ অসদাচরণ না করিলে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন।

শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখা ইহার প্রধান কর্তব্য। শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া সুপ্রীম কোর্ট শাসনবিভাগ ও আইনসভার ক্ষমতা সংযত রাখিয়াছে। এই ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়া শাসনতন্ত্রের অনমনীয় ভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মূলরাষ্ট্রগুলির অধিকার ও কর্তব্য—পঞ্চাশটি মূলরাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ইহাদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি আছে :

১। শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নিরপেক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতা ; ২। স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ও পৃথক করধার্য করিবার অধিকার ; ৩। শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার ইত্যাদি।

তাহাদের কর্তব্য হইল : ১। প্রজাতন্ত্রী সরকার অব্যাহত রাখা ; ২। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যপরিধির মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা ; ৩। যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ না করিবার বাধ্যবাধকতা।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতি—সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন এই দুইটি স্তরে শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইয়া থাকে। সংশোধন প্রস্তাব দুইটি পদ্ধতিতে উত্থাপিত হইতে পারে। উত্থাপিত প্রস্তাবও দুইটি পদ্ধতিতে অনুমোদিত হইতে পারে।

১। প্রস্তাব উত্থাপন-পদ্ধতি

(ক) কংগ্রেসের উভয় কক্ষের (সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ) উপস্থিত সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়।

অথবা (খ) অঙ্গরাজ্যসমূহের (৫০টি) আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের (৩৪টি) অনুরোধে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত বিশেষ সভা কর্তৃক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে।

২। প্রস্তাব অনুমোদন পদ্ধতি

(ক) অঙ্গরাজ্যসমূহের আইনসভার তিন-চতুর্থাংশের অর্থাৎ ৩০টি রাজ্য আইনসভা কর্তৃক সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়া চাই।

অথবা (খ) অনুমোদনের উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যসমূহে আহূত বিশেষ সভার তিন-চতুর্থাংশের দ্বারা সংশোধন প্রস্তাব সমর্থিত হওয়া চাই।

কার্যতঃ প্রথম পদ্ধতির সাহায্যেই সকল সংশোধন প্রস্তাব আনীত হইয়াছে। কি পদ্ধতিতে আনীত প্রস্তাব অনুমোদিত হইবে তাহা কংগ্রেস সভাই স্থির করে এবং কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে অনুমোদনের সময়-সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ—আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং রাজ্যসরকারগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল ছিল। কিন্তু কালক্রমে কতিপয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তির প্রভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া কেন্দ্রীয় প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শক্তিগুলি হইল, ১। শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইন, (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ব্যাখ্যাগত সিদ্ধান্ত, (৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি, (৪) জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান, (৫) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্যদান ও (৬) সংবাদপত্রগুলি কর্তৃক প্রাদেশিকতার পরিবর্তে জাতীয়তা প্রচার বৃদ্ধি।

দলব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রে প্রজাতন্ত্রী দল ও গণতন্ত্রী দল—এই দুইটি রাজনৈতিক দল সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দল দুইটির মধ্যে নীতিগত পার্থক্য অপেক্ষা সংগঠনের পার্থক্য বেশী। নির্বাচনপ্রার্থী এবং স্থায়ী কর্মচারী মনোনীত করা দলগুলির প্রধান কার্য। প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে অবস্থিত প্রাথমিক দলীয় সংগঠন হইতে জাতীয় মহাসভা পর্যন্ত ইহাদের অনেকগুলি দলীয় সংগঠন আছে। উভয় দলই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমর্থক।

তৃতীয় অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র (U. S. S. R.)

সোভিয়েত রাষ্ট্র নামের তাৎপর্য—Significance of the name of the Soviet State

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিধ্বংসী বিপ্লবের ফলে রুশ দেশের সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জারতন্ত্রের সহিত ইহার আনুষঙ্গিক সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া নিকোলাই লেনিন, স্টালিন প্রভৃতি বলশেভিক নেতৃগণ মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে এক অভিনব শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জবরদস্তিমূলক উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সাম্যবাদী নেতৃগণ গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করেন। এই শাসনতন্ত্রটিকে পরবর্তী কালে সময়োপযোগী করিয়া গঠন করিবার জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আর একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই নূতন শাসনতন্ত্রে আরও কতিপয় রাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাজ্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রটির নামকরণ হইল 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের সংঘ' (Union of the Soviet Socialist Republics)। এই নামকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, নামকরণের মধ্যে কোথাও 'রাশিয়া' শব্দটির উল্লেখ নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনব্যবস্থা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রচিত শাসনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরলোকগত সাম্যবাদী নেতা স্টালিনের নামানুসারে এই শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ 'স্টালিন শাসনতন্ত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের সংঘ নামক রাষ্ট্রটির শাসনব্যবস্থার সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে এই দেশটি সম্পর্কে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

আয়তনে সোভিয়েত রাষ্ট্র পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র। ইউরোপ ও এশিয়া এই উভয় মহাদেশেই এই রাষ্ট্রের ৮,৫৯৯,৭৭৬ বর্গমাইল পরিমিত স্থান বিস্তৃত। এই দেশের সীমানায় অবস্থিত রাষ্ট্রের সংখ্যা হইল বারটি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিগুলির উল্লেখ না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, এই রাষ্ট্রে একশত নয়টি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতি বাস করে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যেও এই রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বিপ্লবের পূর্বে দেশের বিভিন্ন অংশের স্থানীয় নাম থাকিলেও সাধারণতঃ এই বিপুল আয়তনের দেশটি জার-শাসিত রুশিয়া বলিয়া অভিহিত হইত। বিপ্লবের পরবর্তী কালে এই রাষ্ট্রের নামকরণ হইল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের সংঘ। নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই নূতন নামকরণে 'রুশিয়া' নামটির উল্লেখ নাই। যে ১৫টি সাধারণতন্ত্র রাজ্য লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত, রুশিয়া তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান সাধারণতন্ত্র মাত্র।

নব-গঠিত রাষ্ট্রের নামকরণ বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রটির প্রকৃতি জানা যাইতে পারে। বিপ্লবের পূর্বে শতকরা নব্বুইজন কৃষক-শ্রমিক লইয়া গঠিত মানুষ শতকরা দশজন পুঁজিপতি, মালিক ও আমলাতন্ত্র কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হইত। উৎপাদন, বণ্টন ও শাসনব্যবস্থা শতকরা এই দশজন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। বিপ্লবের ফলে শতকরা এই দশজন ক্ষমতাচ্যুত হইলেন এবং শতকরা নব্বুইজন মেহনতি মানুষ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। লেনিনের মতে বিপ্লব দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে শতকরা দশজনের গণতন্ত্র শতকরা নব্বুইজনের গণতন্ত্রে পরিণত হইল। জমি-জায়গা, খনি, কল-কারখানা প্রভৃতির মালিক হইল এই শতকরা নব্বুইজন মেহনতি মানুষ। যৌথ কৃষি (Collective Farming) ও সমবায় পদ্ধতিতে শিল্প (Co-operative Firm) ব্যবস্থাপনার ফলে শ্রমিকগণই কৃষি ও শিল্পের মালিক হইল। প্রত্যেক শ্রমিক তাহার সাধ্যমত পরিশ্রম করিবে এবং শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে পারিশ্রমিক পাইবে। এইরূপে সমাজব্যবস্থা হইতে নিষ্কর্মা পরজীবী শোষক শ্রেণী অপসারিত হইয়া শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং নবগঠিত রাষ্ট্র এক নব-পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার মূল কথা হইল, সকলকেই কাজ করিতে হইবে এবং কাজ করা এক সম্মানজনক

ব্যাপার। যে কাজ করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না (He who does not work neither shall he eat)। এই বাধ্যতামূলক কাজের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হইল এবং এই বাধ্যতামূলক শ্রম প্রত্যেক সবল নাগরিকেরই অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবার ফলে সমাজব্যবস্থায় শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রেণীহীন সমাজের অভ্যুত্থান ঘটিল। এই কারণে সোভিয়েত রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া দাবি করে।

সোভিয়েত শব্দটির অর্থ হইল সভা বা পরিষদ (Council)। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ধর্মঘট পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম এই সভা গঠিত হয়। অত্যল্পকালের মধ্যে এই সংগঠন শক্তিশালী হইয়া সরকারের নিকট হইতে কয়েকটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবি আদায় করে। কিন্তু পরে এই সভা সরকার কর্তৃক দমন করা হয়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময় পুনরায় এই সোভিয়েতগুলির অভ্যুত্থান ঘটে। পেট্রোগ্রাড্ শহরে প্রথম সোভিয়েত গঠিত হয় এবং অল্পসময়ের মধ্যে অন্যান্য শহরেও পেট্রোগ্রাড্ সোভিয়েতের অনুকরণে সোভিয়েত গঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলের কৃষি-শ্রমিকগণ শহরাঞ্চলের শিল্প-শ্রমিকগণের মত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও সুসংবদ্ধ ছিল না বলিয়া গ্রামাঞ্চলে কিছু বিলম্বে এই সোভিয়েত গঠিত হয়। সোভিয়েত সংস্থাগুলি শুধু মালিক-বিরোধী ছিল না, ইহারা সরকার-বিরোধীও ছিল। বিপ্লব পরিচালনা করাই ছিল ইহাদের প্রধান কাজ। জারের পদত্যাগের পর কেরেনস্কীর নেতৃত্বে যে সাময়িক সরকার (Provisional Government) গঠিত হয়, সোভিয়েতগুলির উগ্র বিরোধিতার ফলে কেরেনস্কী সরকারেরও পতন ঘটে। এই সময়ে লেনিন ঘোষণা করিলেন—সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হস্তে ন্যস্ত (All power to the Soviets)। লেনিনের এই ঘোষণায় সোভিয়েত ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং কার্যতঃ এই সোভিয়েত সংগঠন সাহায্যে লেনিন ক্ষমতা হস্তগত করিয়া দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনিতে সমর্থ হন।

প্রতি গ্রামে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া, শহরে প্রতি শিল্প-কারখানার শ্রমিক লইয়া এবং সেনাদলের প্রতিনিধি লইয়া প্রাথমিক সোভিয়েত গঠিত

এই সভার বৈশিষ্ট্য হইল যে, একমাত্র যাহারা নিজেরা কাজ করে তাহারই এই সভার সদস্য হইতে পারে। মূলধনের মালিক, জমিদার বা ব্যবসায়ী প্রভৃতি পরজীবীর এই সভায় স্থান নাই। সোভিয়েতগুলি দ্বি-বিধ কাজ করে। প্রথমতঃ, এই সোভিয়েত ব্যবস্থার সাহায্যে শ্রমিকগণকে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সোভিয়েতগুলিই স্থানীয় উৎপাদন, বন্টন ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে ও উচ্চস্তরের সোভিয়েত-গুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। দ্বিতীয়তঃ, এই সংগঠনের সাহায্যেই সাম্যবাদী দলের নীতি, নির্দেশ ও কার্যক্রম জনগণের মধ্যে কার্যকর করা সম্ভব হইয়াছে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে গ্রামাঞ্চল সোভিয়েতগুলি অনগ্রসর ছিল। উচ্চ-স্তরের সোভিয়েতগুলিতে শহরাঞ্চল সোভিয়েতগুলির অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকিবার ফলে শহরাঞ্চল সোভিয়েত-গুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের স্টালিন শাসনতন্ত্র শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল সোভিয়েত-গুলির পার্থক্য দূর করিয়া উভয়কে সমপর্যায়ভুক্ত করে। সমগ্র দেশে আজ নানাস্তরের সোভিয়েত সুসংবদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতেছে। সোভিয়েত সংগঠনের সহিত একটি পিরামিডের তুলনা করা যাইতে পারে। পিরামিডের ভিত্তি যেরূপ বহু-বিস্তৃত কিন্তু যতই উর্ধ্বে উঠিয়াছে ততই সংকীর্ণ হইয়া চূড়ায় সংকীর্ণতম হইয়াছে। সোভিয়েত সংগঠনও তদ্রূপ অসংখ্য গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল সোভিয়েত লইয়া গঠিত। এই বহু-বিস্তৃত প্রাথমিক সংগঠনগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক জেলা সোভিয়েত গঠিত, জেলা সোভিয়েতের প্রতিনিধি লইয়া অঞ্চল সোভিয়েত গঠিত। এইরূপে প্রত্যেকটি নিম্নস্তরের সোভিয়েতের প্রতি-নিধি লইয়া উচ্চস্তরের সোভিয়েতগুলি, যথা, জাতীয় এলাকা সোভিয়েত, স্ব-শাসিত অঞ্চল সোভিয়েত, স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র সোভিয়েত, অঙ্গরাজ্য সোভিয়েত এবং সর্বোপরি হইল সমগ্র দেশের সুপ্রীম সোভিয়েত। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলির প্রতিনিধি লইয়া সোভিয়েত পিরামিডের এই চূড়া গঠিত হইয়াছে। কিন্তু শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হইল জনপ্রতিনিধি লইয়া গঠিত প্রাথমিক সোভিয়েত সংগঠনগুলি।

স্টালিন শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সোভিয়েত সংগঠনগুলির গুরুত্ব ও কার্যকারিতার উল্লেখ আছে। উক্ত অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েত সংগঠন হইল এই সাধারণতন্ত্রসমূহের সংঘের প্রকৃত বুনিয়াদ। মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোভিয়েত সংস্থা জমিদার ও পুঁজিপতিগণকে উচ্ছেদ করিয়া মেহনতি মানুষের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এই গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল সোভিয়েতগুলিই হইল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনার যন্ত্র।

সোভিয়েত সংস্থাগুলির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অঙ্গীকার না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, সোভিয়েত দেশে একমাত্র রাজনৈতিক দল—সাম্যবাদী দল (Communist Party) থাকিবার ফলে সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থা এই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সোভিয়েত সংস্থাগুলি নির্বিচারে দলীয় নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন করে।

বর্তমানে সোভিয়েত রাষ্ট্র হইল পনেরটি সম-পর্যায়ভুক্ত অঙ্গরাজ্যের সংঘ। জাতির ভিত্তিতে গঠিত এই পনেরটি অঙ্গরাজ্য বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। সেইজন্য এই নূতন রাষ্ট্রের নামকরণ করা হইল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের সংঘ (Union of the Soviet Socialist Republics —U.S.S.R.)

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যাহাতে বিপ্লবের আদর্শের প্রতিফলন ও রূপায়ণ সম্ভব হয়। শাসনতন্ত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে। বিপ্লবের পর যে নব-বিধান প্রবর্তিত হইল তাহার অর্থনৈতিক কাঠামো হইল সমাজতান্ত্রিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো হইল সোভিয়েত শাসন। শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, নব গঠিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের সংঘ রাষ্ট্রটি কৃষক ও মজদুর লইয়া গঠিত এবং কর্মিগণই এই রাষ্ট্রের একমাত্র মালিক ও শাসনকর্তা। নিষ্কর্মা পরজীবী সম্প্রদায়ের এ রাষ্ট্রে কোন স্থান নাই। সুতরাং সোভিয়েত রাষ্ট্রে একমাত্র শ্রেণী হইল শ্রমিক শ্রেণী এবং একমাত্র রাজনৈতিক দল হইল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের ধারক সাম্যবাদী দল।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—Characteristics of the Soviet Constitution

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—Federal Government

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। নিম্নলিখিত পনেরটি সদস্যরাষ্ট্রের (Union Republics) সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্রটি গঠিত:—১। রাশিয়া, ২। ইউক্রেন, ৩। বাইলো-রাশিয়া, ৪। আজার বাইজান, ৫। জর্জিয়া, ৬। আর্মেনিয়া, ৭। তুর্কমেনিয়া, ৮। উজবেকিস্তান, ৯। তাজাকস্তান, ১০। খিরগিজিয়া, ১১। কাজাকস্তান, ১২। মলডেভিয়া, ১৩। এস্তোনিয়া, ১৪। ল্যাটভিয়া, ১৫। লিথুয়ানিয়া। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখের একটি নূতন আইনের বলে কেরেলো-ফিনিশ রাজ্যটির স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ করিয়া ইহাকে রুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সদস্য-রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত একটি স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা হয়। উল্লিখিত পনেরটি সদস্যরাষ্ট্র ব্যতীত আরও তিনটি পৃথক শ্রেণীর আঞ্চলিক সরকার বা স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীটি সাধারণতঃ স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র (Autonomous Republics) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সদস্যরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু জাতিগুলির বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ধরনের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত সংখ্যালঘু জাতির জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর তাহাদের জন্য স্ব-শাসিত প্রদেশ (Autonomous Regions) গঠিত হইয়াছে। স্ব-শাসিত প্রদেশের নাগরিকগণ তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ভাষা, আচার-পদ্ধতি ও কৃষ্টির উৎকর্ষসাধন করিবার অধিকার পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ, অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি জাতীয় অঞ্চল (National Areas) সৃষ্টি করা হইয়াছে। সদস্যরাষ্ট্রগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় অঞ্চল পর্যন্ত এই চার শ্রেণীর স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথক্ভাবে সুপ্রীম সোভিয়েতের জাতিবর্গের সভায় যথাক্রমে পঁচিশ, এগার, পাঁচ ও একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র-কর্তৃক প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সহিত অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যরাষ্ট্রগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূলনীতিবিরোধী এইরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন, বাইলো-রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পৃথক প্রতিনিধির দ্বারা এই দুইটি সদস্যরাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হয়। তৃতীয়তঃ, সদস্যরাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করিবার অধিকারও শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে সদস্যরাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার-নিরপেক্ষভাবে পৃথক সেনাবিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, উল্লিখিত চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর আঞ্চলিক সরকার পৃথকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকারী।

একটু সূক্ষ্মভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কার্যতঃ সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও সদস্যরাষ্ট্রীয় সরকার-গুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের নীতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কেন্দ্রীয়ভাবের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, করস্থাপন, সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, মুদ্রাব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায়, বিচারব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা করে। এতদ্ব্যতীত করধার্য ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন ব্যতীত কোন সদস্যরাষ্ট্রই নূতন কর প্রবর্তন করিতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট নীতিগুলিও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন আইনের সহিত যদি কোন সদস্যরাষ্ট্র-প্রণীত আইনের বিরোধ হয় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনই বলবৎ হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সাম্যবাদী দলের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাধান্য সূচিত করে। এই শাসনব্যবস্থায়

সরকার ও দলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যাঁহারা দলের নেতা তাঁহারাই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দলের নেতৃগণ প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত শাসন-পরিচালনার উপর অবাধ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বিভাগ থাকিলেও ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকার একদল লোকের হস্তেই কেন্দ্রীভূত।

২। অর্থনৈতিক ভিত্তি--Economic Basis

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই হইল শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য। এই ব্যবস্থায় নিষ্কর্মা, পরজীবী সম্প্রদায়ের কোন স্থান নাই।

৩। অধিকার ও কর্তব্য-সম্বলিত—Rights United with Duties

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র শুধু নাগরিক অধিকারগুলির তালিকা বিধিবদ্ধ করিয়া কর্তব্য শেষ করে নাই, নাগরিক অধিকারগুলি—বিশেষ করিয়া অর্থ-নৈতিক অধিকারগুলি যাহাতে কার্যকরী হয়, সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সোভিয়েত শাসনতন্ত্র হইল শুধু একমাত্র শাসনতন্ত্র, যে শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকারের সহিত নাগরিক কর্তব্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতা সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

৪। সম-ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বি-কক্ষ—Two Houses with Co-equal Powers

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উভয় পরিষদই সমান ক্ষমতার অধিকারী। কি আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদের ক্ষমতার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা হয় নাই।

৫। দ্বি-বিধ মন্ত্রী—Two classes of Ministers

শাসন-পরিষদের সংগঠনেও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পরিষদ আইনসভার উভয় পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে। শাসন-পরিষদের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া গঠিত। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রিগণকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী (All Union Ministers) বলা হয়। ইঁহারা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র-সম্পর্কিত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রিগণকে সদস্য রাষ্ট্রমন্ত্রী (Union Republic Ministers) বলা হয়। ইঁহাদের কার্য হইল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের অনুরূপ বিভাগগুলির সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা।

৬। প্রেসিডিয়াম—The Presidium

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল প্রেসিডিয়াম। তেত্রিশ জন সদস্য লইয়া প্রেসিডিয়াম গঠিত। সুপ্রীম সোভিয়েতের যুক্ত অধিবেশনে এই সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রধানতঃ আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেও, প্রেসিডিয়াম শাসন-সংক্রান্ত ও বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতাও পরিচালনা করিয়া থাকে।

৭। বিশেষ বিচার-ব্যবস্থা—Peculiar Judicial Organisation

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব হইল, ইহার বিচার-ব্যবস্থা। নির্বাচনপদ্ধতিতে সমুদয় বিচারকগণের নিয়োগ হয় এবং বিচার-কার্য পরিচালনায় জনগণের প্রতিনিধিগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে বে-আইনী ঘোষণা করিবার ক্ষমতা কোন সোভিয়েত বিচারালয়ের নাই।

৮। এক-দলীয় শাসন—One-Party Rule

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার এক-দলীয় শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থায় একমাত্র সাম্যবাদী দল ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না।

৯। গণভোট ব্যবস্থা—System of Referendum

স্টালিন শাসনতন্ত্রে গণভোটের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রেসিডিয়ামের নেতৃত্বে অথবা যে-কোন একটি অঙ্গরাজ্যের দাবিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সিদ্ধান্ত সমগ্র দেশব্যাপী গণভোটের মাধ্যমে গ্রহণ করিবার বিধি আছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পরবর্তী কাল হইতে আজ পর্যন্ত কোন বিষয়ই গণভোটের সাহায্যে স্থির করিবার প্রয়োজন হয় নাই। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের আরও কতিপয় বিধানের মত এ বিধানটিও একটি নিষ্ক্রিয় বিধান মাত্র।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য—Fundamental Rights and Duties in the Soviet Constitution

সকল সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে শুধুমাত্র যে নাগরিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকে তাহা নহে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই মৌলিক অধিকারগুলির সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এরূপ কতকগুলি নাগরিক অধিকারের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা অন্য কোন দেশের শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই। সর্বদেশের শাসনতন্ত্র-কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখ ছাড়াও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এরূপ কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা নাগরিকগণ এই মৌলিক অধিকারগুলির সহায়তায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। কাজ করিবার অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার প্রভৃতি এমন কতকগুলি অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক বিধিবদ্ধ ও কার্যে রূপায়িত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে যাহা অন্য কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। শাসনতন্ত্র-কর্তৃক নিম্নলিখিত অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(১) কাজ করিবার অধিকার—Right to Work

এই অধিকার সংরক্ষিত হওয়ার ফলে বেকারসমস্যার সমাধান হইয়াছে। কোন কর্মঠ সোভিয়েত নাগরিক বেকার থাকিতে পারে না। নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার সাহায্যে বেকার-

সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছে। সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি হইল, যে কাজ করে না, সে খাইতেও পাইবে না ("He who does not work, neither shall he eat.")। এই ব্যবস্থা দ্বারা সমাজ হইতে শ্রমবিমুখ, পরজীবী সম্প্রদায়কে উৎসাদিত করিয়া শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার—Right to Rest and Leisure

নাগরিকগণের যেরূপ চাকুরী পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে এবং কাজের পরিমাণ ও যোগ্যতা অনুসারে বেতন পাইবার নিশ্চয়তা আছে, তদ্রূপ বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার আছে। এইজন্য শ্রমিকদের দৈনিক সাত ঘণ্টার অধিক কাজ করিতে হয় না ও বিশেষ আয়াসসাধ্য কার্যে চার ঘণ্টার অধিক এক-যোগে কাহাকেও কাজ করিতে হয় না। নিযুক্ত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী পূর্ণ বেতনে বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাল ছুটি পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্য দেশের সর্বত্র স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামাগার ও অবসর-বিনোদনের নানাবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বার্ধক্যে, অসুস্থ অবস্থায় অথবা অক্ষমতা ক্ষেত্রে সোভিয়েত নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবার অধিকারী।

(৩) শিক্ষার অধিকার—Right to Education

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বিরাট অভিযান পরিচালনা করিয়া যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছে, সে-সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলেই একমত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর অধিবাসীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও নানাবিধ বৃত্তিমূলক উচ্চস্তরের শিক্ষা গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞান বিষয়গুলির শিক্ষা ও গবেষণা ব্যাপারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আজ জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উচ্চস্তরের শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। পরবর্তী কালে উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বল্প বেতন দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে।

(৪) জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান অধিকার —Equality of Rights regardless of nationality, race and sex

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের সর্ববিষয়ে সমান অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাজাতির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদান করিবার সুব্যবস্থা করা সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান কীর্তি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যাহাতে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আত্মোন্নতি করিতে সক্ষম হয়, সেজন্য তাহাদের নিজস্ব লিপি, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত জীবনের সহায়ক নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। নারীদেরও জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

(৫) ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার—Freedom of Conscience

বিপ্লবের পরবর্তী কালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যে শুধু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল তাহা নহে, অধিকন্তু রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে ধর্মসংগঠনগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহাদের বিলোপসাধন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের এই বিরূপ মনোভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। বর্তমানে সোভিয়েত নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে ধর্মমত পোষণ ও প্রচার করিতে পারে। ধর্মের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও সোভিয়েত নাগরিকগণের উপর অর্পিত হইয়াছে।

(৬) বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা—Freedom of Speech and Expression

সমস্ত সভ্য দেশেই জনগণের বাক্-স্বাধীনতা একটি মূল্যবান মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে একটি শর্তে এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ শ্রমিকদের স্বার্থের সহিত সংগতি রাখিয়া এই মতামত প্রকাশের অধিকার পাইতে পারেন—'In conformity with the interests of the working people.' মতা-

মত প্রকাশের দ্বারা যদি কোন মতে শ্রমিকদের স্বার্থের হানি হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ নির্বিচারে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন। এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোন্ মতামত শ্রমিকের স্বার্থের পরিপন্থী তাহা কে নির্ধারণ করিবে? সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র সাম্যবাদী দল-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকার জন্য এই অনুমান স্বাভাবিক যে, সাম্যবাদী সরকার যে মতামত শ্রমিকের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া বিবেচনা করিবেন, সে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিকেরই থাকিতে পারে না। একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে যে দেশে অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়াছে, সেখানে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার কি পরিমাণে থাকিতে পারে, সে-সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এতদ্ব্যতীত সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, শিক্ষায়তন প্রভৃতি জনমত-গঠনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়া রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন জনমত-সৃষ্টি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(৭) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাধীনতা—Personal Freedom and inviolability of Home

কোন ব্যক্তিকেই বিনা বিচারে বা সরকারী অভিযোক্তার বিনা অনুমোদনে আটক করা যায় না। অনুরূপভাবে চিঠিপত্রের ও পারিবারিক জীবনের অন্য বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছে। উল্লিখিত অধিকারগুলি নাগরিকগণ কি পরিমাণে ভোগ করিতে পারেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রাষ্ট্রের অথবা সাম্যবাদী দলের প্রতি আনুগত্যের অভাব বা দলীয় নীতির বিরুদ্ধ সমালোচক সন্দেহক্রমে যে-কোন ব্যক্তিকেই নির্বিচারে আটক করা যায় এবং সরকার পরিচালিত বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

(৮) আশ্রয় পাইবার অধিকার—Right of Asylum

শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্ত যে সমস্ত বিদেশী স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সোভিয়েত দেশে আগমন করে, সোভিয়েত শাসনতন্ত্র সেই সমস্ত

শ্রমিকের স্বার্থের ধারক বিদেশীকে আশ্রয় পাইবার অধিকার দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে-সমস্ত বিদেশী তাহাদের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কার্যকলাপের জন্য অথবা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও আশ্রয় পাইবার অধিকার শাসনতন্ত্র-কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

(৯) সংঘ গঠন করিবার অধিকার—Freedom to form Organisations

শ্রমিক সংঘ, সমবায় সমিতি, যুব সংঘ, বিজ্ঞানবিষয়ক সংঘ প্রভৃতি নানাবিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার সোভিয়েত নাগরিকগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হইল যে, অন্য সর্ববিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার থাকিলেও সোভিয়েত নাগরিককে রাজনৈতিক দল গঠন করিবার অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হইয়াছে। সাম্যবাদী দলই হইল সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র রাজনৈতিক দল।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের কোন উল্লেখ নাই। স্টালিন শাসনতন্ত্রে তিন প্রকার সম্পত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা,—১। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, ২। সমবায় ও যৌথ কৃষিসম্পত্তি ও ৩। ব্যক্তিগত সম্পত্তি। স্বোপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, পারিবারিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্রায়তনের কুটিরশিল্প, ব্যক্তিগত ব্যবহারোপযোগী তৈজস ও আসবাব-পত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নাগরিকগণ রাখিতে পারেন এবং এইগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করিতে পারেন। সুতরাং নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত নাগরিকগণ সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন।

মৌলিক কর্তব্য—Fundamental Duties

মৌলিক অধিকারগুলির সহিত কতকগুলি মৌলিক কর্তব্যের সন্নিবেশ হইল সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। নাগরিকগণ যেরূপ রাষ্ট্রের উপর কতকগুলি অধিকারের জন্য দাবী করিতে পারে, রাষ্ট্রও তদ্রূপ

নাগরিকগণের উপর কতকগুলি কর্তব্যপালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে পারে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হইল সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

(১) সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিধি অনুসারে প্রত্যেক সমর্থ নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল কাজ করা এবং কাজ করা একটা সম্মানের বিষয় বলিয়া সে দেশে পরিগণিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হইল, যে কাজ করে না সে খাইতেও পাইবে না। সোভিয়েত শাসনতান্ত্রিক বিধানানুযায়ী কাজ করা, আইন-কানুন মান্য করা, শ্রমশৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনসাধারণ সম্পর্কিত কর্তব্যগুলি নিষ্ঠা ও সততার সহিত সম্পাদন করা ও সমাজতান্ত্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের বিধিনিষেধগুলি যথাযথভাবে পালন করা সোভিয়েত নাগরিকগণের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

(২) সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-ব্যবস্থাই হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মূল উৎস। যাহারা এই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-ব্যবস্থার ক্ষতি করে, তাহারা সমগ্র জনসাধারণের শত্রু। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সোভিয়েত নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

(৩) স্বদেশ রক্ষার জন্য সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করা সোভিয়েত নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধকালে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্ত সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

(৪) স্বদেশদ্রোহিতা, পররাষ্ট্রের গুপ্তচর হিসাবে স্বদেশের স্বার্থের প্রতিকূল কার্য করা, সশস্ত্রবাহিনী হইতে পলায়ন করা প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যগুলি অতি গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চরম শাস্তি প্রদান করা হয়। স্বদেশপ্রীতি ও রাষ্ট্রের প্রতি অচল আনুগত্য সোভিয়েত নাগরিকের পবিত্র ও সম্মানজনক কর্তব্য।

অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য—Features of the Rights

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নাগরিক অধিকারগুলি বিশ্লেষণ করিলে

এরূপ কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাহা অন্য কোন দেশের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত অধিকারগুলির নাই।

প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্রে মানুষের জন্মগত প্রাকৃতিক অধিকার বলিয়া কোন অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে নাই। শাসনতন্ত্র অনুসারে মানুষের সকল অধিকারই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত।

দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রে অর্থনৈতিক অধিকারগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে এবং পৌর অধিকারগুলির (Civil Rights) উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে—কারণ অর্থনৈতিক অধিকারগুলির অবর্তমানে পৌর অধিকারগুলি সার্থক হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের ন্যায় সোভিয়েত শাসনতন্ত্র মৌলিক অধিকারগুলিকে শাসনতন্ত্রে শুধুমাত্র বিধিবদ্ধ করে নাই। নাগরিকগণ যাহাতে শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত অধিকারগুলির আর একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই অধিকারগুলিকে কতিপয় নাগরিক কর্তব্যের সহিত সংযুক্ত ও নির্ভরশীল করিয়া নাগরিকগণকে রাষ্ট্রের অংশীদার করিয়াছে। অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নাগরিকগণের সমাজ-চেতনা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে।

পঞ্চমতঃ, সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত পৌর অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তৎসমুদয় একটি শর্তে ভোগ করা যাইতে পারে। বাক্‌-স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকারগুলি এরূপভাবে নাগরিকগণ ব্যবহার করিবেন যাহাতে এই স্বাধীনতাগুলি প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী না হয় অর্থাৎ এই স্বাধীনতাগুলি সর্বদা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে।

শাসনবিভাগ—The Executive

মন্ত্রিপরিষদ—The Council of Ministers

নিয়োগ ও সংগঠন—Appointment and Composition

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও শাসন-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্রিপরিষদ। যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন চলাকালে মন্ত্রিগণ সুপ্রীম সোভিয়েতের নিকট প্রত্যক্ষভাবে এবং এই সভার অবকাশ কালে প্রেসিডিয়ামের নিকট পরোক্ষভাবে দায়ী থাকেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সোভিয়েত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ইংলণ্ড প্রভৃতি পার্লামেন্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থার অনুরূপ। কিন্তু কার্যতঃ তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিসহ সকল মন্ত্রীই সাম্যবাদী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত সর্বোচ্চ দলীয় সংস্থা 'পলিট্‌বুরো' (Politburo) কর্তৃক মনোনীত হন। সুপ্রীম সোভিয়েত ইহার যুক্ত অধিবেশনে পলিট্‌বুরোর সিদ্ধান্তে আবশ্যিকভাবে সম্মতিদান করে। সুতরাং সুপ্রীম সোভিয়েতের সম্মতিদান একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। সুপ্রীম সোভিয়েতের অবকাশ কালে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির (Chairman) সুপারিশক্রমে প্রেসিডিয়াম মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন অথবা মন্ত্রীকে ভারমুক্ত করিতে পারেন। অবশ্য সকল নিয়োগ ও অপসারণ আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদন-সাপেক্ষ।

স্টালিন-শাসনকালে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন ছিল। পরবর্তী কালে পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা সাধারণতঃ তিরিশ জনে সীমাবদ্ধ থাকে। মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি, প্রথম বা প্রধান সহ-সভাপতি, অন্য পাঁচজন সহ-সভাপতি, অন্যান্য মন্ত্রী এবং পদাধিকারবলে অঙ্গরাজ্যসমূহের সভাপতিগণকে লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। প্রত্যেক মন্ত্রীই এক একটি শাসনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত থাকেন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদ নির্ধারিত নির্দেশ অনুসারে বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। কোন

একজন মন্ত্রীর কাজ সমগ্র মন্ত্রিসভা বাতিল করিতে পারে। সুপ্রীম সোভিয়েতের কোন সদস্য কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে মন্ত্রিগণকে তিনদিনের মধ্যে উত্তর দিতে হয়। মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির নেতৃত্বেই সভার কার্য পরিচালিত হয়। সভাপতির ক্ষমতা তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সাম্যবাদী দলে তাঁহার প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। উপরি-উক্ত কারণেই স্টালিন এত শক্তিশালী নেতারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের প্রকৃতি—Nature of the Soviet Council of Ministers

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের এরূপ কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় যাহার দৃষ্টান্ত অন্য দেশে বিরল।

প্রথমতঃ, বলা যাইতে পারে যে, আপাতদৃষ্টিতে সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদ পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থার অনুরূপ মনে হইলেও কার্যতঃ তাহা নহে। যে শাসনব্যবস্থায় কোন বিরোধী দলের অস্তিত্ব নাই, যেখানে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সে স্থলে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার কোন স্থান নাই। মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিসহ অন্যান্য মন্ত্রিগণ দলীয় মনোনয়নে নিযুক্ত হন এবং দলীয় নির্দেশে অপসারিত হন। সুপ্রীম সোভিয়েত শুধু দলীয় নির্দেশে সম্মতি দান করে।

দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি (প্রধানমন্ত্রী) তাঁহার সহকর্মী মন্ত্রিগণকে মনোনীত করেন এবং তাঁহাদের অপসারিত করিতে পারেন কিন্তু সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির এরূপ ক্ষমতা নাই।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য দেশে মন্ত্রিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্ব স্থানীয় বলিয়াই প্রধানতঃ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা যে বিভাগসমূহের ভারপ্রাপ্ত হন, সেই বিভাগগুলি পরিচালনাকার্যে তাঁহারা বিশেষজ্ঞ না হইতেও পারেন। কিন্তু সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ দলের সদস্য হইলেও দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নাও হইতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভাগীয় কার্য পরিচালনার দক্ষতা ও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী দলীয় সদস্যগণকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।

চতুর্থতঃ, সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদ দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া গঠিত, যথা, (১) সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী দপ্তর (All-Union Ministries) ও (২) যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহের মন্ত্রী দপ্তর (Union Republican Ministries)। প্রথমোক্ত মন্ত্রিগণ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয়টির কার্য হইল তাহাদের অধীন বিষয়সমূহ অঙ্গরাজ্যগুলির অনুরূপ নামের শাসনবিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা করা। বৈদেশিক বাণিজ্য, বিদ্যুৎ, শিল্প, রেল পরিবহণ, নগর-নির্মাণ প্রভৃতি দপ্তরগুলি প্রথমোক্ত মন্ত্রী দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র, কৃষি প্রভৃতি হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় অঙ্গরাজ্যগুলির মন্ত্রী দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবস্থার সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনকার্যে সহযোগিতার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, অন্যান্য দেশের মন্ত্রিপরিষদের সহিত সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের পার্থক্য হইল, সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিলেই তাঁহাদের কর্তব্য সমাপ্ত হয় না। দেশের সমগ্র ধনোৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সু-পরিচালিত করিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অব্যাহত রাখা তাঁহাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

এইজন্য তাঁহাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও শিল্প-পরিচালনার যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়।

মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্য—Powers and Functions of the Council of Ministers

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। শাসনতন্ত্রের ৬৮ ধারায় মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতার তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

১। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় অঙ্গরাজ্য মন্ত্রিপরিষদের এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাভুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ইহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। অঙ্গরাজ্যগুলির মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সংস্থা এবং অন্যান্য এলাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপদেশ দান করা।

২। রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-গুলিকে সফল করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

৩। শান্তি-শৃঙ্খলা বলবৎ রাখা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করা।

৪। দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেনাবাহিনীতে বার্ষিক কতজন নাগরিক যোগদান করিবে সে সংখ্যা নির্ধারণ করা।

৫। পররাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণভাবে নীতি নির্ধারণ করা।

৬। অর্থনৈতিক, কৃষ্টিমূলক ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা জাতীয় সংস্থা গঠন করা।

৭। প্রচলিত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনানুসারে আদেশ ও নির্দেশ প্রচার করা এবং সেগুলিকে বলবৎ করা।

৮। মন্ত্রিপরিষদ অঙ্গরাজ্যগুলি কর্তৃক প্রচারিত শাসনবিভাগীয় নির্দেশ-গুলিকে বাতিল করিতে পারে যদি এই নির্দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন বা নির্দেশের সহিত সংগতি না থাকে।

৯। সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ কোন একজন মন্ত্রীর কাজ বাতিল করিতে পারে।

১০। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মন্ত্রি-পরিষদ অঙ্গ-রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্য বাতিল করিতে পারে।

উপদেষ্টামণ্ডলী—Advisory Boards

প্রত্যেক মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য একটি করিয়া উপদেষ্টামণ্ডলী আছে। এই উপদেষ্টামণ্ডলী হইতে কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য লইয়া রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সমিতি (State Planning Commission) গঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বিধি দ্বারা একটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিদপ্তর (State Control Commission) সৃষ্টি করা হয়। এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভা কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। এই দপ্তরটি যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিদপ্তরগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার কার্য হইল, সমগ্র শাসনবিভাগের কার্যের উপর তদারক করা।

মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব—Ministerial Responsibility

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হয়। শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, মন্ত্রিপরিষদ তাহাদের

কার্যকলাপ ও নীতির জন্য আইনসভা অর্থাৎ সুপ্রীম সোভিয়েত অথবা সুপ্রীম সোভিয়েতের অবর্তমানে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকিবে। শাসনতন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, আইন-পরিষদে যে-কোন কক্ষের কোন সদস্য যদি মন্ত্রিপরিষদের কোন সদস্যকে প্রশ্ন করেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে তিন দিনের মধ্যে উক্ত প্রশ্নের মৌখিক অথবা লিখিত জবাব প্রদান করিতেই হইবে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় যে, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি পার্লামেন্টারী প্রথা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মন্ত্রিপরিষদের সমুদয় সদস্যই সাম্যবাদী দলের প্রকৃত কার্যকরী সংস্থা (Politburo) কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। কার্যকরী সংস্থার মনোনয়ন সুপ্রীম সোভিয়েত শুধুমাত্র অনুমোদন করিয়া থাকে। আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে কোন সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদই আজ পর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত হয় নাই। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের নিয়োগ ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণরূপে দলের কার্যকরী সংস্থা Politburo-র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আইনসভা শুধু এই সংস্থার সিদ্ধান্ত-গুলিকে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ন্যায় সমর্থন করে। সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদ যাহাতে তাঁহাদের খুশীমত বে-আইনী কার্যকলাপ করিতে না পারেন সেজন্য শাসন-তন্ত্রের ছেষট্টি ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রিগণকে প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে ও প্রচলিত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ ও নির্দেশ প্রচলিত আইন-বিরোধী হইলে সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সেই আদেশ ও নির্দেশ বাতিল করিতে পারে। এক-দলীয় শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণের কোন দায়িত্বের প্রশ্ন নাই। দলীয় নীতিই হইল সরকারী নীতি।

আভ্যন্তরাণ মন্ত্রিপরিষদ—The Inner Cabinet

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ তিরিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত। সুতরাং জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পক্ষে এরূপ একটি বৃহৎ পরিষদ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সেইজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্টালিনের সভাপতিত্বে এগার জন সদস্য লইয়া একটি কার্যকরী মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের

একজন সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বহু বৎসর পর্যন্ত স্টালিন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাধারণতঃ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এই ক্ষুদ্র পরিষদ কর্তৃকই স্থিরীকৃত হয়। সাম্যবাদী দলের কার্যকরী সংস্থা Polit-buro-র নেতৃস্থানীয় সদস্যগণকে লইয়া ঐ ক্ষুদ্র মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় ও দলের প্রধান নেতা সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন। বর্তমানে এই ক্ষুদ্র পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছয়জনে হ্রাস করা হইয়াছে। সুতরাং সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় সাম্যবাদী দলের নেতৃগণ একাধারে পলিট্‌বুরোর সদস্য, প্রেসিডিয়ামের সদস্য, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং বিভিন্ন কার্যকরী সংস্থার শাসনক্ষমতা নিজেদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন।

আইনসভা—The Legislature

সুপ্রীম সোভিয়েত—The Supreme Soviet of the U.S.S.R.

সংগঠন—Organisation

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইল সুপ্রীম সোভিয়েত। জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত (The Soviet of Nationalities) ও যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত (The Soviet of the Union) লইয়া সুপ্রীম সোভিয়েত গঠিত হয়।

প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র (Union Republic) হইতে বত্রিশ জন সদস্য, প্রত্যেক স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র (Autonomous Republic) হইতে এগার জন, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রদেশ (Autonomous Region) হইতে পাঁচজন ও প্রত্যেক জাতীয় অঞ্চল (National Area) হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত গঠিত হয়। বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা হইল ৬৪০, যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত নাগরিকগণের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক তিন লক্ষ ভোটদাতা একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত বর্তমানে ৭৩৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত। জাতি, ধর্ম, শিক্ষা,

সম্পত্তি প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেক আঠার বৎসর বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে এবং প্রত্যেক তেইশ বৎসর বয়স্ক সোভিয়েত নাগরিকই সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্য নির্বাচিত হইবার অধিকারী। ভোটদাতৃগণ প্রত্যাবর্তনের আদেশ (Recall) দ্বারা প্রতিনিধিদের সদস্যপদ হইতে অপসারিত করিতে পারেন। সুপ্রীম সোভিয়েতের কার্যকাল চারি বৎসর, কিন্তু তৎপূর্বে প্রেসিডিয়াম এই সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। সাধারণতঃ বৎসরে সুপ্রীম সোভিয়েতের দুইটি অধিবেশন বসে, কিন্তু প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রেসিডিয়ামের আহ্বান-ক্রমে বিশেষ সভা আহূত হইতে পারে। উভয় পরিষদের অধিবেশনই একযোগে চলিতে থাকে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল একটি বহু জাতি-অধ্যুষিত রাষ্ট্র। এই বিভিন্ন জাতিগুলি সমান অগ্রসর নয় বলিয়া তাহাদের স্বার্থও বিভিন্ন। এই বিভিন্ন জাতিগুলির বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে, জাতিপুঞ্জ সোভিয়েতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিষদ শুধু বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত সমগ্র জাতির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। সমস্ত সোভিয়েত নাগরিকগণের ভোটে এই সভার সদস্যগণ নির্বাচিত হন এবং ইঁহারা জাতীয় স্বার্থের রক্ষক।

প্রত্যেক পরিষদ একজন সভাপতি ও চারিজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন। উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতের সভাপতি ও জাতিপুঞ্জ সোভিয়েতের সভাপতি পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। উভয় পরিষদই সর্ববিষয়ে সমান ক্ষমতার অধিকারী। উভয় পরিষদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে উভয় পরিষদের সমসংখ্যক সদস্য দ্বারা গঠিত একটি আপোস সমিতি (Conciliation Committee) দ্বারা মতভেদ দূর করিবার চেষ্টা হয়। আপোস সমিতি মতভেদ দূর করিতে অসমর্থ হইলে ইহা পুনরায় পৃথগ্‌ভাবে উভয় পরিষদ কর্তৃক আলোচিত হয়। ইহা সত্ত্বেও যদি বিরোধের মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েত ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। কিন্তু এক-দলীয় শাসনব্যবস্থায় এরূপ পরিস্থিতি বিরল।

সুপ্রীম সোভিয়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলী—Powers and Functions of the Supreme Soviet

সুপ্রীম সোভিয়েত হইল যুক্তরাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন বিষয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এই সভার মধ্যেও সোভিয়েত জনগণের সার্বভৌমিকতা প্রকাশ পায়। ইহার ক্ষমতার পরিধিও বহু-বিস্তৃত। আইন-প্রণয়ন ব্যতীতও এই সভার অন্য নানাবিধ কাজ আছে। ইহার বিবিধ কার্যগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যাইতে পারে :

১। আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা—Legislative Power

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের উপর আইন-প্রণয়ন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল সুপ্রীম সোভিয়েত। সুপ্রীম সোভিয়েতের যে-কোন কক্ষে আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমে উত্থাপিত প্রস্তাবের ধারা-ওয়ারী আলোচনা ও ভোটদান চলে। পরে সমগ্রভাবে প্রস্তাবটির আলোচনা হইবার পর সদস্যগণের প্রকাশ্য ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি আইনের মর্যাদা পায়। আইন পাস হইলে ইহাকে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষর যুক্ত করিয়া বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির ভাষায় প্রকাশ করা হয়। যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েতই হইল আইন-প্রণয়ন বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সেই হেতু এই সভা কর্তৃক প্রণীত আইন সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্য কোন কর্তৃপক্ষ নাকচ (Veto) করিতে পারে না।

২। বাৎসরিক আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Power Relating to Annual Budget

সমগ্র দেশের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এই সভা কর্তৃক সমর্থিত হওয়া চাই। আয় ও ব্যয় যাহাতে যথাযথভাবে পরিচালিত হয় তাহা এই সভা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ঋণ গ্রহণ ও ঋণ দান এই উভয় বিষয়ই সুপ্রীম সোভিয়েতের বিশেষ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

৩। অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিমূলক কর্মতৎপরতা সংক্রান্ত ক্ষমতা—Power Relating to Economic and Cultural Activities

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই হইল দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি। স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী নানাজাতীয় পরিকল্পনার

সাহায্যে দেশে ধনোৎপাদনের এবং ধনবন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। ভূমিজ, খনিজ, বনজ, জলজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলির যথাযথ সু-ব্যবহার দ্বারা এই পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক করা হয়। সুপ্রীম সোভিয়েত দেশের অর্থ-নৈতিক প্রচেষ্টার মূলনীতি নির্ধারণ ও অনুমোদন করে। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতও সুপ্রীম সোভিয়েত দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কর্মতৎপরতার মূলনীতি নির্ধারণ করে। বিবাহ, পারিবারিক অধিকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকতা অর্জন, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে সুপ্রীম সোভিয়েতের নীতি হইল চূড়ান্ত নীতি।

৪। শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Administrative Power

সুপ্রীম সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্যগণই শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে যে-কোন মন্ত্রীকে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে তিনদিনের মধ্যে প্রশ্নের মৌখিক অথবা লিখিত জবাব দিতে হইবে। সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনের অবকাশকালে প্রেসিডিয়াম কর্তৃক যে সকল আইনানুগ আদেশ ও নির্দেশ বলবৎ করা হয় তৎসমুদয়ই ইহার পরবর্তী অধিবেশন কালে সুপ্রীম সোভিয়েতের সভায় উপস্থাপিত করিয়া এই সভা কর্তৃক অনুমোদন করিয়া লইতে হয়।

৫। পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত ক্ষমতা—Power to decide International Relations

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক এই সভা কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এই সভা পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধিচুক্তি অনুমোদন অথবা চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করিতে পারে। পররাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কের নীতিও এই সভা স্থির করে। এতদ্ব্যতীত অঙ্গরাজ্যসমূহের পররাষ্ট্র-গুলির সহিত যে স্বতন্ত্র সম্পর্ক স্থাপন করিবার শাসনতান্ত্রিক অধিকার আছে, তাহাও সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

৬। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Power over Defence

দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সংগঠন সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সশস্ত্রবাহিনী ব্যতীতও অঙ্গরাজ্যসমূহের সশস্ত্রবাহিনী গঠন করিবার শাসনতান্ত্রিক যে অধিকার আছে, সে অধিকার প্রয়োগের নীতিও

সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদনসাপেক্ষ। যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিস্থাপনের প্রশ্নও সুপ্রীম সোভিয়েত নির্ধারণ করে।

৭। শাসনতন্ত্র সংশোধন ক্ষমতা—Power to Amend the Constitution

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল সুপ্রীম সোভিয়েত। উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করা যায়। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কোন অংশের সংশোধন সাধিত হইলে এই সংশোধনের সহিত সংগতি রাখিয়া যাহাতে অঙ্গ-রাজ্যসমূহের ও নিম্নতর অঞ্চলসমূহের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ সংশোধন হয়, সুপ্রীম সোভিয়েত সে সম্পর্কেও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

৮। নির্বাচন-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Power over Elections

সুপ্রীম সোভিয়েতের ব্যাপক নির্বাচনী ক্ষমতা আছে। এই সভা ইহার যুক্ত অধিবেশনে সভাপতিসহ মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যগণ, প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ, প্রোকিউরেটর জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট ও বিশেষ আদালতের বিচারপতি-গণকে নির্বাচন করে এবং এই সমস্ত উচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সংগঠন ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।

উপরি-উক্ত ক্ষমতার তালিকা দেখিলে মনে হয় সুপ্রীম সোভিয়েত যুক্ত-রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, রাজনৈতিক নীতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে অনেক সময় অনেক দূরত্ব থাকে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিবার ফলে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দলের সর্বোচ্চ সংগঠন পলিট্‌বুরোর হস্তে কেন্দ্রীভূত। এই সংগঠনের সদস্যগণই প্রকৃতপক্ষে শাসননীতি ও কার্যসূচী স্থির করেন। সাম্য-বাদী দলের সক্রিয় সদস্য, সমর্থক বা স্বল্প-সংখ্যক নির্দলীয় সদস্য লইয়া গঠিত সুপ্রীম সোভিয়েত দলের নেতৃবর্গ-নির্ধারিত নীতি ও কর্মসূচী সমর্থন করে মাত্র। আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার—সরকারের এই তিনটি কার্যের মূল উৎস হইল পলিট্‌বুরো।

সুপ্রীম সোভিয়েতকে নিষ্ক্রিয় সমর্থকরূপে চিত্রিত করিলেও সোভিয়েত জাতীয় জীবনে এই সভার বিশেষ গুরুত্ব আছে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রের অসংখ্য ভাষা-ভাষী ও ধর্মাবলম্বী জনগণের প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত।

এই সভা সোভিয়েত দেশবাসী বিভিন্ন জাতির ঐক্য ও সংহতির এক মিলন-ক্ষেত্র এবং এই সভার মাধ্যমেই সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার মূল আদর্শগুলি এই অতিকায় দেশের সুদূর অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সকল দেশেই দলের নেতাগণই হইলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী এবং আইনসভা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এমন কি স্বাধীনতার জন্মভূমি বৃটেনও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি—Law-making Procedure

সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষের সদস্যগণের আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা থাকলেও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণই সাধারণতঃ নিজ নিজ বিভাগ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার পর প্রস্তাবটি সুপ্রীম সোভিয়েতের একটি কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষেই বিভিন্ন প্রস্তাব পরীক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত কমিটি গঠিত থাকে। আইনের প্রস্তাবগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এই কমিটিগুলিই করে। কারণ সুপ্রীম সোভিয়েত বৎসরে মাত্র দুইবার স্বল্পকালের জন্য অধিবেশনে বসে এবং এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে আইনের প্রস্তাবগুলির বিশদ আলোচনা ও পুনঃ পরীক্ষা করিবার মত সময় ইহার নাই। আইনসভার উভয় কক্ষের এই কমিটি বা কমিশনগুলি সুপ্রীম সোভিয়েতের অবকাশ কালেও মিলিত হইয়া আবশ্যকীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং প্রস্তাবটির ধারা-ওয়ারী আলোচনা করিয়া প্রস্তাবটির সংশোধন করে। এইরূপে সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটি উত্থাপক কক্ষে প্রেরিত হইলে উক্ত কক্ষ সাধারণতঃ সংশোধিত আকারে প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করে। সোভিয়েত আইনসভার সদস্যগণ কোন আইনের প্রস্তাবের নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন না। কারণ আইন-সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারক কর্তৃপক্ষ হইলেন দলের নেতৃগণ। দলের নেতৃগণ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি দলীয় সদস্যগণ নির্বিচারে সমর্থন করেন। আইনসভার সদস্যগণ শুধু প্রস্তাবিত আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এই আলোচনাও সময়ের অভাবে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে হয়।

উত্থাপক কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব অপর কক্ষে প্রেরিত হয় এবং সে কক্ষেও অনুরূপ পদ্ধতির সাহায্যে দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবটি সমর্থিত হইয়া আইনের মর্যাদা লাভ করে। উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত আইন প্রেসিডিয়ামের সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারিত হয়। সুতরাং সোভিয়েত রাষ্ট্রে সর্বসম্মত মতে আইন পাস হয় এবং সাম্যবাদী দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিবার ও প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ভোটদানের মাধ্যমে আইন পাস করা হয়।

সুপ্রীম সোভিয়েতের বৈশিষ্ট্য—Peculiarities of the Supreme Soviet

১। শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী সুপ্রীম সোভিয়েত হইল, এই যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। আইন-প্রণয়ন ব্যতীতও এই সভা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নির্বাচন করে। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতি যে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয়।

২। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখা যায় যে, আইনসভার নিম্ন পরিষদ, উচ্চ পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষ করিয়া অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের অধিকতর ক্ষমতা সর্বদেশের শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার উভয় পরিষদই সর্ববিষয়ে সম-ক্ষমতার অধিকারী।

৩। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের সদস্যগণ চারি বৎসর কালের জন্য একই সময়ে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার জন্য উভয় পরিষদের সদস্যগণকে একইরূপ যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়। অন্যান্য দেশে উচ্চ পরিষদের সদস্যগণের নির্বাচনের জন্য পৃথক যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। উচ্চ পরিষদের কার্যকালও সাধারণতঃ দীর্ঘতর হয়।

৪। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় পরিষদকেই প্রেসিডিয়াম তাহাদের কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। কিন্তু অন্য দেশে নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া গেলেও উচ্চ পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলে না।

৫। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উভয় পরিষদের সদস্যগণই জনগণের ভোট দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা ব্যতীত অন্য কোন দেশে উচ্চ পরিষদের সদস্যগণের নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় না।

৬। সুপ্রীম সোভিয়েতের উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত, সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে সমুদয় বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে, সেই সকল জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ক্যানাডা বা অপর কোন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদ এইরূপ জাতিগত ভিত্তিতে গঠিত হয় না। ভারতের উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ রাজ্য-সভা (Council of States) অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভা (Senate) অঙ্গরাজ্যগুলি হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়—অঙ্গরাজ্যগুলিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ ঐ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগুলির, যথা,—রুশ, ইউক্রেনীয়, তাজিক, কাজাক, উজবেগ, খিরগিজ্ প্রভৃতি—প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। প্রত্যেক মূলরাষ্ট্র, প্রত্যেক স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র, প্রত্যেক স্ব-শাসিত প্রদেশ, প্রত্যেক জাতীয় অঞ্চল যথাক্রমে ৩২, ১১, ৫ ও ১ জন করিয়া প্রতিনিধি উচ্চ পরিষদে প্রেরণ করিতে পারে। উচ্চ পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারগুলির সমান ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

৭। অন্যান্য দেশের আইনসভা একাধিক রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ও শাসননীতি নির্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র সাম্যবাদী দল ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব না থাকার ফলে আইনসভার কার্য নির্বিরোধে পরিচালিত হইতে পারে। সাম্যবাদী দলের নেতৃগণ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি দলের সমর্থকগণ বিনাবিচারে অনুমোদন করে। এইজন্য সুপ্রীম সোভিয়েতের বৎসরে মাত্র দুইটি অধিবেশন বসে ও এই দুইটি অধিবেশন পনের হইতে কুড়ি দিনের অধিককাল স্থায়ী হয় না।

কমিটি ব্যবস্থা—Committee System

অন্যান্য দেশের আইনসভার অনুরূপভাবেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উভয় কক্ষের কাজ কতকগুলি বিশেষ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সংস্থাগুলির মধ্যে আইন-প্রণয়ন, পররাষ্ট্র-বিষয়ক ও আয়-ব্যয়-বিষয়ক সংস্থাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি গৌণ সংস্থা আছে, যথা,—সদস্যগণের যোগ্যতা সম্পর্কিত, অনুসন্ধানকারী সংস্থা প্রভৃতি। কৃষিকর স্থাপন, যুদ্ধকালে লোক সংগ্রহ প্রভৃতি কাজের জন্যও সময় সময় বিশেষ কতিপয় সংস্থা গঠিত হইয়া থাকে।

১৮০ জন সদস্য লইয়া সুপ্রীম সোভিয়েতের স্থায়ী সংস্থাগুলি গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েতে এরূপ চারিটি এবং জাতিপুঞ্জ সোভিয়েতে এরূপ পাঁচটি সংস্থা আছে।

সোভিয়েত আইনসভার সংস্থাগুলি অন্যান্য দেশের আইনসভার সংস্থাগুলি অপেক্ষা আইনসভার কার্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সোভিয়েত দেশের আইনসভার অধিবেশনকাল স্বল্পস্থায়ী এবং এই কারণে আইনসভার সংস্থাগুলি স্বল্পস্থায়ী অধিবেশনের পরবর্তী কালেও ইহাদের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উভয় কক্ষের সংস্থাগুলির আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে কোনরূপ অনুপ্রেরণা না থাকিলেও অর্থাৎ আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে না পারিলেও প্রস্তাবিত আইনের সংশোধন ব্যাপারে ইহাদের অত্যধিক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। আইন-প্রণয়ন সংস্থাগুলি প্রস্তাবিত আইনগুলি বিশেষভাবে আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া এইগুলিকে জনপ্রিয় করিবার জন্য বিশেষ রূপদান করে। পররাষ্ট্র সম্পর্কিত সংস্থাগুলি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করিয়া ইহাদের মতামতসহ প্রেসিডিয়ামের সম্মতির জন্য প্রেরণ করে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বাণী ও ঘোষণার খসড়াগুলি এই সংস্থাগুলি রচনা করিয়া থাকে। সংস্থাগুলি কর্তৃক রচিত বাণী বা ঘোষণা সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক গৃহীত হইলেও সেগুলি জগতে শান্তিরক্ষার অনুরোধসহ বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সংস্থাগুলি শুধু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে তাহা নহে, কর্তব্য নিষ্ঠার জন্যও এই সংস্থাগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা

করিয়া থাকে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করে। বিশেষ করিয়া ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইহারা শুধু ব্যয়-হ্রাসের সুপারিশ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, ব্যয়-বৃদ্ধির সুপারিশও করিয়া থাকে। সংস্থা-গুলি আয়-ব্যয়ের যথাযথ ব্যবহার এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-গুলির খসড়া সম্পর্কে বিবরণী দিয়া থাকে। আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিভিন্ন খাতগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সময় সময় উপ-সংস্থা (Sub-Committee) গঠিত হয়। আয়-ব্যয় সংস্থাগুলি ইহাদের নিয়মিত কার্য নিষ্ঠার সহিত পরিচালনা করা ব্যতীতও আয়-ব্যয়ের হিসাবের উৎকর্ষসাধন সম্পর্কেও সুপারিশ করিয়া থাকে।

প্রেসিডিয়াম—The Presidium of the Supreme Soviet

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অভিনবত্ব হইল ইহার প্রেসিডিয়াম। অন্যান্য দেশে শাসন-বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে একজন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন, যাঁহার নামে সমুদয় শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং যিনি রাষ্ট্রের সমুদয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেও রাষ্ট্রের প্রধানরূপে প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। গ্রেট বৃটেনে রাজা এবং মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ ও ভারতে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকেন। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় এইরূপ কোন রাষ্ট্র-প্রধান নাই। তৎপরিবর্তে সাঁইত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম সভা রাষ্ট্র-প্রধানের কার্য পরিচালনা করে। এইজন্য সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে এই প্রেসিডিয়াম সভাকে রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী (a Collegial President) বলা হইয়াছে।

প্রেসিডিয়াম আইনসভার স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) এবং আইনসভার অবর্তমানে ইহা সুপ্রীম সোভিয়েতের সমুদয় কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া থাকে। সাঁইত্রিশজন সদস্য সমন্বিত এই প্রেসিডিয়ামে থাকেন একজন সভাপতি, পনেরটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি, পনেরজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক ও কুড়িজন সাধারণ সদস্য। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ চারবৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হন। চারবৎসর শেষ হইলে অথবা সুপ্রীম সোভিয়েত যদি

তৎপূর্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নূতন নির্বাচনের পর নবগঠিত সুপ্রীম সোভিয়েত নির্বাচনের পর তিন মাসের মধ্যে অধিবেশনে মিলিত হইয়া নূতন প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণকে নির্বাচন করে। প্রেসিডিয়ামের সভাপতি সমুদয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা—Powers of the Presidium

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডিয়াম আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই হিসাবে ইহা বহু ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু স্মরণ রখিতে হইবে যে, এই সভা শুধুমাত্র আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার অধিকারী নয়, ইহা শাসন-বিভাগীয় ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও প্রয়োগ করিয়া থাকে। স্টালিন শাসনতন্ত্রের ৪৯ ধারায় প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা উল্লিখিত হইয়াছে।

১। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডিয়াম সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের স্থান পূরণ করিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ সভাপতির নিকট তাঁহাদের পরিচয়পত্র পেশ করেন এবং সভাপতি কর্তৃক তাঁহারা রাষ্ট্রদূত বলিয়া স্বীকৃত হন। গ্রেট বৃটেনের রাজা ও ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রেসিডিয়াম যোগ্য ব্যক্তিগণকে সম্মানসূচক পদবী, উপাধি, পদক ও নানা-জাতীয় পারিতোষিক প্রদান করে। প্রেসিডিয়াম বৎসরে দুইবার সুপ্রীম সোভিয়েত সভাকে আহ্বান করিতে পারে এবং উভয় পরিষদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে উভয় পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া দুই মাসের মধ্যে নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে।

২। আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রেসিডিয়াম আইনানুযায়ী আদেশ প্রদান (Decree) করিতে পারে। প্রেসিডিয়ামের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা নাই বা সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক প্রণীত আইনকে ইহা বাতিল করিতে পারে না। সুপ্রীম সেভিয়েত বৎসরে মাত্র দুইবার স্বল্পকালের জন্য অধিবেশনে মিলিত হয়, সুতরাং অধিবেশনে এই অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে প্রেসিডিয়াম আইনানুযায়ী আদেশ জারী করিয়া শাসনব্যবস্থাকে চালু রাখে।

শাসনতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাদের কার্যের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েতের নিকট দায়ী। সুপ্রীম সোভিয়েতের

অধিবেশনের অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদ প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকে। অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির সুপারিশক্রমে প্রেসিডিয়াম মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিয়োগ করিতে পারে অথবা নিযুক্ত কোন সদস্যকে ভারমুক্ত (release) করিতে পারে। অবশ্য এইরূপ নিয়োগ ও ভারমুক্তি সুপ্রীম সোভিয়েতের পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়া চাই।

৩। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডিয়াম ভিন্ন দেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করিতে পারে ও নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারে। সশস্ত্রবাহিনীর অধ্যক্ষ নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভায় অনুরূপভাবে প্রেসিডিয়াম পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত সন্ধি-চুক্তি সংখ্যাধিক্য ভোটে অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

৪। আপৎকালে প্রেসিডিয়াম দেশে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করিতে পারে এবং যুদ্ধ পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে। জরুরী অবস্থায় প্রেসিডিয়াম সামরিক আইন জারী করিতে পারে।

৫। আইন-প্রণয়ন বিষয়ক ও শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীতও প্রেসি-ডিয়ামকে বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার অধিকার ইহার আছে। প্রেসিডিয়াম সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আইনের সারমর্ম নির্ধারণ করে এবং এই অনু-সারে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের অথবা কোন অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বা আদেশ আইনানুযায়ী না হইলে তাহা বাতিল করিবার ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রেসিডিয়ামের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা নাই, কিন্তু আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা আছে। যদি কোন অঙ্গরাজ্য প্রণীত আইনের সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আইনের সহিত বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে প্রেসিডিয়াম প্রথমোক্ত আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ এই ক্ষমতা প্রধান বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা প্রধান বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত না করিয়া প্রেসিডিয়ামকে এই ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে।

প্রেসিডিয়ামের প্রকৃতি—Nature of the Presidium

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রেসিডিয়ামে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে স্বভাবতই প্রেসিডিয়ামের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। প্রেসিডিয়াম কি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা না শাসনবিভাগীয় সংস্থা অথবা ইহা কি রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা যাহা অন্যান্য দেশের ন্যায় একজন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে ?

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাম্যবাদী নেতৃগণ শাসন ব্যাপারের সর্বক্ষেত্রে তাঁহাদের কর্তৃত্ব অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সংস্থাটি এইরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, সাম্যবাদী নেতৃগণ আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচারকার্য প্রভৃতি সর্ববিধ সরকারী কার্য একটি কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। সোভিয়েত শাসন-ব্যবস্থার মূল উৎস হইল সাম্যবাদী দলের রাজনৈতিক সংস্থা (Politburo) এবং এই সংস্থাটি সর্ব-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্থাটি শাসনযন্ত্রের কোন অংশ নহে, ইহা সাম্যবাদী দলের একটি সংগঠন মাত্র। সুতরাং এই সংস্থাটি প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যাপারে ইহার সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে পারে না। রাজনৈতিক সংস্থাটির সিদ্ধান্তগুলি বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রেসি-ডিয়ামের সৃষ্টি হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে প্রেসিডিয়ামকে শাসনবিভাগীয় অঙ্গ বা অন্যান্য দেশের রাজা বা রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা বলা যায় না। ইহার কার্যতালিকার ভিত্তিতে দেখিলে এই সংস্থাটিকে শাসনবিভাগীয় অথবা বিচারবিভাগীয় সংস্থা না বলিয়া আইন-প্রণয়ন সংস্থা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেও, এই সংস্থাটিতে আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার—সরকারের এই তিনটি কাজই কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে।

প্রেসিডিয়াম সোভিয়েত আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েত হইতে উদ্ভূত এবং আইনসভার অধিবেশনের অবকাশকালে আইনসভার প্রতিনিধিত্ব করিলেও আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। কিন্তু অপর পক্ষে প্রেসিডিয়াম ইহার স্রষ্টা আইনসভাকে নিধন করিতে পারে অর্থাৎ আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টই আইনসভা প্রণীত আইনগুলির ব্যাখ্যাকার হিসাবে কাজ করে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে

এই বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা কার্য প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রেসিডিয়ামের মতে যদি কোন আঙ্গিক রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইন-বিরোধী হয়, তাহা হইলে আঙ্গিক রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন অসিদ্ধ করিতে পারে। এই সংস্থা মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যগণকে নিযুক্ত বা ভারমুক্ত করিতে পারে এবং মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারে। এই সংস্থাই বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক চুক্তিগুলিতে সম্মতি দান করে এবং যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংস্থার সকল কার্যই সুপ্রীম সোভিয়েতের অনুমোদনসাপেক্ষ।

প্রেসিডিয়ামের ক্ষমতা পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় এই সংস্থাটিই হইল সর্বাধিক সক্রিয় এবং শাসনব্যাপারের সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রভাব বিস্তৃত। ইহার কর্মতৎপরতার ফলে আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ বহু পরিমাণে উহাদের কার্য-ভার মুক্ত হইয়াছে। সাম্যবাদী নেতৃগণ বলেন, প্রেসিডিয়ামের এই সর্বময় কর্তৃত্ব দ্বারা বিত্তহীন শ্রেণীর কর্তৃত্ব সুচিত হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, অন্যান্য দেশে বিত্তবান শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া তাঁহাদের শ্রেণীগত স্বার্থে এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করেন। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্র একমাত্র বিত্তহীন শ্রেণী লইয়া গঠিত এবং বিত্তহীন শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ সুপ্রীম সোভিয়েত গঠন করেন এবং এই সভা অথবা এই সভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডিয়াম বিত্তহীন শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

বিচার বিভাগ—Judicial Organisation

১। গণ-আদালত—People's Court

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হইল গণ-আদালত। এই বিচারালয় একজন নিয়মিত বিচারপতি ও দুইজন নাগরিক-বিচারপতি লইয়া গঠিত হয়। নিয়মিত বিচারপতি সেই জেলার ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ-ভাবে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। নিয়মিত বিচারপতিকে সাহায্য করিবার জন্য যে দুইজন নাগরিক-বিচারপতি (Citizen-judge) নিযুক্ত থাকেন তাঁহারাও ভোটদাতাগণ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। নিয়মিত বিচারপতি ও নাগরিক-বিচারপতি উভয়কেই ভোট-দাতাগণ কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারে। নাগরিক-বিচারপতিগণ পর্যায়ক্রমে বৎসরে দুই সপ্তাহকালের জন্য বিচারপতি-রূপে কাজ করেন। নিয়মিত বিচারপতি ও নাগরিক-বিচারপতিগণ সম-পরিমাণ বেতন পাইয়া থাকেন এবং বিচার পরিচালনায় উভয়েই সমান ক্ষমতার অধিকারী।

গণ-আদালতগুলি তাহাদের এলাকাস্থিত ছোট-খাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিয়া থাকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চুরি-ডাকাতি, কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা প্রভৃতি হইল এই বিচারালয়ের ফৌজদারী বিষয়ক কাজ। শ্রম-শৃংখলা ভঙ্গ, অসদাচরণ ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহাদের দেওয়ানী বিচার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই বিচারালয় হইতে উচ্চতর বিচারালয়-গুলিতে আপীল করা যায়।

২। স্থানীয় আদালতসমূহ—Territorial Courts

গণ-আদালতের উপরে নানাজাতীয় স্থানীয় আদালত আছে। যথা, জাতীয় এলাকা আদালত, অঞ্চল আদালত প্রভৃতি। এই সমুদয় বিচারপতি-গণও স্ব স্ব এলাকার ভোটদাতাগণ কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচতি হন এবং নাগরিক-বিচারপতিগণের সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। আদিম বিভাগে এই বিচারালয়গুলি অপেক্ষাকৃত গুরুতর ফৌজদারী ও দেওয়ানী

মামলার বিচার করে এবং আপীল বিভাগে নিম্ন আদালত হইতে আনিত মামলার পুনর্বিচার করে।

৩। স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র প্রধান আদালত—Supreme Court of Autonomous Republics

প্রত্যেক স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্রে একটি করিয়া প্রধান বিচারালয় আছে। এই বিচারালয় ইহার এলাকাস্থিত নিম্ন আদালতগুলির কার্যের তদারক করে। এই আদালতের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিষয়সমূহে আদিম ও আপীল শুনিবার ক্ষমতা আছে। বিচারপতিগণ সংশ্লিষ্ট সাধারণতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

৪। অঙ্গরাজ্য প্রধান আদালত—Supreme Court of the Union Republics

প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হইল সেই রাজ্যের প্রধান আদালত। এই আদালতের বিচারপতিগণ রাজ্যের সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। এই আদালতের আদিম ও আপীল শুনিবার ক্ষমতা আছে। অতি গুরুতর অভিযোগক্ষেত্রে ও রাজ্যের সরকারী শীর্ষ স্থানীয় কর্মচারিগণের বিচারক্ষেত্রে এই আদালতের আদিম ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। ইহার নিম্নতন আদালত হইতে আনীত মামলাগুলির আপীলের শুনানী এই বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিচারালয়ের অধীন সমস্ত আদালতের সিদ্ধান্ত ইহা বাতিল করিতে পারে। রাজ্যের প্রোকিউরেটর ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রোকিউরেটর-জেনারেল কর্তৃক আনীত অভিযোগ ক্রমে এই আদালত ইহার নিম্নতন আদালতসমূহের সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিতে পারে।

৫। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত—Supreme Court the of U. S. S. R.

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালত হইল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান আদালত। প্রায় ষাটজন বিচারপতি ও পঁচিশজন নাগরিক-বিচারপতি

(Citizen-Judge or People's Assessor) লইয়া এই সর্বোচ্চ আদালত গঠিত। উভয় শ্রেণীর বিচারপতিগণই সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বিচারপতিগণের মধ্যে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি (Chairman and Vice-Chairman) নিযুক্ত হন। এই বিচারালয়ের পাঁচটি পৃথক বিভাগ দ্বারা বিচারকার্য পরিচালিত হয়। বিভাগগুলি হইল—(১) ফৌজদারী, (২) দেওয়ানী, (৩) সামরিক, (৪) রেল-পরিবহণ ও (৫) জলপথ পরিবহণ। ইহার আদিম ও আপীল ক্ষমতা আছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত গুরুতর অভিযোগগুলির বিচার এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই বিচারালয় প্রধানতঃ আপীল আদালত ও পুনর্বিচারের (Review) আদালতরূপে কাজ করে। এই আদালতের সিদ্ধান্তই হইল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

এতদ্ব্যতীত এই আদালত নিম্নতন আদালতগুলির কার্যের তদারক করে, নিম্নতন আদালতগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারে এবং সমগ্র দেশের বিচার-ব্যবস্থা যাহাতে একই পদ্ধতি ও নিয়মে পরিচালিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ নির্দেশ দান করিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্টের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা হইল কোন আইনের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া আইন শোধন করা (Clarificatory function)। এই উদ্দেশ্যে এই বিচারালয় অঙ্গরাজ্যসমূহের প্রধান বিচারপতিগণের স্ব-শাসিত প্রদেশের প্রধান বিচারপতিগণের সাহায্য লইতে পারে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে বিচক্ষণ আইনজীবিগণেরও সাহায্য লইতে পারে। দুই মাসে অন্ততঃ একবার এই বিচারালয়ের অধিবেশন বসে।

৬। বিশেষ আদালতসমূহ—Special Courts

উপরি-উক্ত বিচারালয়গুলি ব্যতীতও সামরিক আদালত, রেলপথ ও জলপথ আদালত আছে। এই বিশেষ আদালতগুলিও সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত এবং এখানকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। বিশেষ বিচারালয়ের বিচারপতিগণও সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Peculiar Features of the Soviet Judicial System

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইহার কতকগুলি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, জনগণের প্রতিনিধিগণ এই বিচারকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। নির্বাচিত বিচারক ব্যতীতও এই বিচারালয়গুলির কার্য নাগরিক-বিচারক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই নাগরিক-বিচারকগণকে আদালতের স্থায়ী বিচারকের ক্ষমতাসম্পন্ন করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশের জুরীর মত ইঁহারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করেন না,—আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারেও ইঁহারা স্থায়ী বিচারকের সমক্ষমতার অধিকারী। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সমুদয় বিচারকার্যই নাগরিক-বিচারকগণের সাহায্যে পরিচালিত হয় বলিয়া সাধারণ নাগরিকগণ বিচারকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভোটদান ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোন নাগরিকই এই নাগরিক-বিচারকের কার্য করিতে পারেন এবং এই নাগরিক-বিচারক যদি বিচারকার্যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন তাহা হইলে জনগণের নির্দেশে তাঁহাকে অপসারিত করা চলে। অন্যান্য দেশে বিচারালয়গুলি জনগণের সংস্পর্শ হইতে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জনসাধারণের মনে বিচারব্যবস্থা ও বিচারক-সম্পর্কে একটা অহেতুক ত্রাসের সঞ্চার করে। অনেকক্ষেত্রে বিচারকের সহিত বিচারপ্রার্থীর এরূপ চরম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় যে, বিচারপ্রার্থী কোনক্রমে বিচারকের নিকট হইতে সুবিচার আশা করিতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারব্যবস্থার সহিত জনসাধারণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে, বিচারব্যবস্থার দ্বারা গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্য অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানকার বিচার-পদ্ধতি অতি সহজ ও সরল এবং স্বল্পকালের মধ্যে বিচারকার্য শেষ করা হয়। এইজন্য বিচারপ্রার্থী পক্ষদ্বয়কে দীর্ঘদিন ধরিয়া বহু ব্যয়ে মামলা পরিচালনা করিতে হয় না। জনসাধারণের বোধগম্য পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও সোভিয়েত বিচার-ব্যবস্থার সহিত পাশ্চাত্য অনেক দেশের বিচারব্যবস্থার সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সোভিয়েত বিচারকেরা সামাজিক হিতসাধন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য অপরাধীকে এরূপভাবে শাস্তি প্রদান করেন যে, ভবিষ্যৎ জীবনে দণ্ডিত ব্যক্তি নিজেকে অপরাধ মুক্ত রাখিয়া সুস্থ, কর্মক্ষম ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক জীবন যাপন করিতে পারে। সেইজন্য সোভিয়েত দেশে নূতন ধরণের জেলখানা গঠিত হইয়াছে। এই জেলখানায় দণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া যাহাতে সু-নাগরিক হইতে পারে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা হইল একপ্রকারের সামাজিক ব্যাধি। সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা এই সামাজিক ব্যাধির সামাজিক কারণ নির্ধারণ করিয়া তাহার সামাজিক প্রতিষেধক প্রয়োগ করিয়া থাকে।

সোভিয়েত বিচারব্যবস্থায় আইনজীবীর বিশেষ কোন স্থান নাই। নির্বাচিত স্থায়ী বিচারক এবং নাগরিক বিচারকগণ অভিযোক্তা, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তথ্য আহরণ করেন। সেইজন্য এখানকার বিচারব্যবস্থা আদৌ ব্যয়সাপেক্ষ নহে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকই একই আইনের দ্বারা বাধ্য: আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমেই বিচারকার্য পরিচালিত হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তি ঐ ভাষায় অজ্ঞ হইলে তাহাকে অনুবাদকের সাহায্য প্রদান করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণের বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর বিচারকই জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত কালের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং একমাত্র জনগণের প্রত্যাবর্তনের আদেশ ও বিশেষ বিচারব্যবস্থার দ্বারা তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকগণ দেশের প্রবর্তিত আইন ও জনমত ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট নতি স্বীকার করেন না। সুতরাং সোভিয়েত বিচারব্যবস্থাকে বে-সরকারী বিচারব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। অনেক সমালোচক বলেন যে, সোভিয়েত বিচারব্যবস্থা অত্যধিক পরিমাণে

জনমতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই ব্যবস্থা স্থায়ী বা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থা যে গণতন্ত্রসম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক অপরাধের বিচারকার্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচার-কার্য পরিচালনার সময় নাগরিক-বিচারকের সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারকার্য পরিচালনায় গণতান্ত্রিক আদর্শের কোন স্থান সোভিয়েত বিচারব্যবস্থায় পরিদৃষ্ট হয় না।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এক বিশেষ আইনের ভিত্তিতে শান্তির সময় মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হয়। কিন্তু ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে এই আইন সংশোধন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচর বৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক কার্যের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড পুনঃ প্রবর্তিত হয়। অধিক পরিমাণ সরকারী তহবিল আত্মসাতের ক্ষেত্রেও এই দণ্ডবিধির ব্যবস্থা বর্তমানে প্রবর্তিত হইয়াছে।

প্রোকিউরেটর-জেনারেল—Procurator-General

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় প্রোকিউরেটর-জেনারেল হইলেন একজন বিশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী শাসনকর্তৃপক্ষ। অন্য কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায় প্রোকিউরেটর-জেনারেলের অনুরূপ কোন কর্মচারী দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রোকিউরেটর-জেনারেল পদের সহিত অনেক দেশের ফৌজদারী মামলার অভিযোক্তা সরকারী উকিল পদের কিছু সাদৃশ্য আছে।

প্রোকিউরেটর-জেনারেল সাত বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইঁহার অধীনে বিভিন্ন আঞ্চলিক এলাকার প্রোকিউরেটরগণ নিযুক্ত থাকেন। আঞ্চলিক এলাকার প্রোকিউ-রেটরগণ সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকিয়া প্রোকিউরেটর-জেনারেলের নির্দেশমত তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। ইঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন।

প্রোকিউরেটর-জেনারেলের দপ্তরের প্রধান কার্য হইল সমগ্র শাসন বিভাগের কার্যের তদারক করা। মন্ত্রিপরিষদ এবং অন্যান্য শাসনবিভাগীয় সংস্থা, সাধারণ কর্মচারিগণ ও নাগরিকগণ যাহাতে কোনরূপ বে-আইনী কার্য না করে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনরূপ অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত না হয় সেজন্য প্রোকিউরেটর-জেনারেল সর্বদা অবহিত থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নাগরিকগণ পর্যন্ত যাহাতে যথাযথভাবে আইন মান্য করে তাহা তদারক করিবার সম্পূর্ণ ভার প্রোকিউরেটর-জেনারেলের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। বে-আইনী কার্য সংঘটিত হইলে নাগরিকগণের অভিযোগক্রমে অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। এই কার্যের জন্য তিনি তাঁহার অধীন স্থানীয় প্রোকিউরেটরগণের সাহায্য পাইয়া থাকেন। প্রোকিউরেটর-জেনারেল বা তাঁহার অধীন প্রোকিউরেটরগণ নিজেরা কোন বে-আইনী কার্যের বিচার করিয়া অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন না। তাঁহাদের কার্য হইল, অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করিয়া অপরাধের তথ্য-সম্বলিত বিবরণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন—Amendment of the Constitution

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক সংশোধিত হইতে পারে। কিন্তু শাসনতন্ত্র পরিবর্তন পদ্ধতি সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা একটু পৃথক। সোভিয়েতের উভয় কক্ষ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সাধারণ আইন পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করিতে হইলে এই সংশোধনী প্রস্তাব উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে গেলে সোভিয়েত শাসনতন্ত্র অনমনীয় পর্যায়ভুক্ত হইলেও এই শাসনতন্ত্র মার্কিন শাসনতন্ত্রের ন্যায় চূড়ান্তভাবে অনমনীয় নহে, আবার বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ন্যায় একান্তভাবে নমনীয় নহে।

সমালোচনা—Criticism

সোভিয়েত শাসনতন্ত্র সংশোধন-পদ্ধতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকেন। এই বিরুদ্ধ সমালোচনার ভিত্তি হইল

যে, সোভিয়েত শাসনতন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র বলিয়া দাবী করা হইলেও এই শাসনতন্ত্র একপক্ষীয় কার্য (Unilateral act) অর্থাৎ কেবলমাত্র সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্ধারিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংশোধন করা যায়। শাসনতন্ত্র সংশোধন ব্যাপারে আঙ্গিক রাজ্যগুলির অংশ গ্রহণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সংশোধন ব্যাপারে আঙ্গিক রাজ্যগুলির নির্ধারিত সংখ্যার সমর্থন ব্যতীত অনেকক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা যায় না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতিকে যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ-পদ্ধতি বলা যায় না।

এই সমালোচনার উত্তরে সাম্যবাদী নেতাগণ বলেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েত এরূপ ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্র সংশোধন ব্যাপারে আঙ্গিক রাজ্যগুলির আর পৃথকভাবে সংশোধন প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিবার প্রয়োজন হয় না। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষ শুধুমাত্র আঙ্গিক রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত হয় নাই, স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র স্ব-শাসিত অঞ্চল এমন কি অতি ক্ষুদ্র জাতীয় এলাকাগুলির প্রতিনিধি লইয়া সুপ্রীম সোভিয়েত গঠিত। সুতরাং শাসনতন্ত্র সংশোধন ব্যাপারে পুনরায় এই স্থানীয় অঞ্চলগুলির অভিমত গ্রহণ করা বাহুল্য মাত্র।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্যবাদীদল—**Role of the Communist Party in the U. S. S. R.**

সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনব্যবস্থা দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল—সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত হয়। এখানে অন্য কোন দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। জনসাধারণের অন্য নানাবিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার থাকিলেও কোন রাজনৈতিক দল গঠন করিবার অধিকার নাই। সাম্যবাদী দলব্যবস্থার বিশেষত্ব হইল যে, দলের হস্তেই সমুদয় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে এবং দেশের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, শাসনকার্যের সকল বিষয়েই দলীয় প্রাধান্য অটুট থাকে। বস্তুতঃ, সাম্যবাদী দল ও সোভিয়েত সরকার এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। শাসন-

প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে দলীয় প্রাধান্যের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ, প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ এবং শাসনকার্যে নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ—সকলেই এই সাম্যবাদী দলের সমর্থক। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আইনসভাগুলির এবং অন্যান্য নানাজাতীয় শাসনসংস্থাগুলির সদস্যনির্বাচন-কার্য এরূপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় যে, সাম্যবাদী দলের সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারে না।

সাম্যবাদী দলের আদর্শ ও কার্যকলাপ মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই নীতি উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব ও ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। রুশীয় সাম্যবাদিগণ মার্কসীয় নীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়া কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়াছেন। সাম্যবাদিগণ তাঁহাদের দলীয় আদর্শে অত্যধিক পরিমাণে আস্থাবান। তাঁহারা মনে করেন যে, একমাত্র সাম্যবাদী আদর্শ কার্যকর করিয়া মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা সম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সাম্যবাদিগণ অন্ধভাবে তাঁহাদের আদর্শের অনুসরণ করিয়া থাকেন। আদর্শ কার্যে রূপায়িত করিবার পথে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন আসে, নির্মম হস্তে তাঁহারা সেগুলিকে অপসারিত করেন। সেইজন্য দলীয় ঐক্য, সংহতি ও প্রাধান্য অটুট রাখিবার নিমিত্ত তাঁহারা যে-কোন পন্থা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করেন না। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা হইল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু সাম্যবাদিগণ গণতান্ত্রিক আদর্শে আদৌ বিশ্বাসী নহেন, তাই তাঁহারা বলপ্রয়োগ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার পক্ষপাতী। ক্ষমতা হস্তগত করিয়া এই ক্ষমতার প্রয়োগে তাঁহারা তাঁহাদের সাম্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী সমাজ গঠন করিতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং সাম্যবাদী জীবনদর্শনে যে মতভেদের কোন স্থান নাই, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অন্যের মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাবই হইল সাম্যবাদী জীবনদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দলীয় সংগঠন—Party Organisation

সাম্যবাদী দলের নিম্নতম সংস্থা হইল 'প্রাথমিক দলীয় সংগঠন'

(Primary Party Organ)। দলীয় আদর্শে অত্যধিক পরিমাণে আস্থাবান ও অনুরক্ত কমপক্ষে তিনজন সদস্য লইয়া প্রাথমিক দলীয় সংগঠন-গুলির সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক গ্রামে, শহরে, যৌথ কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায়, স্কুল-কলেজে সর্বত্র এই সংগঠনগুলি সক্রিয়ভাবে দলীয় আদর্শ ও নীতি প্রচারকার্যে লিপ্ত থাকে। প্রাথমিক সংগঠনগুলির একটি নির্বাচিত কার্যকরী সংস্থা থাকে। এই কার্যকরী সংস্থা দলীয় নীতি ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে ও নূতন সদস্য সংগ্রহ করে। প্রাথমিক সংগঠনগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শহরের বা জিলার সংগঠনগুলিতে (City or District Party Organisation) প্রেরণ করে। শহর বা জিলার দলীয় সংগঠন আঞ্চলিক দলীয় সংগঠনে (Regional Party Congress) তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণ করে। আঞ্চলিক দলীয় সভা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া অঙ্গরাজ্যের দলীয় সভায় (Party Congress of the Union-Republics) প্রেরণ করে। অঙ্গরাজ্যগুলির দলীয় সভা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় মহাসভা (All-Union Congress) গঠিত হয়। দলীয় মহাসভাই হইল সাম্যবাদী দলের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যকরী সংস্থা। দলীয় মহাসভা কর্তৃক দলীয় মূল নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবার পর গৃহীত হয়। নীতি গৃহীত হইবার পর কোন সদস্যই আর তাহার বিরোধিতা করিতে পারে না। বিরোধিতা করিলেই তাহাকে দল হইতে বহিষ্কার করা হয়। দলীয় মহাসভার সদস্যসংখ্যা এত অধিক যে, এই সভা দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য ৭০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Committee) নির্বাচিত হয়। এই সমিতির বৎসরে তিন-চারটি অধিবেশন বসে ও কার্যতঃ ইহাই দলীয় মহাসভার কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক আরও দুইটি ক্ষুদ্রতর সমিতি নির্বাচিত হয়, যথা—(১) রাজনৈতিক সংস্থা (Political Buro or Politburo) ও (২) ব্যবস্থাপনা সংস্থা (Organisational Buro or Orgburo)।

পলিট বুরো—Politburo

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি দলীয় সংস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে রাজনৈতিক সংস্থাই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। দশ হইতে বারজন

সদস্য লইয়া এই সংস্থা গঠিত হয় এবং প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত দুই-তিনজন সদস্যও এই সংস্থায় লওয়া হয়। সাম্যবাদী দলের প্রধান নেতৃগণকে লইয়াই এই সংস্থা গঠিত হয় এবং কার্যতঃ এই সংস্থা যুগপৎ দলীয় নীতি নির্ধারণ ও শাসনব্যবস্থার নির্ধারিত নীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে, এই সংস্থাই হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক। এই সংস্থার সদস্যগণই মন্ত্রিপরিষদ ও প্রেসিডিয়ামের প্রধান সদস্যরূপে দলীয় নীতিগুলিকে কার্যে রূপায়িত করিয়া থাকেন।

ব্যবস্থাপক সংস্থা দশ হইতে পনের জন সদস্য লইয়া গঠিত। এই সংস্থার প্রধান কার্য হইল সাম্যবাদী দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং এই উদ্দেশ্যে দলীয় সংগঠনগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। দলের প্রধান দপ্তরখানা (Secretariat) মস্কো শহরে অবস্থিত। পাঁচজন স্থায়ী কর্মসচিব ও অন্যান্য বহু কর্মী লইয়া দপ্তরখানা গঠিত হয়। দলের প্রধান কর্মসচিব (First or General Secretary) একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত স্টালিন স্বয়ং সাম্যবাদী দলের প্রধান কর্মসচিব ছিলেন।

দলের কেন্দ্রীয় সমিতি আর একটি সমিতি নির্বাচন করে। এই সমিতি হইল 'দলনিয়ন্ত্রণ সংস্থা' (Party Control Commission)। এই সংস্থার প্রধান কার্য হইল দলের নানাজাতীয় সংস্থা ও দলের সদস্যগণের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখা। দলের সদস্যগণ যাহাতে দলীয় বিধিনিষেধ অনুযায়ী তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করে, সেইজন্য এই নিয়ন্ত্রণসংস্থা গঠিত হইয়াছে। দলের নিয়মভঙ্গকারী সদস্যগণের বিরুদ্ধে এই সংস্থা অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে।

সাম্যবাদী দলীয় সংগঠনে নিম্নলিখিত নীতি কয়েকটি স্থান পাইয়াছে :

১। দলের উচ্চ নীচ—প্রত্যেক স্তরের সদস্যগণই নির্বাচন পদ্ধতিতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

২। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে দলের সদস্যগণের তাঁহাদের কার্যের জন্য দলীয় সংগঠনের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়।

৩। দলের নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়।

৪। নিম্নস্তরের দলীয় সংগঠনগুলির পক্ষে উচ্চস্তরের দলীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া একান্তরূপে বাধ্যতামূলক।

সাম্যবাদী দলের সদস্যের যোগ্যতা ও দায়িত্ব – Qualification and Responsibility of Membership of the Communist Party

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে সাম্যবাদী দলের সদস্যসংখ্যা অনেক কম। সাম্যবাদী দলের সক্রিয় সদস্যসংখ্যার স্বল্পতার প্রধান কারণ হইল যে, সাম্যবাদী দলের সদস্য হইবার জন্য যে উচ্চস্তরের যোগ্যতার প্রয়োজন হয় তাহা সচরাচর সাধারণ লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। দলের সদস্য তালিকাভুক্ত হইতে গেলে যে নিয়মানুবর্তিতা ও ত্যাগস্বীকারের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় তাহা অত্যুৎসাহী ব্যক্তির পক্ষেও বাধাস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়। সাম্যবাদী দলের সদস্য-সংখ্যা যাহাতে স্বল্প থাকে সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই দলের নেতৃগণ দলের সদস্য হওয়ার পক্ষে এইরূপ উচ্চস্তরের যোগ্যতা নির্ধারণ করিয়াছেন। দলের সদস্যগণের কতকগুলি গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে হয়। এই কর্তব্য পালনের জন্য তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়। প্রথমতঃ, দলের সদস্যগণের মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতিগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই এবং এই নীতিগুলির প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ আস্থা থাকা একান্ত অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

দলীয় নীতি ও আদর্শকে সর্বতোভাবে তাঁহাদের সমর্থন করিতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে দলের সদস্যগণকে আদর্শচরিত্রের কর্মঠ ব্যক্তি হওয়া চাই যাহাতে কর্মক্ষেত্রে অন্য লোক তাঁহাদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে। মদ্যপান ও বিবাহবিচ্ছেদ আইনের যথেচ্ছ সুবিধা গ্রহণ করা সাম্য-বাদী দলের সদস্যগণের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সর্বোপরি দলের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করা সদস্যগণের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দলীয় বিধিনিষেধ ভঙ্গ করিলে অপরাধ অনুসারে লঘু অথবা গুরু শাস্তি ভোগ অনিবার্য। দলের নেতৃগণের পক্ষে দলীয় নীতির বিরোধিতা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্য তাঁহাদের নির্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ড

পর্যন্ত ভোগ করিতে হয়। সদস্যগণ একনিষ্ঠভাবে দলের সেবা করিলে অনেক উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসনকার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সাম্যবাদী দলের সক্রিয় সদস্যসংখ্যা সমগ্র দেশে অপেক্ষাকৃত কম হইলেও অন্য উপায়ে সাম্যবাদী দল জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সাম্যবাদী প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা অন্য নানাবিধ সংঘ গঠন করিয়াছে। ভবিষ্যৎ নাগরিক কিশোর ও যুবকগণকে সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করিবার জন্য তিন শ্রেণীর সংঘ গঠিত হইয়াছে। আট হইতে এগার বৎসর বয়স্ক শিশুগণকে লইয়া একটি শিশুসংঘ (Little Octobrists) গঠিত হয়। দশ হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক কিশোরগণকে লইয়া 'কিশোর সংঘ' (Pioneers) গঠিত হয়। আবার পনের হইতে ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবকগণকে লইয়া যুবসংঘ (Komsomol) গঠিত হয়। এই সকল সংঘের মধ্য দিয়াই জনসাধারণের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রমিকসংঘ (Trade Unions), সমবায় সমিতি (Co-operatives) প্রভৃতি সংঘগুলি দলীয় আদর্শ প্রচারকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করে।

সাম্যবাদী বিপ্লবের পর ৫৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সাম্যবাদনীতির স্রষ্টা ও বিপ্লবের প্রধান নায়কগণ একে একে তিরোহিত হইতেছেন। কিন্তু ব্যাপক শিক্ষা, প্রচারকার্য ও গঠনমূলক কার্যের দ্বারা সাম্যবাদের মূলনীতি ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব জনসাধারণের মধ্যে এরূপভাবে সঞ্চারিত করা হইয়াছে যে, বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ এই নীতিতে আস্থাবান হইয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একদলীয় শাসন ও গণতন্ত্র—One-Party rule in the U. S. S. R. and Democracy

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইল যে, এই শাসনব্যবস্থা একটিমাত্র রাজনৈতিক দল (সাম্যবাদী) দ্বারা পরিচালিত হয়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের ১২৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে, নাগরিকগণ শুধু সাম্যবাদী দলের সদস্য হইতে পারিবেন এবং কেবলমাত্র এই দলই প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারিবে। অন্য কোন রাজনৈতিক দল সোভিয়েত

দেশে নাই বা থাকিতে দেওয়া হয় না। দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকার অর্থ হইল যে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে মতপার্থক্যের কোন অবকাশ বা সুযোগ নাই। সকল ব্যক্তিরই চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ভিন্নমুখী না হইয়া একমুখী হইতে হইবে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল কথা হইল চিন্তা করিবার বা মতামত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা (Freedom of thought and expression)। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও মতামত প্রকাশ করিবার স্বাধীনতাকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ এবং এই বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। যেখানে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে স্বভাবতঃই স্বাধীন চিন্তা বা চিন্তার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গণতন্ত্রের অবসান ঘটে। যেখানে জনসাধারণ ভোট দিয়া শাসকগোষ্ঠীকে পরিবর্তন করিয়া অন্য শাসকগোষ্ঠী নিযুক্ত করিতে পারে না, সেখানে গণতন্ত্র অচল। সুতরাং একমাত্র সাম্যবাদী দল পরিচালিত সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা আর যাহাই হউক না কেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এই অভিযোগের উত্তরে সাম্যবাদিগণ বলেন যে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন বিশেষ শ্রেণী নাই এবং এজন্য কোন শ্রেণীবিরোধও নাই। সোভিয়েত রাষ্ট্র হইল মেহনতি জনসাধারণের রাষ্ট্র—কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক ও বুদ্ধিজীবী—সকলেই একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সাম্যের ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। এখানে সকলেই সমান ও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যযুক্ত। ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকিবার মুখ্য কারণ হইল সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য এবং এই বৈষম্যের ফলে মতভেদ এবং মতভেদ হইল রাজনৈতিক দলের জন্মদাতা। ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের হানাহানির জন্যই অনেক দেশেই শ্রমিক দলের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। সোভিয়েত দেশে স্বার্থের কোন সংঘাত নাই, তাই ক্ষমতার অধিকার লইয়া কোন রাজনৈতিক দল বা উপদলের কলহ নাই।

ইহা ছাড়া, সাম্যবাদিগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলে জাতীয় শক্তি ও সংহতির অপচয় ঘটে। জাতির

সকল লোকই যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এক-দলীয়, দ্বি-দলীয় বা বহু-দলীয় সকল শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দলের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায়ই ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটিমাত্র দল থাকিলে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বার্থ অধিকতররূপে সুরক্ষিত হয়।

সাম্যবাদিগণ আরও বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এত বৈষম্য রহিয়াছে যে, সেখানে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতামত অভিব্যক্তি প্রহসনে পর্যবসিত হইয়াছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছে। সুতরাং সোভিয়েত রাষ্ট্রে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা দ্বারা গণতান্ত্রিক আদর্শ আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ শতকরা দশজন পুঁজিপতি, মালিক ও আমলাতন্ত্রের গণতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া শতকরা নব্বইজন মেহনতি মানুষের গঠিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা—Government of the Local Areas

সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পনেরটি অঙ্গরাজ্য লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে রুশীয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রটি বৃহত্তম। এই প্রজাতন্ত্রে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটি নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্রে একটি করিয়া সুপ্রীম সোভিয়েত, মন্ত্রিপরিষদ্ ও প্রেসিডিয়াম আছে। সদস্যরাষ্ট্রের নাগরিকগণ কর্তৃক চার বৎসর কালের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সভাই হইল সদস্যরাষ্ট্রগুলির সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

স্ব-শাসিত প্রদেশগুলিতে অনুরূপ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এখান-কার শাসনব্যবস্থাও একটি সুপ্রীম সোভিয়েত, একটি মন্ত্রিপরিষদ্ ও একটি প্রেসিডিয়াম লইয়া গঠিত।

অনুরূপভাবে স্ব-শাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার নিজস্ব আইনসভা (Soviet) থাকে। এই সভাগুলির সদস্যগণ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সোভিয়েত সভাগুলি শাসনকার্যের জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ্ (Executive Committee) নির্বাচিত করে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি—Economic Basis of the Soviet State

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা বলা হইয়াছে। এখানে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে কৃষক-মজদুর লইয়া গঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি হইল মেহনতি জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ। মূলধনের মালিক, জমিদার বা ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিষ্কর্মা পরজীবী সম্প্রদায়ের এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রনৈতিক সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মেহনতি জনসাধারণ। মেহনতি জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষক-মজদুর ও সৈনিকের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সোভিয়েত সভাই হইল রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি।

সোভিয়েত শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইল এই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। বাইবেলে উল্লিখিত অর্থনৈতিক নীতি সাম্যবাদিগণ একটু বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বাইবেলের উপদেশ হইল 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাও' ('Earn thy bread by the sweat of your own brow') অর্থাৎ নিজে কাজ করিয়া নিজের অন্ন সংস্থান কর, অপরের পরিশ্রমলব্ধ ধনের অংশ গ্রহণ করিও না। কিন্তু সাম্যবাদ নীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল, 'যে কাজ করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না'—('He who does not work neither shall he eat') সোভিয়েত রাষ্ট্রে কাজ করা শুধু বাধ্যতামূলক নয়—ইহা সম্মানজনকও বটে। সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই মূলনীতি বলবৎ হইবার ফলে, পূর্বতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইহার অবশ্যম্ভাবী সহচর ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনিক কর্তৃক দরিদ্র

শ্রেণীর নির্মম শোষণসহ সমূলে উৎপাটিত হয়। ফলে বর্তমানে সোভিয়েত রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত মালিকানা নাই। দেশের সমগ্র সম্পদের মালিক হইল রাষ্ট্র অর্থাৎ জনসাধারণ—যাহাদের সমবেত পরিশ্রমের ফলে দেশের সম্পদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েত দেশে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, দ্বিতীয়তঃ, যৌথ খামার সম্পত্তি ও তৃতীয়তঃ, সমবায় সমিতি সম্পত্তি। জমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী, বন, কল-কারখানা, রেল, বিমান, ব্যাঙ্ক, যোগাযোগ, যন্ত্রপাতিসহ বড় বড় রাষ্ট্রীয় খামার, পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের অধিকাংশ আবাস-গৃহ হইল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অর্থাৎ জনসাধারণের সম্পত্তি। যৌথ খামার ও সমবায় সমিতিগুলির সাধারণ সম্পত্তি হইল তাহাদের যন্ত্রপাতি, কারখানা-গৃহ, পালিত পশু, উৎপাদিত সম্পদ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় যৌথ ও সমবায় সম্পত্তি ব্যতীতও সোভিয়েত রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। স্বোপার্জিত আয় ও সঞ্চয়, বাসগৃহ, পারিবারিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্রায়তনের কুটির শিল্প, ব্যক্তিগত ব্যবহারোপযোগী তৈজস ও আসবাবপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নাগরিকগণ রাখিতে পারেন এবং এইগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করিতে পারেন। সুতরাং নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত নাগরিকগণ সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন কিন্তু যে সম্পত্তির মালিকানা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং যে সম্পত্তির সাহায্যে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করিয়া সমাজে অসম ধন-বন্টন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, সেরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সোভিয়েত দেশে নাই। যাহারা কাজ করে, একমাত্র তাহারাই ভোগ করিতে পারে। সোভিয়েত দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র, যৌথ খামার ও সমবায় সমিতিগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়—মুনাফার লোভে নিছক ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয় না। সুতরাং উৎপাদিত সম্পদের মালিক ব্যক্তি-বিশেষ নয়—মালিক হইল উৎপাদনে নিযুক্ত কর্মিগণ। প্রত্যেক কর্মী তাহার সাধ্যমত কাজ করে এবং কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক পায় ('From each according to his ability, to each according to his work')। এইরূপে জাতীয় অর্থনৈতিক

পরিকল্পনার সাহায্যে সোভিয়েত রাষ্ট্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দেশের মেহনতি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও যে দেশ নিরক্ষর কৃষি-প্রধান দেশ ছিল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে সে দেশ আজ ধনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে উন্নীত হইয়াছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্বগুলি হইল, (১) সমাজব্যবস্থা হইতে শ্রেণীভেদ দূর করা, (২) বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা, (৩) শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও (৪) পতিতাবৃত্তি নিরোধ করা। আয়ের বৈষম্য থাকিলেও সকলের জন্য হিতকর কর্ম-সংস্থান দ্বারা বেকারত্ব দূর করা হইয়াছে। অর্থের অভাবে কেহ নিরক্ষর থাকে না বা অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় মারা যায় না। বৎসরে প্রায় দুই কোটি লোককে সোভিয়েত সরকার পেন্সন দান করে এবং ৩০ লক্ষ লোককে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সরকারী খরচে স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠান হয়। ১৯২৭ সাল হইতে ছয়টি রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে উৎপাদন পরিমাণ এরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বর্তমানে শ্রমিকগণকে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টার অধিক কাজ করিতে হয় না। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এই দেশে একটি সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সফল হইলে শ্রমিকগণকে সপ্তাহে ৩০।৩৫ ঘন্টার বেশী কাজ করিতে হইবে না। অবশিষ্ট সময় তাহারা বিশ্রাম ও গঠনমূলক কার্যে নিয়োগ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল এমন দেশ যেখানে মেহনতি জনসাধারণ সুস্থ জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে। এইজন্য সাম্যবাদী নেতাগণ দাবী করেন যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র মেহনতি জনসাধারণকে লইয়া মেহনতি জনসাধারণের কল্যাণের জন্য মেহনতি জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Peculiar Features of the Soviet Federation

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের স্টালিন শাসনতন্ত্রে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থাকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয়

শাসনব্যবস্থার ন্যায় সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায়ও যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যসরকারগুলির অবস্থিতি, উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন, একটি সুপ্রীম কোর্টের অবস্থিতি প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি এই শাসনব্যবস্থায় বর্তমান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এমন কতকগুলি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেজন্য ইহাকে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে সহজেই পৃথক করা যায়।

প্রথমতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পনেরটি অঙ্গরাজ্য লইয়া গঠিত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এই অঙ্গরাজ্যগুলি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির ন্যায় শুধুমাত্র ভৌগোলিক বিভাগ নহে। সোভিয়েতের অঙ্গরাজ্যগুলি জাতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উজবেকিস্থান, কাজাকস্থান, ল্যাট্‌ভিয়া, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যগুলি পৃথক জাতির ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে নিছক জাতির ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলি গঠিত হয় নাই। তবে এই ব্যবস্থার পক্ষে বলা চলে যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সোভিয়েত সরকার সংখ্যালঘু জাতিগুলির সমস্যা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিতে পারিয়াছেন যাহা অনেক যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন নীতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমগ্র দেশের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, করস্থাপন, সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, মুদ্রাব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বীমা, বিচারব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা করে। করধার্য ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন অঙ্গরাজ্য নূতন কর স্থাপন করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রাধান্য সত্ত্বেও অঙ্গরাজ্যগুলির কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য-

গুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূল-নীতিবিরোধী এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে স্থান পায় নাই।

চতুর্থতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন, বাইলো-রাশিয়া প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যগুলিকে ভিন্ন রাষ্ট্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে এই রাজ্যগুলি ইহাদের নিজস্ব প্রতিনিধিগণের দ্বারা স্ব স্ব কার্য পরিচালনা করে।

পঞ্চমতঃ, অঙ্গরাজ্যগুলির স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করিবার অধিকারও শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অঙ্গরাজ্যগুলির এই অধিকারগুলি নামমাত্র অধিকারে পর্যবসিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত কোন অঙ্গরাজ্যই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস পায় নাই।

ষষ্ঠতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানকার কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গ-রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার যে ভাগ রহিয়াছে তাহা ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী করা হয় নাই।

সপ্তমতঃ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একটি সুপ্রীম কোর্ট বিদ্যমান থাকিলেও এই বিচারালয় সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক প্রবর্তিত কোন আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না। এই ক্ষমতা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডিয়ামের উপর অর্পিত হইয়াছে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রায় সমুদয় যুক্তরাষ্ট্রের আইনের বৈধতা বিচার সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

পরিশেষে বলা যায় যে, একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের (সাম্যবাদী) কর্তৃত্বে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলিয়া শাসনব্যবস্থার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে একদলীয় নেতৃত্ব দেখা যায়। একদলীয় নেতৃত্বের ফলে শাসনব্যবস্থার কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রসুলভ হইলেও কার্যতঃ ইহা কঠোরভাবে এককেন্দ্রীয়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি—Structure of the Soviet State

প্রায় ৬০টি বিভিন্ন জাতি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। জার শাসনকালে শাসনব্যবস্থা একান্তভাবে এককেন্দ্রীয় ছিল, কিন্তু বিদ্রোহের পর সাম্যবাদী নেতাগণ এই বিভিন্ন জাতিগুলির জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি ও অতীত ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পূর্বতন এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন করেন। কিন্তু অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একটি মূলগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রই বলপ্রয়োগে বিজয় দ্বারা অথবা বলপ্রয়োগে একটি জাতিকে অবদমিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ইহার সৃষ্টির প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সোভিয়েত নেতৃগণ দাবী করেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র একান্তভাবেই একটি বহুজাতির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ঐক্য ও বন্ধুত্বের ফল। সাম্যের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন জাতি স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া এই অভিনব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। তাই এই যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, এই রাষ্ট্রান্তর্গত ক্ষুদ্র-বৃহৎ—প্রত্যেকটি জাতি ইহার স্বীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া এক বৃহত্তর মানবসমাজ গঠন করিতে পারে। এই কারণে ওয়েব্‌স দম্পতি ও অধ্যাপক লাস্কি সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে এক নূতন ধরণের সভ্যতা (A new type of civilization) আখ্যা দিয়াছেন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবার উদ্দেশ্যে চার শ্রেণীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র নিম্নলিখিত শাসন-সংস্থায় ভাগ করা হইয়াছে।

১। অঙ্গরাজ্য (Union Republic)

২। স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র (Autonomous Republic)

৩। স্ব-শাসিত প্রদেশ (Autonomous Region)

৪। জাতীয় অঞ্চল (National Area)

১। অঙ্গরাজ্য—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি অঙ্গরাজ্যের প্রত্যেকটি অপরাপর অঙ্গরাজ্যগুলির সমপর্যায়ভুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেকটি রাজ্যের নিজস্ব শাসনতন্ত্র আছে এবং এই শাসনতন্ত্র প্রত্যেকটি রাজ্যে সর্বোচ্চ শাসন-সংস্থা সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক রচিত এবং প্রয়োজনমত সংশোধিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্য সমুদয় ক্ষমতাই অঙ্গরাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব নাগরিকত্ব আছে, তবে এই উভয়বিধ নাগরিকত্বের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় পতাকা ছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যের স্বাধীনতা-সূচক নিজস্ব পতাকা আছে। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই নিজস্ব এলাকার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। কোন রাজ্যের বিনা সম্মতিতে রাজ্যের এলাকার পরিবর্তন করা যায় না। ইহা ছাড়া, অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুসারে ইহাদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী গঠন করিতে পারে ও পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। সর্বোপরি প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য যেরূপ স্বেচ্ছায় এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে, সেইরূপ স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার শাসনতান্ত্রিক অধিকারও ইহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যই ইহার জনসংখ্যা ও আয়তন-নিরপেক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ জাতিপুঞ্জ সোভিয়েতে ৩২টি প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে গঠিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ কতকগুলি রাজ্যের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সমবায় বলা যাইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির এত ব্যাপক অধিকার দেখা যায় না।

২। স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র—স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্রগুলি হইল অঙ্গরাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় শাসন-সংস্থা—ইহারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ নহে। অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যে-কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র গঠন করিতে পারে। অঙ্গরাজ্যগুলির ন্যায় প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্রের নিজস্ব শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা আছে। ইহাদের নিজস্ব

এলাকা আছে এবং এই এলাকার কোন পরিবর্তন করিতে হইলে শুধু সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের সম্মতি লইলে চলে না, এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণতন্ত্রটিরও সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। এই সাধারণতন্ত্রগুলি ইহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং ইহাদের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য ইহাদের সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক স্থানীয় ভাষার সাহায্যে পরিচালিত হয়। ইহাদের স্বতন্ত্র পতাকা না থাকিলেও ইহারা সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের পতাকায় নিজস্ব নামাঙ্কিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারে। তবে এই স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্রগুলি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না বা সশস্ত্র বাহিনীও গঠন করিতে পারে না অথবা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে পারে না। প্রত্যেক স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র সাম্যের ভিত্তিতে সোভিয়েত জাতিপুঞ্জ পরিষদে ১১ জন সদস্য নির্বাচন করিতে পারে। সমগ্র সোভিয়েত দেশে এরূপ ১৯টি স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র আছে।

৩। স্ব-শাসিত অঞ্চল—অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। এই ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে স্ব-শাসিত অঞ্চলগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-অধ্যুষিত প্রত্যেকটি অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান আছে। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের আঞ্চলিক সোভিয়েত ও শাসনপরিষদ (Executive Committee) সাহায্যে তাহাদের আঞ্চলিক ভাষায় শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত অঞ্চল সাম্যের ভিত্তিতে সোভিয়েত জাতিপুঞ্জ পরিষদে ৫ জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া থাকে। সমগ্র সোভিয়েত দেশে এরূপ অঞ্চলের সংখ্যা হইল ১৩টি।

৪। জাতীয় এলাকা—জাতীয় এলাকাগুলি হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান। অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে তাহাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এইগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেকটি জাতীয় এলাকায় একটি করিয়া এলাকা সোভিয়েত ও শাসনপরিষদ্ আছে। ইহারা নিজস্ব ভাষায় ইহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি এলাকা সোভিয়েত জাতিপুঞ্জ পরিষদে একজন করিয়া প্রতিনিধি

প্রেরণ করিতে পারে। সমগ্র সোভিয়েত দেশে এরূপ জাতীয় এলাকার সংখ্যা হইল ১০টি।

সুতরাং দেখা যায় যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া একটি বৃহত্তর জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে সমগ্র জাতীয় ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এরূপ সুনিপুণভাবে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান অন্য কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। এই চারিটি শাসন-সংস্থা হইল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এই বিভিন্ন অঙ্গগুলি সাম্যবাদী দলের মধ্যবর্তিতায় সাম্যের ভিত্তিতে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটি অভিনব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন-পদ্ধতি—Method of Election in the U. S. S. R.

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নির্বাচন-পদ্ধতি স্টালিন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আঠার বৎসর অথবা তদূর্ধ্ব বয়সের যে-কোন নারী বা পুরুষ ভোট দানের অধিকারী। একুশ বৎসরের যে-কোন নারী বা পুরুষ স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র সোভিয়েত, অঙ্গরাজ্য সোভিয়েত বা সুপ্রীম সোভিয়েতের সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারে। অন্যান্য নিম্নস্তরের সোভিয়েত-গুলিতে আঠার বৎসর হইলেই সদস্যপদপ্রার্থী হওয়া যায়। নির্বাচন উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশটিকে ভৌগোলিক ভিত্তিতে কতকগুলি নির্বাচন এলাকায় ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক এলাকা হইতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত হয়।

শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী সাম্যবাদী দলীয় সংগঠন, শ্রমিক সংঘ, সমবায় সমিতি, যুব-সংঘ, কৃষ্টিমূলক সমিতি প্রভৃতি প্রার্থী মনোনয়ন করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত শ্রমিক সভা, যৌথ খামার, গ্রাম সভাও বিভিন্ন স্তরের সোভিয়েতগুলিতে প্রার্থী মনোনয়ন করিবার অধিকারী। ভোটদাতাগণ প্রকাশ্য ভোটে (open voting) প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে প্রকাশ্য ভোটে প্রতিনিধি

নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তবে বর্তমানে উচ্চস্তরের সোভিয়েতগুলিতে গোপন ভোটপ্রদান-পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায়।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন-পদ্ধতির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সেই দেশের দলীয় ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। শাসনতন্ত্র কর্তৃক একটিমাত্র রাজনৈতিক দল স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং সেই দল হইল সাম্য-বাদী দল। সাম্যবাদী দলের সদস্য বা সমর্থক অথবা নির্দলীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ ব্যতীত আর কাহারও ভোটদান করিবার, প্রার্থী মনোনয়ন করিবার বা প্রার্থী হইবার অধিকার নাই। সুতরাং সাম্যবাদী দলের সক্রিয় সদস্য বা সমর্থক অথবা কৃষ্টিমূলক, বৈজ্ঞানিক, যুব-সংঘ প্রভৃতি নির্দলীয় সংঘগুলির সদস্য ব্যতীত অন্য কাহারও রাজনৈতিক অধিকার সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং একমাত্র সাম্যবাদী দলের লোকই অথবা এই দলের সমর্থকগণই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। যদি কোন নির্বাচন কেন্দ্রে দুইটি পৃথক সংস্থা কর্তৃক দুইজন প্রার্থী মনোনীত হন তাহা হইলে সাম্যবাদী দলীয় সংগঠন হস্তক্ষেপ করিয়া চূড়ান্তভাবে একজন প্রার্থী মনোনয়ন করে।

এখন প্রশ্ন হইল যে, যদি নির্বাচনে মাত্র একজন প্রার্থী থাকেন তাহা হইলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন অবকাশ নাই এবং এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচন অর্থহীন হয়। কিন্তু নির্বাচন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হইলেও সোভিয়েত দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনে অন্যান্য দেশের মত প্রচারকার্যের সাহায্যে ভোটদাতাগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করা হয়। এই প্রচারকার্যের সাহায্যে সাম্যবাদী দল-পরিচালিত সরকারের প্রগতিমূলক জনহিতকর কার্যাবলীর বিবরণ লোকসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া জনমত সাম্য-বাদী দলের অনুকূল করা হয়। নির্বাচনে একজন মাত্র প্রার্থী। সুতরাং ভোটদাতা নিশ্চিতরূপে জানে কাহাকে ভোট দিতে হইবে। সকল ভোটদাতাই একজন প্রার্থীকে ভোট দিতেছেন, কাজেই প্রকাশ্য ভোটে কাহারও আপত্তি থাকে না। এইরূপে সর্বসম্মত ভোট সাহায্যে নির্বাচন পরিচালনা দ্বারা সাম্যবাদী দলের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

কোন নির্বাচন এলাকা হইতে নির্বাচিত হইলেই নির্বাচিত প্রতিনিধির ভোটদাতাগণের সহিত সম্পর্ক শেষ হয় না। শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচিত

প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্য হইল ভোটদাতাগণকে তাঁহার নিজের কার্যবিবরণী ও সংশ্লিষ্ট সোভিয়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত রাখা। নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি তাঁহার কর্তব্য পালনে অপারগ হন তাহা হইলে ভোটদাতাগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আইনসম্মত-পদ্ধতিতে তাঁহাকে প্রতিনিধিপদ হইতে অপসারিত করিতে পারে। আইনতঃ ভোটদাতাগণই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্য—Federalism in the United States of America and the Soviet Union

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উভয়ই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও এই উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ ফাইনার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করিলে উভয় যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ফাইনারের মতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে (ক) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও (খ) শাসন ক্ষমতার বিভাগ, দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় অঙ্গরাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সদস্য প্রেরণ, তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যসরকারগুলি পৃথক আয়ের উৎসের ব্যবস্থা করা হয়, চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিশেষ বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য দুই জাতীয় বিচারালয় থাকে, পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার গঠনপ্রকৃতি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং এই গঠনপ্রকৃতি সকল রাজ্যেই সমান হয়। ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির জাতীয় সরকার সম্পর্কে আনুগত্য ও ব্যবচ্ছেদ (Allegiance and Secession) সম্পর্কে সুনির্ধারিত নিয়ম থাকে।

উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে বিচার করিলে মনে হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্র, অপরপক্ষে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা জাতীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করা হইয়াছে। ক্ষমতা বিভাজন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা একান্তভাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়া রাজ্য সরকারগুলিকে অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। সুতরাং আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল ও রাজ্য সরকারগুলিকে শক্তিশালী করিয়া গঠন করা হইয়াছিল।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সম্পর্কে আইন-প্রণয়ন ও শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়গুলির মূলনীতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি নানাজাতি ও নানা সম্প্রদায়ের জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। এই রাজ্যগুলির কোনটিই একজাতি বা এক সম্প্রদায় লইয়া গঠিত হয় নাই। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র একটি জাতি লইয়া গঠিত।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির স্থানীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকিলেও ইহারা সার্বভৌম যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়। কোন-মতেই ইহারা যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত শাসনতন্ত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ আত্মঘাতী ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত, অঙ্গ-রাজ্যগুলিকে আরও দুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। এই রাজ্যগুলি ইহাদের নিজস্ব জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করিতে পারে এবং

কেন্দ্রীয় সরকার নিরপেক্ষভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি অন্তর্বিপ্লব ও বিদেশী আক্রমণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নিরাপত্তা রক্ষা করিবার অধিকার দাবী করিতে পারে, ইহাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারে এবং নিজস্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও স্থানীয় কর ধার্য কবিবার ক্ষমতার অধিকারী হইলেও যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার বা নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করিবার অথবা পররাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার ইহাদের নাই।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র সোভিয়েত দেশের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ও কার্যে রূপায়িত করেন। কৃষি, ক্ষুদ্র, বৃহৎ শিল্প, অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থা সব কিছু কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার শতাংশ নিয়ন্ত্রণও দেখা যায় না। রাজ্যগুলি ইহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত উপরি-উক্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, উভয় যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট এবং অঙ্গ-রাজ্যগুলি হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইলেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ সিনেটের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিম্নকক্ষ অপেক্ষা অধিক।

ষষ্ঠতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের আইনসভা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের পরিবর্তন করিতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েত এককভাবে ইহার ইচ্ছামত ক্ষমতা বিভাজন পরিবর্তন করিতে পারে এবং এইরূপে অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা সংকুচিত করিতেও পারে।

সপ্তমতঃ, প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে

শাসনতন্ত্র নির্ধারিত পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্যে করে। শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য আইন-গুলিকে অসিদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রধান বিচারালয় এই উভয় সরকারের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা নাই। সেভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডিয়াম নামক একটি অভিনব সংস্থার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র বলিতে সাধারণতঃ যে প্রকৃতির শাসনব্যবস্থা বুঝা যায়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তন হয় এবং ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অল্পবিস্তর পরিমাণে মার্কিন আদর্শে গঠিত হইয়াছে। হেন্‌রি ও বিয়াট্রেস ওয়েব্‌ সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাকে এক নূতন ধরণের সভ্যতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওয়েব্‌ দম্পতির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও এক অভিনব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ও পরিবেশে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়, তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের পটভূমিকা ও পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য থাকিবে তাহা স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতির আলোচনা করিতে গেলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা একটিমাত্র রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একই নীতি অনুসৃত হয়। সুতরাং কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি এই যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির প্রাবল্য দেখা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সহজেই দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া রাজ্য সরকারগুলির আদি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত স্বাধীন সত্তা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

মার্কিন-শাসনতন্ত্র ও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি—Fundamental Rights in the American and the Soviet Constitutions

অধিকারগুলি হইল নাগরিক জীবনের এমন কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা যেগুলির সাহায্যে নাগরিক জীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং নাগরিকগণ তাহাদের চরিত্রের সম্যক বিকাশলাভে সমর্থ হন। এই উদ্দেশ্যে সকল সুসভ্য রাষ্ট্রই সংবিধানে কতিপয় মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করিয়া নাগরিক জীবনের উৎকর্ষের ব্যবস্থা করে। সংবিধানে বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলির প্রকৃতি হইতেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র এই দুইটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত। এই উভয় দেশের সংবিধানেই নাগরিকগণের কতিপয় মৌলিক অধিকার স্থান পাইয়াছে। কিন্তু উভয় দেশে প্রথম যে সংবিধান রচিত হয়, সেই আদি সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলির কোন উল্লেখ ছিল না। উভয় দেশেই পরবর্তীকালে মৌলিক অধিকারগুলিকে সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রচিত সংবিধানে কোন মৌলিক অধিকার সন্নিবদ্ধ করা হয় নাই। পরবর্তীকালে শাসনতন্ত্রের প্রথম দশটি সংশোধন আইনের সাহায্যে মৌলিক অধিকারগুলি সৃষ্টি করা হয়। অনুরূপভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯১৮ ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রচিত সংবিধানদ্বয়ে মৌলিক অধিকারগুলির কোন উল্লেখ ছিল না। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রচিত স্টালিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত ও সুরক্ষিত করা হয়। এই একটি মাত্র সাদৃশ্য ব্যতীত উভয় দেশের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য বিরল। এই উভয় দেশের মৌলিক অধিকার-গুলির তুলনামূলক বিচার করিবার কালে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উভয় দেশের জীবনাদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র—এই রাষ্ট্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক ও রক্ষক এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষের সাহায্যে সামাজিক উন্নতি বিধানের পক্ষপাতী। অপরপক্ষে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—এই রাষ্ট্রে সমষ্টিগত (সামাজিক) উৎকর্ষের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা

হয় এবং সমষ্টির কল্যাণ সাধনের সাহায্যে ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের পথ উন্মুক্ত করা হয়।

প্রথমতঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্রে মানুষের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার-গুলির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বাক্‌-স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করিবার স্বাধীনতা, বে-আইনী তল্লাসী ও ক্রোকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, ধর্মীয়-স্বাধীনতা প্রভৃতি শাসনতন্ত্র কর্তৃক বিশেষভবে সুরক্ষিত হইয়াছে। অপরপক্ষে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে উপরি-উক্ত রাজনৈতিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ থাকিলেও মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। কাজ করিবার অধিকার, বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অথবা অক্ষমতা ক্ষেত্রে সাহায্য পাইবার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার-গুলির সংরক্ষণ করা হইল শাসনতন্ত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সাম্যবাদীগণের মতে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারগুলিই হইল মুখ্য, রাজনৈতিক অধিকার হইল গৌণ। কারণ বেকার বা অনশনক্লিষ্ট (অর্থনৈতিক অধিকারের অবর্তমানে) ব্যক্তির ভোটদান অধিকার একটি প্রহসন মাত্র। একমাত্র অর্থনৈতিক অধিকারগুলি সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করিয়া মানুষকে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া যায়। সোভিয়েত শাসনতন্ত্রেও বাক্‌-স্বাধীনতা, ধর্মীয়-স্বাধীনতা প্রভৃতি বিধিবদ্ধ আছে। অধিকন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য পরিচালনা করিবারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, উভয় দেশে প্রচলিত রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অযথা অন্যের সুনাম নষ্ট না করিয়া বা অন্যের সম্মান হানি না করিয়া অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বে-আইনী উত্তেজনা সৃষ্টি না করিয়া আইনসম্মতভাবে মার্কিন নাগরিকগণ তাঁহাদের মতামত মৌখিক অথবা লিখিতভাবে প্রকাশ করিতে পারেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের নাগরিক-গণও স্বাধীনভাবে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন যদি এই মতামত সাম্যবাদের পরিপন্থী না হয়। সাম্যবাদ নীতির বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার নাই। আবার মতামত এরূপভাবে প্রকাশ করিতে হইবে যে মতামত সকল সময়ই শ্রমিকগণের স্বার্থের অনুকূল

হয়—অর্থাৎ দেশে প্রচলিত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং সক্রিয় সাম্যবাদী, সাম্যবাদের সমর্থক অথবা নির্দলীয় লোক ব্যতীত আর কাহারও স্বাধীনতা সোভিয়েত শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ থাকিলেও এই অধিকারগুলিকে কার্যে রূপায়িত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রে শুধুমাত্র উল্লিখিত হয় নাই, পরন্তু নাগরিকগণ যাহাতে সংবিধানে বর্ণিত এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই-রূপে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাহায্যে নাগরিকগণের কাজের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের জন্য নানারূপ আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ ও স্বাস্থ্য-নিবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও নামমাত্র বেতনে উচ্চতর শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া শিক্ষার অধিকারকে সার্থক করা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রের দুষ্পরিবর্তনীয়তা ও শেষ পর্যায়ে সুপ্রীম কোর্টের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টই হইল নাগরিক অধিকারগুলির অভিভাবক ও রক্ষক। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের নাগরিক অধিকার রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। প্রেসিডিয়াম আইনের ব্যাখ্যা করে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় হইল সাম্যবাদ-নীতি গ্রহণ করা এবং এই নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

পঞ্চমতঃ, একমাত্র সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলিকে মৌলিক কর্তব্যের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা, দেশের আইন ও শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য, শ্রম-শৃংখলা রক্ষা করা এবং সর্বোপরি সোভিয়েত মাতৃভূমিকে রক্ষা করা নাগরিকগণের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া শাসনতন্ত্র কর্তৃক ধার্য হইয়াছে। অধিকার ও কর্তব্যগুলির এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং অধিকারগুলিকে কার্যে রূপদান করিবার সক্রিয় ব্যবস্থা অধিকারগুলিকে অর্থবহ ও নাগরিকগণের

পক্ষে সহজলভ্য করা হইয়াছে। মার্কিন শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের কোন কর্তব্যের উল্লেখমাত্র নাই।

ষষ্ঠতঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্রে কোন অর্থনৈতিক অধিকারের উল্লেখ নাই। ইহার কারণ হইল, যে সময়ে মার্কিন শাসনতন্ত্র রচিত হয় তখন দেশে বিশেষ কোন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। প্রধানতঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই মার্কিন দেশের অধিবাসিগণ অধিকতর সচেষ্ট ছিলেন। সুতরাং মার্কিন শাসনতন্ত্রে উৎকট ধন-বৈষম্য-জনিত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কোন অর্থনৈতিক অধিকার শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই। তাই মার্কিন শাসনতন্ত্রে রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লবের পূর্বে যে ধনবৈষম্য উদ্ভূত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সেই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল। পুনর্গঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত দেশে রাষ্ট্রের কাঠামো স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারগুলিই হইল মুখ্য, আর রাজনৈতিক অধিকারগুলি হইল গৌণ। সেইজন্য মার্কিন শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েত শাসনতন্ত্র কাহাকেও অপরিমিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হইবার সুযোগ দান করে নাই। সোভিয়েত শাসনতন্ত্র কর্তৃক একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সোভিয়েত নাগরিকগণ নিজেদের ভোগ-ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি অর্জন ও উত্তরাধিকারিগণকে হস্তান্তর করিতে পারেন কিন্তু কোনক্রমে মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতঃ একটি প্রশ্ন মনে জাগে। কোন্ দেশের অধিকার-ব্যবস্থা উৎকৃষ্টতর? উত্তরে বলা যায় যে, উভয় দেশই নাগরিকগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কতিপয় মৌলিক অধিকার স্বীকার করিয়া অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন এবং অধিকারগুলির গুরুত্ব দুই দেশে সমান নহে। উভয় দেশের জীবনাদর্শের পার্থক্য হেতুই উভয় দেশের অধিকারগুলির প্রকৃতি, গুরুত্ব ও তাৎপর্যের পার্থক্য দেখা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি—১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশদেশের যুগান্তকারী বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের সহিত ইহার আনুষঙ্গিক সামন্ত-তান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা ও আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটে। লেনিন্, স্টালিন্ প্রভৃতি বিপ্লবের নেতৃবর্গ সমাজ ব্যবস্থায় এক নব-বিধানের প্রবর্তন করিলেন। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন ও সোভিয়েত শাসন হইল এই নব-বিধানের ভিত্তি। উৎপাদনের সমুদয় উপায়সমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল এবং উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা নব-গঠিত যৌথ খামার ও সমবায় পদ্ধতি শিল্প-কারখানার হস্তে ন্যস্ত করা হইল। এই ব্যবস্থার মূল কথা হইল সকলকেই কাজ করিতে হইবে এবং একমাত্র শ্রমিক সম্প্রদায়ই হইল দেশের প্রকৃত মালিক। শ্রম-বিমুখ পরজীবী মালিক, মুনাফাখোর, পুঁজিপতি প্রভৃতির এ রাষ্ট্রে কোন স্থান নাই। এইরূপে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাহায্যে শ্রমিক রাজ বা বিত্ত-হীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে বিত্তহীন শ্রেণীর হস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার ফলে যে বিত্তহীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল সেই কর্তৃত্ব পরিচালনার যন্ত্ররূপে সোভিয়েত বা পরিষদের অভ্যুত্থান ঘটিল। এই সোভিয়েতগুলি শুধু কৃষক, মজদুর প্রভৃতি শ্রমিক লইয়া গঠিত। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল প্রাথমিক সোভিয়েতগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া সোভিয়েতের সর্বোচ্চ সংগঠন সুপ্রীম সোভিয়েত পর্যন্ত এই শ্রমিক শ্রেণীর সদস্য লইয়া গঠিত। বিত্তহীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে একটি মাত্র শ্রেণী রহিল এবং সে শ্রেণী হইল শ্রমিক শ্রেণী। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজে স্বার্থের কোন হানাহানি নাই—তাই একদলীয় শাসন প্রবর্তিত হইল। দেশের পনেরটি বিভিন্ন অংশ ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় এই নব-বিধানের অন্তর্ভুক্ত হইল। তাই নবগঠিত রাষ্ট্রের নামকরণ হইল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের সংঘ।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : ১। শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। পনেরটি অঙ্গরাজ্য লইয়া সোভিয়েত

যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। চার শ্রেণীর স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত হইয়াছে। অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার শাসনতন্ত্রসম্মত ক্ষমতা থাকিলেও অন্য নানাপ্রকারে তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তে আনা হইয়াছে।

২। সামাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শোষণ-মুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই হইল এই শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য।

৩। শাসনতন্ত্রে যুগপৎ নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪। আইনসভার উভয় পরিষদই সববিষয়ে সমান ক্ষমতার অধিকারী।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপরিষদ দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া গঠিত। আইন-সভার সদস্যগণ যুক্ত অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করেন।

৬। আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক সাঁইত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম হইল কার্যতঃ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এই সভার আইন-প্রণয়ন, শাসনকার্য ও বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

৭। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় বিচারপতি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং বিচারকার্যে নাগরিক বিচারকগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য—সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত নাগরিক অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র নাগরিকগণের কতক-গুলি কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে :—

১। কাজ করিবার অধিকার, ২। বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার, ৩। শিক্ষার অধিকার, ৪। জাতি-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান অধিকার, ৫। ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার, ৬। বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ৭। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ৮। আশ্রয় পাইবার অধিকার, ৯। সংঘ গঠন করিবার অধিকার।

সোভিয়েত নাগরিকের কর্তব্য হইল :

১। কাজ করা, ২। আইন-কানুন মান্য করা ও শ্রমশৃংখলা রক্ষা করা, ৩। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করা, ৪। সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করা, ৫। দেশ রক্ষা।

অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য—১। নাগরিকদের সকল অধিকারের উৎস হইল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা।

২। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি অপেক্ষা অর্থনৈতিক অধিকার-গুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

৩। অধিকারগুলিকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

৪। অধিকারগুলির সহিত কতিপয় মৌলিক কর্তব্য যুক্ত করিয়া নাগরিক-গণকে রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশীদার করা হইয়াছে।

৫। সকল অধিকারই একমাত্র সাম্যবাদ সমর্থক নাগরিকগণই ভোগ করিতে পারিবেন।

শাসন বিভাগ—প্রায় ৫০ জন সদস্য লইয়া মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত হয়। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে মন্ত্রি পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। দুই শ্রেণীর মন্ত্রী লইয়া এই পরিষদ গঠিত হয়, যথা, ১। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী ও ২। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহের মন্ত্রী। নীতিগতভাবে সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হইলেও কার্যতঃ সাম্যবাদী দলের সর্বোচ্চ সংস্থা পলিট্‌ব্যুরো মন্ত্রিগণকে মনোনীত করে।

মন্ত্রি-পরিষদের ক্ষমতা ও কার্য---১। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যের সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে উপদেশ দান করা।

২। বাজেট ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকর করা।

৩। শান্তিরক্ষা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করা।

৪। কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণ করা এবং দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা করা।

৫। অর্থনৈতিক, কৃষ্টিমূলক, যুদ্ধ-সংক্রান্ত সংস্থা গঠন করা।

৬। আইনানুযায়ী আদেশ ও নির্দেশ প্রচার ও বলবৎ করা।

৭। কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বা অঙ্গরাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদ বাতিল করিতে পারে।

আইনসভা—দুইটি পরিষদ—জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত লইয়া সুপ্রীম সোভিয়েত বা সোভিয়েত আইনসভা গঠিত। জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত, সমগ্র দেশের নাগরিকগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। উভয় পরিষদের কার্যকাল চার বৎসর, কিন্তু তৎপূর্বে প্রেসিডিয়াম উভয় পরিষদই ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, মন্ত্রি-পরিষদের সদস্য নির্বাচন, প্রেসিডিয়াম ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে নির্বাচন করা ইহার কার্য। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারে।

প্রেসিডিয়াম—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য দেশের মত রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অনুরূপ কোন উর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ নাই। তৎ-পরিবর্তে সাঁইত্রিশজন সদস্য লইয়া গঠিত প্রেসিডিয়াম রাষ্ট্রপ্রধানের কার্য পরিচালনা করে। প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রেসিডিয়াম আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সভা সরাসরি আইন প্রণয়ন করিতে না পারিলেও আইনানুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারে। সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী কালে মন্ত্রি-পরিষদ ইহার নিকট দায়ী থাকে। সুপ্রীম সোভিয়েতের উভয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উভয় পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া দুই মাসের মধ্যে উহা নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারে। এই সভা রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে ও সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করে। সুপ্রীম সোভিয়েত-প্রণীত কোন আইনের সহিত মূল রাষ্ট্র-প্রণীত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে শেষোক্ত আইনকে এই সভা বাতিল করিতে পারে। সোভিয়েত শাসন-ব্যবস্থার সমুদয় ক্ষমতাই প্রেসিডিয়ামে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে।

বিচারবিভাগ—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায়ও কেন্দ্রীভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। সুপ্রীম কোর্ট হইল সমগ্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়। ইহার আদিম ও আপীল মামলা শুনিবার ক্ষমতা আছে। বিচার-পতিগণ পাঁচ বৎসরের জন্য সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত হন। সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত আরও কয়েক শ্রেণীর বিচারালয় আছে। অঙ্গরাজ্যগুলির

বিচারালয় এবং স্ব-শাসিত প্রদেশ, স্ব-শাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার বিচারালয়গুলি নিজ নিজ এলাকার মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করে। সমস্ত বিচারপতিই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সমস্ত মামলাই নাগরিকগণের প্রতিনিধি বিচারকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। বিচারপদ্ধতি সহজ, সরল ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়-সাপেক্ষ। রাজনৈতিক অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

প্রোকিউরেটর-জেনারেল—শাসনবিভাগের কার্যের তদারক করিবার জন্য একজন প্রোকিউরেটর-জেনারেল ও তাঁহার অধস্তন স্থানীয় অন্যান্য প্রোকিউরেটরগণ আছেন। আইনসভা কর্তৃক সাত বৎসরের জন্য প্রোকিউরেটর-জেনারেল নির্বাচিত হন। কোন বে-আইনী কার্য অনুষ্ঠিত হইলে প্রোকিউরেটর-জেনারেল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন।

দলব্যবস্থা—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র রাজনৈতিক দল হইল সাম্যবাদী দল। এই দলের প্রভাব শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাম্যবাদী দলের হস্তেই সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। দলীয় সংগঠনেও কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য দেখা যায়। প্রাথমিক দলীয় সংগঠন হইল দলের নিম্নতম সংগঠন। তাহার পর শহর ও জিলার সংগঠন, আঞ্চলিক-সংগঠন, এবং অঙ্গরাজ্যগুলির সংগঠন। সর্বোপরি হইল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় মহাসভা। এই সভা একটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংস্থা নির্বাচিত করে। কার্যকরী সংস্থা পলিট্‌বুরো ও অর্গবুরো নামে আরও দুইটি ক্ষুদ্রতর সংস্থা নির্বাচিত করে। পলিট্‌বুরো হইল দলীয় ক্ষমতার প্রধান উৎস। ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ যাহাতে সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, সেজন্য সমগ্র দেশব্যাপী শিশুসংঘ, কিশোরসংঘ ও যুবসংঘ গঠিত হইয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের এক দলীয় শাসন ও গণতন্ত্র—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল শ্রেণীহীন রাষ্ট্র অর্থাৎ এই রাষ্ট্রে শ্রমিক ব্যতীত অন্য কোন পরজীবি শ্রেণী নাই। সুতরাং এই রাষ্ট্র সম-স্বার্থ-বিশিষ্ট শ্রমিক শ্রেণী লইয়া গঠিত। এই রাষ্ট্রে সম-স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত একমাত্র রাজনৈতিক দল হইল সাম্যবাদী দল। অন্যান্য রাষ্ট্রে বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন

দলের অভ্যুদয় ঘটে এবং বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধি দলগুলির মধ্যে ক্ষমতার অধিকার লইয়া লড়াই চলে। সোভিয়েত রাষ্ট্রে সকলেরই এক স্বার্থ, সুতরাং একটি দল। রাষ্ট্রের সমুদয় সিদ্ধান্তই সর্বসম্মত মতে গৃহীত হয়। অন্যান্য দেশে উৎকট ধন-বৈষম্যের ফলে মানুষের পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাগুলি প্রহসনে পর্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ ১। অঙ্গরাজ্যগুলি জাতির ভিত্তিতে গঠিত। এই ব্যবস্থার দ্বারা সংখ্যালঘু জাতিগুলির সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে।

২। শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য দেখা যায়।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য সত্ত্বেও অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া (ক) স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার, (খ) স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করিবার ও (গ) স্বতন্ত্রভাবে পর-রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবার শাসনতন্ত্র-অনুমোদিত ক্ষমতা আছে।

৪। কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র নির্ধারিত ক্ষমতাবণ্টন পরিবর্তন করিতে পারে।

৫। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধান বিচারালয়গুলির আইনসভা-প্রণীত আইনগুলির ব্যাখ্যা করিবার যে ক্ষমতা আছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সে ক্ষমতা নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আইনের ব্যাখ্যা করিবার অধিকার প্রেসিডিয়ামের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

৬। একদলীয় শাসন-ব্যবস্থার ফলে দৃশ্যত: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা হইলেও সোভিয়েত শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে এককেন্দ্রীয় অর্থাৎ সাম্যবাদী-দল কর্তৃক প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়।

মার্কিন শাসনতন্ত্রে ও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি—উভয় দেশের মৌলিক অধিকারগুলির ক্ষেত্রে একমাত্র সাদৃশ্য হইল যে, উভয় দেশেই শাসনতন্ত্র রচনার পরবর্তীকালে এই অধিকারগুলি

শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। উভয় দেশের অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্যগুলি হইল :—

১। মার্কিন শাসনতন্ত্রে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক ও বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকারগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

২। মার্কিন শাসনতন্ত্রে অধিকারগুলি উল্লেখিত হইলেও অধিকারগুলিকে নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য করিবার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, অপরপক্ষে সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে অধিকারগুলিকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩। একমাত্র সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকারগুলিকে নাগরিক কর্তব্যের সহিত যুক্ত করিয়া অধিকারগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছে। মার্কিন শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের কোন কর্তব্যের উল্লেখ নাই।

৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত হয়। সোভিয়েত সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা নাই। একমাত্র সাম্যবাদী দলের সদস্যগণ, সমর্থকগণ ও নির্দলীয় ব্যক্তিগণই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারেন।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-প্রকৃতি—সোভিয়েত নেতৃগণ দাবি করেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র একান্তভাবেই একটি বহুজাতির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ঐক্য ও বন্ধুত্বের ফল। তাই এই যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-প্রকৃতি এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, এই রাষ্ট্রান্তর্গত ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেকটি জাতি ইহার স্বীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া এক বৃহত্তর মানবসমাজ গঠন করিতে পারে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দিবার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পনেরটি অঙ্গরাজ্য ও অন্য তিন শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে, যথা, (১) অঙ্গরাজ্য, (২) স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র, (৩) স্ব-শাসিত অঞ্চল ও (৪) জাতীয় এলাকা।

১। অঙ্গরাজ্য (Union Republic)-গুলি হইল যুক্তরাষ্ট্রের অবি-চ্ছেদ্য অংশ। শাসনতন্ত্র নির্ধারিত ক্ষমতাগুলি ইহারা স্বাধীনভাবে পরিচালনা

করে। অঙ্গরাজ্যগুলি ইহাদের নিজস্ব সংবিধান রচনা ও সংশোধন করিতে পারে। পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিবার, দূত-প্রেরণ করিবার ও স্বতন্ত্র সেনাবহিনী গঠন করিবার অধিকার আছে। ইচ্ছা করিলে অঙ্গরাজ্যগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। সোভিয়েত নাগরিকত্ব ও পতাকা ব্যতীতও ইহাদের নিজেদের স্বতন্ত্র নাগরিকত্ব ও পতাকা আছে। ইহাদের সম্মতি ব্যতীত রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করা যায় না।

২। স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র (Autonomous Republic)—এই সাধারণ-তন্ত্রগুলি হইল কোন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব শাসনতন্ত্র ও শাসন-ব্যবস্থা আছে। ইহাদের নিজস্ব পতাকা না থাকিলেও সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের পতাকায় নিজেদের নামাঙ্কিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারে। ইহারা স্থানীয় ভাষায় সরকারী কার্য পরিচালনা করিতে পারে। প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত সাধারণতন্ত্র সুপ্রীম সোভিয়েতের জাতিপুঞ্জ পরিষদে ১১জন সদস্য নির্বাচন করিবার অধিকারী।

৩। স্ব-শাসিত অঞ্চল (Autonomous Region)-গুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। আঞ্চলিক ভাষায় আঞ্চলিক সোভিয়েত ও শাসন পরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রত্যেকটি অঞ্চল জাতিপুঞ্জ পরিষদে ৫জন সদস্য নির্বাচন করে।

৪। জাতীয় এলাকা (National Area)-গুলি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম বিভাগ। অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিও যাহাতে তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য-গুলি বজায় রাখিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এইগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। নিজস্ব ভাষায় এলাকা সোভিয়েত ও শাসন পরিষদ কর্তৃক ইহাদের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ইহারা জাতিপুঞ্জ সোভিয়েতে একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে।

সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামো অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

সুইজারল্যাণ্ড (Switzerland)

সুইজারল্যাণ্ড দেশটি আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও একাধিক কারণে ইহার শাসনব্যবস্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। একটি মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কিভাবে জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয়—এই তিনটি ভিন্ন ভাষাভাষী পৃথক্ জাতি তাহাদের জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারে, সুইজারল্যাণ্ড হইল তাহার একমাত্র প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাহাদের জাতীয় জীবনের প্রধান অনুপ্রেরণা হইল—একটি গভীর দেশাত্মবোধ; আর এই দেশাত্মবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সুইস্ জাতি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যে উৎকর্ষসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আজ সমগ্র সভ্য জগৎ কর্তৃক আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ড তেরটি ক্যান্টনের একটি দুর্বল সন্ধি-সমবায় ছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের সন্দারবন্দের যুদ্ধের ফলে তাহারা তাহাদের মধ্যে দৃঢ়তর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া একটি নূতন সংবিধান প্রণয়ন করে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রচিত নূতন সংবিধান অনুসারে সুইজারল্যাণ্ড একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইল। নূতন সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষমতা না দিবার ফলে শীঘ্রই একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিবার দাবিতে গণ-আন্দোলন সুরু হইল। ইহার ফলে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বতন সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার অর্পিত হইল।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—Characteristics of the Constitution

১। সন্ধি-সমবায় নহে, প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র—Not a Confederation but in reality a Federation

শাসনতন্ত্র কর্তৃক সুইজারল্যাণ্ড একটি সন্ধি-সমবায় (Swiss Confeder-

ation) বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। সন্ধি-সমবায় হইল একাধিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সাময়িক কালের সংঘ এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলি যে-কোন সময়ে এই সংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতার অধিকারী। সন্ধি-সমবায়ের একটি প্রতিনিধিমূলক কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকিলেও এই কেন্দ্রীয় সংগঠনের সদস্যরাষ্ট্রগুলির উপর কোন ক্ষমতা নাই অর্থাৎ ইহার কোন সার্বভৌমিকতা নাই। সুইজারল্যাণ্ড সন্ধি-সমবায় বলিয়া আখ্যাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি অখণ্ড সার্বভৌমিকতাবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র। সুইস্ শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, সুইস্ জাতির ঐক্য, শক্তি ও সম্মান বজায় রাখিবার ও বর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যেই শাসনতন্ত্র রচিত হইল এবং জাতীয় ঐক্য দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যেই একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী ক্যান্টনসমূহও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তান্তরিত করিতে কার্পণ্য করে নাই। সুতরাং সুইস্ শাসনব্যবস্থাও মার্কিন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ একটি শাসনব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সমুদয় বৈশিষ্ট্যই এই শাসনব্যবস্থায় বর্তমান। সন্ধি-সমবায়ের কোন লক্ষণই সুইস্ শাসনব্যবস্থায় দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্যান্টনগুলির গুরুত্ব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে সুইস্ সন্ধি-সমবায় নামকরণ করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্যান্টনগুলির এই স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব দুইটি উপায়ে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ রাজ্যপরিষদ প্রত্যেকটি ক্যান্টনের সম-সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এবং প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপার, তাহাদের কার্যকাল, বেতন প্রভৃতি নির্ধারণ ব্যাপারও ক্যান্টনগুলিই স্বাধীনভাবে স্থির করে। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রেও গণভোটের সংখ্যাধিক্য ব্যতীতও ক্যান্টনগুলির সংখ্যাধিক্য ভোটও আবশ্যক।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—Federal System

বর্তমান সুইজারল্যাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র উনিশটি ক্যান্টন ও ছয়টি অর্ধক্যান্টন লইয়া গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হইয়াছে, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হইয়াছে।

শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যান্টন সরকারগুলি। ক্যান্টন সরকারগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইলেও তাহাদিগকে তিনটি বিশেষ সর্ত পালন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। প্রথমতঃ, ক্যান্টনগুলিতে প্রজাতন্ত্রী সরকার (Republican Government) বজায় রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ক্যান্টনগুলি কর্তৃক রচিত তাহাদের নিজস্ব সংবিধান একমাত্র গণভোট-পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ক্যান্টনগুলির সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রবিরোধী কোন বিষয় সন্নিবেশিত থাকিতে পারিবে না। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসনতন্ত্রে যে শুধু উভয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহা নয়, কতকগুলি ব্যাপারে উভয় সরকারের ক্ষমতাপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াও দিয়াছে। তবে ক্ষমতার ভাগ হইলেও সুইস্ শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মত অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতা ভাগ করে নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কার্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে মতাবিরোধ ঘটিলে ক্যান্টন সরকারগুলির পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

৩। দীর্ঘতর ও লিখিত—Longer and Written

লিখিত এবং বহু তথ্যসম্বলিত সুইস্ শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা দ্বিগুণ দীর্ঘতর। লিখিত হইলেও বহু অ-লিখিত বিধান এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নাগরিকত্ব অর্জনের নিয়মাবলী রচনা করিবার ক্ষমতা আইনতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইলেও কার্যতঃ ক্যান্টন সরকারগুলিই এই ক্ষমতা পরিচালনা করে। এই শাসনতন্ত্রে নাগরিকের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক বিধানানুযায়ী যে-কোন ক্যান্টনের নাগরিক হইলেই আপনা হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়।

৪। নাগরিক অধিকারপত্রবিহীন—Without any Bill of Rights

অন্যান্য দেশের লিখিত শাসনতন্ত্রের মত সুইস্ শাসনতন্ত্রে কোনরূপ

নাগরিক অধিকারপত্র (Bill of Rights) নাই। ইহা সত্ত্বেও নাগরিকগণের বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত অধিকারগুলি সুস্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের চতুর্থ ধারায় বলা হইয়াছে যে, সকল সুইস্ নাগরিক আইনের চক্ষে সমান এবং কোন নাগরিকই জন্ম, পদবী বা পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে কোন বিশেষ অধিকার বা মর্যাদা পাইতে পারে না। কোন অপরাধীর জন্য স্বতন্ত্র আদালত গঠন করিয়া বিশেষ বিচার-ব্যবস্থা আইন কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই এবং রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।

৫। দুষ্পরিবর্তনীয়—Rigid

সুইস্ শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। অনমনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

৬। ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্য বিধান নীতির অভাব—Absence of Separation of Powers

সুইস্ শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্য বিধান নীতি বিশেষ স্থান পায় নাই। ফলে, সুইস্ আইনসভা প্রশাসনিক সমুদয় ক্ষমতারই অধিকারী। কিন্তু আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে আইনসভার ক্ষমতা গণ-নির্দেশাধিকার দ্বারা সীমায়িত হইয়াছে।

৭। সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ—Plural Executive

সুইস্ শাসনতন্ত্রের আর একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনতন্ত্র শাসনব্যবস্থা অন্যান্য দেশের রাজা বা রাষ্ট্রপতির অনুরূপ কোন এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না করিয়া আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত সাতজন সদস্য-সমন্বিত এক মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত করিয়াছে। মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য এক বৎসরের জন্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন ও সভার সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণের অনুরূপ কোন ক্ষমতাই সুইস্ মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির নাই। তাঁহার সহকর্মী অন্যান্য মন্ত্রিগণ অপেক্ষা তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব নাই। এক বৎসর কার্যকাল পূর্ণ হইলে অন্য একজন

মন্ত্রী পুনরায় এক বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন। তবে সভাপতির কিছু আনুষ্ঠানিক কর্তব্য আছে। মন্ত্রিপরিষদের একজন করিয়া সদস্য পর্যায়ক্রমে এক বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইবার ফলে সাতজন সদস্যই সভাপতি হইবার সুযোগ পান। এইরূপে সভাপতি নিয়োগ ব্যাপারেও সুইস্ দেশে গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ কার্যকর করা হইয়াছে।

৮। সম-ক্ষমতা-সমন্বিত দ্বি-কক্ষ---Two Houses of Legislature with Co-ordinate Powers

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ রাজ্যপরিষদ ক্যাণ্টনগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদ জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। সুইজারল্যাণ্ড হইল একমাত্র দেশ যেখানে সর্বপ্রথম সম-ক্ষমতার অধিকারী আইনসভার দুইটি কক্ষ পরিকল্পিত ও কার্যে রূপায়িত হয়। শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্য-বিধান নীতির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করিয়া আইনসভার হস্তে আইন-প্রণয়ন, শাসন, বিচার, শাসনতন্ত্র সংশোধন-সংক্রান্ত সর্ববিধ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু অপরপক্ষে আইনসভার এই ক্ষমতা চূড়ান্ত নহে—ইহা গণভোট অনুমোদন-সাপেক্ষ। এই ব্যবস্থার দ্বারাও সুইস্ দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শ দৃঢ়তর করা হইয়াছে।

৯। উপযুক্ত ক্ষমতাবিহীন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়---A Federal Tribunal without adequate Power

সুইস্ দেশে একটি সুপ্রীম কোর্ট থাকিলেও ক্ষমতা বা মর্যাদার দিক দিয়া এই বিচারালয়কে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় বলা হয় কারণ এই বিচারালয় অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়গুলির মত জাতীয় আইনসভা বা ক্যাণ্টন আইনসভাগুলি কর্তৃক প্রণীত বৈধ আইনগুলিকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না। এই বিচারালয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী নহে। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকার হইল আইনসভা নিজেই। এই বিচারালয় শাসনকর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশও অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না।

১০। সার্থক ও সক্রিয় গণতন্ত্র—Real Democracy in Operation

সুইস্ শাসনতন্ত্রের প্রধান কৃতিত্ব হইল প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকৃত গণশাসন প্রবর্তন। ক্যান্টনগুলিরও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় গণ-ভোট, গণ-নির্দেশাধিকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আইন-প্রণয়ন, কর স্থাপন, শাসনতন্ত্র সংশোধন প্রভৃতি ব্যাপারে এত ব্যাপকভাবে সচরাচর প্রযুক্ত হয় যে, গণতন্ত্র ও সুইজারল্যাণ্ড একার্থবোধক শব্দে পর্যবসিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে সুইস্ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, ব্যক্তিগত মতামত গঠনে ও প্রকাশের ক্ষেত্রে শক্তিশালী কোন রাজনৈতিক দলের বিশেষ কোন প্রভাব নাই। ভোটদাতাগণ নির্ভয়ে তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি সম্মতভাবে ভোটের মাধ্যমে কোন বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপে সুইস্ গণতন্ত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দান করিয়াছে।

সুইস্ ও মার্কিন শাসনতন্ত্রের পার্থক্য—Contrast between the Swiss and the U. S. A. Constitutions

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র মার্কিন শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতিতে বহু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, ক্ষমতা ভাগ হইলেও সুইস্ শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মত সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতা ভাগ করে নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করিতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে বিরোধ ঘটিলে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশই অগ্রাধিকার পায়।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক এক ব্যক্তির (রাষ্ট্রপতির) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সুইস্ দেশে শাসনক্ষমতা একাধিক ব্যক্তি অর্থাৎ সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভোটদাতাগণ কর্তৃক পরোক্ষে নির্বাচিত হন, আর সুইস্ শাসনকর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভার উভয়কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ সিনেট সুইস্ উচ্চকক্ষ রাজ্য-পরিষদ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ও বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন সিনেট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

পঞ্চমতঃ, গণভোট ও গণ-নির্দেশাধিকারের সাহায্যে সুইস্ শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু মার্কিন শাসনতন্ত্র এরূপ সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

ষষ্ঠতঃ, সুইস্ আইনসভা-প্রণীত আইনগুলি গণভোটের অনুমোদন-সাপেক্ষ, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণভোট দ্বারা আইনসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সংকুচিত হয় নাই।

পরিশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা (কংগ্রেস)-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে কিন্তু, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে এইরূপে আইনসভার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় নাই।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Peculiar Features of the Swiss Federalism

অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইতে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, সুইস্ শাসনতন্ত্রে এই শাসনব্যবস্থাকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া সন্ধি-সমবায় (Swiss Confederation) বলা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি ক্ষুদ্র এই দেশটি নানা জাতির, নানা ভাষার ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত হইলেও ইহারা আজ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করিতেছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় এই তিনটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিভাজন হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বিভাগের ন্যায় এখানে কেন্দ্রীয় ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার ভাগ হয় নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ন্যায় সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না। কিন্তু এ সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, নির্বাচকমণ্ডলী গণপ্রস্তাব অধিকার প্রয়োগ করিয়া আইনসভা-প্রণীত আইন বাতিল করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ রাজ্যপরিষদ একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান। এই পরিষদের সদস্যগণ ক্যান্টন সরকারগুলি কর্তৃক রচিত আইনানুসারে নির্বাচিত হইয়া থাকেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে কোন হাত নাই। এইজন্য কোন কোন ক্যান্টন হইতে উচ্চকক্ষের সদস্যগণ সরাসরি গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হন আবার কোথায়ও বা ক্যান্টন আইন-সভা ইঁহাদিগকে নির্বাচন করে।

সদস্যগণের কার্যকালও ক্যান্টনগুলি কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুসারে স্থির হয় বলিয়া একবৎসর হইতে চারবৎসর পর্যন্ত এই কার্যকালের পার্থক্য দেখা যায়। সদস্যগণকে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষের সদস্যগণের ন্যায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বেতন ও ভাতা দেওয়া হয় না। তাঁহারা নিজ নিজ ক্যান্টন সরকার হইতেই তাঁহাদের বেতন পাইয়া থাকেন।

পঞ্চমতঃ, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত না করিয়া একাধিক ব্যক্তির অর্থাৎ একটি মন্ত্রিপরিষদের (Plural Executive) হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন—Distribution of Powers in the Swiss Federal System

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন।

সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সাধারণ ব্যাপারগুলির শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির শাসন রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। আবার কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্ম (concurrent) এই তিন ভাগে ভাগ করা হয় এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারগুলি একযোগে শাসন পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু সকল যুক্তরাষ্ট্রেই প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়।

ক্ষমতা বণ্টন বিষয়ে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। সুইস্ শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সুনির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় নাই, পরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রের সীমা সুনির্দিষ্ট করিয়া ক্যান্টন সরকারগুলির উপর অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ অর্পণ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র অবশ্য ক্যান্টন সরকারগুলির শাসনক্ষমতার উপরও কতিপয় নিষেধ আরোপ করিয়াছে।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় (কেন্দ্রীয়) সরকারের ক্ষমতাগুলি আংশিকভাবে একেবারে স্বকীয় বা অন্যনিরপেক্ষ এবং আংশিকভাবে যুগ্ম অর্থাৎ ক্যান্টন-গুলির সহিত একযোগে প্রযোজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান স্বকীয় ক্ষমতা হইল—পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা, সেনাবাহিনী গঠন করা ও শিক্ষা দেওয়া, আমদানি-রপ্তানি, শুল্ক, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, রেলপথ, মুদ্রা ও ব্যাংক নোট ও জলশক্তির যথাযথ ব্যবহার প্রভৃতি। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, মৎস্যের চাষ ও শিকার, শিল্প, বীমা ও সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলি হইল যুগ্ম তালিকাভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত যুগ্মবিষয়ক আইন ক্যান্টনগুলিতেও প্রযোজ্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতার উপর যে সমস্ত নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল :—(১) কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ ধর্মমত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না বা ধর্মমতের জন্য কাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইবে না অথবা ধর্মমত কাহারও বিবাহক্ষেত্রে বাধা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে না। (২) কোন রাজনৈতিক অপরাধের

অন্য কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দান করিবার ব্যবস্থা-সম্বলিত কোন আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা পাস করিতে পারিবে না।

ক্যান্টন সরকারগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইলেও তিনটি বিশেষ শর্ত তাহাদের মানিয়া চলিতে হয়। প্রথমতঃ, ক্যান্টনগুলিকে প্রজাতন্ত্রী সরকার বজায় রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ক্যান্টনগুলি কর্তৃক রচিত তাহাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র একমাত্র গণভোট পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ক্যান্টনগুলির সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র-বিরোধী কোন বিষয় সন্নিবেশিত থাকিতে পারিবে না। সুতরাং ক্ষমতার ভাগ হইলেও সুইস্ শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির মত অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার ভাগ করে নাই। দেওয়ানী আইন প্রভৃতি এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে উভয় সরকারই সহযোগিতামূলকভাবে কার্য করিতে পারে।

সুইস্ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—**Federal Systems in Switzerland and the U. S. A.**

মার্কিন দেশ যেরূপ আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত, সুইস্ দেশ তদ্রূপ প্রকৃত কার্যকর গণতন্ত্র (Real democracy in operation) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উভয় দেশের শাসনব্যবস্থাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে এবং সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে গঠিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ দুইটি প্রধান বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই একই কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে তেরটি বিভিন্ন স্বাধীন উপনিবেশ ছিল এবং এই উপনিবেশগুলি অনেক পরিমাণে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ স্বার্থে এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে। সুইস্ দেশেও অনুরূপভাবে স্বাধীন ক্যান্টনগুলি কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের স্বাধীন সত্তা পরিহার করিয়া একটি রাষ্ট্র-সমবায় (Confederation) গঠন করে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হইয়াছে, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হইয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যান্টন সরকারগুলি। উভয় যুক্তরাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থায় আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসনতন্ত্র যে উভয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহা নয়, কতকগুলি ব্যাপারে উভয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে উভয় দেশের রাজ্য ও ক্যান্টন সরকারগুলির পক্ষে প্রজাতন্ত্রী সরকার বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

আর একটি বিষয়েও বর্তমানে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় দেশেই আর্থিক সাহায্যদান, রাজনৈতিক দল ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া স্থানীয় সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দৃষ্ট হয়।

উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে উভয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

উভয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির ও ক্যান্টনগুলির যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে স্বাধীন-অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠনে পরবর্তী কাল হইতে সময়ের বিবর্তনে তাহাদের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও জাতিত্ব বিসর্জন দিয়া আজ এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে সুইস্ জাতি এক অখণ্ড জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও সুইস্ দেশে বিভিন্ন জাতির অধিবাসিগণের এখনও পর্যন্ত তাহাদের ভাষাগত বা ধর্মগত বিভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো ও রেড্ ইণ্ডিয়ান ব্যতীত অন্যান্য ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহ দীর্ঘদিন একত্র বসবাস ও একই জীবন-যাপন পদ্ধতির ফলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে এক অবিমিশ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত জার্মান ভাষাভাষী ক্যান্টনের পার্শ্বে ফরাসী ভাষাভাষী ক্যান্টন দেখিতে পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুরূপভাবে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্টনগুলি হইল অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। শাসনতন্ত্র কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে

যে সমুদয় ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, তৎসমুদয়ই ক্যান্টন সরকারগুলির ক্ষমতাভুক্ত। ক্যান্টন সরকারগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য পরিষদে শুধু যে সদস্য নির্বাচন করিতে পারে তাহা নহে, সদস্যগণের নির্বাচন-পদ্ধতি ও কার্যকাল এমনকি সদস্যগণের বেতন পর্যন্তও ক্যান্টন সরকারগুলি স্থির করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সরকারগুলির এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা নাই। ইহা ছাড়া, ক্যান্টনের সরকারী কর্মচারিগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্য হইতে পারেন। এরূপ বিধান অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে নাই।

সুইস্ ক্যান্টনগুলির ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি অপেক্ষা যে আরও অধিক ব্যাপক তাহা শাসনতন্ত্রের ৯নং ধারার বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র বা কোন ক্যান্টনের স্বার্থের প্রতিকূল না হইলে ক্যান্টনগুলি সীমানা সম্পর্কিত বা সরকারী অর্থনৈতিক ব্যাপারে পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে।

আরও একটি বিষয়েও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত বিভাগগুলিই—শাসন, আইন-প্রণয়ন ও বিচার—একই রাজ্য ওয়াশিংটন শহরে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি বিভিন্ন ক্যান্টনে অবস্থিত—বের্ণ শহরে আইনসভার অধিবেশন বসে, আর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কাজ হয় লুজানে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির শাসন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিগণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু সুইস্ দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত বহু বিষয়ের শাসনকার্য ক্যান্টন সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এই বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও কার্যতঃ ক্যান্টন সরকারগুলি এই বিষয়গুলি পরিচালনা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থার ফলে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারীর সংখ্যা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক স্বল্প।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সুইস্ রাষ্ট্রীয় সরকার ক্যান্টনগুলির উপর কোন প্রকার প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করিতে পারে না। প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করিতে না পারিলেও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক্যান্টনগুলিকে বিপুল পরিমাণে বার্ষিক সাহায্য দান করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ভারত

প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য সরকারগুলিও কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এইরূপ আর্থিক সাহায্য পাইলেও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে এই সাহায্যের পরিমাণ অত্যধিক। যুক্তরাষ্ট্রীয় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের শতকরা ৫০ ভাগ আয় সুইস্ দেশে ক্যান্টনগুলিকে সাহায্য দিবার বাবদ ব্যয় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের রক্ষক হিসাবে ইহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির শাসনতন্ত্র নির্ধারিত সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের এ ক্ষমতা নাই। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ক্যান্টন সরকারগুলির ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিলে ইহার কোন বিচার বিভাগীয় প্রতিকার নাই।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উভয় যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য সম্পর্কে তিনটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগ হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপভাবে ক্ষমতার সূক্ষ্ম ভাগ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা সুইস্ কেন্দ্রীয় সরকার ক্যান্টন-গুলির উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা-প্রণীত আইনকে যেরূপভাবে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের সে ক্ষমতা নাই। এই কারণেও সুইস্ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুইস্ নাগরিকতা ও নাগরিক অধিকারসমূহ—Swiss Citizenship and Rights of Citizens

নাগরিকতা—Citizenship

অন্যান্য দেশের নাগরিকতার সহিত সুইস্ নাগরিকতার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সমগ্র ভারতে মাত্র একদফা নাগরিকত্ব দেখা যায় এবং সেই নাগরিকত্ব হইল ভারতীয় নাগরিকত্ব। ভারতীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত ভারতের কোন নাগরিকেরই কোন রাজ্যগত নাগরিকত্ব (State citizenship) নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নাগরিকগণ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়াই যে রাজ্যে বসবাস করে, সেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। মার্কিন শাসন-

তন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব হইল মুখ্য আর রাজ্য নাগরিকত্ব হইল গৌণ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও নাগরিকগণকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সোভিয়েত নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়।

কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে নাগরিকতার ত্রিবিধ তাৎপর্য দেখা যায়। সমগ্র দেশটি ১৯টি ক্যান্টন ও ৬টি অর্ধ-ক্যান্টন অর্থাৎ ২৫টি ভাগে বিভক্ত এবং এই ক্যান্টনগুলি আবার ৩,১১৮টি উপ-বিভাগ অর্থাৎ কমিউন লইয়া গঠিত। সুইস্ নাগরিকতার মূল ভিত্তি হইল এই কমিউনগুলি। কোন ব্যক্তিকে সুইস্ নাগরিক হইতে হইলে প্রথমতঃ তাহাকে কোন কমিউনের নাগরিক অবশ্যই হইতে হইবে। কমিউনের নাগরিক বলিয়াই সে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনের নাগরিক হইতে পারে এবং কোন ক্যান্টনের নাগরিক হইলে সে সুইস্ নাগরিক হইতে পারে। বিপরীতভাবে বলা যায় যে, সুইস্ নাগরিক হইতে গেলে অবশ্যই কোন ক্যান্টনের নাগরিক হইতে হইবে এবং কোন ক্যান্টনের নাগরিক হইতে হইলেই কোন কমিউনের নাগরিক হইতেই হইবে। সুতরাং সুইস্ দেশে জাতীয় নাগরিকতার ভিত্তি হইল স্থানীয় নাগরিকতা। সুইস্ নাগরিকতা রক্ত সম্পর্ক (*Jus Sanguinis*) নীতির অর্থাৎ পিতৃত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এই নাগরিকতা বর্জন করা যায় না বা রাষ্ট্র অতি গুরুতর কারণ ব্যতীত কোন নাগরিককে দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে পারে না।

নাগরিক অধিকারসমূহ—Citizens' Rights

সুইস্ শাসনতন্ত্র বহু তথ্য-সম্বলিত হইলেও এ দেশের শাসনতন্ত্রে কোন নাগরিক অধিকারপত্র (Bill of Rights) নাই। পরিবর্তে শাসনতন্ত্রের নানাস্থানে অধিকারগুলি বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি হইল :—

১। গতিবিধির স্বাধীনতা—Freedom of Movement

যত্রতত্র চলাফেরা করিবার অধিকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে-কোন স্থানে বসবাস করিবার অধিকার প্রত্যেক সুইস্ নাগরিক ভোগ করে। এই অধিকার অবশ্য অবাধ বা শর্তশূন্য নহে। গুরুতর অপরাধের জন্য পুনঃপুনঃ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা স্থায়িভাবে জনসাধারণের দানের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে এই অধিকার

হইতে বঞ্চিত করা যায়। এরূপ ব্যক্তি যে ক্যান্টনের অধিবাসী সে ক্যান্টন এরূপ ব্যক্তিকে কোন মতে বসবাস করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।

২। আইনের চক্ষে সাম্য—Equality before law

আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান বলিয়া স্বীকৃত হয়। শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, সুইস্ দেশে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পদমর্যাদাগত বা জন্মগত কোন বিশেষ সুবিধার অধিকারী কেহই নাই। দৈহিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।

৩। সংবাদপত্রের, সংঘ গঠন করিবার ও আবেদন করিবার অধিকার—Freedom of Press, Association and Petition.

সমগ্র দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা হইয়াছে। তবে জাতীয় সরকার ও ক্যান্টন সরকারগুলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তবে সুইস্ দেশের সংবাদপত্রগুলি বিশেষ দায়িত্বশীল বলিয়া ইহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার অবসর খুব কমই ঘটে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সুইস্ নাগরিকগণ নানাজাতীয় সংঘ গঠন করিতে পারে এবং সভা-সমিতি করিবার উদ্দেশ্যে একত্র সমাবেশে মিলিত হইতে পারে। কিন্তু এই অধিকারগুলি আইনসম্মতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

আবেদন করিবার অধিকার স্বীকৃত হইলেও এ অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। কারণ গণভোট, গণ-নির্দেশাধিকার মাধ্যমেই জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়।

৪। ধর্মীয় স্বাধীনতা—Freedom of Religion

শান্তি ও শালীনতা ভঙ্গ না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ ধর্মমত পোষণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ ধর্মমত পোষণ করিবার

জন্য বাধ্য করা যায় না বা কোন ধর্মমত পোষণ করিবার জন্য শাস্তি দেওয়া যায় না অথবা কোন বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় করিবার জন্য অপর ধর্মমতাবলম্বী ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা যায় না।

৫। ভোটদান ও প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার অধিকার—Right to Vote and Right to be elected

প্রত্যেক কুড়ি অথবা তদূর্ধ বয়স্ক সুইস্ নাগরিক যে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টন আইন কর্তৃক ভোটদানের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই ভোট দান করিতে পারে ও প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ গণভোট, গণ-নির্দেশাধিকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারী।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ —The Federal Executive—The Federal Council

সংগঠন ও কার্যকলাপ—Organisation and Functions

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অন্যান্য দেশের মত একজন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতার ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সদস্যগণ কর্তৃক চারবৎসরের জন্য নির্বাচিত সাতজন মন্ত্রী লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ গঠিত হয়। আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে অথবা আইনসভার সদস্য নন এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিগণ নির্বাচিত হইতে পারেন। চারবৎসরের জন্য নির্বাচিত হইলেও তাঁহাদের পুনর্নির্বাচনে বাধা নাই এবং কার্যতঃ কোন কোন মন্ত্রীকে দীর্ঘ বত্রিশ বৎসরকাল পর্যন্ত একাদিক্রমে মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। নির্ধারিত কার্যকালের মধ্যে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী কোন একটি ক্যান্টন হইতে একাধিক মন্ত্রী নির্বাচিত করা হয় না।

মোট জনসংখ্যার আশী ভাগ জার্মান-ভাষাভাষী হইলেও জার্মান-ভাষাভাষী ক্যান্টনগুলি হইতে পাঁচজন মন্ত্রীর অধিক নির্বাচিত হইতে পারে না। সাধারণতঃ, জার্মান-ভাষাভাষী ক্যান্টনগুলি হইতে চারজন, ফরাসী অধ্যুষিত ক্যান্টনগুলি হইতে দুইজন ও ইতালীয় অঞ্চল হইতে একজন সদস্য লইয়া শাসন-পরিষদ গঠিত হয়। এইরূপে তিনটি বিভিন্ন জাতি ও দুইটি পৃথক ধর্মমত সুষ্ঠুভাবে শাসন-পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ প্রতি বৎসর পরিষদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন রাষ্ট্রপতি ও একজন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। একই ব্যক্তি এক বৎসরের অধিককাল রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। পর বৎসর উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে সাতজন সদস্যের প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে উপ-রাষ্ট্রপতি এ রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি সমগ্র সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President of the Swiss Confederation) বলিয়া পরিচিত হন। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কিন্তু কার্যতঃ অন্যান্য সহকর্মিগণ অপেক্ষা তিনি কোন শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতার অধিকারী নহেন।

শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের প্রধান কর্তব্য হইল, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধকালে দেশের নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখা ইহার একটি বিশেষ দায়িত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। বৈদেশিক নীতি স্থির করা, কতকগুলি উচ্চপদে কর্মচারী নিয়োগ করা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা ইহার কার্যক্রমের অত্যাবশ্যকীয় অংশ বলিয়া গণ্য হয়।

শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ আইন-প্রণয়ন ক্ষমতারও অধিকারী। ভোটদান করিবার অধিকার না থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের মন্ত্রিগণ আইনসভার অধিবেশনে যোগদান করিয়া আইন-প্রণয়ন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহারা নিজস্ব উদ্যোগে অথবা আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন এবং আয়ব্যয়-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উভয় পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের প্রশ্ন করিতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের কিছু বিভাগীয় ক্ষমতাও বর্তমান। শাসন-বিভাগীয় বিচারালয় হিসাবে ইঁহারা কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের বৈশিষ্ট্য—Features of the Swiss Federal Council

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে এই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ শাসন সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের কতিপয় অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। এককেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষের গঠন ও প্রকৃতি-গত এরূপ অভিনবত্ব বিরল। শাসন-পরিষদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্ন-লিখিতরূপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। সমষ্টিগত শাসন কর্তৃপক্ষ—Plural or Collegial Executive

অন্যান্য দেশে একজন রাজা বা রাণী অথবা একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে সমুদয় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। যে সমস্ত দেশে পার্লামেন্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, সে সমস্ত দেশে একাধিক সদস্য লইয়া গঠিত একটি মন্ত্রি-পরিষদের উপর শাসনভার ন্যস্ত থাকিলেও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সুইস্ দেশের শাসনতন্ত্র এইরূপ রাজা, রাণী, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর একক কর্তৃত্ব স্থাপনের পরিবর্তে সাত-জন সদস্য-সমন্বিত একটি পরিষদের হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে। এই সাতজন সদস্যই শাসন পরিচালনা কার্যের সম-অংশীদার ও সম-দায়িত্বভাগী। আধুনিককালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও সাঁইত্রিশজন সদস্য-সমন্বিত প্রেসি-ডিয়াম সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও এই সভার সভাপতির (Chair-man) কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। এতদ্ব্যতীত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এক-দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার ফলে প্রেসিডিয়াম দলীয় সিদ্ধান্তগুলিই বলবৎ করে। সুইস্ দেশের পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত শাসন-পরিষদের সহিত প্রেসিডিয়াম আদৌ তুলনীয় নহে।

২। সদস্যপদের সমতা—Equality of Membership

নির্বাচনপদ্ধতি, বেতন, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও পদমর্যাদার দিক দিয়া দেখিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের সাতজন সদস্যই সম-পর্যায়ভুক্ত—কাহারও কোন রূপ নেতৃত্ব বা অগ্রাধিকার নাই। সাতজন সদস্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের যুগ্ম অধিবেশনে চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রত্যেকেই সম-পরিমাণ বেতন পান—ক্ষমতা ও দায়িত্ব সকলেরই সমান। সত্য বটে, জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ এই সাতজন সদস্যের একজনকে সভাপতি মনোনীত করে এবং যিনি সভাপতি মনোনীত হন, তাঁহাকেই সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বলা হয়। সভাপতির কার্যকাল মাত্র এক বৎসর। এক বৎসর শেষ হইলেই তিনি পুনরায় শাসন-পরিষদের কনিষ্ঠতম সদস্যরূপে পরিচিত হন। মতভেদের ফলে উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে সভাপতি বা রাষ্ট্রপতি একটি অতিরিক্ত ভোট দান করিতে পারেন। রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেও তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ কোন শাসক-প্রধান সুইস্ দেশে নাই। সুইস্ দেশের ক্যান্টনগুলিতে যেরূপ কোন রাজ্যপাল (Governor) নাই, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায়ও তদ্রূপ কোন রাষ্ট্রপতি নাই। জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে সকল সদস্যই এক বৎসরের জন্য উপ-রাষ্ট্রপতি ও এক বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

৩। শাসন কর্তৃপক্ষ আইনসভার অধীন—Subordination of the Executive to the Legislature

সুইস্ শাসতন্ত্র অনুসারে শাসন কর্তৃপক্ষ আইনসভা-নিরপেক্ষ বা আইন-সভার সমকক্ষ নহে। বস্তুতঃ শাসন কর্তৃপক্ষ একান্তভাবেই আইনসভার অধীন। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতিসহ শাসন-পরিষদের সমুদয় সদস্যই আইন-সভা কর্তৃক মনোনীত হন এবং আইনসভার কার্যকাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শাসন-পরিষদের কার্যকালেরও অবসান ঘটে। আইনসভা নিরপেক্ষভাবে ইহার কোন ক্ষমতা নাই। আইনসভা সচরাচর প্রস্তাব পাস করিয়া শাসন-পরিষদকে নির্দেশ দান করে। শাসন-পরিষদকে আইনসভার নিকট বাৎসরিক বিবরণী (Annual Report) পেশ করিতে হয়। শাসন-

পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য না হইলেও আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন। শাসন-পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত বা অনুসৃত নীতি যদি আইনসভা কর্তৃক অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলে তাঁহারা পদত্যাগ না করিয়া আইনসভার ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের নীতি পরিবর্তন করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করেন।

৪। দীর্ঘ-মেয়াদী কার্যকাল—Long-term Tenure

উপরি-উক্ত কারণে সুইস্ শাসন-পরিষদ দীর্ঘদিন ব্যাপী স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে। কার্যতঃ পরিষদ সদস্যগণ একরূপ স্থায়ী শাসকগোষ্ঠী। যদিও প্রতি চার বৎসর অন্তে আইনসভার নূতন নির্বাচনের সঙ্গে নূতন পরিষদ গঠিত হয়, তথাপি পরিষদ সদস্যগণের বিশেষ কোন রদ-বদল হয় না। পূর্বতন অভিজ্ঞ সদস্যগণ যতদিন পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারাই শাসন-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এইরূপে কোন কোন সদস্য দীর্ঘ ৩০।৩৫ বৎসর পর্যন্ত শাসন-পরিষদের সদস্য হিসাবে কাজ করিয়াছেন। ইহার কারণ হইল যে, সুইস্ শাসন-পরিষদ কোন দলীয় বা নেতৃত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয় না। ভদ্রতা ও শাসনকার্যে দক্ষতা ও যোগ্যতাই হইল শাসন-পরিষদে নিয়োগের মানদণ্ড। সুইস্ শাসন কর্তৃপক্ষ দক্ষতার সহিত ইহার কর্তব্য সম্পাদন করে বলিয়া সুইস্ দেশে শাসন কর্তৃপক্ষের সচরাচর পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

৫। দল-নিরপেক্ষ—Non-Partisan

সুইস্ শাসন-পরিষদের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দল-নিরপেক্ষ প্রকৃতি। শাসন-পরিষদের সদস্যগণ কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য দেশের মন্ত্রি-পরিষদ সদস্যগণের অনুরূপ দলীয় ভিত্তিতে অর্থাৎ সংখ্যাগুরু বা সরকার গঠনকারী একাধিক দলের কোন সদস্য বলিয়া নির্বাচিত হন না। অপরপক্ষে কোন দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়াও তাঁহারা নির্বাচিত হন না। সদস্যগণ কোন দল কর্তৃক মনোনীত হন না বা তাঁহাদের দলীয় নীতি নির্ধারণ করিতে হয় না বা দলীয় নীতি কার্যে রূপায়িত করিবার প্রয়োজন হয় না। সদস্যগণ বিভিন্ন রাজ-

নৈতিক দল হইতে তাঁহাদের গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আইনসভা কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। বাক্-পটুতা, নেতৃত্বের ক্ষমতা, চাতুর্য, রাজনৈতিক কৌশলে দক্ষতা প্রভৃতি মন্ত্রি-পরিষদে সদস্য হইবার যোগ্যতা বলিয়া অন্যান্য দেশে বিবেচিত হইলেও সুইস্ শাসনব্যবস্থায় কর্তব্য-নিষ্ঠা ও সেবার মনোভাবই হইল শাসন-পরিষদে সদস্য মনোনয়নের প্রকৃত মানদণ্ড। সুতরাং সুইস্ শাসন-পরিষদের এই দল-নিরপেক্ষ প্রকৃতি এবং সেবার মনোভাবই এই পরিষদের দীর্ঘ স্থায়িত্বের প্রধান কারণ। জনগণই যে দেশের সার্বভৌমিকতার অধিকারী এবং জনগণের ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে এ সম্পর্কে সুইস্ শাসন কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন।

৬। পার্লামেন্ট-প্রধান বা রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা নহে—Neither Parliamentary Nor Presidential Form

কোন কোন বিষয়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থার সহিত সুইস্ শাসন-পরিষদের কয়েকটি আপাত সাদৃশ্য থাকিলেও এই শাসনব্যবস্থাকে পার্লামেন্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা বলা যায় না। উভয় দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের সাদৃশ্য হইল যে, উভয় ক্ষেত্রেই মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন, তাঁহারা আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন, এবং আইনসভার সদস্যগণ প্রশ্ন করিলে তাঁহাদিগকে উত্তর দান করিতে হয়। কিন্তু সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিক। সুইস্ শাসন-পরিষদের সদস্যগণ কোন দলীয় বা নেতৃত্বের ভিত্তিতে মনোনীত হন না। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ কোন নেতা নাই বা আইনসভা কর্তৃক তাঁহাদের নির্ধারিত নীতি বা কার্যক্রম অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হয় না। আইনসভার ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইঁহারা ইঁহাদের নীতি বা কার্যক্রমের পরিবর্তন সাধন করিয়া দীর্ঘদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন।

অপরপক্ষে মার্কিন শাসনব্যবস্থার অনুরূপভাবে সুইস্ শাসন-পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না এবং তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। কিন্তু মার্কিন শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত ইহার প্রধান বৈসাদৃশ্য হইল যে, সুইস্ শাসন-পরিষদে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির অনুরূপ কোন একক নেতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সদস্যগণ মার্কিন রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী মাত্র আর সুইস্ দেশে শাসন-পরিষদের সদস্যগণ সকলেই সমান ক্ষমতার অধিকারী। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে সুইস্ শাসনব্যবস্থা আদর্শস্থানীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ বৃটিশ ও মার্কিন শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পরিহার করিয়া সুইস্ শাসনব্যবস্থা এই উভয় ব্যবস্থার সমুদয় গুণের অধিকারী হইয়াছে। এই যুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সুইস্ শাসনব্যবস্থায় বৃটিশ শাসনব্যবস্থার দায়িত্বশীলতার সহিত মার্কিন শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্বের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের কার্য—Functions of the Federal Council

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের উপর শাসনতন্ত্র কর্তৃক ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। শাসন-পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করে।

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনা করে।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক, সাধারণ ও বিশেষ আইনগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিগুলি যথাযথভাবে বলবৎ করা।

৩। ক্যান্টনগুলির সহিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ক্যান্টনগুলি যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং ক্যান্টনগুলি যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনগুলি যথাযথভাবে বলবৎ করে সেজন্য প্রয়োজনক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

৪। শাসন-পরিষদ সু-শাসন উদ্দেশ্যে নূতন আইনের প্রস্তাব জাতীয় সভার বিবেচনার্থ প্রেরণ করিতে পারে এবং জাতীয় সভাও বিশেষ আইন-প্রণয়নের জন্য শাসন-পরিষদকে অনুরোধ করিতে পারে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত বিশেষ নিয়োগগুলি ব্যতীত অন্য সমুদয় নিয়োগগুলি শাসন-পরিষদ করিয়া থাকে।

৬। ক্যান্টনগুলির মধ্যে সম্পাদিত পারস্পরিক চুক্তি বা পররাষ্ট্রের সহিত ক্যান্টনগুলির চুক্তি শাসন-পরিষদ পরীক্ষা করে এবং এই চুক্তিগুলি কার্যকরী হইতে গেলে শাসন-পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন। যদি কোন চুক্তি

শাসন-পরিষদ বে-আইনী বা শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া মনে করে তাহা হইলে শাসন-পরিষদ জাতীয় সভাকে এই চুক্তি বাতিল করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারে।

৭। শাসন-পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক স্থির করে এবং বহিরাক্রমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করে। দেশের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা ইহার প্রধান দায়িত্ব।

৮। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং জরুরী অবস্থায় এই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীও নিযুক্ত করিতে পারে।

৯। যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করা এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় সভায় পেশ করা।

১০। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশগুলি বলবৎ করাও ইহার কার্য।

১১। যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনী এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় বিভাগগুলির পরিচালনার ভার ইহার উপর ন্যস্ত।

১২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সকল শ্রেণীর কর্মচারীর আচরণ-বিধি নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার একটি কর্তব্য।

১৩। আইনসভার প্রত্যেক সাধারণ অধিবেশনে শাসন-পরিষদকে দেশের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিষয়ে নিজেদের সুপারিশসহ একটি বিবরণী পেশ করিতে হয়। আইনসভার নির্দেশ অনুযায়ী অনেক সময় এইরূপ বিশেষ বিবরণীও আইনসভায় উপস্থাপিত করিতে হয়।

১৪। এতদ্ব্যতীত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের কিছু বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা আছে। শাসন-পরিষদ বিভিন্ন শাসন বিভাগের ও রেলপথ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিচার করে। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে ক্যান্টন সরকারগুলির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির আপীল বিচার করিতে পারে।

সুইস্ রাষ্ট্রপতি—The President of the Swiss Confederation

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সহিত সুইস্ রাষ্ট্রপতির তুলনা করা চলে না। সুইস্ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, পদমর্যাদা বা প্রতিপত্তি

উপরি-উক্ত রাষ্ট্রপ্রধানদ্বয়ের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি অপেক্ষা বহুপরিমাণে কম।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সাতজন সদস্যের অন্যতম। অন্যান্য সদস্যগণ যে পদ্ধতিতে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত, রাষ্ট্রপতিও তদনুরূপভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আইনসভা তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ব্যতীতও এক বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি বলিয়া মনোনীত করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে এক বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি ও অপর একজনকে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। একবৎসর কার্যকাল শেষ হইলেই উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিপদে উন্নীত হন এবং রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কনিষ্ঠতম সদস্যরূপে কাজ করেন। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সাতজন সদস্যই পর্যায়ক্রমে উপ রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতিপদে নিযুক্ত হইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি দীর্ঘকাল ধরিয়া শাসন-পরিষদের সদস্য থাকিলেও কেহই পরপর দুই বৎসর স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। অবশ্য ভূতপূর্ব উপ-রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতি পালাক্রমে ছয় বৎসর পরে পুনরায় উপ-রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতিপদে মনোনীত হইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি হিসাবে বা সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন ও তাঁহার বিশেষ কোন দায়িত্বও নাই। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণকে নিয়োগ করেন না,—অন্যান্য সদস্যগণের মতই তিনি আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের কোন সভায় মতবিরোধের ফলে উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি একটি অতিরিক্ত ভোট দিতে পারেন। অন্যান্য সদস্যের ন্যায় তিনি একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি তাঁহার অন্যান্য সহ-কর্মিগণের সম-পরিমাণ বেতন পান এবং তাঁহার এক বৎসর কার্যকালে সরকারী কার্যের জন্য যে ব্যয় হয় তজ্জন্য অতিরিক্ত ভাতা পান। তাঁহাকে কোন রাজকীয় প্রাসাদ বা সরকারী গাড়ী দেওয়া হয় না।

রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে তিনিই সভাপতিত্ব করেন এবং বিদেশী রাজদূত ও পদস্থ ব্যক্তিগণকে তিনিই আহ্বান করেন। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং তাঁহার সহকর্মিগণ প্রধানত—

ভাবে তাঁহার অগ্রাধিকার ও নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও সুইস্ রাষ্ট্রপতিকে কোনদিক দিয়াই শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় বলা যায় না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন সংগঠন আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতির হস্তে সীমিত আপৎকালীন ক্ষমতা ও তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে।

বৃটিশ কেবিনেট ও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পার্থক্য —Contrast between the British Cabinet and the Swiss Federal Council

সাতজন সদস্য-সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council) হইল সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ বা কেবিনেট। এই পরিষদের গঠন, প্রকৃতি ও ক্ষমতায় বৃটিশ ও মার্কিন কেবিনেটের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ইহা এই উভয় দেশের কেবিনেট হইতে পৃথক। বৃটিশ কেবিনেটের সহিত ইহার নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায়।

প্রথমতঃ, গ্রেট বৃটেনে কেবিনেটের সকল সদস্যগণকেই আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেন্টের সদস্য হইতেই হইবে, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য থাকিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনে সাধারণতঃ যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে, সেই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেবিনেট গঠন করেন। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ দল-নির্বিচারে তাঁহাদের গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই পরিষদের বৈশিষ্ট্য হইল দল-নিরপেক্ষতা।

তৃতীয়তঃ, বৃটেনে কেবিনেট সদস্যগণ দলের নেতা হিসাবে পার্লামেন্টে নেতৃত্ব করেন এবং দলীয় নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ দলীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হন না। আইনসভা-নির্ধারিত নীতিই তাঁহারা কার্যে রূপায়িত করেন।

চতুর্থতঃ, বৃটেনে একদলীয় শাসনব্যবস্থা থাকার ফলে কেবিনেট কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ লইয়া গঠিত হয় এবং সর্বদা কমন্সসভার সমর্থন পায়। এই কারণে বৃটিশ কেবিনেট শুধু শাসনক্ষমতার অধিকারী নহে—আইন-প্রণয়নেও ইহা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ শুধু শাসনক্ষমতার অধিকারী, আইন-প্রণয়নে এই পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উপর একান্ত নির্ভরশীল।

পঞ্চমতঃ, এক জরুরী অবস্থা বা যুদ্ধকাল ব্যতীত বৃটিশ কেবিনেট একটি-মাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয়, অপর পক্ষে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ বিভিন্ন দলের সদস্যগণ লইয়া গঠিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, একই নীতির সমর্থক একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া বৃটিশ কেবিনেট গঠিত হয়। মতানৈক্য ঘটিলেও কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন না। কেবিনেটে সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানিয়াই চলিতে হয়। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ এই বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন। তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী একযোগে কাজ করিয়া গেলেও পরিষদের যে-কোন সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে আইনসভায় বক্তৃতা করিতে পারেন এবং কার্যতঃ করিয়াও থাকেন।

সপ্তমতঃ, বৃটেনে কেবিনেটের ঐক্য ও সংহতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রক্ষিত হয়। তিনিই কেবিনেটের স্থায়ী সভাপতি এবং তিনি বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রিগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া যায়। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় এরূপ কোন সর্বাধিনায়ক নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হয় এবং ইহার কার্যকালও আইন দ্বারা নির্ধারিত।

মার্কিন কেবিনেট ও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পার্থক্য —Contrast between the U. S. A. Cabinet and the Swiss Federal Council

প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতার অধিকারী হইলেন এক ব্যক্তি। ভোটদাতৃগণ কর্তৃক চার বৎসরের জন্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে সমুদয় শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি স্বয়ংই কয়েকজন সচিব নিযুক্ত করেন। এই সচিব-গণ সর্বতোভাবে রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী এবং এককভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যের জন্য

আইনসভা বা অন্য কাহারও নিকট দায়ী নহেন। সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ক্ষমতা একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি শাসন-পরিষদের উপর ন্যস্ত। সাতজন সম-ক্ষমতা সম্পন্ন সদস্য লইয়া গঠিত এই শাসন-পরিষদ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি থাকিলেও এই রাষ্ট্রপতির পরিষদীয় অন্যান্য সদস্যগণ অপেক্ষা বিশেষ কোন ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি নাই। অন্যান্য সদস্যের ন্যায় তিনিও একটি বিভাগের প্রধান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি দেশে ও বিদেশে যে সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারী সুইস্ রাষ্ট্রপতি সেরূপ কোন পদমর্যাদার অধিকারী নহেন।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক নিয়োগ-ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। তিনি দেশের শাসন বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক ও যুদ্ধকালে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনা করিতে পারেন। কিন্তু সুইস্ রাষ্ট্রপতি শুধু নিজের বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারেন। আপৎকালে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ সৈন্যদল গঠন করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইনসভা-প্রণীত আইন সাময়িকভাবে বাতিল করিতে পারেন ও পরোক্ষভাবে আইন-প্রণয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। সুইস্ রাষ্ট্রপতির এরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগের ফলে রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার সচিববৃন্দ আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আইনসভার বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন না। অপরপক্ষে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য না হইলেও আইনসভার উভয় কক্ষে উপস্থিত থাকিয়া শাসন-সংক্রান্ত বিতর্কের উত্তর দিতে হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, সুইস্ শাসনব্যবস্থা বৃটিশ ও মার্কিন শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিয়া গঠিত হইয়াছে।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগসমূহ—Departments of the Swiss Federal Council

সাতজন সদস্য লইয়া সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত। প্রত্যেক সদস্যই এক একটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। বিভাগগুলি হইল : ১। রাজনৈতিক বিভাগ

(Political Department), ২। অর্থ ও শুল্ক বিভাগ (Finance and Custom), ৩। আভ্যন্তরীণ বিভাগ (Interior), ৪। বিচার ও পুলিশ বিভাগ (Justice and Police), ৫। প্রতিরক্ষা বিভাগ (Military Affairs), ৬। জাতীয় অর্থনৈতিক বিভাগ (Public Economy) ও ৭। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ (Posts and Telegraph)।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা

The Federal Legislature—the Federal Assembly

যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত, যথা—রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়পরিষদ।

রাজ্যপরিষদ—The Council of States

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার অনুরূপভাবে সুইজারল্যাণ্ডের উচ্চ পরিষদ গঠিত হইয়াছে। উনিশটি বড় ক্যাণ্টনের প্রত্যেকটি হইতে দুইজন ও ছয়টি অর্ধক্যাণ্টন হইতে একজন করিয়া—মোট চুয়াল্লিশ জন সদস্য লইয়া রাজ্যপরিষদ গঠিত। সদস্যগণের নির্বাচন-পদ্ধতি ও কার্যকাল ক্যাণ্টনগুলি কর্তৃক পৃথগ্‌ভাবে নির্ধারিত হয়। কোন কোন ক্যাণ্টনে সদস্যগণ ক্যাণ্টন আইনপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন, আবার কোথায়ও বা গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হন। এক বৎসর হইতে চার বৎসর পর্যন্ত তাঁহাদের কার্যকাল নির্ধারিত হইতে পারে। সদস্যগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ ক্যাণ্টন সরকারগুলি বহন করে। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার অনুরূপ কোন বিশেষ ক্ষমতা সুইস্ রাজ্যপরিষদের নাই। আইনতঃ, নিম্ন পরিষদের সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ, রাজ্যপরিষদের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম।

জাতীয়পরিষদ—The National Council

বর্তমানে সুইস্ জাতীয়পরিষদ একশত ছিয়ানব্বুই জন সদস্য লইয়া গঠিত। সমানুপাতিক ভোটপদ্ধতির ভিত্তিতে জাতীয়পরিষদের সদস্যগণ

জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতি চব্বিশ হাজার জন লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রতি কুড়ি বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ নাগরিক ভোটদান করিতে পারে। ক্যান্টন যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, প্রত্যেকটি ক্যান্টন হইতে অন্ততঃপক্ষে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেই। ক্যান্টন হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ক্যান্টনের সমগ্র জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। প্রতিনিধিগণ চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

রাজ্যপরিষদের মতই জাতীয়পরিষদ সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি জাতীয়পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন। সুইস্ আইনসভার পক্ষে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহূত হইবার প্রয়োজন হয় না। শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট দিনে ইহার অধিবেশন বসে। ইহা ছাড়া, অতিরিক্ত অধিবেশনের জন্য জাতীয়পরিষদের এক-চতুর্থাংশ সদস্যের অথবা পাঁচটি ক্যান্টনের অনুরোধের আবশ্যক হয়।

দুইটি পরিষদ সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্যতঃ নিম্ন পরিষদ অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ও সন্ধিচুক্তি অনুমোদন করা আইনসভার প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধঘোষণা অথবা শান্তিস্থাপন করিতে হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

সাধারণতঃ, উভয় পরিষদ পৃথগ্‌ভাবে অধিবেশন পরিচালনা করে, কিন্তু নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করিবার কালে উভয়ের যুক্ত অধিবেশনের প্রয়োজন হয়: ১। রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি, প্রতিরক্ষা-বিভাগের সেনাপতি প্রভৃতির নিয়োগ ব্যাপারে; ২। আইন সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানকল্পে; ৩। দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করিবার উদ্দেশ্যে। সুইজারল্যাণ্ডে কমিটি-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই।

সুইস্ আইনসভা রাষ্ট্রীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হইলেও দুই প্রকারে ইহার ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছে বলা যায়। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদকে ইহা ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জনগণের প্রত্যক্ষ-ভাবে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দ্বারা আইনসভার সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ

হইয়াছে। গণভোট, গণপ্রস্তাব প্রভৃতি অধিকার দ্বারা আইনসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতা ও কার্য—Powers and Functions of the Federal Legislature

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। শাসনতন্ত্র কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে যে সমুদয় ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, সে সম্পর্কে আইনসভা আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। প্রধানতঃ, আইন-প্রণয়নের অধিকর্তা হইলেও এই সভার শাসন-সংক্রান্ত, বিচার-বিষয়ক ও শাসনতন্ত্র-সংশোধন সম্পর্কিত ক্ষমতারও অধিকারী।

১। আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা—Legislative Power

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—জাতীয়পরিষদ ও রাজ্যপরিষদ—যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন ও নির্দেশ জারী করিতে পারে। এই সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্বাচন ও সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র যাহাতে যথাযথভাবে সক্রিয় থাকে এবং ক্যান্টনগুলির শাসনতন্ত্রের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করিবার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-রক্ষা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করে। ক্যান্টনগুলির সীমানা ও স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও নির্দেশ রচনা করিতে পারে। এই সভা বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন ও মঞ্জুর করে এবং ঋণদান অনুমোদন করে।

সুইস্ শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে আইনসভা-প্রণীত সকল আইন এবং আইনসভা কর্তৃক গৃহীত সকল প্রস্তাবই গণভোটের অনুমোদনসাপেক্ষ যদি তিরিশ হাজার ভোটদাতা অথবা আটটি ক্যান্টন আইন বা প্রস্তাব পাস হইবার নব্বই দিনের মধ্যে গণ-অনুমোদনের দাবী করে। গণভোট দ্বারা অনুমোদিত না হইলে প্রস্তাবটি পাস হইবার এক বৎসর পর প্রস্তাবটি অকার্যকর হয়।

২। শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Executive Powers

জাতীয় পরিষদ ও রাজ্য পরিষদ—উভয় কক্ষ যুগ্ম অধিবেশনে শাসন-পরিষদের সাতজন সদস্য, ইহার সভাপতি, সহ-সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণ ও সামরিক বাহিনীর সেনাপতিকে নিয়োগ করে। এই সভা স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের কার্যের তদারক করে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারিবৃন্দের ক্ষমতা-সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করে। কর্মচারিগণের বেতন ও তাহার পরিমাণও এই সভা কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এই সভার হস্তে ন্যস্ত। এই সভা যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনা ও চুক্তি অনুমোদন করিতে পারে। এই সভার নিকট উপস্থাপিত হইলে ক্যান্টনগুলি কর্তৃক সম্পাদিত সকল প্রকার চুক্তিই এই সভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

৩। বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা—Judicial Powers

এই সভা ইহার যুক্ত অধিবেশনে দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে পৃথক অধিবেশনে ক্ষমা প্রদর্শন করে। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ হইতে আনীত শাসন বিভাগ সম্পর্কিত বিরোধগুলির আপীল বিচার করে।

৪। শাসনতন্ত্র সংশোধন-সম্পর্কিত ক্ষমতা—Constitution Amending Powers

অন্যান্য দেশের আইনসভার ন্যায় সুইস্ আইনসভাও শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার অধিকার থাকিলেও চূড়ান্ত অধিকারী নহে। উভয় কক্ষের অনুমোদনে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু উভয় কক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাব গণভোট দ্বারা অনুমোদনসাপেক্ষ।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই শাসনব্যবস্থায়ও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতি প্রযুক্ত হয় নাই। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতার তালিকা দেখিলে মনে হয় যে, এই সভা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। এই সভার সাধারণ আইন-প্রণয়ন ও শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা অবাধ বলিয়া মনে হয়। কারণ অন্যান্য দেশের অনুরূপভাবে সুইস্ রাষ্ট্রপতি এই সভা-প্রণীত আইন নাকচ

করিতে পারেন না বা কোন সুইস্ বিচারালয় এই সভা-প্রণীত আইন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে, সুইস্ আইনসভার ক্ষমতা অন্য উপায়ে বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়াছে। গণ-নির্দেশাধিকার, গণ-প্রস্তাব অধিকার ও কতিপয় ক্ষেত্রে ক্যান্টনগুলির অধিকার দ্বারা এই সভার আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উদ্যোগ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে ইহার দায়িত্বশীলতাও হ্রাস পাইয়াছে। এই কারণে আইনের প্রস্তাব প্রণয়ন ও আইনসভায় ইহার পরিচালনার ভার শাসন-পরিষদের সদস্যগণের উপর ন্যস্ত করিয়া এই সভা ভারমুক্ত হইয়াছে এবং আইন-প্রণয়নের দায়িত্ব পরিহার করিয়াছে।

সুইস্ শাসনবিভাগের সহিত আইনসভার সম্পর্ক—Relation between the Swiss Executive and the Legislature

সুইস্ শাসনকর্তৃপক্ষ বৃটিশ ও মার্কিন শাসনকর্তৃপক্ষ—এই উভয়ের আদর্শে গঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে সুইস্ শাসনব্যবস্থা এই উভয় শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পরিহার করিয়া গুণগুলির সার্থক উত্তরাধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছে। বৃটেনে 'কেবিনেট' বলিতে যাহা বুঝায়, সঠিকভাবে বলিতে গেলে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ' বলিতে তাহা বুঝায় না। বৃটেনের মন্ত্রিসভার মত সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের আইনসভার নিকট কোন যৌথ দায়িত্ব নাই। আইনসভা কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ-নির্ধারিত নীতি সমর্থিত না হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের পদত্যাগ করিতে হয় না বা তাহাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। যখনই আইনসভা ইহার নীতি সমর্থন করে না তখনই পরিষদ আইনসভার ইচ্ছানুযায়ী ইহার নীতি পরিবর্তন করিয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকে। বৃটিশ কেবিনেটের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, একই নীতির সমর্থক একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া কেবিনেট গঠিত (Political homogeneity)। মতানৈক্য ঘটিলেও কেবিনেট সদস্যগণ তাঁহাদের বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন না। অপরপক্ষে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত এবং আইনসভায় তাঁহারা তাঁহাদের বক্তৃতা ও ভোট দ্বারা পরস্পরের বিরোধিতা করিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য-

গণ চার বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে নির্বাচিত হন এবং পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। সাধারণতঃ আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে শাসন-পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হইলেও আইন-সভার সদস্য-বহির্ভূত ব্যক্তিও নির্বাচিত হইতে পারেন। শাসন-পরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন, আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দান করিতে পারেন না। আইনসভা শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে প্রশ্ন করিতে পারে, কিন্তু পদচ্যুত করিতে পারে না। আইনসভা শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে পদ-চ্যুত করিতে পারে না এবং শাসন-পরিষদের সদস্যগণ পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন—এই দুইটি কারণে সুইস্ শাসন-পরিষদের স্থায়িত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসন-পরিষদও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়—The Swiss Federal Tribunal

সংগঠন (**Composition**)—যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সুইস্ শাসনতন্ত্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিচারালয় ২৬ হইতে ২৮ জন বিচারপতি ও ১১ হইতে ১৩ জন অতিরিক্ত (Supplementary) বিচারপতি লইয়া গঠিত। বিচারপতিগণ সকলেই ছয় বৎসরের জন্য জাতীয় সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। বিচারপতিগণের মধ্য হইতে দুই বৎসরের জন্য একজনকে সভাপতি (President) ও অপর একজনকে সহ-সভাপতি (Vice-President) নির্বাচিত করা হয় এবং ইঁহারা কেহই পর পর একাধিকবার সভাপতি বা সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারেন না। জাতীয় সভায় নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে-কোন সুইস্ নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচিত হইতে পারেন। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুসারে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণের কোন আইনগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কার্যতঃ, উচ্চমানের আইনগত যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণই বিচারপতি পদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বিচারপতিগণ যতদিন পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছুক হন ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদিগকে পুনর্নির্বাচন করা হয়।

সাধারণতঃ বিচারপতিগণ সত্তর বৎসর হইলেই অবসর গ্রহণ করেন। স্বল্প-মেয়াদী নির্বাচন হইলেও কার্যতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী নিয়োগের ফলে বিচারপতি-গণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

বিচারপতিগণকে এরূপভাবে নির্বাচন করা হয় যাহাতে জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী এই তিনটি ভাষা-ভাষীর প্রতিনিধি লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়টি গঠিত হয়। বের্ণ শহর সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হইলেও ফরাসী ভাষা-ভাষী ভড্ ক্যানটনের লুজানে শহরে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে অধিবেশন চলে। ফরাসী ভাষা-ভাষীগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার এবং বের্ণ শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রভাব-মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যেই লুজানে শহরে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের অধিবেশনের স্থান নির্ধারিত করা হইয়াছে। বিচারকার্য পরিচালনা করিবার জন্য এই বিচারালয়কে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ফৌজদারী মামলার বিচারকার্য জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়।

ক্ষমতা ও উপযোগিতা—Powers and Usefulness

এই বিচারালয়ের (১) দেওয়ানী, (২) ফৌজদারী, (৩) শাসনতান্ত্রিক ও (৪) শাসনবিভাগীয় বিরোধ সম্পর্কে আদিম ও আপীল ক্ষমতা আছে।

১। এই বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী ক্ষমতা বহু-বিস্তৃত। এই ক্ষমতার বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যান্টনগুলির মধ্যে, বিভিন্ন ক্যান্টন-গুলির মধ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্র বা ক্যান্টনগুলির সহিত নাগরিকগণের বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে পারে।

২। এই বিচারালয় ইহার আদিম ফৌজদারী ক্ষমতার বলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্রোহ, মুদ্রা-জাল, আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের বিচার করিতে পারে।

৩। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার বলে এই বিচারালয় যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যান্টন-গুলির অধিকার-সম্পর্কিত বিরোধ, ক্যান্টনগুলির মধ্যে সাধারণ সম্পর্কিত আইনের বিরোধ এবং ক্যান্টন কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা ক্যান্টন শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ব্যক্তিগত অধিকার ভঙ্গ সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করিতে পারে।

৪। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিচারালয়কে শাসন-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতার বলে এই

বিচারালয় সরকারী কর্মচারিগণের কার্যের বৈধতা বিচার করিতে পারে। সুতরাং এই বিচারালয় শাসন-সংক্রান্ত বিচারালয় হিসাবে শাসন-সংক্রান্ত আইনও বলবৎ করিতে পারে।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ও মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট—The Swiss Federal Tribunal and the U. S. A. Supreme Court

প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকার ও শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে একটি করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় থাকিলেও এই উভয় দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের গঠন-প্রকৃতি ও ক্ষমতার পরিধিতে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণের সংখ্যাধিক্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিয়মিত বিচারপতি ও অতিরিক্ত বিচারপতির সংখ্যাধিক্য মার্কিন, ভারত বা সোভিয়েত দেশের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সংখ্যা অপেক্ষা বহু অধিক।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ আইনগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আজীবন বিচারপতিপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু সুইস্ দেশে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। বিচারপতি নিযুক্ত হইলে নীতিগতভাবে অন্যান্য দেশের বিচারপতিগণের ন্যায় তাঁহাদের আইন-বিশারদ না হইলেও চলে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এই শেষোক্ত বিধিটি বিচারপতি নিয়োগে প্রযোজ্য নহে।

তৃতীয়তঃ, ভারত, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ বহু জাতি দ্বারা অধ্যুষিত হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সংগঠনে এরূপ কোন বিধান নাই যে, সকল জাতির প্রতিনিধি লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় গঠিত হইবে। কিন্তু সুইস্ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সংগঠনে প্রধান তিনটি জাতির অর্থাৎ জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী প্রতিনিধি থাকিবেই।

চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চতম বিচারালয় হইলেও সার্কিট কোর্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট নামে আরও দুই শ্রেণীর নিম্নতর যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় আছে। এই বিচারালয়গুলি হইতে আনীত বিরোধগুলির আপীল সুপ্রীম কোর্টের বিচার্য বিষয়ভুক্ত। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় একমাত্র বিচারালয় হইল সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়। এ সম্পর্কে নিম্নতর কোন বিচারালয় নাই।

পঞ্চমতঃ, ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপ আদিম ও আপীল ক্ষমতার অধিকারী এবং এই ক্ষমতার বলে ফৌজদারী, দেওয়ানী ও শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় একটি অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী। এই বিচারালয় শাসন-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করিতে পারে। মার্কিন বা ভারতের সুপ্রীম কোর্টের এ ক্ষমতা নাই।

ষষ্ঠতঃ, অপর একটি বিষয়ে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট ও ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কংগ্রেস প্রণীত আইন বা শাসন-বিভাগীয় নির্দেশ এবং রাজ্য আইসভা-প্রণীত আইন শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া অসিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টও শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বা মৌলিক অধিকার-বিরোধী বলিয়া কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন অসিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ক্যান্টন সরকার প্রণীত আইন বাতিল করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রণীত কোন আইন বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিবার ক্ষমতার অধিকারী নহে। সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে না।

সপ্তমতঃ, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপ ইহার সিদ্ধান্তগুলিকে বলবৎ করিবার নিজস্ব সংগঠন বা কর্মচারী নাই। এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদের মাধ্যমে ক্যান্টন সরকারগুলির সাহায্যে বলবৎ করা হয়।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের এই আপেক্ষিক দুর্বলতার কারণ হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা একমাত্র গণভোট দ্বারা (Popular Referendum) স্থিরীকৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টকে অত্যধিক ক্ষমতাশালী করিয়া আইনসভার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভাকে শক্তিশালী রাখা হইয়াছে এবং এই শক্তিশালী আইনসভার কার্যও গণভোট, গণ-প্রস্তাব অধিকার ও প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রভৃতি নিয়মতান্ত্রিক কার্যকরী পদ্ধতির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। আইন-প্রণয়ন কার্য বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হইবে, না প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হইবে এ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুইস্ দেশে সুইস্ বিচারব্যবস্থা জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

স্থানীয় শাসন—Local Government

প্রত্যেকটি ক্যাণ্টনে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি মহাসভা (Grand Council) আছে। এই সভাই ক্যাণ্টনের আইন-প্রণয়নের অধিকর্তা। তবে মহাসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা গণভোট, গণ-প্রস্তাব অধিকার দ্বারা বহুলাংশে সংকুচিত হইয়াছে। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচ হইতে সাতজন প্রতিনিধি লইয়া প্রত্যেক ক্যাণ্টনের শাসন-পরিষদ (Administrative Council) গঠিত। আপেন্‌জেল, ইউরি, গ্লারাস্ ও আন্‌তার ওয়াল্‌ডেন্ নামক চারিটি ক্ষুদ্র ক্যাণ্টনে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্তমান আছে। সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক লইয়া গঠিত সাধারণ সভা (General Assembly) এই ক্যাণ্টনগুলির শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণ সভা পাঁচজন সদস্য-সম্বলিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচন করে। এই সমিতি শাসন-সংক্রান্ত দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে।

সুইস্ শাসনব্যবস্থায় সেনাবিভাগ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা (Neutrality) নীতি অনুসরণ করিবার ফলে সুইস্ সরকার স্থায়ী সেনাবিভাগ রাখিতে পারে না। এইজন্য দেশে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তিত করা হইয়াছে।

প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই যুদ্ধে যোগদানের জন্য আহ্বান করা যায়।

সুইস শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি—Procedure in regard to the Amendment of the Swiss Constitution

সাধারণভাবে বলিতে গেলে সুইস্ শাসনতন্ত্র হইল দুষ্পরিবর্তনীয়। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের সংশোধন দুঃসাধ্য নহে। দুইটি বিভিন্ন উপায়ে শাসনতন্ত্রের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে। (১) সংশোধন প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা উত্থাপন করিতে পারে অথবা (২) পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা তাহাদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র দ্বারা সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। আবার শাসনতন্ত্রের আংশিক সংশোধন (Partial Amendment) প্রস্তাব হইতে পারে অথবা সম্পূর্ণ সংশোধন (Total Amendment) হইতে পারে। যে পদ্ধতিতে যে কোন প্রকারের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হউক না কেন উত্থাপিত প্রস্তাব বৈধ ও কার্যকর হইতে হইলে ভোটদাতাগণের সংখ্যাধিক্যের ও ক্যান্টনগুলির সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত হওয়া চাই।

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা আংশিক ও সম্পূর্ণ উভয়বিধ সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদও সংশোধন প্রস্তাবের খসড়া রচনা করিয়া আইনসভার বিচার-বিবেচনার জন্য আইনসভায় প্রেরণ করিতে পারে। আইনসভার উভয় কক্ষ প্রস্তাবিত সংশোধনে সম্মতি দান করিলে উক্ত সংশোধন প্রস্তাব ভোটদাতাগণের ও ক্যান্টনগুলির অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ভোটদাতাগণের ও ক্যান্টনগুলির সংখ্যাধিক্যের ভোটে পাস হইলে উভয়বিধ সংশোধনই বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

যদি আইনসভার একটি কক্ষ উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন না করে সেক্ষেত্রে প্রস্তাবটি আদৌ প্রয়োজনীয় কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে গণভোটে দেওয়া হয়। গণভোটের সংখ্যাধিক্যে যদি প্রস্তাবটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নূতন নির্বাচনের ফলে নূতন যে আইনসভা গঠিত হয়, তাহা স্বভাবতই সংশোধন প্রস্তাবটিতে সম্মতি দান করে। নবগঠিত আইনসভা

কর্তৃক অনুমোদিত হইলে প্রস্তাবটি পুনরায় গণভোট ও ক্যান্টনগুলির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। গণভোটের সংখ্যাধিক্যে ও ক্যান্টনগুলির সংখ্যাধিক্যে পাস হইলে সংশোধন প্রস্তাবটি আইনের মর্যাদা লাভ করে।

২। সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল যে, অন্ততঃ পঞ্চাশ সহস্র ভোটদাতা তাহাদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্রে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে (Constitutional Initiative)। ভোটদাতাগণ যদি আংশিক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা হইলে প্রস্তাবটির অনুমোদন পদ্ধতি প্রস্তাবটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ভোটদাতাগণ সংশোধন প্রস্তাবটি একটি সম্পূর্ণ বিলের আকারে (Formulated Initiative) আইনসভায় পাঠাইতে পারেন অথবা বিশদ বিবরণবিহীন সাধারণ প্রস্তাবরূপে (Unformulated Initiative) পাঠাইতে পারেন।

সম্পূর্ণ বিলের আকারে উত্থাপিত আংশিক সংশোধন প্রস্তাব আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে গণভোট ও ক্যান্টনগুলির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয় এবং এই উভয়ের সংখ্যাধিক্যের অনুমোদনে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি আইনসভা প্রস্তাবটি অনুমোদন না করে তাহা হইলে প্রস্তাবটি বাতিল করিবার সুপারিশ করিয়া গণভোটে দিতে পারে অথবা আইনসভা নিজে বিকল্প প্রস্তাব রচনা করিয়া ভোটদাতাগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটিসহ বিকল্প প্রস্তাবটি গণভোটে দিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই গণভোটের সংখ্যাধিক্য ও ক্যান্টনগুলির সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাবগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

অপর পক্ষে বিস্তারিত বিবরণবিহীন সাধারণ প্রস্তাবগুলি যদি আইনসভা অনুমোদন করে তাহা হইলে আইনসভা গণনির্দেশের ভিত্তিতে প্রস্তাবটির একটি পূর্ণাংগ খসড়া প্রস্তুত করিয়া গণভোট ও ক্যান্টনগুলির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে। যদি আইনসভা প্রস্তাবটি অনুমোদন না করে তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ এই আংশিক সংশোধন প্রস্তাবটির ভাগ্য গণভোটের মাধ্যমে স্থির করিবে। গণভোটের সংখ্যাধিক্যে অনুমোদিত হইলে আইনসভা গণনির্দেশের ভিত্তিতে উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাবটির খসড়া প্রণয়ন করিবে। তারপর পুনরায় গণভোটের ও ক্যান্টনগুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতি পাইলে আংশিক সংশোধন প্রস্তাবটি বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ সংশোধন ও গণপ্রস্তাব অধিকারের মাধ্যমে অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতার আবেদনপত্রের মাধ্যমে উত্থাপিত হইতে পারে। এইরূপে উত্থাপিত প্রস্তাব প্রথমে গণভোটে দেওয়া হয়। গণভোটে সংখ্যাধিক্যে পাস হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত আইনসভা কর্তৃক নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া রচিত হয় এবং আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে এই খসড়া সংশোধন প্রস্তাব গণভোট ও ক্যান্টনগুলির সম্মতির জন্য পাঠান হয়। উভয় ক্ষেত্রেই সংখ্যাধিক্যের অনুমোদন লাভ করিলে সংশোধিত শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়।

সংশোধন-পদ্ধতির সমালোচনা—Criticism of the Amending Procedure

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, এই শাসনতন্ত্র একদিকে ভোটদাতাগণের প্রাধান্য ও অপরদিকে ক্যান্টনগুলির সার্বভৌমিকতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অত্যুৎসাহী হওয়ার ফলে সংশোধন-পদ্ধতি অনাবশ্যকরূপে জটিল ও সময়-সাপেক্ষ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য দেশে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যতীতও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Judicial Review), নজির (Precedent), প্রথাগত বিধান প্রভৃতি নিয়মতান্ত্রিক-বহির্ভূত উপায়ে শাসনতন্ত্রের সংশোধন সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যতীত সুইস্ শাসনতন্ত্র সংশোধন করা যায় না। সুতরাং সুইস্ শাসনতন্ত্র একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংশোধন-সমূহ দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার বা আইনসভা প্রণীত কোন আইন শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার নাই। গণভোট ও ক্যান্টনগুলির সংখ্যাধিক্যই হইল শাসনতন্ত্র সংশোধনের চূড়ান্ত অধিকারী। সুইজারল্যাণ্ডে ভোটদাতাগণের সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বিশেষ প্রস্তাব অধিকার না থাকিলেও শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অধিকার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে।

দলব্যবস্থা—Party System

সুইজারল্যাণ্ডে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকিলেও শাসন-পরিচালনা কার্যে রাজনৈতিক মতামতের পার্থক্যের উপর আদৌ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না বলিয়া দলগুলির বিশেষ কোন প্রতিপত্তি নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ কোন একটি মাত্র দলের সমর্থক লইয়া গঠিত হয় না। ইহাদের মতানৈক্য থাকিলেও দলাদলি নাই এবং জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত তাঁহারা দলীয় মত বিসর্জন দিয়া থাকেন।

সুইস্ দেশে কয়েকটি বিশেষ কারণে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা যায় না। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের (Federal Council) সদস্যগণ দলের ভিত্তিতে নিযুক্ত হন না এবং একবার নিযুক্ত হইলে সদস্যগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত বহুদিন উক্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। সুতরাং শাসন-পরিষদে সদস্য নির্বাচনকালে দলীয় কর্মতৎপরতার আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ পুরাতন সদস্যগণই পুনর্নিযুক্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, গণভোট, গণ-নির্দেশ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তিত থাকার ফলে আইনসভার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং আইনসভার সদস্য নির্বাচনকালেও দলীয় মনোভাব ও দলীয় কর্মতৎপরতার অভাব দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী পদগুলিতে গুণ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নিযুক্ত করা হয়। এই পদগুলির বেতন পরিমাণও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। সুতরাং সরকারী নিয়োগ ব্যাপারের ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থসাধনের সুযোগও নাই। এতদ্ব্যতীত সুইস্ জনসাধারণ জাতীয় স্বার্থকে সকল অবস্থায়ই দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে অভ্যস্ত। সুতরাং এই দেশে সংকীর্ণ দলীয় মনোভাবের অভাব দেখা যায়। অন্যান্য দেশের মত সুইস্ রাজনৈতিক দলগুলি জাতি, ভাষা বা ধর্মমতের পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত নয়।

সুইস্ দেশে ফরাসী দেশের মত বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

১। ক্যাথলিক রক্ষণশীল দল—**The Catholic Conservative Party**

এই দলটি ক্যান্টনগুলির স্বাধীনতার সমর্থক। পূর্বাপর এই দল জাতীয় সরকারের ক্ষমতা প্রসারণের বিরোধিতা করে। পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা এই দল বিশেষভাবে দাবী করে।

২। চরমপন্থী দল—**The Radical Party**

এই দল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষপাতী। ইহারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ইহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়ন বিষয়ে গণ-নির্দেশ প্রবর্তনের সমর্থক। পররাষ্ট্র-সম্পর্কে এই দল নিরপেক্ষ-নীতি অনুসরণ সমর্থন করে।

৩। কৃষক দল—**The Farmers' Party**

কৃষির সংস্কার, কৃষির উন্নয়ন ও কৃষিস্বার্থের সংরক্ষণ—ইহাই হইল এই দলের উদ্দেশ্য। কৃষিজাত দ্রব্যের দেশীয় বাজার রক্ষা করিবার জন্য ইহারা বিদেশজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন সমর্থন করে। এই দল ক্যান্টন সরকার অপেক্ষা জাতীয় সরকারের উপর অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করে। ইহারা জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার পক্ষপাতী।

৪। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দল—**The Social Democratic Party**

এই দল শ্রমিক সংঘ ও সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোক লইয়া গঠিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দল ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে। সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হইলেও এই দল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই উভয়ের সংযোগ সাধনের পক্ষপাতী। এই দল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের উগ্র সমর্থক।

ইহা ছাড়াও, শ্রমিক দল (Labour Party), স্বতন্ত্র দল (Independent Party), উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দল (Liberal Democratic Party) প্রভৃতি আরও কতিপয় দল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি—Methods of Direct Democracy

সুইজারল্যাণ্ড দেশ গণতন্ত্রের আদি জন্মভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে গণ-নির্দেশাধিকার (Referendum) ও গণ-প্রস্তাব অধিকার (Initiative) কার্যকর হওয়ার ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সার্থক হইয়াছে।

গণ-নির্দেশাধিকারের অর্থ হইল যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে আইনের খসড়াকে চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত করিতে হইলে সে খসড়া আইন জনগণের সংখ্যাধিক্য দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন ভোটদাতাগণের নিকট বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়। যদি ভোটদাতাগণ অধিক ভোটে খসড়াটি সমর্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত হয়; আইনসভার আর পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। জনগণের এই নির্দেশ-অধিকার বাধ্যতামূলক (compulsory) বা ঐচ্ছিক (optional) হইতে পারে। কোন্ কোন্ বিষয়ে এই নির্দেশাধিকার বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত হইবে শাসনতন্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে। সাধারণতঃ, শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন, গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ আইন ও অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে এই অধিকার বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ঐচ্ছিক গণ-নির্দেশ গ্রহণ করা হয় তখন, যখন (১) একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক (৩০,০০০) অথবা ৮টি ক্যান্টন এই অধিকার দাবী করে। ক্যান্টন সরকারগুলির ক্ষেত্রেও এই দুই জাতীয় গণ-নির্দেশাধিকার প্রয়োগ করা হয়।

গণ-প্রস্তাব অধিকারের অর্থ হইল যে, নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সেই আইনের একটি খসড়া আইনসভার বিবেচনার্থে পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই খসড়াটি বিবেচনার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি নির্বাচকমণ্ডলী ভোটাধিক্যে সেই খসড়াটি অনুমোদন করে তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে। আইন-প্রণয়নের এই সরাসরি অধিকার দুই প্রকারে হইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী যে খসড়া আইনটি আইনসভার নিকট পেশ করিবে সেটি যদি বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ণাংগ গণ-প্রস্তাব (Formulated Initiative) বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণ-

বর্জিত আইনের প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ গণ-প্রস্তাব (Unformulated Initiative) বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় ও ক্যান্টনের শাসনতান্ত্রিক আইনের ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত দুই প্রকারের গণ-প্রস্তাব প্রয়োগ করা যায়। পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা যদি মিলিতভাবে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব করে ও প্রস্তাবটি যদি বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত আকারে আইনসভার নিকট পেশ হয় তাহা হইলে ইহাকে পূর্ণাংগ গণ-প্রস্তাব বলা হয়।

গণ-নির্দেশ ও গণ-প্রস্তাব একটি অন্যটির পরিপূরক। গণ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল অপ্রস্তাবিত আইনের সূচনা করা, আর গণ-নির্দেশের উদ্দেশ্য হইল প্রস্তাবিত আইনকে না-মঞ্জুর করা। আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করিতে অনিচ্ছুক, গণ-প্রস্তাব আইনসভাকে সেই আইন প্রণয়নে বাধ্য করে। অপর পক্ষে জনমত উপেক্ষা করিয়া আইনসভা যদি কোন আইন জনগণের উপর প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হয় তাহা হইলে গণ-নির্দেশ প্রয়োগ করিয়া সেইরূপ আইনকে কার্যকর হইতে দেওয়া হয় না। সুতরাং উভয় পদ্ধতিই জনমতের বিজয় ঘোষণা করে।

গণ-নির্দেশাধিকার ও গণ-প্রস্তাব অধিকারের গুণ ও দোষ—Merits and Defects of the Referendum and the Initiative

গণ-নির্দেশাধিকার ও গণ-প্রস্তাব অধিকার—এই দুইটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সুইস্ শাসনব্যবস্থার অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই দুইটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে সাধারণের কাজে উৎসাহিত করা যায়। দেশের প্রত্যেকটি ভোটদাতা বুঝিতে পারে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আইন-প্রণয়ন, শাসনতন্ত্র পরিবর্তন ও কর-স্থাপন ব্যাপারে তাহার একটি বক্তব্য আছে। সুতরাং এই ব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে গুরুত্ব আরোপ করিয়া নাগরিক হিসাবে তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাহাকে সজাগ রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতি আইনসভার দ্রুত ও বিবেচনাহীন আইন-প্রণয়ন কার্যে বাধাদান করিয়া আইনসভার স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিতে পারে। সুইস্ দেশে শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভা প্রণীত আইন নাকচ (Veto)

করিতে পারে না। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধান বিচারালয়ও আইনসভা-প্রণীত আইন অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না। সুতরাং সুইস্ দেশে এই পদ্ধতিগুলি অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

তৃতীয়তঃ, এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা ও পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সাধারণ নির্বাচন কালে দেশের যাবতীয় সমস্যাগুলি ও ইহাদের সমাধানের উপায়গুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি একযোগে ভোটদাতৃগণের নিকট উপস্থাপিত করে। ইহার ফলে ভোটদাতৃগণ বিভিন্ন সমস্যাগুলির পৃথক আলোচনা করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু গণ-নির্দেশাধিকার বা গণ-প্রস্তাব অধিকার প্রত্যেকটি সমস্যা পৃথগ্‌ভাবে ভোটদাতার নিকট উপস্থাপিত করিয়া প্রত্যেকটি সমস্যা সম্পর্কে পৃথক পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ করে।

চতুর্থতঃ, এই উপায়গুলির দ্বারা দলব্যবস্থার কুফলগুলি বহু পরিমাণে দূর করা সম্ভব হয়। প্রত্যেক ভোটদাতাই নিজ ইচ্ছানুসারে প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহার মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পায়। এই কারণে সুইস্ দেশে আইনসভার নির্বাচনকালে অন্যান্য দেশের ন্যায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়া সামাজিক জীবন কলুষিত হয় না।

পঞ্চমতঃ, বৎসরে কয়েকবার জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিককেই একযোগে আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে একতাবোধ বৃদ্ধি পায়। জার্মান, ইতালীয়, ফরাসী নির্বিশেষে সকল ভোটদাতৃগণ-ই এক অখণ্ড জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সাধারণ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ফরাসী দেশে অনেক সময় কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের প্রভাবে সাম্প্রদায়িক আইনের জন্ম হয়। ফলে অন্য শ্রেণী বা অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু গণ-নির্দেশাধিকার ও গণ-প্রস্তাব অধিকার এই দুইটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বর্তমান থাকিবার ফলে সুইস্ দেশে এরূপ শ্রেণীগত বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে কোন আইন প্রণয়ন হইতে পারে না। এই ব্যবস্থা জনসাধারণের হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ

দান করিয়াছে। এই কারণে সুইস্ গণতন্ত্র প্রকৃত কার্যকর গণতন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

গণ-প্রস্তাব অধিকার ও গণ-নির্দেশাধিকারের সপক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শিত হউক না কেন, একথা সত্য যে, এই দুইটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ দোষবিমুক্ত নহে।

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, এই পদ্ধতি বর্তমান থাকার ফলে সুইস্ দেশের আইনসভা শুধুমাত্র বিতর্ক সভায় পর্যবসিত হইয়াছে। কারণ এই দুইটি উপায় সাহায্যে ভোটদাতৃগণ সরাসরি আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে এবং প্রস্তাবিত আইন বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে কিনা তাহাও স্থির করে। এরূপ অবস্থায় আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে আইনসভার কোন অনুপ্রেরণা বা দায়িত্ব থাকিতে পারে না, কারণ আইসভা জানে যে, আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ভোটদাতৃগণের মতামতই হইল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। এই ব্যবস্থা থাকার ফলে সুইস্ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধান বিচারালয়ের আইনের ব্যাখ্যা করিবার (Judicial Review) ক্ষমতাহীন হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, পদ্ধতি দুইটি সম্পূর্ণ গণতন্ত্র-সম্মত পদ্ধতি হইলেও বলা যায় যে, আইন-প্রণয়ন কার্য অতি দুরূহ। এই কার্যে যে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, সাধারণ ভোটদাতা সে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতার অধিকারী নহে। সুতরাং ভোটদাতৃগণ কর্তৃক প্রণীত আইন জনপ্রিয় আইন হইলেও ইহাকে সুসম আইন বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ, গণ-প্রস্তাব অধিকারের সাহায্যে আইন-প্রণয়ন অথবা গণ-নির্দেশাধিকারের সাহায্যে আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন প্রত্যাখ্যান এই উভয় পদ্ধতির অর্থ হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রাধান্য বলবৎ করা। কারণ যে স্থলে ভোটদাতৃগণের বৎসরে একাধিকবার ভোটদান কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া নানাবিষয়ে ভোটদান সাহায্যে মতামত প্রকাশ করিতে হয়, সেখানে অতি কম সংখ্যক ভোটদাতাই এই উপায়গুলির সদ্ব্যবহার করেন। সুইস্ দেশে শতকরা ৪৫ জন ভোটদাতা সাধারণতঃ গণ-প্রস্তাব অধিকার ও গণ-নির্দেশাধিকারের প্রয়োগের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং শতকরা এই ৪৫ জনের সংখ্যাধিক্যের ভোটেই কোন প্রস্তাব বা নির্দেশের ফলাফল

স্থির হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, কোন প্রস্তাব বা নির্দেশ সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মতিতেই গৃহীত হয়।

চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থা ব্যয়-বহুল। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ প্রস্তাব চারিটি বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত করিয়া ভোটদাতৃগণের অবগতির জন্য বিতরণ করিতে হয়। ক্ষুদ্র সুইস্ দেশে এই ব্যবস্থা সম্ভব হইলেও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিতে ইহা সম্ভব নহে।

সুইস্ গণতন্ত্র ও ইহার সাফল্যের কারণ—Causes of the Success of the Swiss Democracy

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ডে যেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তদ্রূপ হয় নাই। প্রথমতঃ, দেশের স্বল্প আয়তন এই সাফল্যের একটি কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা একমাত্র কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুইজারল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র না হইলেও ক্ষুদ্র দেশ আরও অনেক আছে, কিন্তু কোথাও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এতটা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে দেখা যায় নাই। দেশটি ক্ষুদ্র বলিয়া জনগণের মধ্যে পারস্পরিক মতের বিনিময় সহজসাধ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে ও কম সময়ে জনমত সংগ্রহ করিবার সুযোগ থাকায় শাসনকার্যে জনমতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সুইজারল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক কাঠামো ইহার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। গ্রেট বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে চূড়ান্ত রকমের ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ধনবৈষম্য না থাকার ফলে এদেশে কোন বংশগত অভিজাত শ্রেণী বা শাসকসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয় নাই। অধিকাংশ অধিবাসীই সম-ব্যবসায়ী ও সম-সামাজিক মর্যাদার অধিকারী বলিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যপরিচালনা করিবার শিক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং কোনরূপ শ্রেণীবিরোধ দ্বারা সুইজারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যাহত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, আন্ত-র্জাতিকক্ষেত্রে বহুদিন হইতে ইহার নিরপেক্ষতা নীতি এই দেশকে আত্মঘাতী সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। ফলে, একদিকে জনসাধারণ শান্তিপ্রিয় নাগরিক হইয়া গঠিত হইয়াছে, অন্যদিকে তাহাদের চরিত্রে সহনশীলতা বৃদ্ধি

পাইয়াছে। সহনশীলতা ও অপরের মতামত-সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব সুইস্ জাতির একটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া এত জনপ্রিয় হইয়া থাকেন যে, একই সদস্য বহুদিন পর্যন্ত পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। শাসন-পরিষদের সাতজন সদস্যই পর্যায়ক্রমে এক বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কি পরিমাণে তাঁহারা গণতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। আত্মকর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থাকিয়া তাঁহারা জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এরূপ বিবেচক নাগরিক অন্যদেশে দুর্লভ। চতুর্থতঃ, গণভোট, গণ-প্রস্তাব অধিকার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি রাজনৈতিক জীবনে তাঁহাদের সংযম ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়া গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতির সমন্বয়ে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকগণের মধ্যে যে বলিষ্ঠ ও সহনশীল দেশাত্মবোধের উন্মেষ হইয়াছে, তাহার ফলে সুইস্ জাতি গণতন্ত্রের সার্থক ধারকরূপে আজ সমগ্র সভ্য-জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হইলেও সুইস্ শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগ হয় নাই। উনিশটি ক্যান্টন ও ছয়টি অর্ধক্যান্টন লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।

২। লিখিত শাসনতন্ত্র। অন্যান্য শাসনতন্ত্র হইতে অপেক্ষাকৃত বহু বিস্তারিত।

৩। শাসনতন্ত্রে কোন অধিকারপত্র নাই।

৪। অনমনীয় শাসনতন্ত্র।

৫। শাসনকর্তৃপক্ষ সমক্ষমতাপন্ন একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত।

৬। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক-পদ্ধতির দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ—যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ—আইনসভার উভয় পরিষদ কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত সাতজন সদস্য লইয়া শাসন-পরিষদ গঠিত। ইঁহাদের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সদস্যগণ আইনসভার সদস্য না হইলেও আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া ইঁহাদের পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে না। কার্যকাল শেষ হইলেও সদস্যগণ পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার গুণগুলির অধিকারী হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—জাতীয় সভা—রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়-পরিষদ লইয়া জাতীয় সভা গঠিত। চুয়াল্লিশ জন ও একশত ছিয়ানব্বই জন সদস্য লইয়া যথাক্রমে রাজ্যপরিষদ ও জাতীয়পরিষদ গঠিত হয়।

সমান ক্ষমতার অধিকারী হইলেও জাতীয়পরিষদের ক্ষমতা কার্যতঃ অনেক বেশী। আইন-প্রণয়ন, আয়ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, সন্ধিচুক্তি-অনুমোদন, যুদ্ধ-ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন করা আইনসভার প্রধান কার্য। রাষ্ট্রপতি, সৈনাধ্যক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতি নিয়োগ ও দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তি মার্জনার জন্য উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আবশ্যক : প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা আইনসভার ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দ্বারা ছয় বৎসরের জন্য ছাব্বিশ হইতে আটাশ জন বিচারপতি নির্বাচিত হইয়া প্রধান বিচারালয় গঠিত হয়। এই বিচারালয়ের আদিম ও আপীল বিচারের ক্ষমতা রহিয়াছে। ক্যান্টন সরকারগুলি রচিত আইন বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার থাকিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা-রচিত আইনের উপর ইহার সে ক্ষমতা নাই। শাসনবিভাগীয় বিচারালয়রূপেও ইহার কিছু কার্য সম্পাদন করিতে হয়।

শাসনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি ঃ ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কর্তৃক উত্থাপিত ও গৃহীত সংশোধন-প্রস্তাব অধিকাংশ ক্যান্টন ও অধিকাংশ ভোটদাতার অনুমোদনে কার্যকর হয়।

২। পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতার লিখিত আবেদনক্রমে আইনসভা সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই আইনসভাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাবটিকে গণ-ভোটের জন্য পেশ করিতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

United Nations

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—Peaceful Co-existence

সামাজিক জীব বলিয়া মানুষের সুনাম থাকিলেও স্বার্থপর ও কলহপ্রিয় বলিয়াও তাহার দুর্নাম আছে। শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকিলেও মানুষ এখনও পর্যন্ত তাহার স্বার্থপরতা-প্রসূত কলহপ্রিয়তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে এই দুইটি প্রবণতাই দেখা যায়। মানব-ইতিহাসে যেরূপ একদিকে দেখা যায় ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার হানাহানি, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশীর বিরোধ, একজাতির সহিত অপর জাতির সংঘর্ষ অপরদিকে তদ্রূপ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার অচ্ছেদ্য বন্ধন, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশীর সৌহার্দ্য এবং একজাতির সহিত অপরজাতির মৈত্রীভাবের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। স্বার্থের এই সংঘাত ক্ষমতালিপ্সার সহিত যুক্ত হইয়া মানুষকে আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত করিয়া সময় সময় বিপথগামী করিলেও স্বভাবত সামাজিক মানুষ ক্রমশ বুঝিয়াছে যে, নিজে বাঁচিতে হইলে অপরকে বাঁচিতে দিতে হইবে এবং এই পারস্পরিক অধিকার সংরক্ষণের জন্যই সংগ্রামের পথ পরিহার করিয়া শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথ অনুসরণ করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে এই শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটিলে ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়। মানুষ যেদিন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবে যে, বিরোধের পথ হইল ধ্বংসের পথ আর শান্তির পথ হইল সৃষ্টির পথ সেদিন কি ব্যক্তিগত জীবনে কি জাতীয় জীবনে, বিরোধের আর কোন অবকাশ থাকিবে না। যুদ্ধ-ক্লান্ত মানুষ একে অপরের সহিত সহযোগিতা ও সহ-মর্মিতার ভিত্তিতে শান্তিতে বসবাস করিয়া ব্যক্তিসমষ্টি ও বিশ্বমানবের কল্যাণসাধনে সমবেতভাবে তৎপর হইবে। এই বিশ্বমানবের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যেই জাতি-সংঘ (The League of Nations) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) জন্ম।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি—Genesis of the U. N.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ হইতে জাতি-সংঘের জন্ম হয়। যুদ্ধরত ও নিরপেক্ষ জাতিগুলি এই সর্বনাশা যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ যুদ্ধ আর না ঘটে তজ্জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতি-সংঘ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে। কয়েক বৎসর আংশিক সাফল্যের সহিত কাজ করিবার পর এই প্রতিষ্ঠানটি ইহার গঠনগত ও প্রকৃতিগত দুর্বলতার জন্য ইহার উদ্দেশ্য সাধনে কার্যতঃ ব্যর্থ-কাম হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ইতালী কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রান্ত হইলে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা জগৎ সমক্ষে প্রমাণিত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য জাতিগুলি দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরে লিপ্ত হইয়া এই প্রতিষ্ঠানটির সমাধি রচনা করেন। শান্তি ও সহযোগিতার পথ বর্জন করিয়া সুসভ্য জাতিগুলি সংঘর্ষের পথ অবলম্বন করে। শান্তিকামী মানুষ হতাশ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হত্যা ও ধ্বংসলীলা প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা অতিক্রম করিল। শান্তিকামী মানুষ আবার উপলব্ধি করিল যে, জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে আর একটি বিশ্ব-সংগঠন গঠন (World Organisation) সাহায্যে এই বর্বরের ব্যবসায় (যুদ্ধ) নিরোধ না করিতে পারিলে মানবজাতির আর পরিত্রাণের পথ নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী কংগ্রেস সভায় যে বাণী (Message) প্রেরণ করেন, সেই বাণীতেই রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সর্বপ্রথম এইরূপ একটি বিশ্ব-সংগঠন প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। উক্ত সালের ১৫ই আগস্ট মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল 'অতলান্তিক সনদ' (Atlantic Charter) নামে যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন সে বিবৃতিতেও প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা সুনিশ্চিত করিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর মার্কিন সরকার ডাম্বারটন ওক্স্-এ বৃটেন, সোভিয়েত ও চীন সরকারের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে ভবিষ্যৎ বিশ্ব-সংগঠনের একটি বাস্তব কাঠামো উপস্থাপিত করে। এই ত্রিশক্তি মার্কিন সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবটি (Dumburton Oaks Proposals) বিশেষভাবে

পরীক্ষা করে। কিন্তু মতভেদের ফলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। ইহার পর ক্রিমিয়ার অন্তর্গত ইয়াল্টা শহরে রুজভেল্ট, স্টালিন ও চার্চিল এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া বিশ্ব-সংগঠনটির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের পর ঘোষিত হয় যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো শহরে যে জাতিসমূহের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে সেই অধিবেশনে ডাম্‌বারটন ওক্‌স্‌ প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ বিশ্ব-সংগঠনের সনদ প্রস্তুত করা হইবে।

এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো নগরে এক সম্মেলন (Sanfrancisco Conference) বসে। এই সম্মেলনে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বহু বাক্‌-বিতণ্ডার পর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে জাতিপুঞ্জের সনদ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং পরবর্তী দিনে উপস্থিত সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই সনদে স্বাক্ষর দান করেন। সদস্যরাষ্ট্রসমূহের আইনসভা কর্তৃক সনদটি অনুমোদিত হইলে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর জাতিপুঞ্জ জন্মলাভ করে।

জাতিপুঞ্জের সনদ ও ইহার উদ্দেশ্য—Charter of the U. N. and its Purposes

একটি উচ্চ আদর্শ-সম্বলিত প্রস্তাবনা (Preamble)-সহ ১১১টি ধারা লইয়া গঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় উল্লেখিত জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

১। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে যুদ্ধের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করা,

২। মৌলিক মানবিক অধিকারগুলির উপর আস্থা সুনিশ্চিত করা,

৩। আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, এবং

৪। সামাজিক অগ্রগতি ও উচ্চতর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণকে সহনশীলতা ও সৎ-প্রতিবেশী-সুলভ আচরণের অনুরোধ করা হইয়াছে।

জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য—Purposes of the U. N.

১। জগতে শান্তি ও প্রগতির প্রধান শত্রু হইল যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-ভীতি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই যুদ্ধের কারণ দূর করা। এই উদ্দেশ্যে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বিরোধ নিরসনের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন সাহায্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবার প্রয়াসী।

২। দ্বিতীয়তঃ, সকল জাতির লোকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যাহাতে তাহারা সকলেই শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীরূপে বাস করিতে পারে সেজন্য সচেষ্ট থাকা। ইহা ছাড়া জাতিগুলির সমানাধিকারের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার মনোভাব বৃদ্ধি করাও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

৩। জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা হইল আন্তর্জাতিক বিরোধের একটি প্রধান কারণ। বিরোধের এই বিশেষ কারণটি দূর করিবার জন্য জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হইল জাতিগুলির সামাজিক, কৃষ্টিমূলক ও অর্থনৈতিক জীবনে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এই সঙ্গে জাতি-ধর্ম-ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণও এই প্রতিষ্ঠানের এক মহান উদ্দেশ্য।

৪। বিশ্ব-সংগঠন হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চতুর্থ ও শেষ উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন জাতির কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনপূর্বক জাতিগুলির মধ্যে মত-ভেদ ও বিরোধের পরিবর্তে ঐক্য ও মত-সামঞ্জস্য স্থাপন করা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতিসমূহ—Principles of the U. N.

জাতিপুঞ্জের সনদে সদস্যরাষ্ট্রগুলি কর্তৃক একক ও যুক্তভাবে স্বীকৃত সাতটি নীতির ভিত্তিতে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। নীতিগুলি হইল :—

১। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সকল রাষ্ট্রই সমান।

২। সকল সদস্য রাষ্ট্রই তাহাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিবে।

৩। সকল সদস্যরাষ্ট্রই এরূপ শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের পারস্পরিক মতভেদের সমাধান করিবে যাহাতে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিপন্ন না হয়।

৪। কোন সদস্যরাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা ভূখণ্ডের উপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলপ্রয়োগ করিবে না বা বল-প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করিবে না।

৫। যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এরূপ রাষ্ট্রের সাহায্য অন্য রাষ্ট্র করিতে পারিবে না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হইল সকল রাষ্ট্রের কর্তব্য।

৬। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে জাতিপুঞ্জ সদস্য-বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলি যাহাতে এই নীতিগুলির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সে বিষয়ও সুনিশ্চিত করিবে।

৭। জাতিপুঞ্জ কোন রাষ্ট্রের নিছক আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না কিংবা এরূপ ব্যাপার জাতিপুঞ্জের দ্বারা নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপিত করিতে বাধ্য করিবে না। কিন্তু শান্তিভঙ্গের অভিযোগে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ নীতি প্রযুক্ত হইলে উপরি-উক্ত নীতি কার্যকর হইবে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ—Membership of the U. N.

স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো সম্মেলনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষরদানকারী ৫১টি রাষ্ট্র লইয়া এই প্রতিষ্ঠান প্রথম গঠিত হয়। শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলি—যাহারা জাতিপুঞ্জে যোগদানে ইচ্ছুক ও সদস্যপদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম এইরূপ রাষ্ট্রগুলিকেই জাতিপুঞ্জের সদস্যভুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা (General Assembly) কর্তৃক নূতন সদস্য গ্রহণ করা হয়। যে সদস্য ক্রমাগত সনদে উল্লিখিত জাতিপুঞ্জের নীতিগুলি ভঙ্গ করে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা এরূপ সদস্যকে বহিষ্কার করিতে পারে। যে সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে সদস্যপদের সকল সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে আবার পুনঃপ্রদানও করিতে পারে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামো—Structure of the U. N.

ছয়টি বিভিন্ন সংস্থার সাহায্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইহার উদ্দেশ্যগুলিকে কার্যে রূপায়িত করে। সংস্থাগুলি হইল :—

১। সাধারণ সভা—The General Assembly

২। নিরাপত্তা বা স্বস্তি-পরিষদ—Tha Security Council

৩। আন্তর্জাতিক বিচারালয়—The International Court of Justice

৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা—The Economic and Social Council

৫। অছি-পরিষদ—The Trusteeship Council

৬। মহাকরণ—The Secretariat.

১। সাধারণ সভা—The General Assembly

(ক) সংগঠন, অধিবেশন ও ভোটদান পদ্ধতি—Organisation, Session and Voting Procedure

সাধারণ সভাই হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থল। এই সভায় জাতিপুঞ্জের সকল কার্য আলোচিত হয়। সকল সদস্যরাষ্ট্র হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইলেও কোন সদস্যরাষ্ট্রই কোন ব্যাপারে একাধিক ভোটদান করিতে পারে না। এই নিয়ম বলবৎ করিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে।

প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ইহার অধিবেশন বসে। এই নিয়মিত অধিবেশন ব্যতীতও নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে প্রধান কর্মসচিব সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপৎকালীন বিশেষ অধিবেশনও (Emergency Special Session) বসিতে পারে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে মধ্য-প্রাচ্যের গুরুতর পরিস্থিতি আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি জরুরী অধিবেশন বসে। প্রতি বাৎসরিক অধিবেশনের জন্য সাধারণ সভা একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচন করে। সভা ইহার কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করে।

জাতিপুঞ্জের সনদে উল্লেখিত সমুদয় ব্যাপার সম্পর্কে সাধারণ সভা আলোচনা করিতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কোন নূতন সদস্য গ্রহণ, সাময়িকভাবে কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা বা একেবারে বহিষ্কার করা, শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ, অছি-পরিষদ-

সংক্রান্ত বিষয়, আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রভৃতি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে উপস্থিত ও ভোটদানকারী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়। সর্বসম্মত মতের পরিবর্তে সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য প্রবর্তিত হইবার ফলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে।

(খ) ক্ষমতা ও কার্যাবলী—Powers and Functions

১। সাধারণ সভার ক্ষমতা ও কার্য সনদের ১০ ও ১৭ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। সনদের অন্তর্ভুক্ত যে-কোন প্রশ্ন বা বিষয় সম্পর্কে সাধারণ সভা আলোচনা করিতে পারে। অন্যান্য সংস্থাগুলির কার্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই সভা সে সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের সদস্যগণকে বা নিরাপত্তা পরিষদে অথবা উভয়ের কাছে সুপারিশ করিতে পারে।

২। কোন সদস্যরাষ্ট্র বা স্বস্তি পরিষদ অথবা জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্র কর্তৃক আনীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষামূলক যে-কোন প্রশ্ন এই সভা আলোচনা করিতে পারে। কোন অবস্থায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা ক্ষেত্রে এই সভা সে বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

৩। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা গবেষণামূলক অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে সুপারিশ করিতে পারে। এই সভা আন্তর্জাতিক আইনের ক্রম উন্নয়নে ও ইহাকে আইন আকারে বিধিবদ্ধ করিতে উৎসাহ দান করিতে পারে।

৪। অছি-পরিষদ সম্পর্কিত ব্যাপারেও সাধারণ সভার কিছু ক্ষমতা আছে। জাতিপুঞ্জের প্রধান কর্ম-সচিব-প্রদত্ত অছি-পরিষদ সম্পর্কিত বিবরণী এই সভা বিবেচনা করে। অছি-পরিষদের অধীন স্বায়ত্তশাসনবিহীন জনপদগুলি সম্পর্কিত তথ্য ও শাসনব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করে।

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এই সভা কর্তৃক বিবেচিত ও অনুমোদিত হয়। বাৎসরিক ব্যয়ের কি পরিমাণ কোন্ সদস্য বহন করিবেন তাহা এই সভা কর্তৃক ধার্য হয়। বিশেষীকৃত শাখাগুলির (Specialised Agencies) আয়-ব্যয়ের হিসাবও এই সভা বিবেচনা করে।

৬। এই সভা নিরাপত্তা পরিষদের দশজন অস্থায়ী সদস্য ও দুই বৎসরের জন্য তিনজন সদস্যকে প্রতি বৎসর নির্বাচন করে।

৭। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ২৭ জন সদস্য এই সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়।

৮। সাধারণ সভা অছি-পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করে।

৯। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে এই সভা মহাসচিবকে নিয়োগ করে।

১০। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা পৃথকভাবে ভোটদান করিয়া আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ১৫ জন বিচারপতিকে নির্বাচন করে। তবে একই দেশ হইতে দুইজন বিচারপতি নির্বাচন করা যায় না।

১১। শান্তির উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব, ১৯৫০—Uniting for Peace Resolution, 1950

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে উপরি-উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের ফলে সাধারণ সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কার্য ছিল। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের বিশেষ করিয়া মার্কিন ও সোভিয়েত সরকারের গুরুতর মতভেদের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলেও শান্তি-ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হইত না। কারণ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্র কোন-না-কোন বৃহৎ শক্তির আশ্রিত রাষ্ট্র বলিয়া একটি বৃহৎ রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ভিটো প্রয়োগ করিত অর্থাৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা-সম্পর্কিত ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যেরই সম্মতি আবশ্যিক। একজন সদস্য অসম্মতি প্রকাশ করিলেই অপর চারজনের সম্মতি অর্থশূন্য হয়। এই নিয়ম বলবৎ থাকিবার ফলে নিরাপত্তা পরিষদ ইহার প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা কার্যে কার্যতঃ ব্যর্থ-কাম হয়।

প্রধানতঃ মার্কিন সরকারের অনুপ্রেরণায় সাধারণ সভা কর্তৃক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ ইহার স্থায়ী সদস্যগণের 'সর্বসম্মত মত' (Unanimity) নীতির ফলে কোন ক্ষেত্রে যদি শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অসমর্থ হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ সভা জরুরী অধিবেশনে মিলিত হইয়া পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করিবে এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে শান্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিবে।

এতদিন পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা-পরিষদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা-পরিষদ ব্যর্থ হইলে সাধারণ সভাই জাতিপুঞ্জের এই প্রধান দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। ইহার ফলে সাধারণ সভার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সেনাবাহিনী মিশরে প্রেরিত হয়।

(গ) কমিটি ব্যবস্থা—Committee System

সাধারণ সভার কার্য সাতটি বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়। কমিটিগুলি হইল: ১। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণসহ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তামূলক, ২। অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সম্বন্ধীয়, ৩। সামাজিক, মানবিক ও কৃষ্টিমূলক, ৪। অছি-সংক্রান্ত, ৫। শাসন ও আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত, ৬। আইন সম্বন্ধীয় ও ৭। বিশেষ রাজনৈতিক কমিটি। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কয়েকটি অস্থায়ী (*Ad hoc*) কমিটিও আছে।

সাধারণ সভার মূল্যায়ন—Evaluation of the General Assembly

সাধারণ সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্ববৃহৎ সংস্থা। এই সভা পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত। মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ফলে এই সভার শক্তি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে সাম্যবাদী চীন এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সদস্যপদভুক্তির ফলে এই সভার গুরুত্ব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই সভার বিশ্ব-সংস্থা নাম সার্থক হইবে।

এই সভা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার গৌণ দায়িত্বের অংশীদার হইলেও শান্তি প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ নীতি গৃহীত হইবার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্বভারও এই সভায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সভা সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের ক্ষমতাভুক্ত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সদস্যগণকে সুপারিশ করিতে পারে কিন্তু এই সুপারিশ গ্রহণ সদস্যগণের পক্ষে বাধ্যতা-মূলক নহে। এই সভা জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সংস্থাগুলির কার্যের তদারক করিতে পারে। একমাত্র নিরাপত্তা-পরিষদ, অছি-পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অস্থায়ী সদস্যগণকে এই সভা এককভাবে নির্বাচন করিতে পারে। কিন্তু নূতন সদস্য গ্রহণ বা পুরাতন সদস্য বহিষ্কার বা জাতিপুঞ্জের প্রধান কর্মসচিবের নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপার নিরাপত্তা পরিষদের সহিত যৌথভাবে পরিচালিত হয়।

অন্যান্য ক্ষমতার উল্লেখ না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ সভার এককভাবে ইহার নিজের সদস্য গ্রহণ বা বহিষ্কার করিবার ক্ষমতা নাই। এ ব্যাপারে সভা নিরাপত্তা পরিষদের উপর নির্ভরশীল। এই সভা পৃথিবীর বৃহত্তম প্রতিনিধিমূলক পরিষদ হইলেও জাতিপুঞ্জের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা হইল গৌণ। সাধারণ সভার এই গৌণ ভূমিকার কারণও সুস্পষ্ট: গ্রেট্ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজেতা এবং বিজেতা এই ত্রি-শক্তি হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টিকর্তা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টিকর্তাগণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ-ভাবে সমানাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পিত ও গঠিত সাধারণ সভার হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার বিরোধী ছিলেন—কারণ এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও স্বল্প শক্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি একজোট হইয়া বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজেদের সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে পারে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজেতাগণ নিজেদের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া গঠন করেন।

২। নিরাপত্তা পরিষদ—The Security Council

(ক) সংগঠন, অধিবেশন ও ভোটদান পদ্ধতি—Composition, Session and Voting Procedure

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ১১ জন সদস্য লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত ছিল। এই বৎসর হইতে ইহার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৫ করা হয়। ৫ জন স্থায়ী সদস্য (Permanent Members) এবং ১০ জন অস্থায়ী সদস্য (Non-permanent) লইয়া এই পরিষদ গঠিত। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চীন এই পরিষদের স্থায়ী সদস্য ছিল। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে সাম্যবাদী চীনের জাতিপুঞ্জের সদস্যপদভুক্তির ফলে ফরমোজায় নির্বাসিত জাতীয়তা-বাদী চীন এই পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং সাম্যবাদী চীন সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। বর্তমানে ৫ জন স্থায়ী সদস্য হইল—১। গ্রেট্ বৃটেন, ২। ফরাসীদেশ, ৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৪। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও ৫। সাম্য-বাদী চীন। অবশিষ্ট ১০জন অস্থায়ী সদস্য সাধারণ সভার ⅔ সংখ্যাধিক্য ভোটে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অস্থায়ী সদস্যগণের কার্যকাল শেষ হইলে সহসা তাঁহারা আর পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন না। সদস্য নির্বাচন ব্যাপারে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সদস্যগণের অবদান ও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের যথাযথ ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় জাতিপুঞ্জের এরূপ কোন সদস্য-রাষ্ট্রের বিশেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের আলোচনা কালে এরূপ রাষ্ট্রের এক-জন প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত থাকিয়া তাহার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন কিন্তু ভোটদান করিতে পারেন না। নিরাপত্তা পরিষদও বিরোধ মীমাংসা ক্ষেত্রে এরূপ রাষ্ট্রকে বিরোধ বিষয় আলোচনা কালে নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত থাকিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ ইহার কার্য পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করে এবং প্রতি মাসের জন্য ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে পর্যায়ক্রমে একজন সদস্যকে সভাপতিপদে নির্বাচন করে। নিরাপত্তা পরিষদ ইচ্ছা করিলে ইহার প্রধান কর্মস্থল নিউইয়র্ক ব্যতীতও অন্যত্র ইহার অধিবেশন বসাইতে পারে।

সাধারণতঃ, একপক্ষকালের মধ্যে ইহার একটি অধিবেশন বসে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরও সচরাচর ইহার অধিবেশন বসিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজন হইলে যাহাতে বিরাম-হীনভাবে অধিবেশন চালাইতে পারে

তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক সদস্যরই ইহার প্রধান কর্মকেন্দ্রে সকল সময়ের জন্য একজন স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত রাখিতে হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যেরই একটি করিয়া ভোটদান করিবার অধিকার আছে। কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত ব্যাপারে (Procedural matters) ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন সদস্যের সম্মতি আবশ্যিক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (Substantive matters) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে স্থায়ী ৫ জন সদস্যসহ ৯ জন সদস্যের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে ৫ জন স্থায়ী সদস্য একমত না হইলে সিদ্ধান্তটি কার্যকর হয় না। একজন সদস্য অসম্মতি প্রকাশ করিলে অপর ৪ জন স্থায়ী সদস্য ও ৫ জন অস্থায়ী সদস্যের সম্মতি বিফল হয়। এই একজন সদস্যের অসম্মতিই বৃহৎ শক্তিবর্গের নাকচ করিবার ক্ষমতা (Veto Power) নামে কুখ্যাত। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার পথে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটদানে কোন সদস্যও বিরতও থাকিতে পারেন। এই বিরতি ভিটো প্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

ভিটো ক্ষমতার ইতিহাস হইল যে, স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো সম্মেলনে যখন ভবিষ্যৎ জাতিপুঞ্জের সংগঠন কাঠামো উপস্থাপিত হয় তখন উপস্থিত অধিকাংশ রাষ্ট্রই ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগের বিরোধিতা করে। বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষ করিয়া মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয় তাঁহাদের এই বিশেষ ক্ষমতার দাবি সম্পর্কে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিল। এই দাবির সমর্থনে তাঁহাদের যুক্তি হইল যে, যেহেতু তাঁহারাই অক্ষ শক্তিকে (Axis Power) পরাজিত করিয়া জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন সেইহেতু ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে তাঁহাদের ভূমিকা হইবে মুখ্য। যদি তাঁহাদের এই বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাঁহারা জাতিপুঞ্জ সংগঠনে যোগদান করিবেন না। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ভীতি প্রদর্শনের ফলে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সমানাধিকার নীতি বিসর্জন দিয়া বৃহৎ পঞ্চশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু বৃহৎ পঞ্চশক্তি বিশেষ করিয়া মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয় তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের যুদ্ধকালীন ঐক্য ও সংহতি চিরস্থায়ী

-নাও হইতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার স্বল্পকাল মধ্যেই ঐ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যের স্থলে অনৈক্য ও সংহতির পরিবর্তে তীব্র বিরোধ আবির্ভূত হইয়া জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় অনতিক্রমনীয় বাধা সৃষ্টি করে। যখনই কোন বৃহৎ শক্তি বা ইহার আশ্রয়পুষ্ট কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের অভিযোগে নিরাপত্তা পরিষদ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যত হয় তখনই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ইহার ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদকে ক্ষমতাহীন করে। স্বস্তিপরিষদের এই দুর্বলতার কারণেই ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে শান্তির প্রস্তাব উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বিধিটি সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

(খ) নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী—Powers and Functions of the Security Council

নিরাপত্তা পরিষদের নামকরণে ইহার কার্যের ইংগিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। সনদ অনুসারে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের কর্তব্য হইল পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লওয়া ও কার্যকর করা।

কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাভঙ্গ প্রত্যাসন্ন হইলে নিরাপত্তা পরিষদ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারে অথবা জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদস্য শান্তিভঙ্গের আশংকা ঘটিলে এ বিষয়ে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে বা জাতিপুঞ্জের প্রধান কর্মসচিবও শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ক্ষেত্রে বিষয়টি পরিষদের গোচরীভূত করিতে পারেন। জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্রও কোন বিরোধে জড়িত হইলে বিষয়টি পরিষদকে জানাইতে পারে।

১। উপরি-উক্ত উপায়ে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হইলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিমূলক পদ্ধতিতে অর্থাৎ আপস, শালিসী, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, বিচারালয়ের সাহায্য বা কাহারও মধ্য-বর্তিতার সাহায্যে বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য বিরোধী পক্ষগুলিকে আহ্বান জানাইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের এই আহ্বান উপেক্ষিত হইলে, পরিষদ বিবদমান পক্ষগুলিকে অস্ত্র সংবরণ ও সৈন্য অপসারণ করিবার

অনুরোধ জানাইতে পারে। এই অনুরোধ ব্যর্থ হইলে পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে অন্য উপায়ে চাপ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। পরিষদ জাতিপুঞ্জের সদস্যগণকে শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সহিত সকল সম্পর্ক ও সংযোগ—রেল, পোষ্ট-টেলিগ্রাফ, জলপথ, আকাশ-পথ, বেতার প্রভৃতি ছিন্ন করিবার সুপারিশ করিতে পারে। এমন কি কূট-নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সুপারিশও করিতে পারে।

২। শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃস্থাপনে উপরি-উক্ত শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি বিফল হইলে নিরাপত্তা পরিষদ বলপ্রয়োগ উপায় অবলম্বন করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী নিযুক্ত করিয়া শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক বলপ্রয়োগ নীতি প্রযুক্ত হইলে সদস্যগণের কর্তব্য হইল সৈন্য ও সমরসম্ভার দ্বারা পরিষদের কার্যে সাহায্য করা।

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদ যতদিন পর্যন্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করে ততদিন পর্যন্ত আক্রান্ত রাষ্ট্রটির একক বা যৌথভাবে আত্মরক্ষা করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। এই আত্মরক্ষা-মূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে আক্রান্ত রাষ্ট্রের পূর্ণ বিবরণ দান করিতে হইবে। আক্রান্ত রাষ্ট্র আত্মরক্ষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেও নিরাপত্তা পরিষদের বিরোধ মীমাংসা করিবার ক্ষমতা কোন মতেই ক্ষুণ্ণ হয় না।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ সভার সহিত যুক্তভাবে স্বতন্ত্র ভোটদান পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ১৫ জন বিচারপতি নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। জাতিপুঞ্জের মহা-সচিব পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(গ) কমিটি ব্যবস্থা—Committee System

নিরাপত্তা পরিষদ ইহার কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করিতে পারে। এই কমিটিগুলির মধ্যে স্থায়ী (Standing) ও অস্থায়ী (Ad hoc)

উভয় প্রকার কমিটি আছে। ১১ জন বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি আছে। নূতন সদস্য গ্রহণ বিবেচনা করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আর একটি স্থায়ী কমিটি আছে।

ইহা ছাড়া, সামরিক কর্মচারী কমিটি (Military Staff Committee) ও নিরস্ত্রীকরণ আযোগ (Disarmament Commission) নামক আরও দুইটি বিশেষ কমিটি পরিষদের সহিত যুক্ত আছে। প্রথমোক্ত কমিটি নিরাপত্তা পরিষদকে সামরিক বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দান করে এবং নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত সেনাবাহিনীর পরিচালনাভার এই কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সেনাধ্যক্ষ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটি গঠিত।

দ্বিতীয় কমিটিটি নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদকে পরামর্শ দান করে।

সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক---Relation between the General Assembly and the Security Council

রাষ্ট্রগুলির আইনসভার ন্যায় জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা হইল বহু সদস্য লইয়া গঠিত একটি আলোচনা ও বিতর্ক সভা। অপর পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদ হইল কমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত জাতিপুঞ্জের শাসন কর্তৃপক্ষ।

সাধারণ সভা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষমতাভুক্ত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। অপর পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কর্তব্য হইল জগতের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। সনদ অনুসারে যে সমস্ত বিরোধের বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আনীত হয়, পরিষদ একমাত্র সেই সমস্ত বিরোধগুলির মীমাংসা করিতে পারে। অপর পক্ষে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক উপস্থাপিত বাৎসরিক বা বিশেষ বিবরণীগুলি পরীক্ষা করিতে পারিলেও নিরাপত্তা পরিষদ যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপর সাধারণ সভার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ না করিলে যে বিরোধ মীমাংসা করিবার

ভার নিরাপত্তা পরিষদ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে, সে বিরোধ সম্পর্কে সাধারণ সভা কোন সুপারিশ করিতে পারে না।

শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক দায়িত্ব হইলেও সনদের ১২ ধারা অনুসারে সাধারণ সভারও কিছু দায়িত্ব আছে। কোন বিরোধ সম্পর্কে সাধারণ সভা আলাপ-আলোচনা করিয়া বিবরণী প্রস্তুত করিতে পারে। সনদের এই ধারার বলে সাধারণ সভা কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে এই উভয়ের সহযোগিতাও দেখা যায়। নূতন সদস্য গ্রহণ, সদস্য বহিষ্কার, মহা-সচিবের নিয়োগ, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণের নিয়োগ ও জাতিপুঞ্জ সনদের সংশোধন প্রভৃতি ব্যাপার উভয়ের সম্মতি-সাপেক্ষ।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব হইল নিরাপত্তা পরিষদের আর এ বিষয়ে সাধারণ সভার দায়িত্ব হইল গৌণ। কিন্তু বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা দ্বারা পরিষদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের এই দুর্বলতা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত শান্তির প্রস্তাব উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া (Uniting for Peace Resolution) কার্যক্রমটি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে উভয়ের সহযোগিতা অপরিহার্য।

নিরাপত্তা পরিষদের মূল্যায়ন—**Appraisal of the Security Council**

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শক্তিশালী ও সক্রিয় অঙ্গ হইল নিরাপত্তা পরিষদ। এই পরিষদের প্রধান দায়িত্ব হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ ক্ষেত্রে পরিষদের দায়িত্ব বলিতে কার্যতঃ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের দায়িত্ব বুঝায়—কারণ আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে বৃহৎ পঞ্চশক্তির এ বিষয়ে একমত হইতে হইবে। কোন একজন সদস্য ভিটো প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ

প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে নিরাপত্তা পরিষদ কোন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ঐক্য ও সংহতি অনৈক্য এমন কি বিরোধে পরিণত হয়। ইহার ফলে পঞ্চশক্তির একগোষ্ঠী উত্থাপিত প্রস্তাব অন্য গোষ্ঠীর ভিটোপ্রয়োগে বাতিল হইতে লাগিল। এইরূপে পঞ্চশক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বে নিরাপত্তা পরিষদ ক্রমশই দুর্বল হইতে লাগিল। ইহার ফলে নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব সাধারণ সভার হস্তে হস্তান্তরিত হইল।

নিরাপত্তা পরিষদে পঞ্চশক্তির এই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হইলেও স্থায়ী সদস্য এই পঞ্চশক্তি যদি স্বার্থের ভিত্তিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হইয়া জাতিপুঞ্জের মহান উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর তৎপর হইতেন তাহা হইলে বিবদমান ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন রাষ্ট্রই এই সম্মিলিত পঞ্চশক্তির নির্দেশ অমান্য করিতে সাহসী হইত না। বৃহৎ পঞ্চশক্তির সর্বসম্মত মত জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সক্ষম হইত।

বৃহৎ পঞ্চশক্তি সম্পর্কে আরও কিছু অভিযোগ করা যাইতে পারে। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চীন নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের অন্যতম সদস্য ছিল। জাতীয়তাবাদী চীনের চীন মূল ভূখণ্ডে কোন অধিকার ছিল না। পূর্বতন চীন সরকার মূল ভূখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়া ফরমোজা দ্বীপে নির্বাসিত হয়। যেহেতু ফরমোজায় নির্বাসিত তথাকথিত চীন সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার ছিল, সেইহেতু চীনের প্রকৃত সাম্যবাদী সরকারকে স্বীকৃতি দান না করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ-স্বার্থের খাতিরে এই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী চীন সরকারকে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের অন্তর্ভুক্ত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ ও অসম আচরণের ফলে নিরাপত্তা পরিষদের শক্তি ও মর্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে এফ্রো-এসিয় দেশগুলির, ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সমর্থনে মার্কিন বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রকৃত চীন সরকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হইয়া নিরাপত্তা পরিষদের একজন স্থায়ী সদস্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। সাম্যবাদী চীনের অন্তর্ভুক্তির ফলে নিরাপত্তা পরিষদ তথা জাতিপুঞ্জের সংগঠনে যে ত্রুটি ছিল তাহা দূর হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যে চীন তাহার কার্যকলাপ দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা

ক্ষেত্রে ইহার নিরপেক্ষতা বা স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দিতে পারে নাই। পাকিস্তানকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে চীন ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র নবগঠিত বাংলাদেশের জাতিপুঞ্জ সদস্যভুক্তির বিরোধিতা করিতেছে।

ইহা ছাড়া বলা যায় যে, মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয় ব্যতীত অপর স্থায়ী সদস্যগণ বৃহৎ শক্তি বলিয়া বর্তমানে পরিগণিত হইতে পারেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। গ্রেট বৃটেন ও ফরাসী দেশ বোধ হয় আজ আর বৃহৎ শক্তি বলিয়া দাবী করিতে পারে না। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ের অংশীদার বলিয়া এই দুই শক্তি যদি নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকেন তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদের নামকরণ বিফল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদের সাংগঠনিক ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত ত্রুটিগুলি দূর করা আশু প্রয়োজন। তবে আশার কথা এফ্রো-এসিয়, দক্ষিণ আমেরিকা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত দেশগুলি ক্রমশই ঐক্যবদ্ধ হইয়া বৃহৎ পঞ্চশক্তির অযৌক্তিক প্রাধান্যে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

৩। আন্তর্জাতিক বিচারালয়—The International Court of justice

আন্তর্জাতিক বিচারালয় হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিচার-বিভাগীয় অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে এই বিচারালয় হইল অধুনালুপ্ত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যে আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত হইয়াছিল তাহারই উত্তরাধিকারী। পূর্বতন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উত্তরাধিকারী হইলেও এই বিচারালয় পূর্বতন বিচারালয়ের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতিপুঞ্জের সনদে লিখিত বিধি-উপবিধিগুলির দ্বারা এই নূতন বিচারালয়ের কার্যাবলী পরিচালিত হয়।

(ক) সংগঠন, যোগ্যতা ও কার্যকাল—Organisation, Qualifications and Duration

পনের জন বিচারপতি লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ পৃথকভাবে ভোটদান করিয়া নিরংকুশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে বিচারপতিগণকে নির্বাচিত করেন। বিচারপতিগণের গুণ ও যোগ্যতা

আদৌ জাতিভিত্তিক নহে। বিচারপতিরূপে নির্বাচিত হইতে গেলে বিচারপতিপদপ্রার্থীর উচ্চ মানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া চাই এবং তাঁহার স্বদেশের উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা থাকা চাই অথবা অবধারিত আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ হওয়া চাই, তবে নির্বাচনকালে নির্বাচকমণ্ডলীকে মনে রাখিতে হইবে বিচারপতি নির্বাচন ব্যাপারে যেন পৃথিবীর প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলি ও প্রধান প্রধান আইন ব্যবস্থাগুলির প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হয়। একই দেশের দুইজন বিচারপতি যাহাতে এক সঙ্গে নির্বাচিত না হইতে পারেন সেদিকেও নির্বাচকমণ্ডলীর লক্ষ্য রাখিতে হয়।

বিচারপতিগণ নয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। কার্যকাল অবসানের পূর্বে কোন বিচারপতির পদ কোন কারণে শূন্য হইলে কার্যকালের অবশিষ্টাংশের জন্য নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচজন বিচারপতির পদ প্রতি তিন বৎসর অন্তে পূরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় তিন বৎসরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে এবং এই উভয়েই পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। বিচারালয় একজন কর্মসচিব (Registrar) ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করে। বিচারবিভাগীয় অবকাশ ব্যতীত অন্য সকল সময়ে বিচারালয়ের অধিবেশন চলে। বিচারালয়ের কার্য যাহাতে দ্রুত পরিচালিত হয় তদুদ্দেশে পাঁচজন বিচারপতি লইয়া একবৎসরের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। নয়জন বিচারপতি উপস্থিত থাকিলেই বিচার কার্য পরিচালিত হইতে পারে। দুইটি দেশের বিরোধের বিচারক্ষেত্রে যদি একটি দেশের একজন বিচারপতি থাকেন তাহা হইলে অপর বিরোধী দেশও বিচারকালে একজন নিজ বিচারপতি দিতে পারে।

(খ) বিচারপতিগণের সুযোগ-সুবিধা—Privileges of Judges

কোন বিচারপতিকেই অন্য সমুদয় বিচারপতির সর্বসম্মত মত ব্যতীত পদচ্যুত করা যায় না। বিচারপতিগণ কূটনৈতিক সুবিধা ও নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। বিচারালয়ের বিচারপতিগণ বেতনভুক ও সভাপতি ও সহ-সভাপতি অতিরিক্ত দৈনিক ও বাৎসরিক ভাতা পাইয়া থাকেন। তবে কোন বিচার-

পতি কোন রাজনৈতিক ও শাসন-সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত হইতে পারেন না বা কোন বিচারক্ষেত্রে আইনজীবী অথবা পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতে পারেন না।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা—Jurisdiction and Competence of the International Court of Justice

জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য এই বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারেন। তবে জাতিপুঞ্জে যোগদান করিলেও যেহেতু রাষ্ট্রগুলি তাহাদের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই, সেইহেতু কোন সদস্যরাষ্ট্রকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিচারালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত করা সম্ভব নয়। অভিযুক্ত রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিচারালয় কোন রাষ্ট্র কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিচার করিতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভার অনুমোদনে সদস্য-পদ-বিহীন রাষ্ট্রও এই বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে। সুতরাং এই বিচারালয়ের কোন বাধ্যতামূলক এক্তিয়ার (Compulsory jurisdiction) নাই।

বিবদমান সদস্যরাষ্ট্রগুলি এই বিচারালয়ের বাধ্যতামূলক এক্তিয়ারভুক্ত হইতে সম্মত হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার করিতে পারে।

(১) কোন চুক্তির ব্যাখ্যা,

(২) আন্তর্জাতিক আইন-সম্পর্কিত প্রশ্ন,

(৩) যে তথ্য প্রমাণিত হইলে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের কর্তব্য ভঙ্গ হয়,

(৪) দায়িত্ব পালনে কর্তব্য ভঙ্গের ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ।

যে সকল সদস্যরাষ্ট্র বিচারালয়ের বাধ্যতামূলক এক্তিয়ারভুক্ত হয় তাহারা শর্তহীনভাবে অথবা একাধিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে স্থায়িভাবে অথবা সাময়িকভাবে এই বিচারালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত হইতে পারে।

১। বিচারালয়ের পরামর্শদান কার্য—Advisory Functions

সাধারণ সভা অথবা নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ করিলে এই বিচারালয়

আইন সম্পর্কিত ব্যাপারে পরামর্শ দান করিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষীকৃত শাখাগুলিও বিচারালয়ের পরামর্শ চাহিতে পারে।

হল্যাণ্ড দেশের হেগ শহরে এই বিচারালয় অবস্থিত। কিন্তু অন্যত্রও ইহার অধিবেশন বসিতে পারে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মূল্যায়ন—Appraisal of the International Court of Justice

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংগঠনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে আনীত অভিযোগ শুনানীকালে যদি অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত রাষ্ট্রের কোন একটির আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নিয়মিত বিচারপতি না থাকে তাহা হইলে সেই রাষ্ট্র বিরোধের বিষয় শুনানীকালে সাময়িকভাবে একজন বিচারপতি নিযুক্ত করিতে পারে। এই নিয়মটি এরূপ রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ন্যায় বিচার ও পক্ষপাতশূন্যতার প্রতি অনাস্থা সূচিত করে। অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত রাষ্ট্র ইহার কৌঁসিলি দ্বারা প্রকৃত তথ্য ও বক্তব্য পেশ করিতে পারে। স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগের অর্থ হইল যে, নিযুক্ত বিচারপতি নিরপেক্ষ না হইয়া দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইবেন।

বিচারালয়ের কোন বাধ্যতামূলক এক্তিয়ার না থাকিবার ফলে ইহার কার্যকারিতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, এই বিচারালয় প্রতিষ্ঠার ফলে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার একটি পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। কার্যতঃ বহু রাষ্ট্র এই বিচারালয়ের সাহায্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়াছে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা এই বিচারালয় আন্তর্জাতিক আইনকে আরও সুস্পষ্ট ও উন্নতিশীল করিয়াছে।

৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—The Economic and Social Council

১। সংগঠন, অধিবেশন ও কার্যকাল—Organisation, Session and Duration

বর্তমানে ২৭ জন সদস্য লইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত। সদস্যগণ সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কার্যকাল

শেষ হইলে ইঁহারা পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। এই পরিষদের ৯ জন সদস্য প্রতি বৎসর নির্বাচিত হন।

পরিষদ একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে এবং ইহার নিজস্ব কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করে। বৎসরে এই পরিষদের দুইটি নিয়মিত অধিবেশন বসে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে বিশেষ অধিবেশনও আহ্বান করা যায়। প্রত্যেক সদস্য একটি করিয়া ভোটদান করিতে পারে এবং পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়।

২। পরিষদের উদ্দেশ্য—Purpose of the Council

নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশ্য হইল জগৎবাসীকে যুদ্ধের আতংক হইতে মুক্ত করা আর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য হইল মানব জাতিকে অভাব-অনটনের ভয়মুক্ত করা। দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য যেরূপ বিপ্লবের কারণ হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তদ্রূপ আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কারণ হয়। এই কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিমূলক ও মানবিক সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাহায্যে সমাধানকল্পে এই পরিষদ গঠন করিয়াছে। মানবিক অধিকার ও মূল স্বাধীনতাগুলির প্রতি যাহাতে সকল জাতিই শ্রদ্ধাবান হয়, সেজন্যও এই পরিষদ প্রচেষ্টা করে।

৩। পরিষদের ক্ষমতা ও কার্য—Powers and Functions of the Council

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে পরিষদের উপর নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে :—

(ক) জীবিকার মান উন্নয়ন, পূর্ণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন,

(খ) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান এবং কৃষ্টি ও শিক্ষামূলক বিষয়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা,

(গ) জাতি-ধর্ম-ভাষা-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মানবিক অধিকারগুলি ও মূল স্বাধীনতাগুলির প্রতি সর্বব্যাপী শ্রদ্ধা ও ইহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

উপরি-উক্ত কার্যগুলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিষদ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়াছে।

(ক) পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে অথবা বিশেষজ্ঞ সাহায্যে ইহার কর্তব্য সম্পর্কিত ব্যাপারের তথ্য আহরণ করে এবং বিবরণী প্রস্তুত করে।

(খ) বিবরণী প্রস্তুত হইলে পরিষদ সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ সভার নিকট বা সদস্যরাষ্ট্রের নিকট বা বিশেষীকৃত শাখাগুলির নিকট সমস্যা সম্পর্কে সুপারিশ করে।

(গ) পরিষদ পূর্বে সাধারণ সভা কর্তৃক ইহার সুপারিশগুলি অনুমোদিত করাইয়া সুপারিশগুলি যাহাতে গৃহীত ও বলবৎ করা হয় তজ্জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলির নিকট পাঠাইতে পারে।

(ঘ) সদস্যরাষ্ট্রগুলি পরিষদের সুপারিশ কার্যকর করিবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তৎসম্পর্কে পরিষদ সদস্যরাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে একটি বিবরণী দাবী করিতে পারে। সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত বিবরণী পরিষদ ইহার মন্তব্যসহ সাধারণ সভার নিকট প্রেরণ করে।

(ঙ) নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে পরিষদকে নিরাপত্তা পরিষদেও তথ্য সরবরাহ করিতে হয়।

৪। পরিষদের বিভিন্ন সংস্থা—Commissions of the Council

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ইহার কার্যগুলি দুই জাতীয় সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদন করে, যথা, (১) কার্য সম্বন্ধীয় সংস্থা (Functional Commissions) ও (২) আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক সংস্থা (Regional Commissions)। কার্য সম্বন্ধীয় সংস্থাগুলি হইল—অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থান সংস্থা, মানবিক অধিকার সংস্থা, স্ত্রীলোকের সামাজিক পদমর্যাদা সংস্থা। অপর পক্ষে ইউরোপের জন্য অর্থনৈতিক সংস্থা, এসিয়া ও পূর্ব প্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক সংস্থা, ইত্যাদি হইল আঞ্চলিক সংস্থা। এতদ্ব্যতীত স্থায়ী কেন্দ্রীয় অহিফেন্ বোর্ড, আন্তর্জাতিক শিশুদের জন্য আকস্মিক তহবিল প্রভৃতি কতিপয় স্থায়ী সংস্থাও আছে।

৫। পরিষদের মূল্যায়ন—Appraisal of the Council

অভাব-অনটন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা হইল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রধান

উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল হইলে জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া যুদ্ধের একটি মূল কারণ দূরীভূত হইবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে এরূপ একটি পরিষদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই পরিষদের সংগঠন ও কার্য-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই পরিষদ নানাজাতীয় বহু শাখা ও উপ-শাখা লইয়া গঠিত। তথ্য আহরণ, গবেষণা, বিবরণী প্রণয়ন ও বিবরণী আলোচনা প্রভৃতি কার্যে ইহার সময় অতিবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই পরিষদের ক্ষমতা পরামর্শ দানে সীমাবদ্ধ।

৫। অছি-পরিষদ—The Trusteeship Council

পূর্বতন জাতিসংঘের অধীনে ক্ষুদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলির উপর কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কতিপয় রাষ্ট্রকে ভার দেওয়া হয়। বর্তমান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত অছি-পরিষদ হইল সেই পূর্বতন ব্যবস্থার একটি পরিবর্তিত রূপ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী, তুরস্ক প্রভৃতি বিজিত শক্তিবর্গের উপনিবেশগুলির শাসনভার জাতিসংঘ স্বয়ং গ্রহণ করে। কিন্তু কার্যতঃ এই শাসনভার জাতিসংঘ পুনরায় ইংলণ্ড, ফরাসীদেশ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিজেতা শক্তিবর্গের হস্তে ন্যস্ত করে। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার সময় এই কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানকারী রাষ্ট্রগুলির সদস্য লইয়া অছি-পরিষদ নামে নূতন একটি সংস্থা গঠিত হয়। অছি-পরিষদের হস্তে তিন জাতীয় স্থানের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানভার জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ন্যস্ত করা হয়। ১। পূর্বতন ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ, ২। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত দেশগুলির কিছু উপনিবেশ ও ৩। যে সমস্ত অঞ্চল স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইল।

১। সংগঠন ও কার্য-পদ্ধতি—Organisation and Procedure

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি ও সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত।

অছি-পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোটদান ক্ষমতা আছে। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সংখ্যাধিক্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পরিষদ একজন সভাপতি নির্বাচন করে এবং ইহার কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মাবলী রচনা করে। বৎসরে এই পরিষদের দুইটি অধিবেশন বসে।

২। কার্য ও ক্ষমতা—Powers and Functions

সাধারণ সভার অধীনে পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করিতে পারে :—

(ক) অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র কর্তৃক উপস্থাপিত বিবরণী বিবেচনা করা।

(খ) আবেদনপত্র গ্রহণ করা ও অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া আবেদনপত্র বিবেচনা করা।

(গ) অছি-শাসন কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্যে অছি-শাসনভুক্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করা।

(ঘ) অছি ব্যবস্থার নিয়মানুযায়ী আরও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অছি-শাসনের অধীন ১১টি দেশের মধ্যে ৯টি স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অবশিষ্ট দুইটির ভাগ্যও শীঘ্রই নির্ধারিত হইবে। ইহার ফলে বর্তমানে বৃটেন, ফরাসী দেশের অধীন কোন অছি-শাসন নাই। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন দুইটি অছি-শাসন বর্তমান। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদের যে পাঁচজন স্থায়ী সদস্য অছি-পরিষদের সদস্য আছেন তন্মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত। অপর চারটি রাষ্ট্র অছি-শাসন-বিহীন। সুতরাং একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপর দিকে অন্য চতুঃশক্তির মধ্যে ভারসাম্যের অভাবে ভবিষ্যতে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

৬। আন্তর্জাতিক মহাকরণ—The Secretariat

মহাসচিবের নেতৃত্বে এই আন্তর্জাতিক মহাকরণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করে। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কর্মচারী লইয়া এই মহাকরণ গঠিত। মহাসচিব ব্যতীত আরও চব্বিশ জন অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে এই বিশাল মহাকরণের কার্য পরিচালিত হয়। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মহাসচিব এই সমুদয়

কর্মচারী নিয়োগ করেন। সদস্যরাষ্ট্রগুলির নাগরিকগণই এই মহাকরণে নিযুক্ত হইতে পারেন। তবে এই মহাকরণে মার্কিন নাগরিকগণের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অতি উচ্চমানের যোগ্যতা ও সততা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই নিযুক্ত করা হয়। কর্মচারিবৃন্দের আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন হইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতি প্রধান আনুগত্য প্রকাশ করিতে হয়।

মহাকরণের কার্য সাতটি পৃথক্ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভাগগুলি হইল :—

১। নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়-সংক্রান্ত বিভাগ।

২। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিষয়-সংক্রান্ত বিভাগ।

৩। অছি-পরিষদ ও স্বায়ত্তশাসন-বিহীন অঞ্চলগুলির তথ্য-সংক্রান্ত বিভাগ।

৪। আইন সম্বন্ধীয় বিভাগ।

৫। সম্মেলন ও সাধারণ কাজ বিভাগ।

৬। শাসন ও অর্থ-সংক্রান্ত বিভাগ।

৭। তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ বিভাগ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে অসংখ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভাগুলির ব্যবস্থা মহাকরণের কর্মচারিবৃন্দ করে। সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার বিবরণী লিপিবদ্ধ করা, অনুবাদ করা ও রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন এই কর্মচারিবৃন্দকেই করিতে হয়। ইহা ছাড়া, নানাজাতীয় তথ্য, সংবাদ, দলিল প্রভৃতি প্রকাশ করা, সম্পাদিত চুক্তিগুলি বিধিবদ্ধ করা, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা এবং জাতিপুঞ্জের অন্যান্য শাখাগুলি কর্তৃক ন্যস্ত কার্য সম্পাদন করাও এই কর্মচারিবৃন্দের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

মহাসচিব—The Secretary-General

মহাসচিব হইলেন মহাকরণের অধিকর্তা। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের পর বর্তমানে চতুর্থ মহাসচিব নিযুক্ত আছেন। জাতিপুঞ্জ মহাসচিবের কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারে।

মহাসচিবের প্রধান কার্য হইল :—

১। নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ সভা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি-পরিষদ কর্তৃক যে যে কার্যভার মহাসচিবের উপর অর্পণ করিবে, মহাসচিব পরিষদগুলির সভায় সেই সেই কার্যগুলি সম্পাদন করিবেন।

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য সম্পর্কে তিনি সাধারণসভায় বাৎসরিক বিবরণী প্রদান করেন।

৩। তিনি যদি মনে করেন যে, কোন কারণে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশংকা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে এ বিষয়ে তিনি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন।

৪। নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাধিক্য সদস্যগণের অনুরোধে তিনি সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

৫। মহাসচিবের প্রধান দায়িত্ব হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যে রূপদান করা এবং বলা যায় যে, মহাসচিবের নিরপেক্ষতা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার উপর জাতিপুঞ্জের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষীকৃত শাখাসমূহ—The Specialised Agencies of the United Nations

বিশ্ব-মানবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত শাখাসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই শাখাগুলি সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অংগও নহে, অধীনও নহে। ইহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনশীল এবং নিজস্ব সনদ দ্বারা প্রত্যেকটি শাখার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ এই শাখাগুলির সদস্য নাও হইতে পারেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে এই শাখাগুলির উল্লেখ থাকিলেও এইগুলি রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির সম্মতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তবে এই বিশেষীকৃত শাখাগুলি জাতিপুঞ্জের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং জাতিপুঞ্জের সহিত একযোগে কাজ করে।

বিশেষীকৃত শাখাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা —United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (U. N. E. S. C. O.)

উদ্দেশ্য—Purpose

ফরসী ও বৃটিশ সরকারের অনুপ্রেরণায় এই সংস্থা গঠিত হয় এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর হইতে ইহার গঠনতন্ত্র কার্যকর হয়। এই সংস্থার প্রস্তাবনায় ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যেহেতু মানুষের মনেই প্রথম দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, সেইহেতু মানুষের মনেই শান্তি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়িতে হইবে ("That since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.")। জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়ের অজ্ঞতাই হইল পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের কারণ। সন্দেহ ও অবিশ্বাস হইল বিদ্বেষের জন্মদাতা এবং শেষ পর্যন্ত এই অজ্ঞতা-প্রসূত বিদ্বেষ জাতিগুলির মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ বিস্তার করে। সুতরাং যুদ্ধের কারণ দূর করিতে হইলে মানুষের মন হইতে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিতে হইবে। জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষামূলক, কৃষ্টিমূলক ও বিজ্ঞান-বিষয়ক আদান-প্রদান সাহায্যে সহযোগিতা সৃষ্টি দ্বারা পারস্পরিক অবিশ্বাসের মনোভাব দূর করিতে পারিলে শান্তির পরিবেশ সম্ভব হয়। শিক্ষা, কৃষ্টি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সহযোগিতা সৃষ্টি দ্বারা জাতিগুলির মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠা, আইনের অনুশাসন এবং জাতি-ধর্ম-ভাষা-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মানবিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করাই হইল এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য।

সংগঠন—Organisation

জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যেরই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইবার অধিকার আছে। জাতিপুঞ্জের সদস্য নহে এরূপ রাষ্ট্রও এই সংস্থার কার্যকরী বোর্ডের (Executive Board) সুপারিশক্রমে ইহার সাধারণ সম্মেলনের (General Conference) ঌ সংখ্যাধিক্য ভোটে সদস্য নির্বাচিত হইতে পারে।

সাধারণ সম্মেলন, কার্যকরী বোর্ড ও মহাকরণ—এই তিনটি বিভাগ দ্বারা এই সংস্থার কার্য পরিচালিত হয়।

কার্যকলাপ—Functions

(ক) জাতিগুলির মধ্যে চুক্তি সম্পাদন সাহায্যে গণসংযোগ বৃদ্ধি করিয়া ভাবের ও আদর্শের বিনিময়ের ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার দ্বারা পারস্পরিক পরিচয় ও বুঝাপড়া সম্ভব করা।

(খ) সদস্যগণের অনুরোধে সদস্যগণের সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জনশিক্ষা ও কৃষ্টি প্রসার করা, সকল জাতির স্ত্রী-পুরুষের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ দান করা এবং জগতের শিশুগণ যাহাতে তাহাদের স্বাধীনতার দায়িত্ব বহন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা।

(গ) অর্জিত জ্ঞান রক্ষা করা, বৃদ্ধি করা ও প্রচার করা।

২। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা—International Labour Organisation (I. L. O.)

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থা গঠিত হয় এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা জাতিসংঘের সহিত সম্পর্কিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদস্য এই সংস্থার শর্ত মানিয়া লইলে ইহার সদস্য হইতে পারে। জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্রও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সাধারণ সম্মেলনের অনুমোদনে ইহার সদস্য হইতে পারে।

উদ্দেশ্য—Purpose

পৃথিবীর সকল শ্রমিকের উচ্চ মানের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। সমান সুযোগ ও সম্মানের ভিত্তিতে কাজ করিয়া যাহাতে সকল শ্রমিকই তাহার অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়, সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করা এই সংস্থার মুখ্য কাজ। এই উদ্দেশ্য সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে সুপারিশ করে।

কার্য—Functions

(ক) পূর্ণ কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

(খ) যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী শ্রমিকগণকে উপযুক্ত কাজে নিয়োগ দ্বারা শ্রমের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা সুনিশ্চিত করা।

(গ) শ্রমিকের শিক্ষার উন্নতি ও গতিশীলতা বৃদ্ধির সাহায্যে উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করা।

(ঘ) পারিশ্রমিকের পরিমাণ, কার্যকালের সময় প্রভৃতি নির্ধারণ সাহায্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) শ্রমিকগণের যৌথভাবে দর কষাকষি (Collective Bargaining) করিবার অধিকার ও সর্ববিষয়ে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা স্থাপনে সাহায্য করা।

(চ) সকল প্রকার কাজে শ্রমিকদের জীবনের ও স্বাস্থ্যের উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা।

(ছ) শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা এবং পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

(জ) সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমটি হইল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন। ইহা শ্রমিক, মালিক ও সদস্যরাষ্ট্রগুলির সরকারের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়টি হইল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী আর তৃতীয়টি হইল আন্তর্জাতিক শ্রমিক কার্যালয়।

৩। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা—World Health Organisation (W. H. O.)

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জন্ম হয় এবং প্রতি বৎসর এই দিনটি বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস বলিয়া পালিত হয়। জাতিপুঞ্জ সদস্য ব্যতীতও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিষদের সংখ্যাধিক্যের ভোটে সদস্য হইতে পারে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকেই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত উন্নয়নকার্য এবং এই সংস্থার স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সুপারিশগুলি বলবৎ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছে, সে সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণী বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় উপস্থাপিত করিতে হয়।

উদ্দেশ্য—Purpose

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যের অর্থ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, স্বাস্থ্যের অর্থ শুধু ব্যাধি মুক্তি বা দুর্বলতার অভাব নহে। স্বাস্থ্যের অর্থ হইল পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ। সকল মানুষেরই নির্বিচারে সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবার দাবি আছে। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মৌলিক উপাদান হইল সকল মানুষের স্বাস্থ্য অর্থাৎ সকলের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ। সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণেই বিরোধের অবসান ঘটে। শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন হইল প্রাথমিক গুরুত্বসম্পন্ন কর্তব্য। জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হইল সরকারের পবিত্র কর্তব্য এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারের উপযুক্ত সামাজিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্য করণীয়।

কার্য—Functions

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিতে হয়। এই কার্যগুলি সম্পাদনের জন্য ইহার জাতিপুঞ্জ ও অন্যান্য বিশেষীকৃত শাখাগুলি, রাষ্ট্রীয় সরকার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সংস্থাগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হয়।

(ক) আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কাজ নিয়ন্ত্রণ করা ও কাজগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করা।

(খ) কোন সরকার অনুরোধ করিলে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যবস্থা শক্তিশালী করিতে সাহায্য করা এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে,

(গ) সরকারগুলির অনুরোধে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান, কলা-কৌশল ও অন্য প্রকারে সাহায্য দান করা।

(ঘ) সর্বপ্রকারের ব্যাধি নির্মূল করিবার প্রচেষ্টায় উৎসাহ ও সাহায্য দান করা।

(ঙ) প্রয়োজন ক্ষেত্রে অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাস-গৃহ, অবসর বিনোদন প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

(চ) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক শাস্ত্রের শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।

(ছ) মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং পরি-বর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বাঁচিয়া থাকি-বার শক্তি অর্জনে উৎসাহ দান করা।

অন্যান্য বিশেষীকৃত শাখাগুলির মত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাজও তিনটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

৪। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা—Food and Agricultural Organisation (F. A. O.)

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থাটি গঠিত হয় এবং পরবর্তী বৎসরে জাতিপুঞ্জের সহিত সম্পর্কিত হয়। ৪৪ জন সদস্য লইয়া এই সংস্থা প্রথম গঠিত হয়। এই সংস্থার সম্মেলনের ⅔ সংখ্যাধিক্য ভোটে নূতন সদস্য গ্রহণ করা যায়। রোম শহরে ইহার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

উদ্দেশ্য—Purpose

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধীন জনসমূহের পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

(খ) খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।

(গ) পল্লীবাসিগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

কার্যাবলী—Functions

(ক) মৎস্য, অন্যান্য জলজাত দ্রব্য, বনসম্পদসহ কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে তথ্য ও সংবাদ আহরণ, বিশ্লেষণ ও প্রচার করা।

(খ) খাদ্য, কৃষি ও পুষ্টি বিষয়ে সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ধরণের গবেষণা পরিচালনা করা।

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) বিক্রয় ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

(ঙ) উপযুক্ত পরিমাণ কৃষি ঋণদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ।

(চ) রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি অনুরোধ করিলে খাদ্য, কৃষি ও পুষ্টি সম্পর্কে সরকারগুলিকে সর্বপ্রকার সাহায্যদান।

এ সংস্থার কাজও তিনটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

৫। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল—International Monetary Fund (I. M. F.)

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। বর্তমানে শতাধিক রাষ্ট্র এই সংস্থার সদস্যভুক্ত। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি লইয়া এই সংস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালক সভা (Boa d of Governors) গঠিত। ২০ জন সদস্য লইয়া ইহার একটি কার্যকরী অধিকর্তামণ্ডলী (Executive Directors) আছে। অধিকর্তামণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত একজন সভাপতি পদাধিকারবলে (Managing Director) এই সংস্থার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন।

এই সংস্থার উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুষম প্রসার ও বৃদ্ধির সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর্মসংস্থান ও প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক বিনিময় হার স্থিরীকরণ দ্বারা মূল্যমান অপরিবর্তিত রাখিতে এই সংস্থা সাহায্য করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনার অসাম্য দূর করিবার জন্য এই সংস্থা সদস্যগণকে ঋণ দান করে।

৬। পুনর্গঠন ও উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক ব্যাংক (বিশ্বব্যাংক) —International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ২৮টি রাষ্ট্রের চুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা জাতিপুঞ্জের একটি বিশেষীকৃত শাখা-ভুক্ত হয়।

৬৮টি সদস্যরাষ্ট্র লইয়া এই ব্যাংক গঠিত হয় ও পরবর্তী কালে ইহার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া শতাধিক হইয়াছে। এই ব্যাংকের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২২,৪২০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ইহার প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হইল ১০০,০০০ ডলার। ওয়াশিংটন নগরে এই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

উদ্দেশ্য Purpose

সদস্যগণের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য সাহায্য করা বিশ্বব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য। দীর্ঘমেয়াদী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুষম বৃদ্ধি দ্বারা আন্তর্জাতিক লেন-দেনের সমতা রক্ষা করিবার জন্যও এই ব্যাংক সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য দান করে।

পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্যের জন্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক ১০°টি রাষ্ট্রকে প্রায় ৯,৩১২ মিলিয়ন পাউণ্ড ধার দেয়। এসিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে এই ব্যাংক রেল, জাহাজ-পরিবহণ বন্দর নির্মাণ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বহু পরিমাণে সাহায্য দান করিয়াছে। ভারতকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাংক একটি বিশেষ সমিতি (Aid India Consortium) গঠন করে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধুনদীর জল বণ্টন-ব্যবস্থা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক মীমাংসিত হয়।

৭। আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা—International Finance Corporation

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থাটি গঠিত হয় এবং ইহা বিশ্বব্যাংকের অধীনে কাজ করে। বিনা জামিনে এই সংস্থা বে-সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প বাণিজ্যে ঋণদান করে। লৌহ-ইস্পাত, বয়ন, কাগজ প্রভৃতি শিল্প-উন্নয়নের জন্য এই সংস্থা ৩৬টি দেশের শতাধিক প্রতিষ্ঠানে ১৯২.৪ মিলিয়ন পাউণ্ড ঋণদান করিয়াছে।

উপরি-উক্ত সংস্থাগুলি ব্যতীতও জাতিপুঞ্জের সহিত সম্পর্কিত আরও কতিপয় সংস্থা আছে। যথা, (৮) আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা, (৯) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, (১০) আন্তর্জাতিক বে-সামরিক বিমান চলাচল সংস্থা, (১১) বিশ্ব আবহবিদ্যা সংস্থা প্রভৃতি।

জাতিপুঞ্জ সনদের সংশোধন--Amendment of the Charter of the U. N.

কোন দেশের বা কোন প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয় হইতে পারে না। নূতন পরিবেশ ও নূতন অবস্থা সৃষ্টির ফলে সকল প্রকার গঠনতন্ত্রেরই সময়োপযোগী পরিবর্তন আবশ্যক হয়। যদি স্বাভাবিক উপায়ে

গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব না হয় তাহা হইলে অস্বাভাবিক উপায়ে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়। সুতরাং অস্বাভাবিক উপায় পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গঠনতন্ত্রের মধ্যেই ইহার পরিবর্তনের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদও ইহার ব্যতিক্রম নহে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে সনদ সংশোধন করিবার নিম্নলিখিত পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যের একটি সাধারণ সম্মেলন নিরাপত্তা পরিষদের যে-কোন সাতজন সদস্য ও সাধারণ সভার ⅔ সংখ্যাধিক্য দ্বারা নির্ধারিত দিনে ও নির্ধারিত স্থলে আহূত হইয়া সনদ পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে।

২। সাধারণ সম্মেলন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সাম্মলনের ⅔ সংখ্যাধিক্য দ্বারা অনুমোদিত হইলে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব যদি নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যসহ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ⅔ সংখ্যক সদস্যের সম্মতি লাভ করে একমাত্র তাহা হইলেই উত্থাপিত প্রস্তাব কার্যকর হয়।

৩। সনদ বলবৎ হইবার পর সাধারণ সভার দশম বার্ষিক অধিবেশনের মধ্যে যদি এরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব সাধারণ সভার অধিবেশনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সভায় পুনরায় উপস্থাপিত করিতে হইবে। যদি সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব সাধারণ সভার সংখ্যাধিক্য ভোটে ও নিরাপত্তা পরিষদের যে-কোন সাত জন সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হয় তাহা হইলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, জাতিপুঞ্জের সনদ সহজ-পরিবর্তনীয় নহে। সনদের ২৩, ২৭ ও ৬১ ধারা তিনটি সংশোধিত হইয়া ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১ আগস্ট হইতে কার্যকর হয়।

১। ২৩ ধারা—স্থায়ী ৫ জন সদস্য ব্যতীত সাধারণ সভা আরও ১০ জন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করিবে। সুতরাং এই সংশোধন দ্বারা নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ১০ হইতে ১৫ বৃদ্ধি পাইল।

২। ২৭ ধারা—নিরাপত্তা পরিষদে কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত ব্যাপারে (Procedural matters) ৯ জন সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

যাইবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে ৫ জন স্থায়ী সদস্যসহ মোট ৯ জন সদস্যের সম্মতি আবশ্যক। সদস্যগণের মধ্যে কেহ যদি বিরোধের একটি পক্ষ হন তাহা হইলে তাহাকে ভোটদানে বিরত থাকিতে হইবে।

৩। ৬১ ধারা—অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত ২৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই সংশোধন দ্বারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার সদস্যসংখ্যা ১৮ হইতে ২৭ বৃদ্ধি করা হইল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে সংশোধন করা দুঃসাধ্য হইলেও অন্য উপায়ে সংশোধিত হইতে পারে। সনদের কতিপয় অংশ বা ধারা দীর্ঘকালব্যাপী কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হইবার ফলে একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়। দ্বিতীয়তঃ, জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগ ও সদস্যগণ সনদের ধারাগুলির নূতন নূতন ব্যাখ্যাদান করিয়াও অনেক কার্যকর সংশোধন আনয়ন করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে শান্তির উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রস্তাব পাশ করিবার পরবর্তী কাল হইতে প্রথা (Usages) ও অভ্যাসগত কার্যের (Practice) দ্বারা অনেকগুলি ধারার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ও অভিমত কতিপয় ক্ষেত্রে সনদ সংশোধনে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আওতায় যৌথ নিরাপত্তা—Collective Security Under the U. N.

জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই জাতিপুঞ্জের অভ্যুদয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা হইল ইহার প্রধান কর্তব্য। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার গুরুদায়িত্ব জাতিপুঞ্জ কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে বা বিঘ্নিত হইবার আশংকা ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ বিবদমান পক্ষগুলিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধ বা বিরোধ নিরসনের সুপারিশ কলহরত দেশগুলির আত্মরক্ষা করিবার অধিকার কোনমতেই ক্ষুণ্ণ করে না। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ

অনুযায়ী যদি কোন বিরোধীপক্ষ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে পরিষদ বলপ্রয়োগ দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হইল অনিচ্ছুক রাষ্ট্রের সহিত স্থল, জল ও বিমান পথে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করা। নিরাপত্তা পরিষদ অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রের সহিত সকল প্রকার আদান-প্রদান রহিত করিতে সুপারিশ করে। এই উপায়ে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রকে বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে বাধ্য করিতে ব্যর্থ হইলে নিরাপত্তা পরিষদ বলপ্রয়োগ নীতি গ্রহণ করিয়া স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর দ্বারা এইরূপ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করিয়া ইহাকে বিরোধের অবসান ঘটাইতে বাধ্য করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোন সশস্ত্র বাহিনী নাই। সুতরাং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ব্যর্থ হইলে নিরাপত্তা পরিষদ সদস্যগণকে সুপারিশ করে যে তাহারা যেন প্রয়োজনীয় সৈন্য ও সমরসম্ভার দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনা কার্যে নিরাপত্তা পরিষদকে সাহায্য করে। অবশ্য জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ কর্তৃক এই সাহায্যদান বাধ্যতামূলক নহে।

সুতরাং দেখা যায় যে, জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ যদি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ না করে বা নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত যুদ্ধ-পরিচালনায় সাহায্য না করে তাহা হইলে জাতিপুঞ্জ কর্তৃক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা প্রহসনে পর্যবসিত হয় এবং অধিকাংশ বিরোধের ক্ষেত্রেই যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হইতে পারে নাই।

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সফল না হইবার প্রধান কারণ হইল নিরাপত্তা পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে গুরুতর মতভেদ। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই এই পঞ্চশক্তি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পশ্চিমী গোষ্ঠী ও সোভিয়েত গোষ্ঠী নামক দুইটি পরস্পর-বিরোধী গোষ্ঠীতে পর্যবসিত হইল— পঞ্চশক্তির যুদ্ধকালীন ঐক্য ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে চরম অনৈক্যে রূপান্তরিত হইল। ইহার ফলে যখনই এই পঞ্চশক্তির কোন একটি বা ইহার অধীনস্থ তাঁবেদার কোন রাষ্ট্র কোন বিরোধের পক্ষভুক্ত হয়, তখন একপক্ষ বিরোধের মীমাংসা করিতে উদ্যোগী হইলে অপর পক্ষ ভিটো প্রয়োগ করিয়া সে প্রয়াস বিফল করে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার উভয় পক্ষই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ

না করিয়া কালক্ষেপ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যৌথ নিরাপত্তা রক্ষা ব্যাপারে এই ব্যর্থতার জন্যই, সেন্টো (CENTO), সিয়াটো (SEATO), ওয়ারশ চুক্তি (Warshaw Pact) প্রভৃতি আঞ্চলিক নিরাপত্তামূলক চুক্তিগুলি সম্পাদিত হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ, আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ, ভারত-পাক যুদ্ধ হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আওতায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতার পরিচায়ক।

মানবিক অধিকারের সার্বিক ঘোষণা—Universal Declaration of Human Rights

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম দায়িত্ব হইল স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল জাতির মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষিত করা। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মার্কিন রাষ্ট্র-পতির পত্নী মিসেস্ রুজভেল্টকে সভাপতি করিয়া একটি মানবিক অধিকার আয়োগ (Human Rights Commission) প্রতিষ্ঠা করে। এই আয়োগ মানবিক অধিকার ঘোষণাপত্রটি প্রণয়ন করে এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই বিখ্যাত ঘোষণাটি সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। এই মানবিক অধিকারের ঘোষণাটি মানবিক অধিকার সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক মহাসনদ (Magna Carta) বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহা প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা স্থাপনে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হয়।

একটি প্রস্তাবনাসহ তিরিশটি সূত্র লইয়া এই ঐতিহাসিক ঘোষণা গঠিত। মার্কিন শাসনতন্ত্রের অধিকারপত্র (Bill of Rights) ও অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের অধিকারের ঘোষণার অনুরূপভাবে এই ঘোষণাটির প্রথম অংশে বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, সাম্যের অধিকার প্রভৃতি মানুষের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। ঘোষণার দ্বিতীয় অংশে মানুষের অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত স্বাধীনতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কিন্তু শুধুমাত্র ঘোষণার দ্বারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা বা সফল করা যায়

না। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি দ্বারা জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ঘোষিত এই অধিকারগুলি স্বীকৃত ও কার্যকর হওয়া চাই। পরিতাপের বিষয় সাড়ম্বরে ঘোষিত এই অধিকারগুলি আজ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের কোন সদস্যরাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই বা কার্যকর করিবার প্রয়াস পায় নাই। সুতরাং ঘোষিত এই অধিকারগুলির একটি নৈতিক মূল্য থাকিলেও ইহার কোন বাস্তব মূল্য নাই। শেষ বিশ্লেষণে বলা যায় যে, ঘোষিত এই অধিকারগুলি শুধু সদিচ্ছার পরিচায়ক মাত্র।

জেনোসাইড্ নিয়মপত্র—Genocide Convention

জেনোসাইড্ (Genocide) শব্দটির অর্থ হইল কোন মানবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে নিধন করিয়া লোপ করা। মানুষ যেমন বনভূমি বিনষ্ট করে, নির্বিচারে পশু, পক্ষী হত্যা করিয়া কোন কোন জাতির পশু, পক্ষী ধরাপৃষ্ঠ হইতে নির্মূল করে, সেইরূপ মানুষ কোন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ হত্যা করিয়া পৃথিবীর বুক হইতে সে জাতির মানুষের অস্তিত্ব একেবারেই বিলোপ করিয়াছে। কোন জাতির মানুষকে নির্বিচার হত্যা দ্বারা বিলোপ করাই 'জেনোসাইড্' নামে কুখ্যাত। আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের কয়েকটি আদিম জাতি এইরূপে নির্বিচার নর-হত্যার ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। স্পেন কর্তৃক আমেরিকার কয়েকটি আদিম জাতি হত্যা, সাম্প্রতিক কালে নাৎসী জার্মানী কর্তৃক ইহুদী জাতি হত্যা এই পর্যায়ভুক্ত।

জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা এই জাতিহত্যা নিবারণ ও হত্যাকারী জাতিকে শাস্তি প্রদানকল্পে একটি নিয়মপত্র প্রণয়নে অগ্রণী হয়। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও জাতিহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের শাস্তি প্রদান উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠনের যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে বিচার করিবার জন্য সাধারণ সভা এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইন পরিষদকে (International Law Commission) অনুরোধ করে। আন্তর্জাতিক আইন পরিষদ এ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ সভা একটি প্রস্তাব পাস করে। এই প্রস্তাবে কোন জাতিহত্যা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। এ

সম্পর্কে একটি নিয়মপত্র প্রণয়নের জন্য সাধারণ সভা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে অনুরোধ করে। পরিষদ কর্তৃক রচিত নিয়মপত্রটি সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তী কালে ২৩টি রাষ্ট্র এই নিয়মপত্রে সম্মতি দান করে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে এই নিয়মপত্রটি বলবৎ হয়। দশ বৎসর পর্যন্ত এই নিয়মপত্রটি চালু থাকিবে এবং তাহার পর যে সমস্ত রাষ্ট্র এই নিয়মপত্রটি মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক তাহাদের ক্ষেত্রে আরও ৫ বৎসর চালু থাকিবে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ই জাতিহত্যা সম্পর্কিত অভিযোগগুলির বিচার-ক্ষমতার অধিকারী।

সমস্যাসমূহ ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা—Problems and Prospects

চিরস্থায়ী শান্তি একটি স্বপ্নমাত্র এবং এ স্বপ্নও সুখকর নহে "(Perpetual peace is a dream and not even a beautiful dream.")। এই উক্তিটির সত্যতা জাতিসংঘ (League of Nations) ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পরও অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। ইহা হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইহার প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে ব্যর্থকাম হইয়াছে। শান্তিরক্ষার ব্যাপারে কতিপয় ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। জাতিপুঞ্জের এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানের কতিপয় গঠনগত, প্রকৃতিগত ও কর্তব্যবিষয়ক ত্রুটিই হইল এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার কারণ। জাতিপুঞ্জের এই গঠনগত, প্রকৃতিগত ও কর্তব্যবিষয়ক সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান না করিতে পারিলে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা অসম্ভব।

পারস্পরিক শুভবুদ্ধি, সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাবই হইল আন্তর্জাতিক যে-কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূল ভিত্তি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্বতন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ী শক্তিত্রয় (বৃটেন, সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রদ্বয়) এই প্রতিষ্ঠান গঠনে অগ্রণী হয় এবং প্রধানতঃ, এই ত্রি-শক্তির ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে এই প্রতিষ্ঠান

গঠিত হয়। বিজিত শক্তিবর্গের এ প্রতিষ্ঠান গঠনে বিন্দুমাত্র বক্তব্য ছিল না। অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ যোগদানকারী সকল রাষ্ট্রই এই ত্রি-শক্তির সিদ্ধান্ত যে-কোন কারণেই হউক গ্রহণ করিল। জার্মানী, জাপান, সাম্যবাদী চীনকে প্রতি-হিংসার বশবর্তী হইয়া এই বিশ্ব সংগঠনের সদস্যভুক্ত করা হইল না।

শুধু প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ নয়, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ত্রি-শক্তির সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠনে প্রাধান্য ও একচেটিয়া অধিকার অক্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশ্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইল একটি বিশ্বসংস্থা। এই সংস্থার সদস্যপদ সাধারণ কতিপয় শর্তে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের জন্যই উন্মুক্ত থাকা উচিত এবং সাধারণ সভার সংখ্যাধিক্য ভোটে নূতন সদস্য গ্রহণ করা সমীচীন। কিন্তু নানা উপায়ে নূতন সদস্য গ্রহণ ব্যাপার জটিল করা হইয়াছে এবং এই বৃহৎ শক্তিগুলির অসম্মতিতে নূতন সদস্য গ্রহণ একরূপ অসম্ভব। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত সাম্যবাদী চীন ও উভয় জার্মানী জাতিপুঞ্জের সদস্যপদে বঞ্চিত ছিল।

সাধারণ সভাই হইল জাতিপুঞ্জের বৃহত্তম প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। সমানাধিকার ভিত্তিতে গঠিত হইলেও শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই সভা একটি আলোচনাকারী বিতর্ক-সভা মাত্র। ইহার অধিকাংশ ক্ষমতাই নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতিতে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের সহিত একযোগে পরিচালনা করিতে হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই সভা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। বর্তমানে শান্তি প্রস্তাবের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া নীতিটি গৃহীত হওয়ার ফলে সাধারণ সভার ক্ষমতা কিছু বৃদ্ধি পাইলেও কার্য-ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে এ ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় না বলিলেও চলে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গের একচেটিয়া অধিকার যাহাতে ক্ষুন্ন না হয় তদুদ্দেশ্যেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত সাধারণ সভার হস্তে বিশেষ কোন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় নাই।

জাতিপুঞ্জের সকল সমস্যার মূল এবং সমস্যাজনিত অসাফল্যের কারণ হইল নিরাপত্তা পরিষদ। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যাল্পতা, পাঁচটি বৃহৎ শক্তির চিরস্থায়ী আসন এবং স্থায়ী সদস্যগণের ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতাই হইল এই বিশ্ব সংগঠনের ব্যর্থতার মূলীভূত কারণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে

যে, বৃটেন, ফ্রান্স জাতীয়তাবাদী চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র—এই পাঁচটি রাষ্ট্র হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজেতা। ফ্রান্স পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত বৃটিশ, সোভিয়েত ও মার্কিন সরকারের সহিত মিলিত হইয়া বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্যতম শক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। আর জাতীয়তাবাদী চীন সরকার চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়া ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও মার্কিন আশ্রয়পুষ্ট হইয়া মার্কিন সরকার সাহায্যে বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্যতম এক শক্তির স্থান গ্রহণ করিল। এই পঞ্চশক্তি হইল নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও ভিটো ক্ষমতার অধিকারী। এই পঞ্চশক্তির মধ্যে যুদ্ধকালে যে সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যুদ্ধ শেষে ক্ষমতার লড়াইয়ে সে ঐক্য বিরোধে পরিণত হয়। পশ্চিমী গোষ্ঠী ও সোভিয়েত গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এরূপ চরম মতভেদ উপস্থিত হয় যাহার ফলে এক গোষ্ঠী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব অন্য গোষ্ঠী কর্তৃক ভিটো প্রয়োগ দ্বারা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। একমাত্র মার্কিন আশ্রয়পুষ্ট তাঁবেদার রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন কারণে জাতীয়তাবাদী চীনের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার কোন যোগ্যতা নাই। যুদ্ধোত্তর কালে বৃটেন ও ফ্রান্স বৃহৎ শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদে ইহাদের স্থায়ী আসন ও ভিটো প্রয়োগের অধিকার কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সক্রিয় ও তৎপর করিবার প্রধান অন্তরায় হইল নিরাপত্তা পরিষদের সংগঠন ও ক্ষমতা। এই সমস্যা সমাধানের উপায় হইল নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, স্থায়ী সদস্যপদের বিলোপ সাধন এবং ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করা। এতদ্ব্যতীত বিরোধ মীমাংসা ক্ষেত্রে সাধারণ সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার একটি উপায় হইল আন্তর্জাতিক বিচারালয়। কিন্তু এই বিচারালয়ের সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর কোন বাধ্যতামূলক এক্তিয়ার না থাকিবার ফলে ইহার কার্যকারিতা বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে।

কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। কিন্তু আক্রমণাত্মক কার্য কাহাকে বলে সে সম্পর্কে

জাতিপুঞ্জের সনদে আক্রমণাত্মক কার্যের কোন নির্দিষ্ট অথবা স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নাই। ইহার ফলে আক্রমণকারী রাষ্ট্র নানা অজুহাতে আক্রমণের অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারে

উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের একমাত্র উপায় হইল জাতিপুঞ্জ সনদের প্রয়োজনীয় সংশোধন। কিন্তু সংশোধন পদ্ধতির জটিলতার জন্য কোন সংশোধনই সুসাধ্য নহে।

রাষ্ট্রগুলির নিরস্ত্রীকরণই হইল শান্তিরক্ষার প্রধান উপায়। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বহু আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়াছে—বহু প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমী গোষ্ঠী ও সোভিয়েত গোষ্ঠীর মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্যের ফলে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হইতে পারে নাই। আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও বৃহৎ শক্তিবর্গ একমত হইতে না পারিবার ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজ ব্যাহত হইয়াছে।

বহুদিন পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রধানতঃ ও কার্যতঃ একটি য়ুরোপীয় সংগঠন বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সংগঠনের নেতৃত্ব মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এফ্রো-এসীয় রাষ্ট্রগুলির জাতিপুঞ্জের সদস্যভুক্তি ও জোট বাঁধিবার ফলে এই ভারসাম্য কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। জাতিপুঞ্জে ভোটদান ব্যাপারেও এই বিভিন্ন গোষ্ঠীগত ভোটদানের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে দুইটি প্রধান শক্তি—সোভিয়েত ও মার্কিন—বর্তমানে এই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে স্ব-স্ব প্রভাবাধীন করিবার দ্বন্দ্বে লিপ্ত আছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর একটি সমস্যা হইল ইহার ক্রমবর্ধমান ব্যয় সংকুলান করা। অনেক সদস্য তাহাদের অমতে কোন কার্য করিলে তাহাদের দেয় অংশের অর্থ প্রদানে বিরত থাকে। কংগো রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বিপ্লব দমন করিবার জন্য যে জাতিপুঞ্জ সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়, তাহার ব্যয়ভার ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাষ্ট্র অংশমত দিতে অস্বীকার করে। ইহার ফলে জাতিপুঞ্জের আয়-ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতি দেখা দিয়াছে।

জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য--Real Fact about the U. N.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার ফলে যে রাষ্ট্রগুলি তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত করিয়াছে এরূপ ধারণা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। জাতিপুঞ্জের সদস্য ও জাতিপুঞ্জ-বহির্ভূত সকল রাষ্ট্রই ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সুতরাং জাতিপুঞ্জ সংগঠন কোন মতেই সকল রাষ্ট্রের উপরিস্থিত একটি অভিভাবক রাষ্ট্র বলিয়া দাবি করিতে পারে না। অন্য রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ রাষ্ট্রগুলিকে শুধুমাত্র অনুরোধ করিতে পারে কিন্তু বাধ্য করিতে পারে না। প্রকৃত তথ্য হইল যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ নানাপ্রকার সাহায্য দান ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এককভাবে অন্য রাষ্ট্রগুলিকে ইহার নির্দেশমত কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে। অনুন্নত ও অসহায় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়াই কোন বৃহৎ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপ আশ্রয় দান করিয়া অসহায় ও শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলিকে নিজ নিজ গোষ্ঠীভুক্ত করা বিষয়ে মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয় বিশেষ অগ্রণী।

যে কয়েকটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ-মীমাংসার সাফল্য জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ ও তৎপরতায় আরোপ করা হয়, সে সমুদয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, দৃশ্যতঃ জাতিপুঞ্জ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেও পরোক্ষে জাতিপুঞ্জের এই সিদ্ধান্ত কোন-না-কোন বৃহৎ শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে। এমন কি সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত সাধারণ সভার ভোটদান ব্যাপারেও বৃহৎ শক্তিবর্গের বিশেষ করিয়া মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয়ের প্রভাব কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করে না। ক্ষুদ্র-বৃহৎ অন্যান্য সকল রাষ্ট্রই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত যে, জাতিপুঞ্জের সনদ দ্বারা তাহাদের ভোটদান ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও কার্যতঃ তাহারা নানা বিষয়ে কোন-না-কোন বৃহৎ শক্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাহাদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার সনদেই সীমাবদ্ধ থাকে। কার্যতঃ ভোটদান ব্যাপারে তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহায্য-দানকারী রাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করে।

কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা উপরি-উক্ত বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত করা যায়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া এই সংঘর্ষের বিষয়টির প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হল্যাণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত হয়। দৃশ্যতঃ জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে বিরোধের মীমাংসা হইলেও কার্যতঃ এই বিরোধ-নিষ্পত্তির ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা হল্যাণ্ড সরকারকে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন সার্বভৌম পদমর্যাদা স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

কি উপায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গ ইহাদের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্তে পরিণত করিয়া জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নামে এই সিদ্ধান্তগুলি বলবৎ করে কোরিয়ার যুদ্ধ তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সাম্যবাদী উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদ প্রসারিত হইবার ভয়ে এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে বদ্ধপরিকর হয়। তদানীন্তন নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধির সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রস্তাব অনুমোদন করাইতে সমর্থ হয়। সাম্যবাদী চীন সরকারের উত্তর কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান ও নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধির প্রত্যাবর্তন ও ভিটো প্রয়োগ সমস্যাটির জটিলতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই জটিল পরিস্থিতি আলোচনা না করিয়াও বলা যায় যে, কোরিয়ার যুদ্ধ কার্যতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্যবাদী চীনের মধ্যে যুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কারণ নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পূর্বেই মার্কিন সরকার এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী কোরিয়ার যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এই যুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ-ক্রমে যে কয়েকটি রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের পক্ষে যোগদান করে তাহাদের সংখ্যা ছিল যেমন অত্যল্প, সাহায্যের পরিমাণও ছিল সেইরূপ নামমাত্র। এই যুদ্ধে মার্কিন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থাই মার্কিন সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইত।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন আলজিরিয়ার ব্যাপার লইয়া সাধারণ সভায় আলোচনার প্রস্তাব হয় তখন ফরাসী সরকার সাধারণ সভার বৈঠক বর্জন করে এবং এই ব্যাপার সাধারণ সভায় আলোচিত হইলে ফরাসী সরকার জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে। এই ভীতি প্রদর্শনের ফলে সাধারণ সভা আলজিরিয়ার ব্যাপার লইয়া আলোচনায় বিরত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিটো প্রয়োগ করিবার ভয়েই দীর্ঘদিন ধরিয়া সাম্যবাদী চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদে বঞ্চিত ছিল। সাম্যবাদী চীন সরকারের ভিটো প্রয়োগের ভয়ে বাংলাদেশ জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত আছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোন মীমাংসা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও বৃহৎ শক্তিবর্গের সমর্থনের অভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে পারে না। প্যালেস্টাইন বিভাগ সম্পর্কে আরব ও ইস্‌রায়েলের বিরোধ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই বিরোধ এখন চরম আকার ধারণ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহুদি পক্ষের সমর্থক আর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রগুলিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতেছে। এই বিরোধের ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে পাক-ভারত বিরোধেরও কোন সমাধান আজ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের দ্বারা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং দেখা যায় যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ যদি কোন বিষয়ে একমত না হয় বা কোন বিরোধ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান হীনবল হইয়া পড়ে। একমাত্র যখন বৃহৎ শক্তিবর্গ কোন বিষয়ে একমত হয় তখনই জাতিপুঞ্জের কার্যকারিতা দেখা যায়। জাতিপুঞ্জের কর্মতৎপরতা বা কর্মতৎপরতার অভাব একমাত্র বৃহৎশক্তিবর্গের নিজ নিজ স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই পরিচালিত হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন—An Appraisal of the U.N.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শান্তির রক্ষক বলিয়া পরিচিত পূর্বতন জাতিসংঘের সমাধি রচনা করিয়া শান্তিকামী জগৎবাসীকে নিরাশ করে। বর্তমানে শান্তির রক্ষক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এখনও পর্যন্ত জীবিত থাকিলেও অসংখ্য

আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে এই প্রতিষ্ঠান এরূপভাবে পর্যুদস্ত ও দুর্বল হইয়াছে যে, এই প্রতিষ্ঠানকে একটি জীবন্মৃত প্রতিষ্ঠান বলা চলে। জাতিপুঞ্জ গঠিত হইবার পর পৃথিবীতে বহু আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। এই সংঘর্ষগুলির মধ্যে আবার কতিপয় সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে। কিন্তু জাতিপুঞ্জ কোন একটি সংঘর্ষেরও সন্তোষজনক এবং বিবদমান পক্ষগুলি কর্তৃক গ্রহণীয় কোন সমাধান করিতে পারে নাই। চীনের গৃহযুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া, আরব-ইজরাইল, পাক-ভারত, কোরিয়া, আলজিরিয়া, সুয়েজ খাল, ইন্দোনেশিয়া, গ্রীস, মালয়, ইন্দো-চীন প্রভৃতি বহু যুদ্ধ ঘটিয়াছে। ইহার অনেকগুলি অঘোষিত হইলেও কার্যতঃ প্রত্যেকটি সশস্ত্র আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ কার্য। সুতরাং ম্যাকাইভারের ভাষায় বলা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত সসীম রাষ্ট্র অসীম ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে অর্থাৎ রাষ্ট্র সীমিত কর্তব্য সম্পাদনকারী সামাজিক সংঘ হইলেও যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনা বিষয়ে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে ততদিন পর্যন্ত কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনই জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে না। এখন প্রশ্ন হইল, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কি কোন প্রয়োজনীয়তা নাই?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, বিরোধ-নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থকাম হইলেও এই প্রতিষ্ঠান বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও অন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। জাতিপুঞ্জের আলাপ-আলোচনা ও কর্মতৎপরতার ফলে বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং ক্রমশঃ শান্তির পথ উন্মুক্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির উপর নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সমবেতভাবে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করিয়া বিবাদের অবসান ঘটাইতে প্রচেষ্টা চালাইতে পারে। এককভাবে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে অপর রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বা এমন কি সদুপদেশ দেওয়া সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বসংস্থার একজন সদস্য হিসাবে সকল সদস্যই একজোটে বিরোধ-মীমাংসার উদ্দেশ্যে উপায় নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে। সমবেত অনুরোধ বা নির্দেশ বিবদমান রাষ্ট্রগুলি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে দ্বিধাবোধ করে।

তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইল একটি বিশ্বসভা। এই সভায় সমগ্র-ভাবে বিশ্বমানবের কল্যাণের বিষয় আলোচিত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৃষ্টি-ভঙ্গী, ন্যায়-অন্যায়বোধ এই সভার আলোচনায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতি-ফলনের ফলে বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে ধীরে ধীরে একটা বিশ্ব জনমত গঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই বিশ্ব জনমতের প্রভাবে বহু রাষ্ট্র অন্যায় কার্য হইতে বিরত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই বিশ্বসংগঠনের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। পারস্পরিক পরিচয়ের অভাব এবং পরিচয়ের অভাবহেতু পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মনোভাবের জন্ম। এই অবিশ্বাসের কারণেই রাষ্ট্রগুলি একে অপর হইতে দূরে থাকে। বিশ্বসংস্থা নানা উপায়ে রাষ্ট্রগুলিকে পারস্পরিক সংস্পর্শে আনিয়া রাষ্ট্র-গুলির মধ্যে মতভেদ ও সন্দেহের কারণ দূর করিয়া গঠনমূলক সহযোগিতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আর সহযোগিতা স্থাপিত হইলে বিরোধের কারণও দূরীভূত হয়।

পঞ্চমতঃ, এই সংগঠন অন্যথায় উপেক্ষণীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে বিশ্বের দরবারে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করিবার সুযোগ দান করিয়া তাহাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বর্তমানে এই সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি একজোটে কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করিতে পারে। অপর পক্ষে বৃহৎ রাষ্ট্রের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করিতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, বিশ্বসংস্থা ইহার সংশ্লিষ্ট নানাজাতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিমূলক বিশেষীকৃত শাখাসমূহের সাহায্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি দ্বারা বিশ্বমানবের বিশেষ করিয়া অনগ্রসর দেশগুলির উন্নতি সাধনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। ইহার খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষ্টি-মূলক কর্মতৎপরতায় জগৎবাসী আজ এই বিশ্ব সংগঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

শান্তিরক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মহামানবের এক মহামিলন ক্ষেত্র। এই মহামিলনক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিগুলি মিলিত হইয়া বস্তুগত ও ভাবগত আদান প্রদান সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের

পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা করিতে পারে। বিশ্বসংস্থা শান্তির পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। এ পথে চলার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রগুলির—বিশ্বসংস্থার নয়।

সংক্ষিপ্তসার

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

মানুষে মানুষে বিরোধ থাকিলেও নানাকারণে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সামাজিক জীবনের ভিত্তি হইল ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধভাবে পারস্পরিক অধিকারের স্বীকৃতি এবং এই অধিকারের স্বীকৃতি হইলেই সকলেই একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতি-নির্বিশেষে সকল জাতির মানব অধিকারগুলি সকল জাতি কর্তৃক স্বীকৃত হইলে সকল জাতির পক্ষে এক সঙ্গে বাস করা সম্ভব। 'আপনি বাঁচ ও অপরকে বাঁচিতে দাও'—এই নীতিই হইল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রধান শর্ত।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি

স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে প্রধানতঃ মার্কিন, সোভিয়েত ও বৃটিশ শক্তিত্রয়ের অনুপ্রেরণায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কংগ্রেস সভায় প্রেরিত বাণী, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর অতলান্তিক সনদ নামে যুক্তঘোষণা, ডাম্বারটন্ ওক্স্ প্রস্তাব, ইয়াল্টা সম্মেলন ও পরিশেষে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো সম্মেলনে এই বিশ্বসংস্থা গঠনের কার্য আলোচিত ও চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর ৫১টি সদস্যরাষ্ট্রের অনুমোদনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জন্মলাভ করে।

উদ্দেশ্য

১। মানব জাতিকে যুদ্ধের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করা।

২। মৌলিক মানবিক অধিকারগুলির উপর আস্থা সুনিশ্চিত করা।

৩। আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

৪। সামাজিক অগ্রগতি ও উচ্চতর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ

নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক শান্তিপ্রিয় এবং সদস্যপদের শর্ত পালনে ইচ্ছুক রাষ্ট্রগুলিকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামো

১। সাধারণ সভা

জাতিপুঞ্জের সর্ববৃহৎ সংগঠন হইল সাধারণ সভা। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইলেও প্রত্যেক রাষ্ট্র একটিমাত্র ভোটদান করিতে পারে। এই সভার বৎসরে একটি অধিবেশন বসে তবে বিশেষ অধিবেশন ও জরুরী অধিবেশনেরও ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বাৎসরিক অধিবেশনের জন্য সভা একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। নূতন সদস্য গ্রহণ বা সদস্য বহিষ্কার, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে সভার ⅔ সংখ্যাধিক্যের সম্মতি প্রয়োজন। অন্য বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাধিক্য হইলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

সনদের অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে এই সভা আলোচনা করিতে পারে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষামূলক প্রশ্নে কোন পক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে এই সভা সে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ব্যাপারে এই সভা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও পারে। জাতিপুঞ্জের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ও অনুমোদন এই সভার অন্যতম কার্য। এই সভা নিরাপত্তা পরিষদের ১০ জন অস্থায়ী সদস্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ২৭ জন সদস্য ও অছি-পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ-ক্রমে এই সভা মহা-সচিবকে নিয়োগ করে এবং নিরাপত্তা পরিষদের সহিত পৃথক ভোটদান দ্বারা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নির্বাচন

করে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে শান্তির উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার ফলে এই সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২। নিরাপত্তা পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদ হইল জাতিপুঞ্জের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। ৫ জন স্থায়ী ও ১০ জন অস্থায়ী—মোট ১৫ জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয়, বৃটেন, ফ্রান্স ও সাম্যবাদী চীন হইল স্থায়ী সদস্য ও অন্য ১০ জন অস্থায়ী সদস্য সাধারণ সভার ⅔ সংখ্যাধিক্য ভোটে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। প্রতিমাসের জন্য এই পরিষদ একজন সভাপতি নির্বাচন করে। একপক্ষকালের মধ্যে এই সভার একটি অধিবেশন বসে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরও সচরাচর ইহার অধিবেশন বসে। এই কারণে সকল সদস্যরাষ্ট্রেরই একজন প্রতিনিধির সর্বদা উপস্থিত থাকিতে হয়।

কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে ৯ জন সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৫ জন স্থায়ী সদস্যসহ ৯ জনের সম্মতি আবশ্যিক অর্থাৎ একজন স্থায়ী সদস্যের অসম্মতিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। স্থায়ী যে-কোন একজন সদস্যের এই অসম্মতি ভিটো নামে কুখ্যাত।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এই পরিষদের প্রধান কার্য। বিরোধী রাষ্ট্রগুলিকে বিরোধ-মীমাংসার উপায় স্থির করিয়া দিতে পারে, বিরোধী পক্ষের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিবার সুপারিশ করিতে পারে। অন্যথায় সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে সুপারিশ করিতে পারে।

এই পরিষদ মহাসচিবের নিয়োগ সাধারণ সভার নিকট সুপারিশ করে এবং সাধারণ সভার সহিত যুক্তভাবে পৃথক ভোটদান পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ১৫ জন বিচারপতি নির্বাচন করে।

স্থায়ী পঞ্চশক্তির মধ্যে মতভেদের ফলে এই পরিষদ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকার্যে ব্যর্থকাম হইয়াছে।

৩। আন্তর্জাতিক বিচারালয়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আন্তর্জাতিক বিচারালয়

নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। বিচারপতিগণ ৯ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন ও পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। এই বিচারালয় ৩ বৎসরের জন্য একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করে।

জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যই এই বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে। এই বিচারালয়ের কোন বাধ্যতামূলক এক্তিয়ার না থাকার ফলে কোন রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিচারালয় ইহার সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে পারে না। ইচ্ছুক রাষ্ট্রগুলির বিরোধ-মীমাংসা ব্যতীতও এই বিচারালয় কোন চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ সভার অনুরোধে এই বিচারালয় আইন-সম্পর্কিত ব্যাপারে পরামর্শ দান করিতে পারে।

৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত ২৭ জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। পরিষদ একজন সভাপতি নির্বাচন করে এবং বৎসরে ইহার দুইটি সাধারণ অধিবেশন বসে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিমূলক ও মানবিক সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাহায্যে সমাধান উদ্দেশ্যে এই পরিষদের সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান এবং কৃষ্টি ও শিক্ষামূলক বিষয়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হইল এই পরিষদের প্রধান কার্য।

৫। অছি-পরিষদ

জাতিসংঘের সময়ে অছি-পরিষদের জন্ম হয়। জাতিপুঞ্জ গঠিত হইবার পর কিছু পরিবর্তিত আকারে এই পরিষদ নূতনভাবে গঠিত হইয়া অনগ্রসর জাতিগুলির অভিভাবকের কাজ করে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি ও সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমসংখ্যক সদস্য লইয়া এই

পরিষদ গঠিত। বর্তমানে অছি-শাসনের অধীন অধিকাংশ স্থানগুলি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

৬। মহাকরণ

জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্তগুলিকে রূপদান ও দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য মহাসচিবের নেতৃত্বে এই মহাকরণ বিভিন্ন দেশের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার নাগরিক লইয়া গঠিত। সাতটি পৃথক বিভাগ দ্বারা এই মহাকরণের কার্যাবলী পরিচালিত হয়।

মহাসচিব—নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগগুলি কর্তৃক ন্যায্য কার্য সম্পাদন করাই হইল মহাসচিবের প্রধান কর্তব্য। সাধারণ সভায় জাতিপুঞ্জের কার্য সম্পর্কে বাৎসরিক বিবরণী প্রদান করা তাঁহার আর একটি কর্তব্য। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গের আশংকা ক্ষেত্রে তিনি এবিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। মহাসচিবের নিরপেক্ষতা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার উপর জাতিপুঞ্জের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

বিশেষীকৃত শাখাসমূহ

বিশেষীকৃত শাখাসমূহ জাতিপুঞ্জের অঙ্গও নহে বা অধীনও নহে তবে জাতিপুঞ্জের সহিত অনেকগুলি সম্পর্কযুক্ত। বিশ্বমানবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই এই শাখাগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান শাখাগুলি হইল :

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা (ইউএন্ স্কো)

জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষা ও কৃষ্টিমূলক এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক আদান-প্রদানে সহযোগিতা সৃষ্টি দ্বারা পারস্পরিক অবিশ্বাসের মনোভাব দূর করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হইল এই শাখাটির প্রধান কার্য। জাতিগুলির মধ্যে চুক্তি-

সম্পাদন সাহায্যে গণ-সংযোগ বৃদ্ধি করিয়া ভাবের ও আদর্শের বিনিময় দ্বারা এই শাখাটি শান্তিপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

২। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (আই এল ও)

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থা গঠিত হয়। সকল রাষ্ট্রই এই সংস্থার শর্ত মানিয়া লইয়া ইহার সদস্য হইতে পারে। সকল দেশের শ্রমিকদের উচ্চ-মানের জীবনযাত্রা ও সমান সুযোগ ও সম্মানের ব্যবস্থা করা এই সংস্থার মুখ্য কাজ।

৩। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)

সকল মানুষের পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ-সাধনই হইল এই সংস্থার কাজ। মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক কল্যাণ-সাধন এবং এই উদ্দেশ্যে পুষ্টি, বাসগৃহ ও অবসর বিনোদন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে এই সংস্থা সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে উৎসাহ দান করে ও সাহায্য করে।

৪। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফ এ ও)

জনসমূহের পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি এবং পল্লীবাসিগণের অবস্থার উন্নতি-সাধন করা হইল এই শাখাটির উদ্দেশ্য।

৫। আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা (আই এম এফ)

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে গঠিত এই সংস্থাটির উদ্দেশ্য হইল (১) আন্তর্জাতিক আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনার দ্বারা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, (২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুষম প্রসার সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং (৩) আন্তর্জাতিক বিনিময়হার স্থিরীকরণ।

৬। বিশ্ব ব্যাংক

সদস্যরাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই ব্যাংকটি গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে এই ব্যাংক

শতাধিক রাষ্ট্রকে বহু পরিমাণ অর্থ ধার দিয়াছে। এসিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি এই ব্যাংকের সাহায্যে রেল ও জাহাজ পরিবহণ, বন্দর নির্মাণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা প্রভৃতি আরও কতিপয় বিশেষীকৃত শাখা আছে।

জাতিপুঞ্জের সনদের সংশোধন

জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যের একটি সম্মেলন কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাব উক্ত সম্মেলনের ⅔ সংখ্যাধিক্যে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব যদি নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যসহ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ⅔ সংখ্যক সদস্যের অনুমোদন লাভ করে একমাত্র তাহা হইলেই উত্থাপিত প্রস্তাব কার্যকর হয়।

যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে অথবা বলপ্রয়োগ দ্বারা শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। শান্তিভঙ্গকারী কোন রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদ অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিবার অথবা সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করিবার সুপারিশ করিতে পারে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের এই সুপারিশ গ্রহণ করা সদস্যরাষ্ট্রগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। অধিকাংশ শান্তিভঙ্গের ক্ষেত্রেই বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতভেদের ফলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সুতরাং জাতিপুঞ্জ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করিতে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই।

মানবিক অধিকারের সার্বিক ঘোষণা

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত মানবিক অধিকারের এই ঘোষণাটি একটি আন্তর্জাতিক মহাসনদ বলিয়া গণ্য হয়। এই ঘোষণায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সাম্যের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি মানুষের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদা

করা হইয়াছে। মানুষের অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত স্বাধীনতাও এই ঘোষণাটিতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন সদস্যরাষ্ট্রই আজ পর্যন্ত এই সাড়ম্বরে ঘোষিত অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দান করে নাই।

জেনোসাইড নিয়মপত্র

কোন জাতির মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করিয়া নির্মূল করা 'জেনোসাইড' নামে কুখ্যাত। স্পেন কর্তৃক আমেরিকার কয়েকটি আদিম জাতি হত্যা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া জাতিহত্যাকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধের পর্যায়ভুক্ত করে। এ সম্পর্কে একটি নিয়মপত্র রচিত হয় এবং এই নিয়মপত্রটি কতিপয় রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জাতিহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিচার করিবার ক্ষমতা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

সমস্যা ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা

জাতিপুঞ্জের প্রধান সমস্যা এবং এই প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হইল বৃহৎ পঞ্চশক্তি যাহারা নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি আসন স্থায়িভাবে প্রায় জবরদখল করিয়া আছে। এই পঞ্চশক্তির মধ্যে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল বর্তমানে জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিদ্বয়। এই দুই শক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জাতিপুঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কার্যকর করিতে পারে না। ভিটো ক্ষমতার অধিকারী এই পঞ্চশক্তি এককভাবে অথবা জোট বাঁধিয়া নিজেদের স্বার্থের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সুতরাং কোরিয়ার যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ পর্যন্ত কোন বিরোধেরই স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হয় নাই।

সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও সাধারণ সভা একটি আলোচনাকারী সভামাত্র। এই সভাও বহু বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের উপর নির্ভরশীল এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পঞ্চশক্তিই ইহার সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবিত করে।

বাধ্যতামূলক কোন এক্তিয়ার না থাকিবার ফলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কার্যকারিতা ও মর্যাদা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

নিরস্ত্রীকরণ ও আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও জাতিপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান না করিতে পারিলে জাতিপুঞ্জ ইহার সনদে উল্লেখিত মহান উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইবে।

জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন

রাষ্ট্রগুলি যতদিন পর্যন্ত সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট থাকিয়া যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের অবাধ অধিকারী থাকিবে অর্থাৎ জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে যতদিন পর্যন্ত অবাধ শক্তির অধিকারী না করা হইবে ততদিন পর্যন্ত শান্তির আশা দুরাশামাত্র। কিন্তু বিশ্বসংগঠনের এই ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, এই সংগঠন নানাভাবে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিয়া পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া বা না হওয়া হইল রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ দায়িত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শাসনপদ্ধতি

বাংলাদেশ (Bangladesh)

প্রারম্ভ—Introduction

'পাক্' শব্দের অর্থ হইল পবিত্র। সুতরাং পাকিস্তানের অর্থ হইল পবিত্রস্থান। ভারত উপ-মহাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বিভক্ত পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিভক্ত বাংলা লইয়া পাকিস্তান গঠিত হয়। কিন্তু এই উপ-মহাদেশে যদি কোন পবিত্রস্থানের অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলে বর্তমান বাংলাদেশ হইল সেই পবিত্র-স্থান। কারণ মাতৃভাষার স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য এই অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও দারিদ্র্য-পীড়িত বাঙ্গালী জাতি স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে যে অপূর্ব আত্মত্যাগ, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, অসীম সহনশীলতা ও অতুলনীয় ক্ষমার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই বর্তমান বাংলাদেশকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

বাংলাদেশের সংবিধানের সহিত পরিচিত হইতে হইলে ইহার জন্মের ইতিহাসের সহিত একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় আবশ্যক। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অবিভক্ত বাংলা তথা সমগ্র ভারতে ক্রমবর্ধমান হিন্দু মুসলমান ঐক্য দৃঢ়তর হইতেছে দেখিয়া ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের শাসন কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শাসন কর (Divide and Rule) নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই নীতি প্রয়োগের ফলে ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তথা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হইল এবং শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া গেল। ইংরেজের চক্রান্ত সফল হইল। এক সময়ে কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ও সমর্থক জনাব মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানের জন্য পৃথক রাষ্ট্র—পাকিস্তানের দাবি

করিলেন। ইংরেজ তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজড়িত ও ব্যতিব্যস্ত। সোভিয়েত সেনাবাহিনী যখন বার্লিনে উপস্থিত হইল এবং নেতাজী সুভাষ আজাদ হিন্দ্ বাহিনী লইয়া ভারতের পূর্বদ্বারে হানা দিলেন তখন ইংরেজ ভারত ছাড়িতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। কিন্তু ভারত ছাড়িবার পূর্বে তাহারা ভারতকে বিধ্বস্ত করিয়া ছাড়িল। জনাব জিন্নার দাবি বহু গোলটেবিল বৈঠক, সম্মেলন ও প্রস্তাবের পর স্বীকৃত হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হইল। খণ্ডিত পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ, সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইল নবগঠিত পাকিস্তানের পশ্চিম অঙ্গ আর সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা ডিভিসন, বনগ্রাম মহকুমা, মুর্শিদাবাদ ও ২৪ পরগণা ব্যতীত সমগ্র যশোহর, খুলনা জেলা ও নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট মহকুমা ব্যতীত সমগ্র প্রেসিডেন্সী ডিভিসন এবং মালদহ, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের কিয়দংশ ব্যতীত সমগ্র রাজসাহী ডিভিসন এবং তৎসঙ্গে আসামের শ্রীহট্ট জেলা লইয়া গঠিত পূর্ব-পাকিস্তান ইহার পূর্ব অঙ্গ। পাকিস্তানের এই দুই অঙ্গের ব্যবধান হইল প্রায় হাজার মাইল। এতদ্ব্যতীত দুস্তর ব্যবধান রহিল ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত।

পাকিস্তান সৃষ্টির অত্যল্পকাল মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তানী বাঙ্গালীগণ বুঝিতে পারিলেন যে, যে স্বাধীনতা তাঁহারা লইয়াছেন তাহা অন্তঃসারশূন্য। শাসকের পরিবর্তন ঘটিলেও শাসন ও শোষণ পূর্ববৎ বজায় আছে। তাঁহারা আরও বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং পূর্ব-পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তাঁহাদের সংখ্যালঘিষ্ঠের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। রাজস্বের বেশীর ভাগ পূব-পাকিস্তান হইতে আদায়ীকৃত হইলেও ইহার বেশীর ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তান উন্নয়নের জন্য।

ইহার পর আসিল পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের মাতৃভাষার ও সংস্কৃতির উপর আঘাত। উর্দুকে জোর করিয়া রাষ্ট্রভাষা করা হইল। বাঙ্গালীরা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রসমাজ মাতৃভাষার সম্মান ও স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিল। অবশেষে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলাভাষাকে উর্দুর সহিত রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দল গঠিত হয়। শেখ সাহেবের নির্ভীক নেতৃত্বে বাঙ্গালীগণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলিলেন। শেখ সাহেব বলিলেন আমরা পাকিস্তানের ভাই হইয়া থাকিতে চাই, ক্রীতদাস হইয়া নয়।

ইহার উত্তরে তিনি পাইলেন কারাদণ্ড ও বুলেট্। এদিকে পাকিস্তানেও বে-সামরিক শাসনের অবসান ঘটাইয়া আয়ুব খাঁ নামক জনৈক সেনাধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতি হইয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আয়ুব উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কঠোর হস্তে বাঙ্গালী অভ্যুত্থান দমনের প্রয়াস পাইলেন। শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে ভারতের সহিত চক্রান্ত করিবার অজুহাতে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আনিলেন কিন্তু বিচারে শেখ সাহেব মুক্তি পাইলেন। ভারতের সহিত দুইবার যুদ্ধ করিয়া পর্যুদস্ত এবং পূর্ব-পাকিস্তানে বিপ্লব দমনে অসমর্থ আয়ুব অবশেষে তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁর হস্তে জঙ্গী শাসনভার ন্যস্ত করিয়া যবনিকার অন্তরালে প্রস্থানে বাধ্য হইলেন। ইয়াহিয়া তাঁহার প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। মুজিব স্বাধীনতার দাবি জানাইলেন। ২৬ বৎসর পাকিস্তানে কোন সাধারণ নির্বাচন হয় নাই। পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙ্গালীরা নির্বাচন দাবি করিল। ২৬ বৎসর পর পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। মুজিবের আওয়ামী লীগ দল সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠনের আইনতঃ যোগ্য অধিকারী হইল। কিন্তু পিপ্‌লস্ পার্টির নেতা লারকানার নবাব নন্দন জনাব জুল্‌ফিকার আলি ভুট্টো মুজিবকে কিছুতেই প্রধান-মন্ত্রী হইতে দিবেন না। তিনি প্রকাশ্যেই বলিলেন আমি সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানি না। মুজিব ও ভুট্টোর এই বিরোধের সুযোগ লইয়া ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন। ইহার প্রতিবাদে পূর্ব-পাকিস্তানে মুজিবের নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। অবশেষে ইয়াহিয়া ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ বেলা ৯টার সময় ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিলেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব ও তাঁহার দল এ অধিবেশনে যোগদান করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভুট্টো সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ১লা মার্চ ইয়াহিয়া ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রহিল।

এবার পূর্ব-পাকিস্তানে উঠিল প্রবল ঝড়। মুজিবের ডাকে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙ্গালীগণ সংঘবদ্ধভাবে সরকারী কার্য অচল করিয়া দিলেন। ৭ই মার্চ স্মরণীয় দিন। এই দিন ঢাকার রমনা ময়দানে মুজিব বাঙ্গালীকে স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য লড়াই করিতে প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান জানাইলেন। পূর্ব-

পাকিস্তানের ঝড় থামাইবার জন্য ইয়াহিয়া স্বয়ং ঢাকায় আসিয়া মুজিবের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। ভুট্টো সাহেবকেও ডাকা হইল। এ দিকে নিশাযোগে আকাশপথে চৈনিক ও মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অগণিত সৈন্য ও সমরসম্ভার আমদানী হইতে লাগিল। আসিল ২৫শে মার্চ কাল রাত্রি। ঐ রাত্রিতে ইয়াহিয়া সকলের অজ্ঞাতে করাচী প্রত্যাবর্তন করিলেন। অধিক রাত্রে সৈন্যপরিবৃত হইয়া ভুট্টো সাহেবও পলায়ন করিলেন। তাঁহারা রাখিয়া গেলেন বালুচিস্তানের কুখ্যাত টিক্কা খাঁকে। সমগ্র পাক্‌বাহিনী ২৫শে মার্চ হইতে ঢাকা ও পূর্ব-পাকিস্তানে আরম্ভ করিল তাণ্ডব—নির্বিচারে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন। পাকিস্তানী সৈন্যের বর্বরতা তৈমুর, চেঙ্গিস্‌ ও হিট্‌লারের বর্বরতাও ম্লান করিয়া দিল। সেই রাত্রেই মুজিবকে গ্রেফতার করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের এক অজানা রুদ্ধ কারার অন্তরালে রাখা হইল।

এবার বাঙ্গালী উত্তেজিত হইল। তাঁহারা ত্বরায় অসংবদ্ধভাবে মুক্তিফৌজ গঠন করিয়া গেরিলা-পদ্ধতিতে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিব্রত করিতে লাগিল। পরে সুসংবদ্ধভাবে মুক্তিবাহিনী গঠন করিয়া সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইল। বহু বাঙ্গালী যুবক ভারতে আসিয়া সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিল। বাঙ্গালীরা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করিল এবং স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রচারকার্য আরম্ভ করিল। এদিকে পাকিস্তানী অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত প্রায় এক কোটি বাঙ্গালী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণ তাহাদের আশ্রয় ও ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিল। এদিকে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান, মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশের সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া রাষ্ট্র-প্রধানদের অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু এক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত খুব কম রাষ্ট্রই এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে সমানে নির্বিচারে অত্যাচার চলিল। মুক্তিবাহিনীও পাক্‌ সেনাদের বিব্রত করিয়া তুলিল। পাকিস্তান মার্কিন ও চৈনিক সাহায্যপুষ্ট হইয়া এবং মধ্য-প্রাচ্যের মুস্‌লিম রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক সমর্থিত হইয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ঘোষণা করিলেন যে, এ যুদ্ধ পূর্ব-পাকিস্তানীরা করিতেছে না। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারিগণ মুসলমানের

ছদ্মবেশে লড়াই করিতেছে—সুতরাং ভারতকে বিধ্বস্ত কর। যেমন কথা তেমন কাজ। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ৩রা হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। পূর্ব রণাঙ্গনে কয়েকদিন যুদ্ধের পর ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যুক্ত কমাণ্ড গঠন করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করে। যখন ঢাকা নগরীর পতন আসন্ন তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, পাকিস্তান বাহিনীর সাহায্যার্থে মার্কিন সপ্তম নৌ-বহর বঙ্গোপসাগরের দিকে আসিতেছে। পরদিন জাপানী সূত্রে খবর পাওয়া গেল যে, এক শক্তিশালী সোভিয়েত নৌ-বহরও মার্কিন সপ্তম নৌ-বহরের পিছু পিছু বঙ্গোপসাগর অভিমুখে ছুটিয়াছে। ১৬ই ডিসেম্বর ৯২০০০ সুসজ্জিত সৈন্যসহ পাকিস্তানী সামরিক শাসক জেনারেল নিয়াজী ও সেনাধ্যক্ষ রাও ফরমান আলি ঢাকায় যুক্ত কমাণ্ডের নিকট বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিলেন। ইয়াহিয়া ভুট্টো সাহেবের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহার নায়কীয় নাট্য সমাপ্ত করিলেন। ভুট্টো সাহেব মুজিবকে মুক্তি দান করিলেন। মুজিব দেশে ফিরিবার পথে দিল্লী হইয়া ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার সোনার বাংলায় ফিরিলেন। ইহাই হইল বাংলাদেশ জন্মের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ ইতিহাসের তুলনা বিরল।

বাংলাদেশের সংবিধান ও ইহার বৈশিষ্ট্য—Constitution of Bangla Desh and its Characteristics

সংবিধান—Constitution

সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতীক হইল এই সংবিধান। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর এই সংবিধান পাস হয় ও উক্ত সালের ৪ঠা নভেম্বর এই সংবিধান স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান বাংলা ভাষায় লিখিত। মোট ৮২ পৃষ্ঠায় এই সংবিধানের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এই সংবিধান প্রস্তাবনা ব্যতীত একাদশ ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগ কতিপয় পরিচ্ছেদ লইয়া গঠিত। সর্বসমেত এই সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আছে। এতদ্ব্যতীত ৪টি তফসিল আছে। প্রত্যেক ভাগে শাসন-ব্যবস্থার এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্রমের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যথা, প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্র সম্পর্কিত বিষয়, তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার, চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগ (Executive and Administrative), দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন এবং একাদশ বা শেষ ভাগে বিবিধ বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে। সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক এবং রাজধানী নির্ধারিত করা হইয়াছে।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য—Characteristics of the Constitution

বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে স্মরণীয় হইল যে, এই সংবিধান লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে স্নাত বাংলাদেশের বাঙ্গালী জনসাধারণের নির্বাচিত গণপরিষদ-কর্তৃক রচিত। এই সংবিধান বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব কীর্তি। এই সংবিধান কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত বা কাহারও দ্বারা প্রদত্ত নহে।

১। বাংলা ভাষায় রচিত—Framed in Bengali

স্বাধীনতার প্রাক্-শর্ত হিসাবে বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষার স্বাধীনতা দাবি করে এবং রক্তের বিনিময়ে ভাষার স্বাধীনতা অর্জন করে। তাই বাংলাদেশের সংবিধান বাংলা ভাষায় লিখিত। সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে এই সংবিধান

বোধগম্য। বাংলা ভাষায় সংবিধান রচনা করিয়া বাংলাদেশের অধিবাসিগণ মাতৃভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছে।

২। লিখিত সংবিধান—Written Constitution

এই সংবিধানের বিষয়বস্তু লিখিতভাবে একটি দলিলে সন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। লিখিত হইলেও এই সংবিধান মার্কিন বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয়ের সংবিধানের মত অতি সংক্ষিপ্ত নহে, আবার ভারতের সংবিধানের মত অতিবৃহৎ এবং জটিল নহে। ইহাকে ন্যাতি-বৃহৎ সংবিধান বলা চলে।

৩। দুষ্পরিবর্তনীয়—Rigid

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়, কারণ সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন বা রহিতকরণ করিতে পারে না। সংশোধনী প্রস্তাবের শিরোনামা সুস্পষ্ট হওয়া চাই এবং আইনসভার অন্তত ⅔ সদস্যের সম্মতি অপরিহার্য। এইরূপে গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত হইলে তাঁহাকে সাতদিনের মধ্যে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে হইবে নতুবা সাতদিন পরে উক্ত প্রস্তাব বিনা অনুমোদনেই বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং দুষ্পরিবর্তনীয় হইলেও বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন দুঃসাধ্য নহে।

৪। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা—Unitary Form of Government

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় অর্থাৎ এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভাজনের কোন প্রয়োজনও নাই এবং বিধিও নাই। সরকারী সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। ডিভিসন বা জিলাগুলির স্থানীয় শাসন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫। গণ-প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা—Democratic Republic

জনগণের সক্রিয় উদ্যমে ও আত্মত্যাগের ফলে এই রাষ্ট্রের জন্ম। সুতরাং এই রাষ্ট্রের ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল জনগণ। এই রাষ্ট্রে কোন বংশানুক্রমিক রাজা নাই। একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই হইলেন রাষ্ট্রের কর্ণধার।

৬। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—Socialistic State

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা হইল গণ-প্রজাতন্ত্রী। আর ইহার অর্থনৈতিক

ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থা বলিয়া সংবিধানে বর্ণিত হইয়াছে। উৎপাদনের উপাদানসমূহ এবং বণ্টন-প্রণালীর মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং শোষণ মুক্তি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা এই সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

৭। জাতীয়তাবাদী—Nationalistic

সমগ্র বাংলাদেশে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটিমাত্র জাতি বাস করে এবং সে জাতি হইল বাঙ্গালী জাতি। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হইল জাতির ঐক্য ও সংহতি—ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙ্গালী জাতি মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির এই স্বাদেশিকতার সহিত আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধ নাই। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন হইল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য।

৮। ধর্মনিরপেক্ষতা—Secularism

বাঙ্গলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান রাষ্ট্র হইলেও সংবিধানে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি গৃহীত হইয়াছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে এই রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। বাংলা-দেশের সকল অধিবাসীই—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেই বাংলা-দেশের নাগরিক এবং ধর্মমতের পার্থক্য সত্ত্বেও সকলেই সমান পদমর্যাদার অধিকারী। ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্র নাগরিকগণের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না। বাংলাদেশ ইংলণ্ডের ন্যায় কোন বিশেষ ধর্মমতের সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক নহে।

৯। মৌলিকতা-বর্জিত নহে—Not without originality

বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারত ও মিত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কিছু প্রভাব দেখা গেলেও বাংলাদেশের সংবিধানে কিছু মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সংবিধান উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করে নাই। ন্যায়পাল পদসৃষ্টি, প্রশাসনিক আদালতসমূহ স্থাপন, সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ গঠন প্রভৃতি সংবিধানের মৌলিকতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই সংবিধানের অন্যতম মৌলিকতা হইল যে, রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ করিলে বা দলের বিরুদ্ধে ভোটদান কারণে

সেরূপ সদস্যের আসন শূন্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। সংবিধানে এইরূপ দুর্নীতি-নিরোধক বিধি অন্য কোন দেশের সংবিধানে বিরল।

১০। সংবিধানের প্রাধান্য—Supremacy of the Constitution

ইংলণ্ডে আইনসভা—পার্লামেণ্টই হইল প্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই হইল প্রধান। বাংলাদেশেও সংবিধানের প্রাধান্য বলবৎ। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হইল জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ একমাত্র এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। সংবিধান-বিরোধী কোন আইন বা আদেশ, নিদেশ কার্যকর হইবে না।

১১। প্রস্তাবনা-সমন্বিত --With a Preamble

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সংবিধানের অনুরূপ একটি প্রস্তাবনা সংযোজনা বাংলাদেশের সংবিধানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রস্তাবনার সাহায্যে সংবিধান রচনার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

১২। রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ—Determination of the Fundamental Principles of State Policy

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের অনুরূপভাবে বাংলা-দেশের সংবিধানেও রাষ্ট্র-পরিচালনার কয়েকটি মূলনীতি ঘোষিত হইয়াছে। এই নীতিগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও উদ্দেশ্য, মালিকানার নীতি, কৃষক ও শ্রমিকদের মুক্তি, জনগণের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম, আন্ত-র্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নীতিগুলি সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইলেও কার্যকর করা সময়সাপেক্ষ।

১৩। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের সমাবেশ—Unification of Citizen's Rights and Duties

সোভিয়েত সংবিধানের অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সংবিধানেও কতিপয় মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাগরিকগণের পৌর, রাজনৈতিক ও কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকার সংবিধান কর্তৃক

ঘোষিত হইয়াছে এবং এই অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইয়াছে। এই অধিকারগুলির সহিত অসমঞ্জস্য আইন বাতিল হইবে।

নাগরিক ও সরকারী কর্মচারিগণের কর্তব্য হইল সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃংখলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা।

কাজ করা হইল প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়। "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী" —এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাইবে। রাষ্ট্র এরূপ অর্থ নৈতিক নীতি প্রবর্তিত করিবে যেখানে কাজ না করিয়া কেহই অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে পারিবে না এবং যেখানে কায়িক ও বুদ্ধিজীবী-মূলক শ্রম সৃষ্টিধর্মী ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়।

১৪। পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা—Parliamentary form of Government

বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশে মন্ত্রিসংসদ পরিচালিত (Parliamentary or Cabinet System) শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। এই শাসনব্যবস্থার বিশেষত্ব হইল যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসক প্রধান (রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি) থাকিলেও কার্যতঃ এই শাসন-ক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইন-সভার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ ইহার নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভার আস্থা হারাইলেই মন্ত্রিগণের পদত্যাগ করিতে হয়। ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশেও এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

১৫। এক কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা—Uni-Cameral Legislature

বাংলাদেশের আইনসভা মাত্র একটি কক্ষ—জাতীয় সংসদ লইয়া গঠিত। এখানে দ্বি-কক্ষের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। ব্যয়-বাহুল্য বর্জন করিয়া জনমতের প্রাধান্য স্থাপন করিতে একটিমাত্র প্রতিনিধিমূলক সংসদই উপযুক্ত।

সংবিধানের প্রস্তাবনা—Preamble to the Constitution

প্রস্তাবনা—Preamble

প্রস্তাবনার অর্থ হইল মুখবন্ধ বা ভূমিকা। প্রস্তাবনা লিখিত সংবিধানে সাধারণতঃ সন্নিবেশিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হইল এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক। পরবর্তীকালে স্বাধীন আয়ার, বর্মা, ভারত ও জাপানের সংবিধানে এই মার্কিন-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। প্রস্তাবনার সাহায্যে সংবিধানের ক্ষমতার উৎস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রস্তাবনা শাসন-ক্ষমতা সৃষ্টি করে না। প্রস্তাবনার প্রধান কার্য হইল সংবিধান কর্তৃক শাসন, আইন-প্রণয়ন ও বিচার বিভাগগুলির উপর প্রদত্ত ক্ষমতাগুলির প্রকৃতি ও প্রয়োগ ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করা। সংবিধানের কোন অংশের অভিপ্রায় সম্পর্কে যদি কখনও কোন সংশয় জাগে তাহা হইলে বিচারপতিগণ প্রস্তাবনায় বর্ণিত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংবিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে পারেন। যেহেতু প্রস্তাবনা সংবিধানের পরিচিতিপত্র মাত্র এবং সংবিধানের কার্যকর অংশের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, সেইহেতু প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা—Preamble to the Constitution of Bangladesh

বাংলাদেশের সংবিধানেও একটি প্রস্তাবনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবনাটি দীর্ঘতর ও বিস্তারিতভাবে লিখিত। প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে কি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহা বলা হইয়াছে। জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং বাংলাদেশকে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইয়াছে এবং এই স্বাধীনতা তাঁহাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পুরস্কার। এই স্বাধীনতা অর্জিত স্বাধীনতা—কাহারও দান বা ভিক্ষালব্ধ নহে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদগুলি হইল কতিপয় অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির সমষ্টি। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতি হইল যে, যে সমুদয় মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলাদেশের বীর সন্তানগণ মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া অনেকেই জীবন

উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই আদর্শ চতুষ্টয়—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি হইবে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে অঙ্গীকার করা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হইবে, যে সমাজে আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে। চতুর্থ অনুচ্ছেদ হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, যে ঘোষণা দ্বারা সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে এবং সংবিধানের এই প্রাধান্য সংরক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ হইল বাঙ্গালী জাতির পবিত্র কর্তব্য। সংবিধানের এই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালী জাতি যাহাতে এই সংবিধানের সাহায্যে ইহার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সুযোগ পায় এবং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর প্রগতিশীল অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

পঞ্চম বা শেষ অনুচ্ছেদে গণ-পরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচনা, বিধিবদ্ধ ও সমবেতভাবে গ্রহণ করিবার তারিখ (তেরশত উনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠার তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখ) দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবনার তাৎপর্য—Significance of the Preamble

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সংবিধানের রচয়িতাগণ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মোৎসর্গে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব যে অর্জিত, প্রাপ্ত নহে এ বিষয়ে সমগ্র জাতিকে সচেতন রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

প্রস্তাবনায় উল্লেখিত মহান আদর্শগুলিকে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া সমগ্র জাতিকে উপরি-উক্ত আদর্শগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রয়াস সাধু প্রয়াস এবং সাফল্য লাভ করিলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে এই প্রয়াসের সাফল্য সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল এবং সময়সাপেক্ষ। প্রস্তাবনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হইল জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের সাধু প্রয়াস।

রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি—Fundamental Principles of State Policy

মূলনীতি—Fundamental Principles

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সকল মানুষকে সুখী করা। তাই শক্তি-ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা পরিবর্তিত হইয়া আজ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ধারণা প্রবর্তিত হইয়াছে। যে রাষ্ট্র জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নয়, সে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা সমর্থযোগ্য নয়—সে রাষ্ট্র ইহার নাগরিকগণের নিকট আনুগত্য দাবি করিতে পারে না। রাষ্ট্রের এই মহান্ জনকল্যাণকামী উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহাতে জনসাধারণ সন্দেহাতীতরূপে আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান থাকে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপগুলির মুখ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এইগুলি বাস্তবায়নের কর্মসূচী জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের একটি লক্ষণ। এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি সংবিধানে যুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি—Fundamental Principles of State Policy in the Constitution of Bangladesh

স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতের সংবিধানের অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সংবিধানেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশকে একটি গণ-প্রজাতন্ত্রী জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট নহে। পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলবৎ করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া সংবিধানের রচয়িতাগণ সংবিধানে কতকগুলি মূলনীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং শাসকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহার জন্যও যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতিগুলিকে চারিটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা (১) রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নীতি,

(২) অর্থনৈতিক নীতি, (৩) সরকারী কর্মচারী ও নাগরিকগণের কর্তব্য সম্পর্কিত নীতি ও (৪) আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত নীতি।

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই নীতি চতুষ্টয়ই হইল রাষ্ট্র-পরিচালনার বুনিয়াদ এবং এই প্রসঙ্গে বর্ণিত অন্যান্য নীতিগুলি উপরি-উক্ত নীতি চতুষ্টয় সম্পর্কিত আইন-প্রণয়ন ও আইনের ব্যাখ্যা দান কালেও এই নীতিগুলি অনুসৃত হইবে।

১। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙ্গালী জাতি সংঘবদ্ধ-ভাবে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙ্গালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

২। শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

৩। এমন একটি প্রজাতন্ত্রী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে যেখানে স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ব্যক্তির সত্তা ন্যায্য মূল্য ও মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে জনগণের পরোক্ষ প্রভাব থাকিবে।

৪। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করিয়া ধর্মমতের পার্থক্য হেতু মানুষে মানুষে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হইবে।

৫। জনগণই হইবেন উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন-প্রণালী-সমূহের মালিক। তিন শ্রেণীর মালিকানা উল্লেখিত হইয়াছে, যথা, (১) রাষ্ট্রীয়, সমবায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানা যাহার সীমা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬। কৃষক, শ্রমিক ও অনগ্রসর জনসমূহের শোষণমুক্তি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

৭। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্যে জনগণের মৌলিক প্রয়োজনের, যথা, অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্ম-সংস্থান, অবসর বিনোদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

৮। যোগাযোগ ও শিক্ষাব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রবর্তন সাহায্যে গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন দ্বারা গ্রাম ও নগরের পার্থক্য দূর করা।

৯। আইনের দ্বারা নিধারিত স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা ও শিক্ষাকে সামাজিক প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করা।

১০। জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জন-স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্য সাধনে মদ্য ও অন্যান্য মাদক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার আইনের দ্বারা নিষিদ্ধকরণ। গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধকরণ।

১১। মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা।

১২। সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কাজ করিতে হইবে এবং কাজ করা সকল নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে পুনর্গঠিত করিবে যে ব্যবস্থায় কেহই অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে পারিবে না।

১৩। সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃংখলা রক্ষা করা, জনসেবার মনোবৃত্তি লইয়া সর্বপ্রকার কাজ করা হইবে নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী-বৃন্দের পবিত্র দায়িত্ব।

১৪। নির্বাহী বিভাগ (শাসন বিভাগ) হইতে বিচার বিভাগের পৃথকী-করণ করা হইবে।

১৫। জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় স্মৃতি নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৬। জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার সহিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক বল প্রয়োগ নীতি পরিহার করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন করাও রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মূলনীতিগুলির সমালোচনা—Criticism of the Principles

বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নীতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতিপয় নীতি ভারতের সংবিধানে বর্ণিত নীতির অনুসরণে রচিত হইয়াছে এবং কতকগুলি নীতি বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক নীতিগুলি সোভিয়েত সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা, তিন শ্রেণীর মালিকানা প্রতিষ্ঠা, কাজ করা, শৃংখলা রক্ষা করা, সংবিধান ও আইন মান্য করা প্রভৃতি নীতিগুলি সোভিয়েত সংবিধান হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত জাতির মহান্ আদর্শগুলি বিশদভাবে এই মূলনীতিতে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই নীতিগুলি সরকারের দায়িত্ব সূচিত করে, অপর দিক দিয়া এই নীতিগুলি হইল নাগরিক অধিকারের সমষ্টি যাহা নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে দাবি করিতে পারেন। কিন্তু সংবিধানের ৮নং অনুচ্ছেদের (২) ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না। সুতরাং সংবিধানে এই নীতিগুলি সন্নিবেশ নিরর্থক হইয়াছে। সরকার যদিও গ্রামোন্নয়ন ও কর্ম-সংস্থানের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তথাপি কোন বেকার ব্যক্তি কর্মসংস্থানের অভাবে সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের মত যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত দেশের পক্ষে এই নীতিগুলিকে কার্যকর করা শুধু সময়সাপেক্ষ নহে, ব্যয়সাপেক্ষও বটে। আরও বলা যায় যে, এই নীতিগুলির কার্যে রূপায়ণ শুধু মাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় সম্ভব নহে—এই রূপায়ণের জন্য জনগণের অকুণ্ঠ ও সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য।

কিন্তু এই নীতিগুলিকে একেবারেই নিরর্থক বলা সমীচীন নহে। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, কোন নবীন জাতির সম্মুখে যদি কোন উচ্চ আদর্শ না থাকে তাহা হইলে এই জাতি কখনও উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে এই নীতিগুলি বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করিয়া উদ্দেশ্যসাধনের উদ্দেশ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই নীতিগুলির পশ্চাতে কোন আইনসম্মত সমর্থন না থাকিলেও ইহার রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন আছে। নির্বাচনকালে ভোটদাতার নিকট এই নীতিগুলি অবহেলা করিবার জন্য ভোটপ্রার্থী দায়ী থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ, বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকগণের বিশেষ কোন অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। রাষ্ট্র-পরিচালনার মূল নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নীতি অর্থনৈতিক অধিকারের স্থান পূরণ করিয়াছে এবং ধনী ও নির্ধনকে এবং গ্রাম ও নগরকে সমপর্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রকৃত ও পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশের সংবিধানে এই নীতিসমূহ স্থান পাইয়াছে। এই নীতিগুলি এখনও পর্যন্ত

শাসনক্ষেত্রে অতি সীমিতভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে কিন্তু আশা করা যায় যে, মুক্তি-সংগ্রামী বাঙ্গালীগণ এই নীতিগুলিকে কার্যে রূপায়ণের জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করিবেন। স্বাধীনতা অর্জনই চূড়ান্ত নহে, স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ কাম্য। সুতরাং নীতিগুলিকে একেবারে নিরর্থক বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

মৌলিক অধিকার—Fundamental Rights

[মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা এই পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার—Fundamental Rights in the Constitution of Bangladesh

ভারতের ন্যায় বাংলাদেশের আদি সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আদি সংবিধানে মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। পরবর্তীকালে এই দুই দেশে মৌলিক অধিকারগুলি সন্নিবেশিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, কারণ প্রচলিত কোন আইন বা আইনের অংশ এবং ভবিষ্যতে রচিত কোন আইন যদি মৌলিক অধিকার-বিরোধী হয় তাহা হইলে সেই সমুদয় আইন আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

১। আইনের দৃষ্টিতে সমতা—Equality in the eye of law

সংবিধানে উল্লিখিত ও স্বীকৃত প্রথম মৌলিক অধিকার হইল আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকই সমান এবং সকলেই আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

আইনের দৃষ্টিতে এই সমতা নিম্নলিখিত উপায়ে বলবৎ করা হইবে, যথা,

(ক) ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।

(খ) গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকিবে।

(গ) জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামস্থানে প্রবেশের বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা, বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

তবে সমতা নীতির একটি ব্যতিক্রম হইল যে, রাষ্ট্র নারী বা শিশুদের

অনুকূলে বা কোন অনগ্রসর শ্রেণীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২। সরকারী নিয়োগলাভে সমতা—**Equality in the appointment of Government Services**

(ক) প্রজাতন্ত্রের নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের পক্ষে সমান সুযোগ থাকিবে।

(খ) কোন নাগরিকই উপরি-উক্ত কারণগুলির অজুহাতে সরকারী কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবে না বা তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

এই অধিকারটির তিনটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম ব্যতিক্রম হইল প্রজাতন্ত্রের কর্মে অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিধান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণ বিষয়ক আইন কার্যকর করা যাইতে পারিবে।

তৃতীয়তঃ, যে কাজের জন্য শুধু নারী উপযুক্ত এবং যে কাজের জন্য শুধু পুরুষ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেরূপক্ষেত্রে নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে নারী ও পুরুষের জন্য সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

৩। আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার—**Right to Protection under law**

আইনের আশ্রয়লাভ এবং একমাত্র আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে-কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এমন কি সাময়িককালের জন্য বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার। কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির আইনানুযায়ী ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে হানি করা যাইবে না।

৪। জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার—**Right to Life and Personal Freedom**

আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিম্নলিখিত উপায়ে রক্ষা করা হইয়াছে :

(ক) কাহাকেও গ্রেপ্তার করিলে তাহাকে গ্রেপ্তারের কারণ না জানাইয়া

প্রহরায় আটকান যাইবে না এবং গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর পরামর্শ ও তাহার দ্বারা আত্মসমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(খ) আটক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করিতে হইবে এবং আদালতের আদেশ ব্যতীত তাহাকে অতিরিক্ত কাল আটক রাখা যাইবে না। এই অধিকারটির ব্যতিক্রম হইল যে বিদেশী শত্রুর ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত বিধান দুইটি প্রযোজ্য হইবে না।

৫। চলাফেরার স্বাধীনতা—Freedom of Movement

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধসাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে-কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৬। সমাবেশের স্বাধীনতা—Freedom of Meeting

জন-শৃংখলা ও জন-স্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধসাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৭। সংগঠনের স্বাধীনতা—Freedom of Association

জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধসাপেক্ষে সমিতি ও সংঘ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে।

তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন সাম্প্রদায়িক সংঘ বা সমিতি বা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন ধর্মভিত্তিক কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না।

৮। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা—Freedom of Thought and Conscience and Freedom of Speech

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃংখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধসাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা অধিকারের এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৯। পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা—Freedom of Occupation

আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধসাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে-কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে-কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

১০। ধর্মীয় স্বাধীনতা—Freedom of Religion

(১) আইন, জনশৃংখলা ও নৈতিকতাসাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে-কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশ গ্রহণ বা যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না।

১১। সম্পত্তির অধিকার—Right to Property

(ক) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

(খ) তবে আইন-প্রণয়ন সাহায্যে ক্ষতিপূরণসহ অথবা বিনা ক্ষতিপূরণে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পত্তি গ্রহণ বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা যাইতে পারে। ক্ষতিপূরণের বিধান নির্ধারিত হইলে তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন আদালতে উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। গৃহ ও যোগাযোগের স্বাধীনতা—Freedom of Home and Correspondence

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃংখলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহ নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকিবে ; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতা রক্ষার অধিকার থাকিবে।

উপরি-উক্ত অধিকারগুলির সৃষ্টি ও সহায়ক হিসাবে রাষ্ট্র উপাধি, সম্মান ও ভূষণের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমোদনে কেহ বিদেশী উপাধি বা খেতাব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

তবে সাহসিকতার জন্য কিংবা একাডেমীয় বিশিষ্টতার জন্য পুরস্কার দানে বা গ্রহণে কোন বাধা নাই।

কোন অপরাধীকে অপরাধ সংঘটনকালে বলবত্তীকৃত আইন অনুসারে দণ্ড দিতে হইবে এবং এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার দণ্ড দেওয়া চলিবে না। ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকার দেওয়া হইবে। কোন ব্যক্তিকে লাঞ্ছনাজনক, নিষ্ঠুর বা অমানুষিক দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

মৌলিক অধিকারের বলবৎকরণ—Enforcement of Fundamental Rights

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুপ্রীম কোর্টের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল। তবে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া আইনসভা আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল বা যে-কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবে।

মৌলিক অধিকারগুলির ব্যতিক্রম—Exceptions to Fundamental Rights

(১) শৃংখলামূলক আইন যে সমস্ত ক্ষেত্রে অপরিহার্য সে সমস্ত ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের অজুহাতে শৃংখলাভঙ্গের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সাধারণ নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

(২) সরকারী কোন কর্মচারী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রয়োজনে অথবা রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে শৃংখলা রক্ষা বা পুনর্বহাল

করিবার উদ্দেশ্যে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা এরূপ ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতির যে-কোন একটিকে বলবৎ করিবার জন্য সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করে যে, অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন উপরি-উক্ত কোন মৌলিক অধিকার-বিরোধী বলিয়া বাতিল গণ্য হইবে না।

সমালোচনা—Criticism

সংবিধানে বর্ণিত অধিকারগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকারগুলি সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইলেও প্রত্যেকটি অধিকার শর্তসাপেক্ষ এবং এই শর্তগুলির ব্যাখ্যা একমাত্র আদালতগুলি করিতে পারে। প্রত্যেক দেশের অধিকারগুলিই শর্তসাপেক্ষ। কারণ অধিকারগুলি হইল সামাজিক জীবনে শৃংখলা ও শালীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়ক।

দ্বিতীয়তঃ, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হইলেও সংবিধানে নাগরিকগণের কোন অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। অর্থনৈতিক অধিকার না থাকিলে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করা যাইবে না। রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি বলবৎ করিবার জন্য সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালনার এই মূলনীতিগুলি এত ব্যাপক ও জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, এই মূলনীতিগুলি প্রয়োগের অজুহাতে নাগরিকগণকে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি হইতে যে-কোন সময়ে বঞ্চিত করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষাকবচরূপে কাজ করিবে।

রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের পার্থক্য—Difference between the Fundamental Principle of State Policy and Fundamental Rights

রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতিসমূহ এবং মৌলিক অধিকারগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মূলনীতিগুলি হইল আদর্শগত ও মৌলিক অধিকারগুলি হইল

বাস্তব। মূলনীতিগুলির দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। এইগুলির দ্বারা রাষ্ট্রের সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে, অপর পক্ষে মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিক জীবনের পূর্ণ আত্মবিকাশের কার্যকর উপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মৌলিক অধিকারের উল্লেখ দ্বারা রাষ্ট্রকে কতিপয় কার্য হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ রাষ্ট্র কর্তৃত্বের বাধাস্বরূপ। অপরপক্ষে মূলনীতিগুলি দ্বারা রাষ্ট্র সরকারকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ ইহার নীতি ও কার্য পরিচালনার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এই নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় না, কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায়।

নির্বাহী বিভাগ—The Executive Department

গঠন—Composition

বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রিসভা ও কর্মবিভাগ লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি হইলেন নির্বাহী বিভাগের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা হইল প্রকৃত ও রাজনৈতিক (Real and Political) শাসক এবং কর্মবিভাগ হইল স্থায়ী শাসক। ইহারা মন্ত্রিসভা কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচীর বাস্তবায়ন করেন। মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিলেও ইহাদের পদত্যাগ করিতে হয় না। ইহারা সরকারী কার্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

রাষ্ট্রপতি—The President

রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা, নির্বাচন, মেয়াদ ও অপসারণ—Qualifications, Election, Duration and Removal

রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাবলী হইল :

(ক) তাঁহাকে অবশ্যই অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে।

(খ) সংসদ সদস্য হইবার যোগ্যতা থাকা চাই।

(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদ হইতে অপসারিত না হইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যগণের বৈঠকে সংসদ সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হইবেন এবং এই নির্বাচন ব্যাপার পরিচালনা করিবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। নির্বাচন কমিশনার ভোটকেন্দ্র কর্তা ও এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মচারিগণের সাহায্যে ভোটগ্রহণ পরিচালিত হইবে। নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়নপত্র দাখিল, মনোনয়ন পরীক্ষা, ভোটগ্রহণ ও ভোটের ফল প্রকাশ এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যদি একজনমাত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলিয়া কমিশনার কর্তৃক ঘোষিত হয় বা একজন ব্যতীত অন্য সকল প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন তাহা হইলে কমিশনার ঐ একজন প্রার্থীকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন। সংসদ সদস্যগণ গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটপত্রে তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থীর নামের পার্শ্বে ঢেরা-চিহ্ন দিয়া ব্যক্তিগতভাবে ভোটদান করিবেন। দুইজন মাত্র প্রার্থী থাকিলে অধিকসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হইবেন। যদি তিন বা ততোধিক সংখ্যক প্রার্থী থাকেন তাহা হইলে একজন প্রার্থী অবশিষ্ট প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সর্বমোট ভোটসংখ্যা অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকিলে তিনিই নির্বাচিত বলিয়া কমিশনার ঘোষণা করিবেন। কিন্তু উপরি-উক্ত বিধান অনুযায়ী কোন প্রার্থী যদি নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন তাহা হইলে পুনরায় ভোট গ্রহণ হইবে এবং পূর্ববর্তী নির্বাচনে যে প্রার্থী সর্বাপেক্ষা কমসংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে উপরি-উক্ত নিয়মাবলী অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

যদি মাত্র দুইজন নির্বাচনপ্রার্থী থাকেন এবং যদি কোন ভোটগ্রহণে সমসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে একজনকে বাদ দিতে হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রমত নির্বাচনের জন্য বা বাদ দিবার জন্য প্রার্থী বাছাই লটারীর দ্বারা হইবে।

ভোটগ্রহণের পর ভোট গণনা সমাপ্ত হইলে এবং ভোটগ্রহণ ফলাফল স্থিরীকৃত হইলে কমিশনার তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্যে ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তির দ্বারা তাহা ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন তবে নির্দিষ্ট সময় অন্তে তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকিবেন। একাদিক্রমেই হউক আর না হউক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি

পদে একই ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। এই বিধানটি বাংলাদেশের সংবিধানের একটি অভিনবত্ব।

রাষ্ট্রপতি নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্রযোগে স্পীকারের নিকট পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

বাংলাদেশের সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণ অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে। ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে। নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাবটি আলোচিত হইতে পারিবে না অর্থাৎ নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ দিন পর ষোল দিনের মধ্যে এই আলোচনা করিতেই হইবে। সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকিলে স্পীকারকে তৎক্ষণাৎ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। অভিযোগ তদন্তের ভার সংসদ কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন। অভিযোগ বিবেচনা কালে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকিতে পারেন এবং প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন। অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্যসংখ্যার অন্যান দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

অসামর্থ্যের কারণেও রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাক্ষরে স্পীকারকে একটি নোটিশ দিতে হইবে। স্পীকার একটি চিকিৎসা পর্ষদ গঠন করিয়া রাষ্ট্রপতিকে ঐ পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার অনুরোধ জানাইয়া দশ দিনের মধ্যে পর্ষদের নিকট উপস্থিত হইতে বলিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যদি পর্ষদের নিকট উপস্থিত না হন অথবা পর্ষদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি কার্যভার পরিচালনায় অসমর্থ বিবেচিত হন তাহা হইলে তাঁহার অপসারণের প্রস্তাবটি সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হইলে গৃহীত হইবার তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বা রাষ্ট্রপতি স্বীয় দায়িত্বভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

রাষ্ট্রপতির নিষ্কৃতি বা দায়মুক্তি—Immunities of the President

রাষ্ট্রপতি তাঁহার সরকারী কার্য পরিচালনার জন্য কোন আদালতে তাঁহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না। রাষ্ট্রপতির কার্যকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী আদালতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারী করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা—Powers of the President

সংবিধানের ৪৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন। রাষ্ট্রপতির উপর সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

১। নির্বাহী বা শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা :—

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি-সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন। রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণের পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করিবেন ও প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিবেন। এ্যাটর্নী-জেনারেল, মহা-হিসাব পরীক্ষক ও নিরীক্ষক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দকে রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করিবেন।

২। আইন প্রণয়ন-বিষয়ক ক্ষমতা—Legislative Powers

বাংলাদেশে পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার ফলে রাষ্ট্রপতি সংসদের সাধারণ সদস্য না হইলেও সংসদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করিতে পারেন এবং সংসদের প্রথম বৈঠককালে বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। যুদ্ধাবস্থায় প্রয়োজন বোধ করিলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া সংসদ পুনরাহ্বান করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন-সাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতির নিকট সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন বিল পেশ করিবার ১৫ দিনের মধ্যে তিনি উহাতে সম্মতি দান করিবেন অথবা সমগ্র বিলটি কিংবা ইহার কোন অংশ বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জানাইয়া একটি বার্তা-সহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদ অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতি যদি অনুরূপভাবে বিলটি সংসদে ফেরত পাঠান তাহা হইলে সংসদ তাহা বিবেচনা করিবে এবং রাষ্ট্রপতি-প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিবে। উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে বিলটিতে সম্মতি দান করিতে হইবে এবং তাহা না করিলে সাতদিন অন্তে বিলটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং আইনের মর্যাদা লাভ করিবে। সুতরাং রাষ্ট্রপতির সাময়িক কালের জন্য ভিটো দান ক্ষমতা আছে।

৩। অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Financial Powers

সরকারী ব্যয়-সংক্রান্ত কোন প্রস্তাবই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত সংসদে উপস্থাপিত হইতে পারিবে না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরী দাবী করা যাইবে না। স্পীকারের স্বাক্ষরযুক্ত প্রত্যেক অর্থবিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে বিলটি আইনের মর্যাদা লাভ করিবে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হইবে। মহা হিসাব-নিরীক্ষককে প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৪। ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা—Power of Pardon

কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

৫। অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা—Ordinance-making Power

(ক) সংসদের অধিবেশনের অবর্তমান কালে বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত পরিস্থিতির উপযোগী অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অধ্যাদেশ আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। তবে এই অধ্যাদেশগুলি এরূপভাবে প্রণীত হইবে যে, যাহা (ক) সংসদের আইন দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায়, (খ) যাহা এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করিতে পারে না অথবা (গ) যাহার দ্বারা পূর্ব-প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে-কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়। অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম অধিবেশনে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতিপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ৩০ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা লোপ পাইবে।

(খ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়নও জারী করিতে পারিবেন যাহাতে সংবিধান দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়মুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয় নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

৬। সামরিক ক্ষমতা—Military Powers

রাষ্ট্রপতি হইলেন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক। তাঁহার প্রতিরক্ষা বিষয়-সংক্রান্ত ক্ষমতার প্রয়োগ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। স্থল, জল বা আকাশপথে বাংলাদেশ আক্রান্ত হইলে অথবা আক্রমণ প্রত্যাসন্ন ক্ষেত্রে দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে-কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে তৎক্ষণাৎ সংসদ আহ্বান করিতে হইবে। কারণ সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা—Position and Powers of the President of Bangladesh

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক সহজ ও সরল পদ্ধতিতে নির্বাচিত রাষ্ট্র-প্রধান। তাঁহার অপসারণ পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই জটিল করা হইয়াছে তবে অভিসংশনকালে রাষ্ট্রপতিকেও তাঁহার বক্তব্য ও আত্মপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ দান করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁহার হস্তে রাষ্ট্রীয় সমুদয় উচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, যথা, শাসন বিভাগীয়, আইন প্রণয়ন বিষয়ক, আর্থিক, বিচার বিভাগীয় ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন প্রভৃতি। সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত ক্ষমতাগুলির তালিকা দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয় তিনি অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তি। কিন্তু কার্যতঃ এই সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুসারে তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হয়। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীকে তিনি নিয়োগ করিতে পারেন কিন্তু এ বিষয়েও তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামতের ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর নাই। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে কোন বিষয়ে উপদেশ বা পরামর্শ দান করিতে পারেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করিলে রাষ্ট্রপতির কিছু করিবার নাই। একমাত্র মতভেদের কারণে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির যথেষ্ট পদমর্যাদা থাকিলেও তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই। তিনি ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রধান—শাসনব্যবস্থার প্রধান নহেন। রাষ্ট্রপতির প্রতিপত্তি বহুলাংশে তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দান করিতে পারেন, উৎসাহ দান করিতে পারেন বা কোন কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে বাধ্য করিতে পারেন না। বাংলাদেশের পরিস্থিতি অন্যদেশের পরিস্থিতি অপেক্ষা একটু ভিন্ন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশে এরূপ জনপ্রিয় এবং বিদেশেও এরূপ প্রখ্যাত ব্যক্তি যে, স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর বর্তমানে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি ম্লান হইয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা—Prime Minister and the Council of Ministers

বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক বাংলাদেশে পার্লামেন্ট-প্রধান বা মন্ত্রিসভা

পরিচালিত শাসনব্যবস্থা (১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রবর্তিত হইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই হইল প্রকৃত শাসক। বাংলাদেশে একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা শাসন পরিচালনা করে। প্রধানমন্ত্রী আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।। প্রধানমন্ত্রীসহ সকল শ্রেণীর মন্ত্রীকে অবশ্যই আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। যদি কোন মন্ত্রী নিয়োগের সময় আইনসভার সদস্য না থাকেন তাহা হইলে নিয়োগের দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আইনসভার সদস্য হইতে হইবে নতুবা তিনি মন্ত্রিসভায় বহাল থাকিতে পারিবেন না। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট পদ ত্যাগ করিতে পারেন। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কার্য—Powers and Functions of the Council of Ministers

ইংলণ্ড ও ভারতের মন্ত্রিসভার অনুরূপভাবে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা গঠিত হইলেও বাংলাদেশের সংবিধান মন্ত্রিসভার সংগঠন ও কার্য নিরূপণ করিয়াছে। এখানে প্রথাগত বিধানের সাহায্যে মন্ত্রিসভার কোন কার্যই পরিচালিত হয় না।

মন্ত্রিসভার প্রধান কার্য হইল শাসন-সংক্রান্ত। শাসনকার্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত থাকে এবং এক একজন মন্ত্রী এক বা একাধিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী গুণ, যোগ্যতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও দলীয় সংহতির ভিত্তিতে মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। অবশ্য এই দপ্তর বণ্টন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে প্রচারিত হয়।

মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে শাসনব্যবস্থার সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে; আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থির করা মন্ত্রিসভার গুরু দায়িত্ব। বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন, বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ, বা কোন্ রাষ্ট্রকে সাহায্য দান কিংবা কোন্ রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে তাহা মন্ত্রিসভাই স্থির করে।

জাতীয় জীবনের উন্নয়ন ক্ষেত্রেও মন্ত্রিপরিষদের প্রভাব অসীম। পরিকল্পনা-

সাহায্যে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণ করাও মন্ত্রিসভা কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

জাতীয় জীবনের আর্থিক ক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভার কার্য বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। কর ধার্য করা, জাতীয় আয় যথাযথভাবে ব্যয় করা, ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সকল কার্যই মন্ত্রিসভা নির্ধারণ ও পরিচালনা করে। অর্থ-সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব কোন মন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) ব্যতীত অন্য কোন সংসদ সদস্য করিতে পারেন না।

এতদ্ব্যতীত মন্ত্রিসভা আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ করেন এবং নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। সংসদে যে সমস্ত বিল উত্থাপিত হয় তাহার অধিকাংশই মন্ত্রিগণ কর্তৃক পেশ করা হয়। মন্ত্রিগণ দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সংসদে বিলগুলি পাস করাইতে পারেন। মন্ত্রিসভার সমর্থন ব্যতীত কোন বে-সরকারী সদস্য উত্থাপিত বিল পাস হইতে পারে না। এইরূপে মন্ত্রিসভা শাসন-নীতি নির্ধারণে, আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে ও আইন-প্রণয়নে ইংলণ্ড বা ভারতের মন্ত্রিসভার সম-পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক—Relation between the Prime Minister and Council of Ministers

সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নির্বাচিত নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমেই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্রী নিয়োগ করেন। সুতরাং মন্ত্রিগণের প্রকৃত নিয়োগকর্তা হইলেন প্রধান মন্ত্রী এবং এই কারণে অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। প্রধান-মন্ত্রীই গুণ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই মধ্যস্থতা করেন। প্রধানমন্ত্রী শুধু দলের নেতা নহেন, তিনি মন্ত্রিগণেরও নেতা। মন্ত্রিগণের ঐক্য ও সংহতি তাঁহার নেতৃত্বেই রক্ষিত হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সভাপতি এবং সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। সংসদে মন্ত্রিসভা নির্ধারিত নীতি তিনিই সমর্থন করেন। কোন মন্ত্রী তাঁহার সহিত একমত না হইলে পদত্যাগ করা ভিন্ন উক্ত মন্ত্রীর গত্যন্তর নাই। সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদে (২) বলা হইয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী যে-কোন সময়ে যে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারেন এবং উক্ত মন্ত্রী যদি পদত্যাগ করিতে

অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটাইবার পরামর্শ দান করিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে তবে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন। সুতরাং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর উপর শুধু নির্ভরশীল নহেন তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীর নিকট দায়ীও বটেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হইলেও প্রধান মন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার সংবিধান কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত। মন্ত্রিসভার সহিত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার বহুল পরিমাণে তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 'জাতির জনক' বলিয়া অভিহিত হন। সুতরাং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও পদমর্যাদা—Position and Influence of the Prime Minister

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ সাংবিধানিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধানের ৫৬ (১) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। উক্ত অনুচ্ছেদের (৩) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। সুতরাং কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রী স্ব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। সংবিধানে ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। সুতরাং দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতির হস্তে সংবিধান যে বিস্তারিত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তৎসমুদয় পরিচালনা করিবার প্রধান অধিকারী হইলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহা জানা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, প্রধানমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিসভার সভাপতি ও পরিচালক। অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাঁহার সুপারিশ বলেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রীই তাঁহাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তিনি মন্ত্রিগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি

বজায় রাখেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে তাঁহার সহকর্মিগণকে স্বমতে আনয়ন করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার মত গ্রহণ না করেন তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দ্বিবিধ। স্বীয় দপ্তর পরিচালনা করা ও অন্যান্য দপ্তরগুলির কার্য তদারক করা।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি আইনসভারও নেতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তাঁহাকে দলের সংহতি ও মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া জনমত নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্ব, দলীয় নেতৃত্ব সব কিছুই তাঁহার জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে।

সংসদে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনার উত্তর দান করেন। তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সুবিধা হইল যে, বাংলাদেশে বিরোধী দলের সদস্যসংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে তিনিই হইলেন যোগসূত্র। রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে কার্যতঃ সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও পদমর্যাদা অতুলনীয়। তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর একটি অসুবিধা হইল তাঁহার কোন পূর্বসূরী নাই যাঁহাদের দৃষ্টান্তে তিনি অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। তাঁহাকেই প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। এ বিষয়ে তাঁহার মূলধন হইল জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও কতিপয় মিত্র-রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও সাহায্য।

মন্ত্রিসভার সহিত আইনসভার সম্পর্ক ও মন্ত্রিগণের দায়িত্ব—Relation of the Council of Ministers to the Legislature and Ministerial Responsibility

বৃটিশ ও ভারতের শাসনব্যবস্থার অনুরূপভাবেই বাংলাদেশের শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য-বিধান নীতি অবলম্বন করা হয় নাই। শাসন বিভাগ আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গঠিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে অবশ্যই আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। আইনসভার সদস্য হিসাবে মন্ত্রিগণ সাধারণ ও অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারেন এবং দলীয় সমর্থনের সাহায্যে প্রস্তাবগুলিকে আইনে পরিণত করিতে পারেন। মন্ত্রিগণ সংসদে উপস্থিত থাকিয়া সংসদের কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫ (৩) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন। যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল যে, মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে অকুণ্ঠভাবে সমগ্র সভা কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে হইবে। মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে হয়ত মন্ত্রিগণের মতানৈক্য ঘটিতে পারে কিন্তু সংসদের সহিত বা জনমতের সহিত সম্পর্কে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা কখনই মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। সংসদের সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিসভা একটি একক ও অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কার্য পরিচালনা করিবেন। আইন-সভা যদি কোন একজন মন্ত্রীর কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে অথবা কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল সংসদের সংখ্যাধিক্য ভোটে অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রি-সভার পরাজয় বলিয়া বিবেচিত হয় ও সমগ্র মন্ত্রিসভা একযোগে পদত্যাগ করে। সংসদের সদস্যগণ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা, মন্ত্রিসভার কার্যের সমালোচনা করিয়া ও শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভার কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের অর্থ পরিমাণ হ্রাস করিবার প্রস্তাব আনয়ন করিয়াও মূল বাজেট না-মঞ্জুর করিতে পারে। বাজেট না-মঞ্জুর হইলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিতে হয়।

বাংলাদেশে সংসদের নিকট মন্ত্রিসভার এই দায়িত্ব বৃটিশ ব্যবস্থার মত প্রথাভিত্তিক নয়, সংবিধান কর্তৃক এই দায়িত্ব বলবৎ করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অসদাচরণ, অযোগ্যতা বা কুশাসনের ফলে অপ্রিয় হন তাহা হইলে এই মন্ত্রী বিশেষের ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভা দায়ী হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই এককভাবে পদত্যাগ করিতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর মারফৎ রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করিতে হয়। নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, পার্লামেন্টারী

শাসনব্যবস্থায় মাত্রই মন্ত্রিসভার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। দলের সদস্যগণ একরূপ অন্ধভাবেই মন্ত্রিসভা কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রম অনুমোদন করিয়া থাকেন।

প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার রাষ্ট্রপতির সহিত সম্পর্ক—Relation of the Council of Ministers headed by the Prime Minister with the President

রাষ্ট্রপতি হইলেন রাষ্ট্র-প্রধান আর প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা হইল শাসক-প্রধান। রাষ্ট্রপতি হইলেন নামসর্বস্ব নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রধান আর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা হইল প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। সত্য বটে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন ও প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিগণকেও নিয়োগ করেন। কিন্তু এ সমস্ত নিয়োগ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় না। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগ করিতে পারেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর মারফৎ রাষ্ট্রপতি সকাশে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার বিধিসমূহ প্রণয়ন করেন, কিন্তু সংবিধানের ৪৮ (৩) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। তবে রাষ্ট্রপতি যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিসভাকে প্রভাবিত করিতে পারেন।

এ্যাটর্নি-জেনারেল—Attorney-General

এ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় যাঁহার সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্যতা আছে। এ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এই কারণে তিনি বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময় সীমা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিতে পারিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাইবেন।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক—Comptroller and Auditor-General

বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁহার নিয়োগ করিবেন ও তাঁহার কার্যের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবেন।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক বাংলা সরকারের হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করিবেন। এইজন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে-কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার বা অন্য প্রকার সরকারী সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হইবেন। সংসদও আইন প্রণয়ন করিয়া তাঁহার উপর নূতন কার্যভার অর্পণ করিতে পারিবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবেন না। তাঁহার কার্যকাল ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত কিন্তু তিনি নিজ স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতির নিকট তৎপূর্বেই পদত্যাগ পত্র দিতে পারিবেন। অবসর গ্রহণের পর প্রজাতন্ত্রে অন্য কোন কার্যে তিনি যোগদান করিতে পারিবেন না। কোন কারণে তাঁহার অনুপস্থিতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কোন ব্যক্তিকে উক্ত পদের দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আকারে ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হইবে। মহা হিসাব-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতিকে যে কারণে ও যে পদ্ধতিতে অপসারণ করা যায়, মহা হিসাব-নিরীক্ষককেও অনুরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত করা যাইবে।

বাংলাদেশের আইনসভা—The Legislature of Bangladesh

জাতীয় সংসদ—The National Assembly

রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নামে একটি কক্ষ লইয়া আইনসভা গঠিত। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য না হইলেও ইহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী তিন শত সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে। সংবিধান প্রবর্তন কাল হইতে আগামী দশ বৎসর পর্যন্ত পনেরটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। মহিলা সদস্যগণ আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত

হইবেন। তবে মহিলারা সাধারণ আসনগুলির জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

সংসদ সদস্যের যোগ্যতা—Qualifications for Membership of the Assembly

সংসদ সদস্য হইবার প্রথম যোগ্যতা হইল সদস্যপদপ্রার্থী বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন ও অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বা দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন নাই। তৃতীয়তঃ, নৈতিক স্খলন অপরাধে দুই বৎসর দণ্ড ভোগকারী ব্যক্তিকে দণ্ড ভোগের পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইতে হইবে। চতুর্থতঃ, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত না হওয়া। পঞ্চমতঃ, আইনের দ্বারা নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হন নাই।

সংসদ সদস্য নির্ধারিত সময়মধ্যে শপথ গ্রহণ না করিলে বা দলত্যাগ কিংবা দলের বিরুদ্ধে ভোট দান করিলে তাঁহার সদস্যপদ শূন্য হইবে। কোন সদস্য স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্পীকারের নিকট পদত্যাগ করিতে পারেন। সংসদ সদস্যগণ আইন দ্বারা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত বেতন পাইবেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে। যুদ্ধাবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বোধ করিলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া সংসদ পুনরাহ্বান করিতে পারেন।

সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি—Special Privileges and Immunities of the Assembly and Members

সংসদ সদস্যগণ যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশের আইনসভাকে ও সদস্যগণকে বিশেষ অধিকার ও কতিপয় নির্ধারিত বিষয়ে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। সংসদ সদস্যগণের পক্ষে এই অধিকার ও দায়মুক্তির সুযোগ লইয়া নির্ভীকভাবে তাঁহাদের দায়িত্ব পালন কাম্য। বাংলাদেশের সংসদ ও সদস্যগণও এই বিশেষ অধিকার ও নিষ্কৃতি ভোগ করেন। বিশেষ অধিকারগুলি হইল :

১। সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

২। কোন সংসদ সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্য-প্রণালী নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা বা শৃংখলা রক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিলে তিনি এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না। এই বিশেষ অধিকারটি স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের স্বাধীনতা সূচীত করে।

৩। সংসদ বা সদস্যদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৪। সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজ-পত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৫। সংসদের আইন দ্বারা সংসদের, সদস্যদের ও সংসদ কমিটিসমূহের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার—Speaker and Deputy Speaker

সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করিবেন। তাঁহারা পদত্যাগ করিলে সংসদ সাতদিনের মধ্যে পুনরায় ঐ দুইটি পদে নূতন নির্বাচন করিবেন। স্পীকার রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারেন। তিনি সংসদ সদস্য না থাকিলে তাঁহার পদ শূন্য হইবে। তাঁহার অপসারণ দাবি করিয়া কোন প্রস্তাব সংসদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়।

স্পীকারের কোন কারণে অনুপস্থিতি কালে বা তিনি রাষ্ট্রপতির পদ পূরণ করিলে তাঁহার স্থলে ডেপুটি স্পীকার কার্যভার গ্রহণ করিবেন এবং এই উভয়ের অনুপস্থিতি কালে সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য এই দায়িত্ব পালন করিবেন।

স্পীকারের কার্য—Functions of the Speaker

স্পীকার সংসদে সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভার বিতর্ক পরিচালনা করেন এবং সভার নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা ও বলবৎ করেন। কোন বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উঠিলে তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হয়। নির্বাচনের পর স্পীকার নিরপেক্ষ থাকেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন সদস্য বক্তৃতা

করিতে পারেন না এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দিতে হয়। তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে সভার কার্য স্থগিত রাখিতে পারেন। তিনিই অধিবেশনের শৃংখলা রক্ষা করেন। উভয় পক্ষে সমসংখ্যক ভোট পড়িলে তিনি একটি অতিরিক্ত ভোট দান করিতে পারেন। তিনিই ভোটের ফল ঘোষণা করেন। সংসদে কোন বিল গৃহীত হইলে তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা হয়। কোন বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কি না এ সম্পর্কে স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এক কথায়, স্পীকারের গুণ, যোগ্যতা ও দলনিরপেক্ষতার উপর সংসদের কার্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

সংসদের কার্য ও ক্ষমতা—Functions and Powers of the Assembly

বাংলাদেশের আইনসভা অ-সার্বভৌম আইনসভা, কারণ সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাগুলিই সংসদ পরিচালনা করিতে পারে।

সংসদের প্রথম ও প্রধান কার্য হইল নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে আইন প্রণয়ন করা। আইন প্রণয়ন করা সময়সাপেক্ষ। আইন সহসা অল্প সময়ের মধ্যে কোন দেশেই পাস করা চলে না—কারণ আইন জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। এই কারণে বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া জনস্বার্থের উপর আইনের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিচার করা হয়। এইজন্যই প্রতিটি আইনের তিনটি পাঠ (Reading) হয় এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়। সুতরাং বিশেষ বিচার-বিবেচনা করাও (Deliberation) আইনসভার আর একটি কার্য।

সংসদের আর একটি কার্য হইল অর্থ-সংক্রান্ত বিল অনুমোদন করা। সংসদের বিনা অনুমোদনে কোন রাজস্ব আদায় ও ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হয় না।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ ও প্রেরিত বাণী সম্পর্কে সংসদ আলোচনা করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশগুলি সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ।

সংসদ সদস্যগণ অধিবেশন কালে মন্ত্রিগণকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন। মন্ত্রিগণের প্রশ্নগুলির লিখিত বা মৌখিক জবাব দিতে হয়। সংসদ

মন্ত্রিসভার অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রমের সমালোচনা করিতে পারে। প্রয়োজন হইলে নানাপ্রকারে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে। সুতরাং সংসদের হস্তে নির্বাহী বিভাগীয় কিছু ক্ষমতাও আছে। সংসদ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, সমালোচনার দ্বারা ও অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বলবৎ করে। সংসদ রাষ্ট্রপতি ও স্পীকারকে নির্বাচন করে।

সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না বা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। সংসদ প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগদান ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করে। প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহ গঠন ও সংরক্ষণ সংসদের একটি প্রধান কার্য।

সংসদের কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও আছে। রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ক্ষেত্রে ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের অপসারণ ব্যাপারে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক ভোট প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যায় যে, সংসদের হস্তে বিচার-বিবেচনাপূর্বক আইন-প্রণয়ন, অর্থ সংক্রান্ত, নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কিত ও বিচার বিভাগীয় কার্য ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। তবে এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ষাটজন সদস্য উপস্থিত না থাকিলে সংসদের কোন কার্যই চলিতে পারে না।

সংসদে আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি—Process of Lawmaking in the Assembly

সংসদের প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাব বিল আকারে কোন সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হইতে হইবে। সাধারণতঃ প্রত্যেক বিলের তিনটি পাঠ হয়। যথা, প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ ও তৃতীয় অথবা শেষ পাঠ। এই পাঠগুলির অন্তর্বর্তী কালে বিলটিকে আইন-সভার একটি সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলটির বিশদ পর্যালোচনা করিয়া ইহার রিপোর্টসহ অথবা বিনা রিপোর্টে আইনসভায় প্রেরণ করে। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য উক্ত গৃহীত বিল তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির নিকট বিলটি উপস্থাপিত হইলে তিনি পনের দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দান করিবেন অথবা সম্মতি দান না করিলে বিলের বা ইহার কোন অংশের

বিশেষ পুনর্বিবেচনা কিংবা বিলের কোন সংশোধনী প্রস্তাব একটি বার্তাসহ সংসদের পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যদি ১৫ দিনের মধ্যে উপরি-উক্ত কার্য সম্পাদনে বিরত থাকেন তাহা হইলে ১৫ দিন পরে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতি যদি পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি সংসদে ফেরত পাঠান তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া যদি বিলটি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে তাহা হইলে ৭ দিনের মধ্যে তাঁহাকে বিলটিতে সম্মতি দান করিতে হইবে। এরূপ সম্মতিদানে রাষ্ট্রপতি অসমর্থ হইলে নির্দিষ্ট মেয়াদ অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে অথবা সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে বিলটি আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদ আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।

অর্থবিল প্রণয়ন—Financial Legislation

বাংলাদেশে অর্থবিল বলিতে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত বিলগুলিকে বুঝায় :

১। কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ।

২। সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ বা কোন গ্যারান্টি দান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন।

৩। সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলে অর্থপ্রদান, অনুরূপ তহবিল হইতে অর্থদান বা নির্দিষ্টকরণ।

৪। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোন দায় রদবদল বা বিলোপ।

৫। সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান কিংবা সরকারের হিসাব নিরীক্ষা।

৬। উপরি-উক্ত উপ-দফাসমূহ নির্ধারিত যে-কোন বিষয়ের অধীন আনুষঙ্গিক বিষয়।

সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন কোন অর্থ বিল বা বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাইবে না। কিন্তু কোন

কর হ্রাস বা বিলোপ সম্পর্কিত কোন সংশোধনী উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে না। সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃক ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না।

অর্থবিল সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত প্রণালীতে গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করিবার পূর্বে স্পীকার কর্তৃক বিলটি অর্থবিল বলিয়া একটি সার্টিফেকেট সহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতির নিকট অর্থবিল উপস্থাপিত হইলে তিনি পনের দিন মধ্যে বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন। তিনি সম্মতিদানে বিরত থাকিলে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে বিলটি আইনে পরিণত হইয়া সংসদ আইন বলিয়া গণ্য হইবে।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি—The Annual Budget

সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অর্থ বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবৃতি সংসদে উপস্থাপিত করিতে হইবে। সাধারণ মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রাপ্ত ও বিশেষভাবে পরীক্ষিত আয় ও ব্যয়ের তালিকা একত্রিত করিয়া অর্থমন্ত্রী এই বিবৃতি সংসদে তাঁহার বক্তব্যসহ পেশ করেন। সংসদ সদস্যগণ মঞ্জুরী দাবীতে সম্মতি দান বা অস্বীকৃতি কিংবা মঞ্জুরী দাবীর অর্থ পরিমাণ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিতে পারেন। কিন্তু বৃদ্ধি বা ব্যয়ের উদ্দেশ্য পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতে পারেন না। সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরী দানের পর সংযুক্ত তহবিল হইতে নিম্নলিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অর্থ নির্দিষ্টকরণের বিধান সম্বলিত একটি বিল যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উত্থাপন করা হয়।

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ মঞ্জুরী, এবং (খ) সংসদে উপস্থাপিত বিবৃতিতে প্রদর্শিত অর্থের অনধিক সংযুক্ত তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয়।

যদি কোন সরকারী কর্মবিভাগে মঞ্জুরীকৃত ব্যয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় বা আর্থিক বিবৃতি বহির্ভূত কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সংযুক্ত তহবিল হইতে এই অতিরিক্ত বা সম্পূরক ব্যয় নির্বাহের কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে পেশ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। মঞ্জুরী দাবী সংসদ কর্তৃক পাস হইবার পূর্বে কোন অর্থ বৎসরের কোন অংশের জন্য অনুমিত

ব্যয়ের মঞ্জুরী দানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে। সংসদ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব ব্যয়ের জন্যও মঞ্জুরী দান করিতে পারিবে।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে ব্যয়-বরাদ্দগুলি দুইভাগে ভাগ করা হয়, যথা, (১) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রূপে বর্ণিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং (২) সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় করা হইবে এইরূপ প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ।

সরকারের তহবিল নিম্নলিখিত আয়গুলি লইয়া গঠিত। সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল অর্থ এবং কোন ঋণ-পরিশোধ হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হইবে এবং তাহা "সংযুক্ত তহবিল" নামে অভিহিত হইবে। অন্য সকল প্রকার সরকারী আয় সরকারী হিসাবে জমা হইবে।

সরকারী ব্যয়-বরাদ্দগুলির এই দুই ভাগের মধ্যে পার্থক্য আছে। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়-বরাদ্দগুলি সংসদের অধিবেশনে আলোচিত হইতে পারে কিন্তু এই ব্যয়গুলির উপর সংসদের ভোটাধিকার নাই। সর্ব-দেশেই এইরূপ কতকগুলি ব্যয় আছে যাহার জন্য আইনসভার বার্ষিক অনুমোদন প্রয়োজন হয় না, অন্যান্য ব্যয়-বরাদ্দগুলির জন্য সংসদের অনুমোদন অপরিহার্য। সংযুক্ত দায়যুক্ত ব্যয়-বরাদ্দগুলি হইল :

১। রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তাঁহার দপ্তর সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যয়।

২। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন।

৩। মহা হিসাব-পরীক্ষক, নিরীক্ষক, নির্বাচন কমিশনারগণের, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের, সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যগণকে দেয় পারিশ্রমিক।

৪। ঋণ-পরিশোধ, সুদপ্রদান প্রভৃতি বাবদ ব্যয়।

৫। কোন আদালত কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোন পরিমাণ অর্থ।

৬। এই সংবিধানে বা সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে-কোন ব্যয়।

রাজস্ব বিল ও ব্যয়-বরাদ্দ বিল অর্থবিল এবং অর্থবিলের অনুরূপ পদ্ধতিতে গৃহীত হয়।

. সংসদের কমিটিসমূহ—Committees of the Assembly

প্রত্যেক সভ্য দেশে আইনসভা কতিপয় কমিটি গঠন করে। কমিটিগুলি গঠনের উদ্দেশ্য হইল বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রস্তাবিত আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও পরীক্ষা করা। আইন-প্রণয়ন-কার্যে অবহেলা ঘটিলে জনস্বার্থ ব্যাহত হয় এবং এইজন্যই আইন-প্রণয়নের পূর্বে বিশেষ বিবেচনা অপরিহার্য। আইনসভা প্রতিনিধিমূলক সভা। বহুশত সদস্য লইয়া এই সভা গঠিত। সুতরাং এত অধিক সংখ্যক সদস্যের পক্ষে প্রস্তাবিত আইনের বিস্তারিত পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করিবার সময়ও থাকে না এবং আইন-প্রণয়নে যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাহারও নিতান্ত অভাব। সেই কারণে অল্প সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত বিভিন্ন শ্রেণীর আইনের আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলিতে প্রথম বা দ্বিতীয় পাঠের পর প্রস্তাবিত আইন প্রেরিত হয়। সংশ্লিষ্ট কমিটি আইনটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া ইহার সুপারিশসহ অথবা বিনা সুপারিশে আইনসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে।

বাংলাদেশও উপরি-উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিতে পারেন :

১। সরকারী হিসাব কমিটি

২। বিশেষ অধিকার কমিটি

৩। সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

কমিটিগুলির কার্য—Functions of the Committees

১। খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবে।

২। আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩। জনগুরুত্ব-সম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয় সম্পর্কে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্পর্কে কমিটি অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন হইলে মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত জবাব পাইতে পারিবেন।

৪। সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে-কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

সংসদ আইনের দ্বারা নিযুক্ত কমিটিসমূহকে সাক্ষীর হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের এবং দলিলপত্র দাখিল করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ন্যায়পাল—Nayapal

সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন। সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধানবদ্ধ কর্তৃপক্ষের যে-কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা করিবার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রদান করিবেন ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত করিবেন।

ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি বাংলাদেশের সংবিধানের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য। অবশ্য অনেক দেশেই অনুরূপ পদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে সরকারী কর্মে শৈথিল্য ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব হ্রাস পাইতে পারে। যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ না হইলে সরকারী কাযে অযথা হস্তক্ষেপের ফলে সরকারী কার্য ব্যাহত হইতে পারে। এই পদ সৃষ্টিতে সোভিয়েত সংবিধানে বর্ণিত প্রোকিউরেটর জেনারেল পদের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

বিচার বিভাগ—The Judiciary

সুপ্রীম কোর্ট—The Supreme Court

সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্ট নামে অভিহিত সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে। একজন প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক বিভাগে কত সংখ্যক বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন তাহা রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত করিবেন। প্রয়োজন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। বাষট্টি বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিচারপতিগণ কার্য করিতে

পারিবেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁহারা কোন আদালতে ওকালতি বা প্রজাতন্ত্রের অন্য কোন কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

যোগ্যতা—বিচারপতি হইতে গেলে তাঁহাকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে, সুপ্রীম কোর্টে দশ বৎসর কাল অ্যাড্‌ভোকেট থাকিতে হইবে, বাংলাদেশের কোন বিচার বিভাগীয় পদে অন্যূন দশ বৎসর অধিষ্ঠান করিতে হইবে, অন্যূন দশ বৎসর কাল অ্যাড্‌ভোকেট থাকিতে হইবে এবং অন্যূন তিন বৎসরকাল কোন জেলা বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ করিতে হইবে।

অপসারণ—কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত প্রমাণিত অসদাচরণ, অসামর্থ্যের কারণ সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার ⅔ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশে কোন বিচারপতিকে অপসারণ করা যাইবে।

প্রধান বিচারপতির কোন কারণে অনুপস্থিতিকালে অথবা প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে রাষ্ট্রপতি ক্ষেত্রমত প্রধান বিচারপতি কার্যে যোগদান না করা পর্যন্ত অথবা নূতন প্রধান বিচারপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপীল বিভাগের প্রধানতম বিচারককে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সাধারণতঃ রাজধানী ঢাকা শহরে সুপ্রীম কোর্ট বসিবে তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্যস্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার—Jurisdiction of the High Court Division

এই বিভাগ সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে-কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত নির্দেশাবলী ও আদেশাবলী দান করিতে পারিবে। প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে বে-আইনী কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া, প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সংশ্লিষ্ট যে-কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসঙ্গত

কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন, অথবা যে-কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে (অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বে-আইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা কোন সরকারী পদে আসীন বা অধীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ব বলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ দান করিয়া উক্ত বিভাগে আদেশদান করিতে পারিবেন।

কিন্তু যেখানে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থার বা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে, সেইক্ষণে এ্যাটর্নি-জেনারেলের বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত উপরি-উক্ত দুইটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দান করিবেন না।

আপীল বিভাগের এখতিয়ার—Jurisdiction of the Appeleate Division

হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, দণ্ডাদেশ বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর এবং তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, হাইকোর্ট বিভাগের ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেইক্ষেত্রে অধিকার বলে আপীল করা যাইবে, যেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ (ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে অথবা (খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন বা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন অথবা (গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিয়াছেন। সংসদ-প্রণীত আইন দ্বারা হাইকোর্টের বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে অন্যান্য মামলায় আপীল বিভাগে আপীলের অনুমোদন করিলে সেই মামলার আপীল চলিবে।

কোন ব্যক্তির হাজিরা বা কোন দলিলপত্র উদ্‌ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে-কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায় বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেই নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রি বা রীট জারী করিতে পারিবে।

সংসদের যে-কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে এবং আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে-কোন বিধি সাপেক্ষে আপীল বিভাগের ঘোষিত কোন রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।

সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে-কোন আইন সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের ও অধস্তন যে-কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন। হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইবুনালের উপরি-উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকিবে। সুপ্রীম কোর্ট একটি 'কোর্ট অব রেকর্ড' হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দণ্ডাদেশ দানের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে-কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা হইল ইহার উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার। রাষ্ট্রপতি কোন আইনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা হইতে পারে এবং বিষয়টি এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। আপীল বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠা—Creation of Inferior Courts

আইনের দ্বারা অন্যান্য অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে—

(ক) জেলা বিচারকের পদের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশক্রমে

(খ) অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারী কমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের

পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করিবেন।

জেলা জজ নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা হইল:

(ক) নিয়োগ লাভের সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মরত থাকেন এবং উক্ত কর্মে অন্যূন সাত বৎসর কাল বিচার বিভাগীয় পদে বহাল থাকিতে হইবে, (খ) অন্যূন দশ বৎসর কাল অ্যাডভোকেট থাকিতে হইবে। বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগে দায়িত্ব পালনেরত ম্যাজিস্টেটদের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, দান, ছুটি মঞ্জুরী ও শৃংখলা বিধান সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল—Administrative Tribunal

সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল গঠন করিতে পারিবেন। কর্ম বিভাগ ও সরকারী কর্ম কমিশন-সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী, যে-কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে বা সংবিধানবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের চালনা, ব্যবস্থাপনা বা অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধানবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা এবং যে আইনের উপর এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (৩) দফা (যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ দানের ক্ষমতা থাকিবে না) প্রযোজ্য হয়, সেইরূপ কোন আইন এই ট্রাইবুনালের এখতিয়ারভুক্ত হইবে।

প্রতিষ্ঠিত কোন ট্রাইবুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ের উপর অন্য কোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ প্রণয়ন করিবেন না। তবে সংসদ আইনের দ্বারা কোন প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা ইহার বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।

কর্ম বিভাগ—Public Services

এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত উপরি-উক্ত ক্ষমতাসমূহ রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময় সীমা পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকিবেন। অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ বরখাস্ত করিতে পারিবেন না। কতিপয় শর্তসাপেক্ষে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ দর্শাইবার সুযোগ দান না করা পর্যন্ত বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনতি করা যাইবে না। আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বিভাগসমূহের সৃষ্টি, সংযুক্তকরণ বা একীকরণসহ পুনর্গঠন করা যাইবে। এরূপ আইনের দ্বারা নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কর্মের শর্তাবলীর তারতম্য করিতে বা তাহা রদ করিতে পারিবে।

সরকারী কর্ম কমিশন—Public Service Commission

আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা যাইবে এবং একজন সভাপতি ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে।

রাষ্ট্রপতি কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণকে নিযুক্ত করিবেন। কমিশনের সদস্যগণের অন্ততঃ অর্ধেক সদস্যগণ ২০ বৎসর কাল বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে কোন সরকারী কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি হইবেন। কর্ম কমিশনের সদস্যগণ পাঁচ বৎসর বা বাষট্টি বৎসর পর্যন্ত উক্ত পদে নিযুক্ত থাকিবেন। তবে কার্যকালের মধ্যে যেটি আশু হইবে, সেই অনুসারে কার্যে বহাল থাকিবেন। সভাপতিসহ কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণকে অপসারণ করিতে হইলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে যে পদ্ধতিতে অপসারণের ব্যবস্থা আছে, সেই পদ্ধতি ব্যতীত অপসারণ করা যাইবে না।

কমিশনের কার্য—প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ দানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বাছাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন সদস্য অপসারণ বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান; এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন। রাষ্ট্রপতি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কমিশনের সহিত

পরামর্শ করিতে পারেন, যথা, প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি, প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃংখলামূলক বিষয়াদি ইত্যাদি।

কমিশন প্রত্যেক বৎসরান্তে মার্চ মাসের প্রথম দিবসে এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি স্মারকলিপিসহ রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

নির্বাচন—Election

বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনা করিবার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সংখ্যক অন্যান্য সদস্য লইয়া কমিশন গঠিত হইবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। নির্বাচন কমিশনারগণ পাঁচ বৎসরের জন্য কার্যে বহাল থাকিবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মেয়াদ অন্তে দ্বিতীয়বার আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হইতে পারিবেন না, তবে অন্য কমিশনারগণ অনুরূপ কর্মাবসানের পর প্রধান কমিশনাররূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন।

নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালন ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন। নির্বাচন কমিশনারগণকে পদচ্যুত করিতে গেলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ অপসারণ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাদের কাজের শর্তাবলী সংসদ কর্তৃক নির্ধারণসাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির আদেশের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। নির্বাচন কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগ করিতে পারেন।

কমিশনের দায়িত্ব—সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংসদের নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন ;

(খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন, এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ ও ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন। এতদ্ব্যতীত সংবিধান বা আইন দ্বারা প্রদত্ত অন্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচন এলাকায় একটি করিয়া ভোটার তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।

ভোটার তালিকার নামভুক্তির যোগ্যতা—

(১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে;

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;

(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃস্থিত বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে উক্ত পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

সংসদ আইন প্রণয়ন করিয়াও নির্বাচন সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশকে একটি গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সংবিধানে ১৮ বৎসর বয়স্ক জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষের ভোটাধিকার প্রদান করিয়া উক্ত ঘোষণা কার্যকর করা হইয়াছে। নির্বাচন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন পরিচালনা ব্যাপারে অন্যনিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

সংবিধান সংশোধন—Amendment of the Constitution

সংবিধানের দশম ভাগে ১৪২ অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনযোগ্য।

(ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান নিম্নলিখিত শর্তে সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে—

(অ) অনুরূপ সংশোধনী বা রহিতকরণের জন্য আনীত কোন বিলের শিরোনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন বা রহিত করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকা চাই-ই।

(আ) সংসদের সদস্যসংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক গৃহীত হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতি দানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা যাইবে।

(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে বিলটি গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি সম্মতি দান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

সুতরাং সংশোধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি আদৌ জটিল নহে বলিয়া মনে হয়। সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংবিধান পরিবর্তন করিতে না পারিলেও সংশোধন পদ্ধতিটিকে অনাবশ্যকরূপে জটিল ও দীর্ঘ করা হয় নাই। পদ্ধতিটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, সংবিধানের কোন্ অংশ সংশোধন বা রহিত করিতে হইবে তাহা স্পষ্টভাবে বিলটির শিরোনামায় থাকা চাই-ই। রাষ্ট্রপতির সম্মতি দান আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। বাংলাদেশে ক্ষমতার উৎস হইল জনগণ এবং এই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের অবধারিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে সংবিধান সংশোধন করিবার ব্যবস্থা দ্বারা রাষ্ট্রের গণ-প্রজাতন্ত্রী প্রকৃতি প্রকটিত হইয়াছে।

স্থানীয় শাসন—Local Government

আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় ভার প্রদান করা হইবে। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনসাপেক্ষে উপরি-উক্ত উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয়-সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে—

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

প্রথমোক্ত বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ, নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ—Military Services

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে। সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন—

(ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহ এবং বিভাগসমূহের সংরক্ষিত অংশসমূহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ,

(খ) উক্ত কর্ম বিভাগসমূহে কমিশন মঞ্জুরী,

(গ) প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগপত্র ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করা;

(ঘ) উক্ত কর্ম বিভাগসমূহ ও সংরক্ষিত অংশসমূহ সংক্রান্ত শৃংখলামূলক ও অন্যান্য বিষয়।

সংসদ আইন দ্বারা উপরি-উক্ত বিধানাবলী নির্ধারণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সে সকল বিষয়ের জন্য আইন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না বা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

বাংলাদেশ স্থল, জল বা আকাশপথে আক্রান্ত হইলে রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং সংসদের বৈঠক না থাকিলে অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করিবেন।

যুদ্ধ কিংবা আক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহের কালে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য বলিয়া অভিব্যক্ত সংসদের বিধিবদ্ধ কোন আইনকে এই সংবিধানের কোন কিছুই অবৈধ করিবে না।

বিবিধ—Miscellaneous

শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নীতি ও নিয়মগুলি ব্যতীতও বহু বিষয় বাংলাদেশের সংবিধানে স্থান পাইয়াছে। ভারতের সংবিধানেও বিবিধ বস্তু সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। বাংলাদেশের সংবিধানের এই বিবিধ বিধানাবলীতে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব, বাংলাদেশের নামে মামলা, কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক, ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী আইন, সংবিধানের প্রবর্তন, উল্লেখ ও পাঠ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সম্পত্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীতও ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধককরণ, বিলি-ব্যবস্থা, যে কোন কারবার বা ব্যবস্থা পরিচালনা বা চুক্তি প্রণয়ন করা যাইবে।

বাংলাদেশ কর্তৃক বা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে।

কতিপয় পদাধিকারীর যথা, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিগণসহ প্রধানমন্ত্রী, মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রভৃতি পদের বেতন আইন দ্বারা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ক্ষেত্রে তাহা যেরূপ প্রযোজ্য ছিল, সেইরূপ হইবে অথবা উপরি-উক্ত বিধান প্রযোজ্য না হইলে রাষ্ট্রপতির আদেশের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় আদেশ রহিত করা হইয়াছে, যথা, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ সালের নির্বাচন কমিশন আদেশ, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সরকারী কর্ম সম্পাদন) আদেশ, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণ-পরিষদ আদেশ প্রভৃতি।

বিবিধ প্রসঙ্গে সংবিধানে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যথা, "নাগরিক" অর্থ নাগরিকতা সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক, "জেলা বিচারক" বলিতে অতিরিক্ত জেলা বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

"অর্থ বৎসর" বুঝাইতে জুলাই মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ, "প্রজাতন্ত্র" অর্থ গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, "শৃংখলা বাহিনী" অর্থ স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আইনের দ্বারা ঘোষিত যে-কোন শৃংখলা বাহিনী; "রাষ্ট্র" বলিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধানস্থ সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত, ইত্যাদি।

আরও বলা হইয়াছে যে, এই সংবিধানকে "গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের" সংবিধান বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং বাংলায় ইহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে যাহাতে গণ-পরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট দান করিবেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল—Political Parties in Bangladesh

বাংলাদেশের 'বিবিধ' শীর্ষক বিধানাবলীর মধ্যে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। "রাজনৈতিক দল বলিতে এমন একটি অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোন নামে কার্য করেন বা কোন রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসঙ্ঘ হইতে পৃথক কোন অধিসঙ্ঘ হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন"।

উপরি-উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দল ব্যক্তি-সমষ্টি লইয়া গঠিত একটি সংঘ। প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র নাম থাকে। ইহারা আইনসভার ভিতরে ও বাহিরে কাজ করেন। প্রত্যেক দল ইহার মত প্রচারের বা কোন রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইহাকে অন্যান্য অনুরূপ দল হিসাবে পৃথক মনে করেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল হইল—

১। আওয়ামী লীগ দল—এই দল প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ দল নামে গঠিত হয়। পরে সাম্প্রদায়িকতাসূচক 'মুসলীম' শব্দটি পরিহার করিয়া আওয়ামী লীগ দল নামে পুনর্গঠিত হয়। সাম্প্রদায়িকতা বর্জনের ফলে এবং ইহার উদার ও প্রগতিশীল কার্যক্রমে আকৃষ্ট হইয়া বহু অ-মুসলমান এই দলে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করেন। এই দল ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

জনসাধারণকে প্রচার মাধ্যমে এইরূপভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় যে, তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় মুসলীম লীগ দল নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহার নিকট পর্যুদস্ত হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দল শুধু পূর্ব-পাকিস্তানে নয় অখণ্ড পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

এই দলের রাজনৈতিক আদর্শ হইল বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী গণ-প্রজাতন্ত্রী ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করা। ইহার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা। ইহারা জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার সুনিশ্চিত করিতে কৃতসংকল্প। এই দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া পূর্ব-পাকিস্তান রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। এই দলের একটি প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপভাবে এই দল প্রণীত সংবিধান ১৮ বৎসর বয়স্ক বাংলাদেশের প্রত্যেক নরনারীকে ভোটদান ক্ষমতা প্রদান করিয়া মূঢ় ও মূক জনগণকে তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার স্বাধীনতা দান করিয়াছে। এই দল এখন বাংলাদেশের সরকারী দল এবং ক্ষমতায় আসীন হইয়া ইহার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শগুলি বাস্তবায়নের জন্য গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। পররাষ্ট্র সম্পর্কেও এই দল উদারপন্থী। এই দলের উদ্দেশ্য হইল যুদ্ধ পরিহার করিয়া পররাষ্ট্রের সহিত সহাবস্থান নীতি অনুযায়ী শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করা।

২। মৌলানা ভাসানীর দল—এই দলও সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী নহে এবং বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব সমর্থন করে। এই দল চৈনিক সাম্যবাদে আস্থাবান ও চীনের অনুগত বলিয়া পরিচিত। ইহারা আওয়ামী লীগের সকল নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন করে না। এই দলের অনুগামী সংখ্যা স্বল্প।

৩। মুসলিম লীগ দল—এই দলটি পূর্বাবধি একটি সাম্প্রদায়িক দল। এই দলে অ-মুসলমান সদস্য হইতে পারিত না। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বৎসর পর পর্যন্ত এই দল পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল এবং কয়েকবার সরকারও গঠন করিয়াছে। কেবলমাত্র মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহারা জাতীয়তাবাদ, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নহে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের কালে দেশের

বিরুদ্ধে এই দল পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে সাহায্য করে। বর্তমানে বাংলাদেশে এই দলের আর বিশেষ কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই।

৪। অধ্যাপক মজফফর আহমেদের সাম্যবাদী দল—এই দলটি অনেক বিষয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া থাকে। কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, কৃষক ও শ্রমিক লইয়া এই দল গঠিত। ইহারা সোভিয়েত সাম্যবাদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত এবং বাংলাদেশেও সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চায়।

৫। জামায়েৎ উলেমা দল—এই দলকে রাজনৈতিক দল না বলিয়া একটি ধর্মীয় সংগঠন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দল সাম্প্রদায়িকতার ও ইসলামী নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করিতে চায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দল মুসলীম লীগের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেশদ্রোহিতা করে। বর্তমানে বাংলাদেশে এই দলের প্রভাব ক্ষীয়মান।

সংক্ষিপ্তসার

বাংলাদেশের সংবিধান—প্রস্তাবনাসহ ৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই সংবিধানে একাদশটি ভাগ, ১৪৩টি অনুচ্ছেদ ও ৪টি তফসিল আছে। শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ এই সংবিধানে লিখিতভাবে আছে।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১। বাংলা ভাষায় লিখিত, ২। এককেন্দ্রীয়, ৩। পার্লামেন্টারী বা মন্ত্রিসভা পরিচালিত, ৪। এক কক্ষ-বিশিষ্ট, ৫। প্রস্তাবনা সম্বলিত, ৬। রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি ও নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত, ৭। লিখিত, ৮। দুষ্পরিবর্তনীয়, ৯। সংবিধানের প্রাধান্য, ১০। ধর্মনিরপেক্ষতা।

প্রস্তাবনা—প্রস্তাবনার অর্থ হইল ভূমিকা। প্রস্তাবনায় সংবিধানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা এই চারিটি হইল সংবিধানের মূলনীতি। শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য সুনিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতা সৃষ্টি করাও এই রাষ্ট্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি

মূলনীতিগুলি হইল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি, কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা রক্ষা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য রূপে কর্ম, জাতীয় সংস্কৃতি ও স্মৃতি-নিদর্শন সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা।

উপরি-উক্ত মূলনীতিগুলি সরকারের সদিচ্ছার পরিচায়ক। এইগুলির নৈতিক মূল্য থাকিলেও ইহাদের পশ্চাতে কোন আইনগত সমর্থন নাই।

মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

সংবিধানে বিধিবদ্ধ প্রধান প্রধান মৌলিক অধিকার হইল—১। আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ২। সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সমতা, ৩। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, ৪। জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, ৫। চলা-ফেরার স্বাধীনতা, ৬। সমাবেশের স্বাধীনতা, ৭। সংগঠনের স্বাধীনতা, ৮। বাক্-স্বাধীনতা এবং চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ৯। পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ১০। ধর্মীয় স্বাধীনতা, ১১। সম্পত্তির অধিকার, ১২। গৃহ ও যোগাযোগের স্বাধীনতা।

মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল হইবে।

সাধ্যানুসারে প্রত্যেকের কাজ করা, শৃংখলা রক্ষা করা প্রভৃতি হইল নাগরিক কর্তব্য

নির্বাহী বিভাগ—রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা ও কর্মবিভাগ লইয়া নির্বাহী বিভাগ গঠিত।

রাষ্ট্রপতি—রাষ্ট্রপতি হইলেন রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতিকে অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে। তিনি স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারেন অথবা অভিশংসন পদ্ধতিতে

তাঁহাকে অপসারণ করা চলে। কোন রাষ্ট্রপতিই পর পর বা সময়ের ব্যবধানেও দুই বারের অধিক উক্ত পদে বহাল থাকিতে পারেন না।

ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে—শাসন-সংক্রান্ত, ২। আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক, ৩। অর্থ-সম্পর্কিত, ৪। ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা, ৫। সামরিক, ৬। অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা, ৭। সংসদে ভাষণদান ও বাণী প্রেরণ।

কিন্তু সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার ক্ষমতা-প্রয়োগের সকল ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী কাজ করিবেন। তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন নাই। রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নাম-সর্বস্ব নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান মাত্র।

প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

একজন প্রধান মন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রিগণ প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। মন্ত্রিসভা হইল প্রকৃত শাসক।

প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তিনি রাষ্ট্রপতির নামে মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন ও বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। প্রধান মন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিসভার সভাপতি। মতানৈক্যের ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। প্রধান মন্ত্রী হইলেন সংসদের ও নেতা এবং জনগণের নেতা। মন্ত্রিগণ আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী।

মন্ত্রিসভার কার্য ও ক্ষমতা

১। আইনের প্রস্তাবগুলির বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা, ২। আইন প্রণয়ন করা, ৩। আয় ব্যয় নির্ধারণ ও বাজেট প্রণয়ন, ৪। সরকারী নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা, ৫। আইনসভায় সরকারী নীতি ও কার্যসূচী ব্যাখ্যা করা ও সমর্থন করা, ৬। যুদ্ধ ঘোষণা করার দায়িত্ব।

আইনসভা—জাতীয় সংসদ

প্রাপ্তবয়স্কের (১৮ বৎসর) ভোটাধিকার ভিত্তিতে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য লইয়া জাতীয় সংসদ গঠিত। সংবিধান চালু হইবার পর ১০ বৎসর পর্যন্ত ১৫ জন মহিলা নির্বাচিত হইবেন। সংসদ সদস্য হইতে

গেলে তাহাকে দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ হইলে চলিবে না এবং কোন প্রকারে অযোগ্য হইলে চলিবে না। দলত্যাগ বা দলের বিরুদ্ধে ভোট দান করিলে তাঁহার পদ শূন্য হইবে।

সরকারী বিজ্ঞপ্তির দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। সংসদে রাষ্ট্রপতি ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন। সংসদের কার্যপরিচালনার জন্য একজন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

স্পীকার—নির্বাচিত হইবার পর স্পীকার সাধারণতঃ দলনিরপেক্ষ থাকিবেন। তিনি সংসদের কার্যপরিচালনা করেন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। তিনি সংসদের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন। কোন বিষয়ে বৈধতায় প্রশ্ন উঠিলে তিনি নিষ্পত্তি করেন। তিনি সদস্যগণের অধিকার রক্ষা করেন। উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি অতিরিক্ত ভোট দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সাময়িক অনুপস্থিতিকালে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। কোন বিল অর্থ-বিল কিনা তাহা তিনি স্থির করেন। স্পীকারের অনুপস্থিতিক্ষেত্রে ডেপুটি-স্পীকার তাঁহার কার্য পরিচালনা করেন।

সংসদের কার্য ও ক্ষমতা

১। আইনের প্রস্তাবের বিশেষ বিবেচনা করা, ২। আইন প্রণয়ন করা, ৩। সরকারী আয় ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা, ৪। বাজেট মঞ্জুর করা, ৫। প্রশ্নোত্তর, সমালোচনা ও অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিগণের দায়িত্ব বলবৎ করা, ৬। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না, ৭। রাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ, কর্ম কমিশনের সভাপতি, মহা হিসাব-পরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের অভিশংসন ক্ষমতা।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—১। খসড়া আইন প্রণয়ন, ২। আইনসভায় পেশ, ৩। প্রথম পাঠ, ৪। দ্বিতীয় পাঠ, ৫। কমিটিতে প্রেরণ, ৬। কমিটি হইতে সুপারিশসহ অথবা বিনা সুপারিশে সংসদে প্রেরণ, তৃতীয় পাঠ—রাষ্ট্রপতির সম্মতি। রাষ্ট্রপতি বিলটিকে ১৫ দিনের মধ্যে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে প্রেরণ করিতে পারেন। সংসদ রাষ্ট্রপতির

সুপারিশ গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট পুনঃপ্রেরণ করিলে রাষ্ট্রপতিকে সাত দিনের মধ্যে উক্ত বিলে সম্মতি দান করিতে হইবে নতুবা উক্ত মেয়াদ অন্তে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থবিলের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসৃত হইলেও কোন অর্থবিল বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হইতে পারে না। সদস্যগণ অর্থমঞ্জুরী পরিমাণ হ্রাস করিতে অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন মাত্র। কিন্তু প্রত্যেক অর্থবিল স্পীকার কর্তৃক অর্থবিল বলিয়া ঘোষিত হইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি অর্থবিলে ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি দান করিলে অর্থবিল উক্ত মেয়াদ অন্তে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। আয়-ব্যয়, ঋণদান, ঋণ গ্রহণ, সরকারী সম্পত্তিবিষয়ক ব্যাপারগুলি অর্থবিলের অন্তর্ভুক্ত।

বিচারবিভাগ—সুপ্রীম কোর্ট

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হইল সুপ্রীম কোর্ট। ইহার দুইটি বিভাগ আছে, যথা, হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ। এই আদালতের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। ইহা ছাড়া প্রয়োজন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত বিচারপতিও নিযুক্ত করিতে পারেন। বিচারপতিগণ বাষট্টি বৎসর পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকিতে পারেন কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহারা লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ করিতে পারেন। অবধারিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের জন্য অভিশংসন পদ্ধতিতে তাঁহাদের অপসারিত করা যায়।

হাইকোর্ট বিভাগের উপর আদিম, আপীল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা আইনের দ্বারা অর্পণ করা যাইবে। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের এবং কতিপয় আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রেও হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা থাকিবে।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, দণ্ডাদেশ বা কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আবেদন করা যাইবে। আপীল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা থাকিবে।

সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে তাঁহাকে আইন-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ইহার মতামত জ্ঞাপন করিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির

অনুমোদনক্রমে প্রত্যেক বিভাগের ও অধস্তন আদালতগুলির জন্য বিধিগুলি প্রণয়ন করিতে পারে ও অন্যান্য আদালতসমূহের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদে ও জেলা জজের পদে নিয়োগ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট সুপারিশ করিবে।

এতদ্ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের কর্মের শর্তাবলী, অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ড ব্যাপারের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল গঠন করিতে পারিবে।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের জন্য একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্য করিতে পারিবেন। মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সকল হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করিবেন। অভিশংসন পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহাকে অপসারণ করা যাইবে না।

অ্যাটর্নি-জেনারেল

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইবার যোগ্যতা-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি উক্তপদে নিযুক্ত করিবেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব তিনি পালন করিবেন। বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার আছে।

কর্মবিভাগ

সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবেন। কর্মচারিগণ রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময় সীমা পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকিবেন। কোন কর্মচারীকে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ কার্য হইতে বরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

সরকারী কর্ম কমিশন

একজন সভাপতি ও কতিপয় সদস্য লইয়া বাংলাদেশে একটি বা একাধিক কর্ম কমিশন গঠিত হইবে। সভাপতি ও সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অভিশংসন পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহাদের অপসারণ

করা চলিবে না। কমিশনের কার্য হইল নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বাছাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা। কমিশনের ইহার কার্যের জন্য একটি বার্ষিক বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে।

নির্বাচন

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যগণের নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে একজন সভাপতি ও কতিপয় সদস্যসহ একটি নির্বাচনী কমিশন গঠিত হইবে। সভাপতিসহ সকল সদস্যই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। একমাত্র অভিশংসন পদ্ধতিতে কমিশনারগণকে পদচ্যুত করা যায়।

নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক এলাকায় একটি ভোটার তালিকা থাকিবে এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে ১৮ বৎসর বয়স্ক যোগ্য ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক ভোটার হইতে পারিবেন।

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

১। সংবিধানের কোন অংশ সংশোধন করিতে হইলে একটি বিলের আকারে সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে আনিতে হইবে এবং বিলটির শিরোনামায় স্পষ্টভাবে কোন্ অংশ সংশোধন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা থাকা চাই।

২। উপরি-উক্ত শর্ত পালিত হইলে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইতে হইবে।

৩। এইরূপে সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি সাতদিনের মধ্যে তাঁহার সম্মতি দান করিলে সংশোধনী প্রস্তাব পাস হইবে—রাষ্ট্রপতি সম্মতি দান না করিলেও উক্ত মেয়াদ অন্তে বিলটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বিবিধ—বাংলাদেশের এই বিবিধ বিধানাবলীতে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ও কারবার সম্পর্কে নির্বাহী কর্তৃত্ব, বাংলাদেশের নামে মামলা, কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক, শাসন ব্যাপার সম্পর্কিত কতিপয় শব্দের অর্থ, ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী আইন, সংবিধানের প্রবর্তন, উল্লেখ ও পাঠ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

রাজনৈতিক দল

১। আওয়ামী লীগ—সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। এই দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকার গঠন করিয়াছে। জাতীয়তাবাদ,

সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা হইল এই দলের আদর্শ চতুষ্টয়। শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গঠন করিয়া মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা ইহাদের অন্যতম লক্ষ্য।

২। মৌলানা ভাসানীর দল—ইহারা চীনপন্থী সাম্যবাদী। বাংলাদেশে প্রভাব-প্রতিপত্তি অতি স্বল্প।

৩। অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদের দল—ইহারা সোভিয়েতপন্থী সাম্যবাদী দল। সরকারের সহিত অনেক বিষয়ে সহযোগিতা করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত মুসলিম লীগ, জামায়েত্ উলেমা দল সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। ইহাদের বিশেষ কোন কার্যক্রমও নাই। অনুগামী সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প।

প্রশ্নাবলী

১। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। এই সঙ্গে ইহার কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

Discuss the main characteristics of the Constitution of Bangladesh. Mention, in this connection, some of its original provisions.

২। প্রস্তাবনার অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত প্রস্তাবনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

What are the meaning and aims of a Preamble. Discuss, in this connection, the significance of the preamble to the Constitution of Bangladesh.

৩। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র-পরিচালনার মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর।

Explain the fundamental principles of State policy as stated in the Constitution of Bangladesh.

৪। মৌলিক অধিকার বলিতে কি বুঝ? বাংলাদেশের সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সহিত রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতিগুলির পার্থক্য দর্শাও।

What do you mean by 'Fundamental Rights'? Point out the difference between the fundamental rights as embodied in the Constitution of Bangladesh and fundamental principles of State policy.

৫। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতিতে বলা হইয়াছে যে, 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা' হইল রাষ্ট্রের প্রধান আদর্শসমূহ।

উপরি-উক্ত আদর্শগুলির সমালোচনামূলক আলোচনা কর।

The fundamental principles of State Policy states that the ideals for which the state stands are 'Nationalism, Socialism, Democracy and Secularism'.

Give a critical estimate of the above ideals.

৬। বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ কি কি লইয়া গঠিত? আইন-সভার সহিত (জাতীয় সংসদ) ইহার সম্পর্ক নির্ণয় কর।

What constitutes the Executive Department of Bangladesh ? Discuss its relation with the Legislature.

৭। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নিয়োগ, অপসারণ পদ্ধতি ও অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা আলোচনা কর।

Discuss the procedure of appointment, removal and power of ordinance-making of the President of Bangladesh.

৮। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি শাসন করেন না।

উক্তিটির সমালোচনামূলক আলোচনা কর।

In spite of the extensive powers vested in the President of Bangladesh, he does not govern.

Critically examine the statement.

৯। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সহিত রাষ্ট্রপতির, মন্ত্রিসভার ও আইন-সভার সম্পর্ক বিচার কর।

Examine the relation between the Prime Minister and the President, the Council of Ministers and the Legislature.

১০। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন, কার্য ও ক্ষমতা আলোচনা কর।

Discuss the composition, functions and powers of the Legislature of Bangladesh.

১১। বাংলাদেশের সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

Discuss the procedure of ordinary law-making in Bangladesh.

১২। বাজেট কাহাকে বলে? বাংলাদেশের বাজেট কি করিয়া পাস হয়?

What is a Budget? How is the Budget of Bangladesh passed?

১৩। সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও এখতিয়ার বর্ণনা কর। মৌলিক অধিকার বলবৎ ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা কি?

Discuss the Composition and Jurisdiction of the Supreme Court What part does it play in the enforcement of Fundamental Rights?

১৪। বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা আলোচনা কর।

Discuss the role of the Comptroller and Auditor-General of Bangladesh.

১৫। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন-পদ্ধতি আলোচনা কর। এই সংবিধান সহজ পরিবর্তনীয় অথবা দুষ্পরিবর্তনীয়? যুক্তিসহ উত্তর প্রদান কর।

Discuss the procedure of the amendment of the Constitution of Bangladesh. Is it flexible or rigid? Give reasons for your answer.

১৬। বাংলাদেশের নির্বাচন-পদ্ধতি আলোচনা কর। নির্বাচন-পদ্ধতি তোমার মতে বাংলাদেশে গণ-প্রজাতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-গঠনে কতদূর সাহায্য করিয়াছে তাহা আলোচনা কর।

Discuss the procedure of election in Bangladesh. Discuss how far, in your opinion, the procedure has helped to establish a secular democratic republic in Bangladesh.

১৭। বাংলাদেশের সংবিধানের বিবিধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় বিষয় আলোচনা কর।

Discuss some of the provisions of the miscellaneous provisions of Bangladesh Constitution.

১৮। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর টিকা লিখ :—

(ক) অ্যাটর্নি-জেনারেল
(খ) সরকারী কর্ম-বিভাগ
(গ) সামরিক কর্ম-বিভাগ
(ঘ) স্থানীয় শাসন
(ঙ) শৃংখলামূলক আইন
(চ) শৃংখলা বাহিনী
(ছ) বাংলাদেশের নাগরিক
(জ) অর্থবিল
(ঝ) আওয়ামী লীগ।

Write notes on the following :—

(a) Attorney-General
(b) Public Services
(c) Military Services
(d) Local Government
(e) Law for enforcement of discipline
(f) Organisation for enforcing law and order
(g) Citizen of Bangladesh
(h) Money bill
(i) Awami League.